সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

র বী ন্দ্র-সং খ্যা

রবীন্দ্র-আলেখ্য

শিল্পী শশিকুমার হেশ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বর্ষ ৬৬ ॥ সংখ্যা ৩-৪

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা ৬

মূল্য দশ টাকা

বিষয়-সূচী

চিত্রসূচী

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র

রবীন্দ্র-সংগ্রহ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
বর্ষ ৬৬ সংখ্যা ৩-৪
রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি

রবীন্দ্রনাথ ও উপনিষদ্

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য

সূচনা ॥

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের নিকট লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ জানাইতেছেন—

"টমসন তাঁহার কেতাবে আমাকে আমার বায়ুমণ্ডল হইতে ছিন্ন করিয়া আনিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। ইহাতে কাজ সহজ হয়—রেখার স্পষ্টতা পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে সেই অতিস্ফুটতাই সত্যের অসম্পূর্ণতা। মানুষের কেবল যে ব্যক্তিত্ব আছে তাহা নহে, তাহার সম্বন্ধ আছে—সেই সম্বন্ধ দূরব্যাপী এবং তাহা অতি-নির্দ্দিষ্ট নহে। আমার সেই সম্বন্ধের সত্যটি টমসন দেখিতে পান না। তাঁহার সঙ্গে কথা কহিয়া দেখিয়াছি যে তিনি ঠিকমত জানেন না যে বৈষ্ণবসাহিত্য এবং উপনিষৎ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈরি করিয়াছে। নাইট্রোজেনে এবং অক্সিজেনে যেমন মেশে তেমনি করিয়াই তাহারা মিশিয়াছে। আমার রচনায় সীমা ও অসীমের দ্বন্দ্ব নাই, মিলন আছে তাহার কারণটি কেবলমাত্র আমার ব্যক্তিগত প্রকৃতিতে নাই, আমার চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া আছে; সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির বেড়ার ভিতর দিয়া ইহা বুঝা যায় না। আমার পিতার হৃদয়ে হাফিজ ও উপনিষদের এই সঙ্গম ঘটিয়াছিল—সৃষ্টির পক্ষে এইরূপ দুই বিষমের মিলনের প্রয়োজন আছে—সৃষ্টিকর্তার চিত্তের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই আছেন, নহিলে একভাবে সৃষ্টি হইতেই পারে না। কিন্তু কবির পক্ষে এ সকল তর্ক যদি ধৃষ্টতা হয়, তবে মাপ করিবেন।"[১]

'শান্তিনিকেতনে'র একটি ভাষণেও মহর্ষির উল্লেখপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই একই কথা বলিয়াছেন—

"প্রাচীন ভারতের তপোবনের ঋষিরা যেমন তাঁর গুরু ছিলেন, তেমনি পারস্যের সৌন্দর্য্যকুঞ্জের বুলবুল হাফেজ তাঁর বন্ধু ছিলেন। তাঁর জীবনে আনন্দ-প্রভাতে উপনিষদের শ্লোকগুলি ছিল প্রভাতের আলোক এবং হাফেজের কবিতাগুলি ছিল প্রভাতের গান। হাফেজের কবিতার মধ্যে যিনি আপনার রসোচ্ছ্বাসের সাড়া পেতেন তিনি যে তাঁর জীবনেশ্বরকে কিরকম নিবিড় রসবেদনা-পূর্ণ মাধুর্য্যঘন প্রেমের সঙ্গে অন্তরে বাহিরে দেখেছিলেন সে কথা অধিক করে বলাই বাহুল্য।"[২]

মহর্ষির নিকট হইতে পৈতৃক উত্তরাধিকারসূত্রে রবীন্দ্রনাথ ঔপনিষদ অধ্যাত্মবোধ লাভ করিয়াছিলেন—ইহা সত্য হইলেও, তিনি আপন কবিসুলভ সহজ তত্ত্বদৃষ্টি ও জীবন-

দর্শনের আলোকে উপনিষদের বহু-উচ্চারিত—"ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্"— মন্ত্রসমূহের যে নিগূঢ় অর্থ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে বিষয়েও কোনও সংশয় থাকিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের জীবনের সহিত উপনিষদের সম্বন্ধ এতই সুগভীর ও অবিচ্ছেদ্য, যে একটিকে বাদ দিয়া অপরটিকে চিন্তা করাই দুরূহ ব্যাপার। উপনিষদের মন্ত্ররাজি রবীন্দ্রনাথের নিকট কতকগুলি তত্ত্বকথার সমষ্টিমাত্র ছিল না, উহা তাঁহার প্রাত্যহিক জীবনচর্য্যার মূলে জ্ঞান কর্ম ও প্রেমের অক্ষয় উৎসরূপে বিরাজমান ছিল। রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টিতে উপনিষৎ অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহার সমগ্র জীবনচর্য্যা সেই দৃষ্টির সহিত অবিরোধ সামঞ্জস্যসূত্রে গ্রথিত। এই দিক্ দিয়া রবীন্দ্রনাথের জীবনই বর্ত্তমানকালে উপনিষদের এক অভিনব প্রাণবন্ত ভাষ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রনাথ উপনিষৎকে কি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত ভাষণাংশটুকু হইতে উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে—

"উপনিষৎ ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি। এ যে কেবল সুন্দর শ্যামল ছায়াময় তা নয়, এ বৃহৎ এবং এ কঠিন। এর মধ্যে যে কেবল সিদ্ধির প্রাচুর্য্য পল্লবিত তা নয়, এতে তপস্যার কঠোরতা ঊর্ধ্বগামী হয়ে রয়েছে।"[৩]

রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টি যেমন সকল সংকীর্ণতাকে পরিহার করিয়া চলিত, বিশ্বের বিচিত্র বাণীর মধ্যে যেমন একটি গভীর ঐকতান আবিষ্কারের জন্য সর্বদা উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত, একটি পরম সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের মধ্যে যেমন সর্ববিধ আপাত-বিরোধ ও বৈষম্য নিমজ্জিত করিয়া দিতে অনুক্ষণ রত থাকিত, উপনিষদের মন্ত্ররাজিতেও অনুরূপ বাণীই ভারতীয় ঋষিগণের উদার কণ্ঠ হইতে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন—

"স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুকের সঙ্গে যখন আমার আলাপ হয়েছিল, তখন তিনি আমাকে বললেন যে, কোনো-একটা বিশেষ সাম্প্রদায়িক দলের কথা বা বিশেষ দেশের বা কালের প্রচলিত রূপক ধর্মমত বা বিশ্বাসের সঙ্গে আমার কবিতা জড়িত নয় ব'লে আমার কবিতা প'ড়ে তাঁদের আনন্দ ও উপকার হয়েছে।...আমাদের উপনিষদের বাণীতে কোনো বিশেষ দেশকালের ছাপ নেই—তার মধ্যে এমন কিছুই নেই যাতে কোনো দেশের কোনো লোকের কোথাও বাধতে পারে। তাই সেই উপনিষদের প্রেরণায় আমাদের যা-কিছু কাব্য বা ধর্মচিন্তা হয়েছে সেগুলো পশ্চিম দেশের লোকের ভালো লাগবার প্রধান কারণই হচ্ছে তার মধ্যে বিশেষ দেশের কোনো সংকীর্ণ বিশেষত্বের ছাপ নেই।"[৪]

এইভাবে উপনিষদের ভাবধারায় আবাল্য বর্ধিত কবি আপনার মানস ও অধ্যাত্ম-লোকের পরিপুষ্টিসাধন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহার দৃষ্টিও প্রাচীন ঋষিকবিগণের দৃষ্টির ন্যায়ই স্বচ্ছ, নির্মল, উদার এবং দেশকালবিনির্মুক্ত হইতে পারিয়াছিল। তাহার উপর ছিল প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে স্বাধীন বন্ধনহীন ক্রীড়া—বিশেষতঃ, শান্তিনিকেতনের দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরে নিরন্তর ঈশ্বরারাধনার পরিবেশের মধ্যে মহাকবি

আপনার অধ্যাত্মবোধের উপযুক্ত পরিমণ্ডলই খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। 'শান্তিনিকেতন' ভাষণের এক স্থলে কবি বলিতেছেন—

"এই আশ্রমে আছে কী? মাঠ এবং আকাশ এবং ছায়াগাছগুলি, চার দিকে একটি বিপুল অবকাশ এবং নির্মলতা। এখানকার আকাশে মেঘের বিচিত্র লীলা এবং চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহতারার আবর্তন কিছুতে আচ্ছন্ন হয়ে নেই।…চার দিকে বিশ্ব-প্রকৃতির এই অবাধ প্রকাশ এবং তার মাঝখানটিতে শান্তং শিবমদ্বৈতমের দুই সন্ধ্যা নিত্য আরাধনা—আর কিছুই নয়। গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে, উপনিষদের মন্ত্র পঠিত হচ্ছে, স্তবগান ধ্বনিত হচ্ছে, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর—সেই নিভৃতে, সেই নির্জনে, সেই বনের মর্মরে, সেই পাখির কূজনে, সেই উদার আলোকে, সেই নিবিড় ছায়ায়।"[৫]

২. দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ॥

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতেই উপনিষদের মন্ত্রগুলিকে একটি সমন্বয়াত্মক যোগসূত্রের দ্বারা গ্রথিত করিবার চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। বিভিন্ন ঋষির বিভিন্ন কালে দৃষ্ট মন্ত্ররাজির মধ্যে সমন্বয় স্থাপন কতখানি সম্ভব, তাহা সত্যই বিচারসহ। কিন্তু ব্যাখ্যাকারগণের চেষ্টার বিরাম নাই। এই বিভিন্ন ব্যাখ্যানশৈলী হইতেই পরবর্তীকালে বেদান্তদর্শনের বিভিন্ন প্রস্থান গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল প্রস্থানভেদের মধ্যে আচার্য্য শঙ্করপ্রবর্তিত মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদই সর্বাধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে এবং ভারতীয় দার্শনিক মনীষার অপূর্ব কীর্তিস্তম্ভরূপে বিশ্বের বিদগ্ধসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এই দার্শনিকতার কথা বাদ দিলেও শঙ্করপ্রবর্তিত অদ্বৈতবাদের প্রভাব ভারতীয় সমাজজীবনের উপর দূরপ্রসারী হইয়াছিল, এবং অনেক ক্ষেত্রে যে কুফলও প্রসব করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আচার্য্য শঙ্করের কর্মসন্ন্যাসমার্গ তাঁহার অদ্বৈতবাদের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া গিয়া সাধারণ অল্পবুদ্ধি জনগণকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল, নিষ্ক্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। এই বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ ও কর্মসন্ন্যাসমার্গের বিরুদ্ধে যখন দ্বৈতবাদ মাথা চাড়া দিয়া উঠিল, জন-জীবনেও তাহার প্রভাব লক্ষিত হইল। রবীন্দ্রনাথ এই একান্ত অদ্বৈতবাদ ও একান্ত দ্বৈতবাদ—এই উভয় মতবাদের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতের ইতিহাস অতি স্বল্প কথায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"ভারতবর্ষে একদিন অদ্বৈতবাদ কর্মকে অজ্ঞানের অবিদ্যার কোঠায় নির্বাসিত ক'রে অত্যন্ত বিশুদ্ধ হতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, ব্রহ্ম যখন নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্মলাভ করতে গেলে কর্মকে সমূলে ছেদন করা আবশ্যক।

"সেই অদ্বৈতবাদের ধারা ক্রমে যখন দ্বৈতবাদের নানা শাখাময়ী নদীতে পরিণত হল তখন ব্রহ্ম এবং অবিদ্যাকে নিয়ে একটা দ্বিধা উৎপন্ন হল।

"তখন দ্বৈতবাদী ভারত জগৎ এবং জগতের মূলে দুইটি তত্ত্ব স্বীকার করলেন। প্রকৃতি ও পুরুষ।

"অর্থাৎ ব্রহ্মকে তাঁরা নিষ্ক্রিয় নির্গুণ বলে এক পাশে সরিয়ে রেখে দিলেন এবং শক্তিকে জগৎক্রিয়ার মূলে যেন স্বতন্ত্র সত্তারূপে স্বীকার করলেন। এইরূপে ব্রহ্ম যে কর্ম দ্বারা বদ্ধ নন এ কথাও বললেন, অথচ কর্ম যে একেবারে কিছুই নয় তাও বলা হল না। শক্তি ও শক্তির কার্য থেকে শক্তিমানকে দূরে বসিয়ে তাঁকে একটা খুব বড়ো পদ দিয়ে তাঁর সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যাগ করলেন।

"শুধু তাই নয়, এই ব্রহ্মই যে পরাস্ত, তিনিই যে ছোটো, সে কথাও নানা রূপকের দ্বারা প্রচার করতে লাগলেন।"[৬]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের মধ্যে এই পরস্পর দ্বন্দ্ব নিরর্থক। কেননা, তিনি সত্যকে তর্কের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চান না, তিনি তাহাকে জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করিতে চান ; এবং উপলব্ধির মধ্যে দ্বৈত ও অদ্বৈত পাশাপাশি ভাসমান। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলিয়াছেন—

"অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ নিয়ে যখন আমরা বিবাদ করি তখন আমরা মত নিয়েই বিবাদ করি, সত্য নিয়ে নয়। সুতরাং সত্যকে আচ্ছন্ন ক'রে, বিস্মৃত হয়ে, আমরা এক দিকে ক্ষতিগ্রস্ত হই, আর-এক দিকে বিরোধ করে আমাদের দুঃখ ঘটে।

"আমাদের মধ্যে যাঁরা নিজেকে দ্বৈতবাদী বলে ঘোষণা করেন তাঁরা অদ্বৈতবাদকে বিভীষিকা বলে কল্পনা করেন। সেখানে তাঁরা মতের সঙ্গে রাগারাগি করে সত্যকে পর্যন্ত একঘরে করতে চান।

"যাঁরা 'অদ্বৈতম্' এই সত্যটিকে লাভ করেছেন তাঁদের সেই লাভটির মধ্যে প্রবেশ করো। তাঁদের কথায় যদি এমন কিছু থাকে যা তোমাকে আঘাত করে সেদিকে মন দেবার দরকার নেই।"[৭]

কিন্তু যদিও রবীন্দ্রনাথ ভেদ ও অভেদ, ঐক্য ও বৈচিত্র্য—উভয়কেই সমান সত্যরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বটে, তথাপি অদ্বৈত তত্ত্বের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতও নানাস্থানে নানাভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। 'নির্বিশেষ' শীর্ষক ভাষণে তিনি বলিতেছেন—

"…নির্বিশেষের অভিমুখেই মানুষের সমস্ত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা সমস্ত উন্নতির চেষ্টা কাজ করছে।

"অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, বৈরাগ্যবাদ মানুষের এই ভাবকে এই সত্যকে সমুজ্জ্বল করে দেখেছে। সুতরাং, মানুষকে অদ্বৈতবাদ একটা বৃহৎ সম্পদ দান করেছে। তার মধ্যে নানা অব্যক্ত অর্ধব্যক্তভাবে যে সত্য কাজ করছিল, সমস্ত আবরণ সরিয়ে দিয়ে তারই সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়েছে।"[৮]

অদ্বৈত ও দ্বৈত-প্রত্যয়ের এই অন্তহীন দ্বন্দ্ব ও লীলা রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত চতুর্দ্দশপদী কবিতাটিতে অনুপম কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে—

আছি আমি বিন্দুরূপে, হে অন্তরযামী,
আছি আমি বিশ্বকেন্দ্রস্থলে। 'আছি আমি'

এ কথা স্মরিলে মনে মহান্ বিস্ময়
আকুল করিয়া দেয়, স্তব্ধ এ হৃদয়
প্রকাণ্ড রহস্যভারে। 'আছি' আর 'আছে'
অন্তহীন আদিপ্রহেলিকা, কার কাছে
শুধাইব অর্থ এর! তত্ত্ববিদ্ তাই
কহিতেছে, 'এ নিখিলে আর কিছু নাই,
শুধু এক আছে।' করে তারা একাকার
অস্তিত্বরহস্যরাশি করি অস্বীকার।
একমাত্র তুমি জান এ ভবসংসারে
যে আদি গোপন তত্ত্ব—আমি কবি তারে
চিরকাল সবিনয়ে স্বীকার করিয়া
অপার বিস্ময়ে চিত্ত রাখিব ভরিয়া।[৯]

৩. ব্রহ্মের স্বরূপ : নির্বিশেষ ও সবিশেষ ॥

উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, তিনি জ্ঞানস্বরূপ, এবং তিনি অনন্ত। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই মন্ত্রটি নিরন্তর ধ্যানের বিষয় ছিল, শুধু ধ্যান নয় প্রাত্যহিক আচরণের নিয়ন্তা ছিল। তাই তিনি বলিয়াছেন—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—এই মন্ত্রটি তো কেবলমাত্র ধ্যানের বিষয় নয়। এটিকে প্রতিদিনের সাধনায় জীবনের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে।

"সেই সাধনাটি কী? আমাদের জীবনে সত্যের সঙ্গে অনন্তের যে বাধা ঘটিয়ে বসেছি, যে বাধাবশত আমাদের জ্ঞানের বিকার ঘটছে, সেইটে দূর করে দিতে থাকা।"[১০]

রবীন্দ্রনাথ যে-ভাবে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রহ্মকে রবীন্দ্রনাথ জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় তত্ত্বরূপে দেখেন নাই। ব্রহ্ম এই পরিদৃশ্যমান সৃষ্টির মধ্যেই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, এই সীমার মধ্য দিয়াই তাঁহার অসীম অনন্তস্বরূপ নিয়ত প্রকাশ করিতেছেন, সেই পরম সত্যের মধ্যে সকল বিরোধের সমন্বয়। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"এইবার আমাদের সমস্ত মন্ত্রটি একবার দেখে নিই। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

"অনন্ত ব্রহ্মের সীমারূপটি হচ্ছে সত্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সত্যনিয়মের সীমার মধ্য দিয়েই অনন্ত আপনাকে উৎসর্গ করছেন। প্রশ্ন এই যে, সত্য যখন সীমায় বদ্ধ তখন অসীমকে প্রকাশ করে কেমন করে? তার উত্তর এই যে, সত্যের সীমা আছে, কিন্তু সত্য সীমার দ্বারা বদ্ধ নয়। এই জন্যই সত্য গতিমান। সত্য আপনার গতির দ্বারা কেবলই

আপনার সীমাকে পেরিয়ে পেরিয়ে চলতে থাকে, কোনো সীমায় এসে সে একেবারে ঠেকে যায় না। সত্যের এই নিরন্তর প্রকাশের মধ্যে আত্মদান করে অনন্ত আপনাকেই জানছেন—এইজন্যই মন্ত্রের একপ্রান্তে 'সত্যং', আর-এক প্রান্তে 'অনন্তং ব্রহ্ম', তারই মাঝে মাঝে 'জ্ঞানং'।

"এই কথাটিকে বাক্যে বলতে গেলেই স্বতোবিরোধ এসে পড়ে, কিন্তু সে বিরোধ কেবল বাক্যেরই। আমরা যাকে ভাষায় বলি সীমা, সেই সীমা ঐকান্তিকরূপে কোথাও নেই ; তাই সীমা কেবলই অসীমে মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমরা যাকে ভাষায় বলি অসীম সেই অসীমও ঐকান্তিকভাবে কোথাও নেই ; তাই অসীম কেবলই সীমায় রূপ গ্রহণ করে প্রকাশিত হচ্ছেন। সত্যও অসীমকে বর্জন করে সীমায় নিশ্চল হয়ে নেই, অসীমও সত্যকে বর্জন করে শূন্য হয়ে বিরাজ করছেন না। এইজন্য ব্রহ্ম, সীমা এবং সীমাহীনতা দুইয়েরই অতীত ; তাঁর মধ্যে রূপ এবং অরূপ দুইই সংগত হয়েছে।"[১১]

অনন্তের সম্যক্ উপলব্ধি যাঁহার ঘটিয়াছে, তাঁহার কাছে যে সকল দ্বন্দ্বের সমাধান ঘটিয়া গিয়াছে,—তাহা কর্মক্ষেত্রেই হউক, বা দার্শনিক বিচারের ক্ষেত্রে হউক, অথবা ধর্মশাস্ত্রের বা নীতিশাস্ত্রের আলোচনাতেই হউক—এ কথা রবীন্দ্রনাথ যেমন অপরূপভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তেমনটি আর কেহ পারিয়াছেন কিনা জানি না। কিন্তু অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপের এই উপলব্ধি শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশুদ্ধ অনুভূতিমাত্র নহে, এই উপলব্ধি 'সংবেদনঘন আনন্দানুভূতি'—রবীন্দ্রনাথ যাহাকে বলিয়াছেন, 'আনন্দের জানা। প্রেমের জানা।' 'সামঞ্জস্য' শীর্ষক ভাষণের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য—

"তর্কের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত পরস্পরের একান্ত বিরোধী।...কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত ঠিক একই স্থান জুড়ে রয়েছে। প্রেমেতে একই কালে দুই হওয়াও চাই, এক হওয়াও চাই।...

"উপনিষদে ঈশ্বরের সম্বন্ধে এইজন্যে কেবলই বিরুদ্ধ কথাই দেখতে পাই। য একোঽবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।...তিনি যে প্রেমস্বরূপ—তাই, শুধু এক হয়ে তাঁর চলে না, অনেকের বিধান নিয়েই তিনি থাকেন।...

"আমাদের প্রকৃতির মধ্যেও এই স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য আমরা একটিমাত্র জায়গায় দেখতে পাই ; সে হচ্ছে প্রেমে।...

"কর্মক্ষেত্রে ত্যাগ এবং লাভ ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত, তারা বিপরীত পর্যায়ের। প্রেমেতে ত্যাগও যা লাভও তাই।...

"দর্শনশাস্ত্রে মস্ত একটা তর্ক আছে। ঈশ্বর পুরুষ কি অপুরুষ, তিনি সগুণ কি নির্গুণ, তিনি personal কি impersonal? প্রেমের মধ্যে এই হাঁ না এক সঙ্গে মিলে আছে।... সেইজন্যে ভগবান সগুণ কি নির্গুণ সে-সমস্ত তর্কের কথা কেবল তর্কের ক্ষেত্রেই চলে ; সে তর্ক তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না।

"ধর্মশাস্ত্রে তো দেখা যায় মুক্তি এবং বন্ধনে এমন বিরুদ্ধ সম্বন্ধ যে, কেউ কাউকে রেয়াত

করে না।…কিন্তু একটি ক্ষেত্র আছে যেখানে অধীনতা এবং স্বাধীনতা ঠিক সমান গৌরব ভোগ করে, এ কথা আমাদের ভুললে চলবে না। সে হচ্ছে প্রেমে।…প্রেমই সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং প্রেমই সম্পূর্ণ অধীন।

"ঈশ্বর তো কেবলমাত্র মুক্ত নন।…তিনি নিজেকে বেঁধেছেন।…তাঁর যে আনন্দ রূপ যেরূপে তিনি প্রকাশ পাচ্ছেন, এই তো তাঁর বন্ধনের রূপ।…কোন্‌টা বড়ো কথা? ঈশ্বর শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত, এইটে? না, তিনি আমাদের সঙ্গে পিতৃত্বে সখিত্বে পতিত্বে বদ্ধ—এইটে? দুটোই সমান বড়ো কথা।…

"তেমনি সীমাকে আমরা গাল দিয়ে থাকি।—যেন, সীমা জিনিসটা যে কী তা আমরা কিছুই জানি! সীমা একটি পরমাশ্চর্য রহস্য।…অসীমের অপেক্ষা সীমা কোনো অংশেই কম আশ্চর্য নয়, অব্যক্তের অপেক্ষা ব্যক্ত কোনোমতেই অশ্রদ্ধেয় নয়।…

"স্বাধীনতা অধীনতা নিয়েও আমরা কথার খেলা করি।…অধীনতা জিনিসটা যে কত বড়ো মহিমান্বিত বৈষ্ণব ধর্মে সেইটে আমাদের দেখিয়েছে।…"[১২]

যেহেতু প্রেমের মধ্যে, আনন্দের মধ্যে সর্ববিরোধের সামঞ্জস্য এবং যেহেতু ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ—'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি', 'রসানাং রসতমঃ'—সেই হেতু ব্রহ্ম একই সঙ্গে নিষ্ক্রিয় এবং ক্রিয়াবান্, একই সঙ্গে শান্ত ও চঞ্চল, যুগপৎ কূটস্থ ও সর্বতঃপ্রসারী।

"উপনিষৎ বলেছেন—'এষ দেবো বিশ্বকর্মা', এই দেবতা বিশ্বকর্মা, বিশ্বের অসংখ্য কর্মে আপনাকে অসংখ্য আকারে ব্যক্ত করছেন; কিন্তু তিনিই 'মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ', মহান-আপন-রূপে, পরম-এক-রূপে সর্বদাই মানুষের হৃদয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছেন। 'হৃদা মনীষা মনসাভিক৯প্তো য এতৎ'—সেই হৃদয়ের যে জ্ঞান, যে জ্ঞান একেবারে সংশয়রহিত অব্যবহিত জ্ঞান, সেই জ্ঞানে যাঁরা এঁকে পেয়ে থাকেন, 'অমৃতাস্তে ভবন্তি', তাঁরাই অমৃত হন।"[১৩]

আবার—

"উপনিষদে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলেছে তাঁর 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ'। অর্থাৎ, তাঁর জ্ঞান বল ও ক্রিয়া স্বাভাবিক। তাঁর বল আর ক্রিয়া এই তো হল যা-কিছু—এই তো হল জগৎ। চার দিকে দেখতে পাচ্ছি বল কাজ করছে—স্বাভাবিক এই কাজ—অর্থাৎ, আপনার জোরেই আপনার এই কাজ চলছে—এই স্বাভাবিক বল ও ক্রিয়া যে কী জিনিস তা আমরা আমাদের প্রাণের মধ্যে স্পষ্ট করে বুঝতে পারি। এই বল ও ক্রিয়া হল বাহিরের সত্য। তারই সঙ্গে সঙ্গে একটি অন্তরের প্রকাশ আছে, সেইটি হল জ্ঞান। আমরা বুদ্ধিতে বোঝবার চেষ্টায় দুটিকে স্বতন্ত্র করে দেখছি, কিন্তু বিরাটের মধ্যে এ একেবারে এক হয়ে আছে। সর্বত্র জ্ঞানের চালনাতেই বল ও ক্রিয়া চলছে এবং বল ও ক্রিয়ার প্রকাশেই জ্ঞান আপনাকে উপলব্ধি করছে। 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ' মানুষ এমন কথা বলতেই পারত না যদি সে নিজের মধ্যে স্বাভাবিক জ্ঞান ও প্রাণ এবং উভয়ের

যোগ একান্ত অনুভব না করত। এইজন্যই গায়ত্রীমন্ত্রে এক দিকে বাহিরের 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এবং অন্য দিকে অন্তরের ধী উভয়কেই একই পরমশক্তির প্রকাশরূপে ধ্যান করবার উপদেশ আছে।"[১৪]

কিন্তু সেই ব্রহ্ম বা পরমা শক্তির এই সতত পরিস্পন্দ বা ক্রিয়া যেহেতু স্বাভাবিক, বাহিরের কোনও প্রভাবের তাড়নায় নয়, সেই হেতু এই ক্রিয়াশীলতা তাঁহার স্বরূপানন্দেরই বিলাস বা লীলামাত্র। সেইজন্যই তিনি স্বাধীন, মুক্ত।

"উপনিষৎ বলেন, তাঁর 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ'। তাঁর জ্ঞান শক্তি এবং কর্ম স্বাভাবিক। তাঁর পরমা শক্তি আপন স্বভাবেই কাজ করছে। আনন্দই তাঁর কাজ, কাজই তাঁর আনন্দ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য ক্রিয়াই তাঁর আনন্দের গতি।"[১৫]

এইভাবে ব্রহ্মের মধ্যে সকল বিরোধের সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে বলিয়াই তিনি চরম সত্য, তিনি অখণ্ড এবং তিনি অদ্বৈত। রবীন্দ্রনাথ নিম্নোদ্ধৃত সন্দর্ভাংশটিতে ব্রহ্মের এই পরম সত্যরূপ অনুপম ভঙ্গীতে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"বেদমন্ত্রে আছে মৃত্যুও তাঁর ছায়া, অমৃতও তাঁর ছায়া—উভয়কেই তিনি নিজের মধ্যে এক করে রেখেছেন। যাঁর মধ্যে সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে আছে তিনিই হচ্ছেন চরম সত্য। তিনিই বিশুদ্ধতম জ্যোতি, তিনিই নির্মলতম অন্ধকার।

"সংসারের সমস্ত বিপরীতের সমন্বয় যদি কোনো একটি সত্যের মধ্যে না ঘটে তবে তাকে চরম সত্য বলে মানা যায় না। তবে তার মধ্যে যেটুকু কুলোল না তার জন্যে আর একটা সত্যকে মানতে হয়, এবং সে দুটিকে পরস্পরের বিরুদ্ধ বলেই ধরে নিতে হয়। তা হলেই অমৃতের জন্যে ঈশ্বরকে এবং মৃত্যুর জন্যে শয়তানকে মানতে হয়।

"কিন্তু আমরা ব্রহ্মের কোনো শরিককে মানি নে—আমরা জানি তিনিই সত্য, খণ্ড সত্যের সমস্ত বিরোধ তাঁর মধ্যে সামঞ্জস্য লাভ করেছে। আমরা জানি তিনিই এক; খণ্ড সত্তার সমস্ত বিচ্ছিন্নতা তাঁর মধ্যে সম্মিলিত হয়ে আছে।"[১৬]

৪. ব্রহ্মবাদীর লক্ষণ ॥

এইভাবে ব্রহ্মে 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া'র সহিত আনন্দের সম্মিলন ঘটিয়াছে। সুতরাং যিনি ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন তাঁহার জীবনেও অনুরূপ-ভাবেই জ্ঞান কর্ম ও প্রেম বা আনন্দের সমাবেশ ঘটিবে—কেননা, উপনিষদে আছে, 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি', ব্রহ্মবিৎ যিনি তিনি ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হন। যদিও সম্পূর্ণ তাদাত্ম্যলাভ, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে অসম্ভব এবং অনভীপ্সিতও বটে, তথাপি ব্রহ্মের সেই অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ক্রিয়াশক্তি এবং অনন্ত আনন্দ ও প্রেমের স্বল্প অংশও যদি আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের আধারে সঞ্চিত করিতে পারি, তবে তাহাতেই আমাদের জীবন সার্থক হইয়া উঠিবে।[১৬ক] যিনি ব্রহ্মবিৎ তিনি সেই পরম সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের ন্যায়ই

জ্ঞানযোগী, নানা কর্মে সতত যুক্ত এবং সর্ববিধ কর্মই তাঁহার নিকট আনন্দের আভাসমাত্র, পরাধীনতার শৃঙ্খল নহে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

"উপনিষদে 'ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ', ব্রহ্মবিৎদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কাকে বলেছেন? আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ। পরমাত্মায় যাঁর আনন্দ, পরমাত্মায় যাঁর ক্রীড়া, এবং যিনি ক্রিয়াবান্ তিনিই ব্রহ্মবিৎদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আনন্দ আছে, অথচ সেই আনন্দের ক্রীড়া নেই এ কখনো হতেই পারে না। সেই ক্রীড়া নিষ্ক্রিয় নয়—সেই ক্রীড়াই হচ্ছে কর্ম। ব্রহ্মে যাঁর আনন্দ তিনি কর্ম না হলে বাঁচবেন কি করে? কারণ, তাঁকে এমন কর্ম করতেই হবে যে কর্মে সেই ব্রহ্মের আনন্দ আকার ধারণ করে বাহিরে প্রকাশমান হয়ে ওঠে। এইজন্য তিনি ব্রহ্মবিৎ, অর্থাৎ জ্ঞানে যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি 'আত্মরতিঃ', পরমাত্মাতেই তাঁর আনন্দ; এবং তিনি 'আত্মক্রীড়ঃ', তাঁর সকল কাজই হচ্ছে পরমাত্মার মধ্যে—তাঁর খেলা, তাঁর স্নান-আহার, তাঁর জীবিকা-অর্জন, তাঁর পরহিত-সাধন, সমস্তই হচ্ছে পরমাত্মার মধ্যে তাঁর বিহার। তিনি ক্রিয়াবান্, ব্রহ্মের যে আনন্দ তিনি ভোগ করেন তাকে কর্মে প্রকাশ না করে তিনি থাকতে পারেন না। কবির আনন্দ কাব্যে, শিল্পীর আনন্দ শিল্পে, বীরের আনন্দ শক্তির প্রতিষ্ঠায়, জ্ঞানীর আনন্দ তত্ত্বাবিষ্কারে যেমন আপনাকে কেবলই কর্ম আকারে প্রকাশ করতে যাচ্ছে, ব্রহ্মবিদের আনন্দ তেমনি জীবনে ছোটো বড়ো সকল কাজেই সত্যের দ্বারা, সৌন্দর্যের দ্বারা, শৃঙ্খলার দ্বারা, মঙ্গলের দ্বারা অসীমকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করে।

"ব্রহ্মও তো আপনার আনন্দকে তেমনি করেই প্রকাশ করছেন—তিনি 'বহুধাশক্তি-যোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি।' তিনি আপনার বহুধা শক্তির যোগে নানা জাতির নানা অন্তর্নিহিত প্রয়োজন সাধন করছেন।...আমাদেরও সার্থকতা ওইখানে—ওইখানেই ব্রহ্মের সঙ্গে মিল আছে। বহুধাশক্তিযোগে আমাদেরও আপনাকে কেবলই দান করতে হবে।"[১১]

যিনি ব্রহ্মবিদ্ তাঁহার কাছে অতি তুচ্ছ বিষয়ের মধ্যেও অনন্তের প্রকাশ সুস্পষ্ট, তাঁহার প্রত্যেক কর্তব্যকর্মে ব্রহ্মেরই আনন্দাংশ বিমিশ্রিত হইয়া আছে। এইভাবে ব্রহ্ম শুধু তাঁহার নিকট কেবলমাত্র যুক্তিসিদ্ধ একটি অমূর্ত ভাবমাত্র নহে, উহা তাঁহার প্রাত্যহিক আচরণের অঙ্গীভূত ও উপলব্ধির বিষয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টিতে উপনিষদের বাণীসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহাতে ব্রহ্মের abstract রূপ নিতান্তই অলীক বলিয়া প্রতিভাত হয়—উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণেরও ব্রহ্মের এই জাতীয় রূপ অভিপ্রেত ছিল বলিয়া মনে হয় না। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মত অত্যন্ত স্পষ্ট—

"য়ুরোপের কোনো কোনো আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানী, যাঁরা পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে উপনিষদের কাছেই বিশেষভাবে ঋণী, তাঁরা সেই ঋণকে অস্বীকার করেই বলে থাকেন, ভারতবর্ষের ব্রহ্ম একটি অবচ্ছিন্ন (abstract) পদার্থ। অর্থাৎ, জগতে যেখানে যা-কিছু আছে সমস্তকে

ত্যাগ করে বাদ দিয়েই সেই অনন্তস্বরূপ—অর্থাৎ, এক কথায় তিনি কোনোখানেই নেই, আছেন কেবল তত্ত্বজ্ঞানে।

"এরকম কোনো দার্শনিক মতবাদ ভারতবর্ষে আছে কিনা সে কথা আলোচনা করতে চাই নে, কিন্তু এটি ভারতবর্ষের আসল কথা নয়। বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থের মধ্যেই অনন্তস্বরূপকে উপলব্ধি করার সাধনা ভারতবর্ষে এতদূরে গেছে যে অন্য দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা সাহস করে ততদূরে যেতে পারেন না।"[১৮]

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য সংসারত্যাগের, কর্মসন্ন্যাসের কোনও আবশ্যকতা নাই ; বরং সন্ন্যাসমার্গ তাঁহার নিকট ব্রহ্মের পূর্ণস্বরূপ উপলব্ধির পক্ষে অন্তরায়। ব্রহ্মবিৎ নিরন্তর কর্মযোগের দ্বারাই আপন যথার্থ সত্তা উপলব্ধি করিয়া থাকেন, কর্ম-সন্ন্যাসের দ্বারা নহে।—

> বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
> অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
> লভিব মুক্তির স্বাদ।...

সুতরাং আচার্য্য শঙ্করের কর্মসন্ন্যাসমার্গের সহিত রবীন্দ্রনাথের কর্মযোগের বিরোধ অতি স্পষ্ট। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তিই উদ্ধারযোগ্য—

"আমাদের আত্মার যে সত্যসাধনা তার লক্ষ্যও এই দিকে, এই পরিপূর্ণতার দিকে, এই শান্ত-শিব-অদ্বৈতের দিকে—কখনোই প্রমত্ততার দিকে নয়।...

"এই অপ্রমত্ত পরিপূর্ণ শান্তিকে লাভ করবার অভিপ্রায় একদিন এই ভারতবর্ষের সাধনার মধ্যে ছিল। উপনিষদে ভগবদ্‌গীতায় আমরা এর পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছি।

"মাঝখানে ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের যখন আধিপত্য হল তখন আমাদের সেই সনাতন পরিপূর্ণতার সাধনা নির্বাণের সাধনার আকার ধারণ করল।[১৯]

"এমনি করে পূর্ণতার শান্তি একদিন শূন্যতার শান্তি -আকারে ভারতবর্ষের সাধনাক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল। সমস্ত বাসনাকে নিরস্ত ক'রে, সমস্ত প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করে দিয়ে, তবেই পরম শ্রেয়কে লাভ করা যায়, এই মত যেদিন থেকে ভারতবর্ষে তার সহস্র মূল বিস্তার করে দাঁড়ালো সেইদিন থেকে ভারতবর্ষের সাধনায় সামঞ্জস্যের স্থলে রিক্ততা এসে দাঁড়ালো—সেই দিন থেকে প্রাচীন তাপসাশ্রমের স্থলে আধুনিক কালের সন্ন্যাসাশ্রম প্রবল হয়ে উঠল এবং উপনিষদের পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম শঙ্করাচার্যের শূন্যস্বরূপ ব্রহ্ম-রূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদে পরিণত হলেন।"[২০]

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি চ"—উপনিষদের এই বাণী রবীন্দ্রনাথের সকল জীবনসাধনার মূলে ছিল। তাঁহার প্রত্যেক কর্ম আনন্দের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। প্রকৃত ব্রহ্মবাদীর জীবনে তাই জ্ঞানের সহিত কর্মের, কর্মের সহিত আনন্দের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।" তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"উপনিষৎ বলেছেন, আনন্দ হতেই সমস্ত জীবের জন্ম, আনন্দের মধ্যেই সকলের জীবনযাত্রা এবং সেই আনন্দের মধ্যেই আবার সকলের প্রত্যাবর্তন। বিশ্বজগতে এই-যে আনন্দসমুদ্রে কেবলই তরঙ্গলীলা চলছে প্রত্যেক মানুষের জীবনটিকে এরই ছন্দে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে জীবনের সার্থকতা। প্রথমেই এই উপলব্ধি তাকে পেতে হবে যে, সেই অনন্ত আনন্দ হতেই সে জেগে উঠেছে, আনন্দ হতেই তার যাত্রারম্ভ। তার পরে কর্মের বেগে সে যতদূর পর্যন্তই উচ্ছ্রিত হয়ে উঠুক-না এই অনুভূতিটিই যেন সে রক্ষা করে যে সেই অনন্ত আনন্দ-সমুদ্রেই তার লীলা চলছে। তার পরে কর্ম সমাধা করে আবার যেন সে অতি সহজেই নত হয়ে, সেই আনন্দ-সমুদ্রের মধ্যেই আপনার সমস্ত বিক্ষেপকে প্রশান্ত করে দেয়। এই হচ্ছে যথার্থ জীবন এই জীবনের সঙ্গেই সমস্ত জগতের মিল। সে মিলেই শান্তি এবং মঙ্গল এবং সৌন্দর্য প্রকাশ পায়।"[২১]

ডঃ রাধাকৃষ্ণন্ রবীন্দ্রনাথের এই জীবন-সাধনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন—

The Vedanta system and its latest exponent Rabindranath stand for a synthetic idealism, which while not trying to avoid the temporal and the finite, has still a hold on the Eternal Spirit. They give us a practical mysticism which would have us live and act in the temporal world, but make action a consecration and life a dedication to God. But our work in the temporal world should not absorb all our energies and make us miss the vision universal. With a strong hold on the idea of the all- pervading, we must work in the world. "Oh, grant me my prayer that I may never lose the bliss of the touch of the one in the play of the many" (*Gitanjali*, 63). The truly religious hero does the dullest deeds with a singing soul.[২২]

৫. রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ॥

রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের মন্ত্রের আলোকে ব্রহ্মবাদীর যে লক্ষণ অবধারণ করিয়াছিলেন, তাহা আধুনিক যুগে নব্যবঙ্গের দুই মহাপুরুষের চরিত্রে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের যে চিত্র উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ আপন-আপন দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে অঙ্কন করিয়াছিলেন, বাঙলার নবযুগের প্রথম প্রবর্তক ভারতপথিক রামমোহন ও আপন পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ যেন তাহারই প্রতিচ্ছবি দেখিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। এই দুই মহান্ নেতার চরিত্রে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি বা প্রেমের যে অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল, একমাত্র সেই সমন্বয়ের ফলেই সঙ্কীর্ণ জীবনবোধ দূরীভূত হইয়া উদার বিশ্ববোধের স্ফূর্তি সম্ভব হইতে পারে। ব্রহ্মোপলব্ধির পথ যে কর্মসন্ন্যাস নয়, কর্মযোগ; সংসার হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া যে মুক্তিলাভ করা যায় না, সংসারের সর্ববিধ কল্যাণকর কর্মে চিন্তায় ও ধ্যানে আপনাকে যুক্ত করিয়া রাখাই যে সর্বোত্তম মুক্তিমার্গ—কোনও স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যে; এবং মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশই

যে মর্ত্ত্যমানবের পক্ষে চরম আকাঙ্ক্ষণীয় শ্রেয়ঃপথ—ইহা এই দুই মহামানবের জীবনে প্রমাণিত হইয়াছে। রামমোহন রায়ের সকল সাধনাই যে উপনিষদের উদার বাণীর দ্বারা উদ্বুদ্ধ—তাহা ধর্মীয়ই হউক, সামাজিকই হউক, অথবা রাষ্ট্রীয়ই হউক,—ইহা রবীন্দ্রনাথ যেমনভাবে দেখাইয়াছেন, তেমনটি আর কেহও পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ—

"একদা বৈদিক যুগে কর্মকাণ্ড যখন প্রবল হয়ে উঠেছিল তখন নিরর্থক কর্মই মানুষকে চরমরূপে অধিকার করেছিল;...তার পরে জ্ঞানের সাধনার যখন প্রাদুর্ভাব হল তখন মানুষের পক্ষে জ্ঞানই একমাত্র চরম হয়ে উঠল—কারণ, যাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান তিনি নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, সুতরাং তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনোপ্রকার সম্বন্ধ হতেই পারে না; এ অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান নামক পদার্থটাতে জ্ঞানই সমস্ত, ব্রহ্ম কিছুই নয় বললেই হয়।...তার পরে ভক্তি যখন মাথা তুলে দাঁড়ালো তখন সে জ্ঞানকে পায়ের তলায় চেপে ও কর্মকে রসের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে একমাত্র নিজেই মানুষের পরম স্থানটি সম্পূর্ণ জুড়ে বসল...।

"এইরূপ গুরুতর আত্মবিচ্ছেদের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে মানুষ চিরদিন বাস করতে পারে না।...

"সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ আকাঙ্ক্ষাকে বহন করে এ দেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হয়েছিল। ভারতবর্ষে তিনি যে কোনো নূতন ধর্মের সৃষ্টি করেছিলেন তা নয়; ভারতবর্ষে যেখানে ধর্মের মধ্যে পরিপূর্ণতার রূপ চিরদিনই ছিল, যেখানে বৃহৎ সামঞ্জস্য, যেখানে শান্তং শিবমদ্বৈতম্, সেইখানকার সিংহদ্বার তিনি সর্বসাধারণের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিলেন।

"সত্যের এই পরিপূর্ণতাকে এই সামঞ্জস্যকে পাবার ক্ষুধা যে কিরকম প্রবল এবং তাকে আপনার মধ্যে কিরকম করে গ্রহণ ও ব্যক্ত করতে হয়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনে সেইটেই প্রকাশ হয়েছে।[২০]

'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' শীর্ষক ভাষণেও রবীন্দ্রনাথ অতি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—

"...এমন সময়েই রামমোহন রায় আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রহ্মসাধনাকে নবীন যুগে উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন। ব্রহ্মকে তিনি নিজের জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে জীবনের সমস্ত শক্তিকে বৃহৎ ক'রে, বিশ্বব্যাপী ক'রে, প্রকাশ করে দিলেন। তাঁর সকল চিন্তা সকল চেষ্টা; মানুষের প্রতি তাঁর প্রেম, দেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, কল্যাণের প্রতি তাঁর লক্ষ্য, সমস্তই ব্রহ্মসাধনাকে আশ্রয় করে উদার ঐক্য লাভ করেছিল। ব্রহ্মকে তিনি জীবন থেকে এবং ব্রহ্মাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবলমাত্র ধ্যানের বস্তু জ্ঞানের বস্তু করে নিভৃতে নির্বাসিত করে রাখেন নি। ব্রহ্মকে তিনি বিশ্ব-ইতিহাসে বিশ্বধর্মে বিশ্বকর্মে সর্বত্রই সত্য করে দেখবার সাধনা নিজের জীবনে এমন করে প্রকাশ করলেন যে, সেই তাঁর সাধনার দ্বারা আমাদের দেশে সকল বিষয়েই তিনি নূতন যুগের প্রবর্তন করে দিলেন।

"রামমোহন রায়ের মুখ দিয়ে ভারতবর্ষ আপন সত্য বাণী ঘোষণা করেছে।..."[২১]

সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধন সাধনায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন রায়েরই যোগ্য

উত্তরসাধক ছিলেন—তাই জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্যে তাঁহার জীবন পূর্ণ প্রস্ফুটিত শতদলের মতই আপনার সৌন্দর্য ও সৌরভ চতুর্দিকে বিকিরণ করিতে পারিয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তপঃপূত জীবনের বিচিত্র সাধনার কথা চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় সাংসারিক জীবের পক্ষে ব্রহ্মোপলব্ধি কি জাতীয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পিতৃদেবের আদ্যকৃত্য উপলক্ষে প্রার্থনান্তিক ভাষণে বলিয়াছিলেন—

"পৃথিবীতে কোনো পরিবার কখনোই চিরদিন একভাবে থাকিতে পারে না—...কিন্তু এই পরিবারের মধ্য দিয়া যিনি অচেতন সমাজকে ধর্মজিজ্ঞাসায় সজীব করিয়া দিয়াছেন, যিনি নূতন ইংরেজী শিক্ষার ঔদ্ধত্যের দিনে শিশু বঙ্গভাষাকে বহুযত্নে কৈশোরে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, যিনি দেশকে তাহার প্রাচীন ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, যিনি তাঁহার তপঃপরায়ণ একলক্ষ্য জীবনের দ্বারা আধুনিক বিষয়লুব্ধ সমাজে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ পুনঃস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, তিনি এই পরিবারকে সমস্ত মনুষ্যপরিবারের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া ইহার পরম ক্ষতিকে সমস্ত মনুষ্যের ক্ষতি করিয়া দিয়া আমাদিগকে যে গৌরব দান করিয়াছেন...অদ্য আমরা তাহাই স্মরণ করিব।"[২৫]

মহর্ষির ব্রহ্মসাধনা যে কর্মসন্ন্যাস নয়, কিন্তু বহু বিচিত্র কর্মধারার সতত নিরাসক্ত অনুসরণ, তাহা 'শান্তিনিকেতন' ভাষণাবলীর অন্তর্গত নিম্নোদ্ধৃত অংশটিতেও অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—

"...তাঁর ব্রহ্ম একলার ব্রহ্ম নয়, তাঁর ব্রহ্ম শুধু জ্ঞানীর ব্রহ্ম নয়, শুধু ভক্তের ব্রহ্মও নয়, তাঁর ব্রহ্ম নিখিলের ব্রহ্ম—নির্জনে তাঁর ধ্যান, সজনে তাঁর সেবা; অন্তরে তাঁর স্মরণ, বাহিরে তাঁর অনুসরণ; জ্ঞানের দ্বারা তাঁর তত্ত্ব-উপলব্ধি, হৃদয়ের দ্বারা তাঁর প্রতি প্রেম; চরিত্রের দ্বারা তাঁর প্রতি নিষ্ঠা এবং কর্মের দ্বারা তাঁর প্রতি আত্মনিবেদন। এই-যে পরিপূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম, সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ উৎকর্ষের দ্বারাই আমরা যাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে পারি, তাঁর যথার্থ সাধনাই হচ্ছে তাঁর যোগে সকলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং সকলের যোগে তাঁরই সঙ্গে যুক্ত হওয়া—দেহ মন হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দ্বারাই তাঁকে উপলব্ধি করা এবং তাঁর উপলব্ধির দ্বারা দেহ মন হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে বলশালী করা—অর্থাৎ, পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের পথকে গ্রহণ করা। মহর্ষি তাঁর ব্যাকুলতার দ্বারা এই সম্পূর্ণতাকেই চেয়েছিলেন এবং তাঁর জীবনের দ্বারা একেই নির্দেশ করেছিলেন।"[২৬]

রবীন্দ্রনাথ 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থখানি যে কি জন্য তাঁহার "পরমপূজ্যপাদ পিতৃদেবের শ্রীচরণকমলে উৎসর্গ" করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে আমাদের কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। কেননা, রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের মন্ত্ররাজির মধ্যে ব্রহ্মোপলব্ধির যে স্বরূপ নির্ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতৃদেবের প্রাত্যহিক চিন্তা ও আচরণের মধ্যেও তাহারই প্রকাশ মূর্ত দেখিয়াছিলেন—

মধ্যাহ্নে নগর-মাঝে পথ হতে পথে
কর্মবন্যা ধায় যবে উচ্ছ্বসিত স্রোতে
শত শাখা-প্রশাখায়—নগরের নাড়ী
উঠে স্ফীত তপ্ত হয়ে, নাচে সে আছাড়ি
পাষাণ ভিত্তির পরে—চৌদিকে আকুলি
ধায় পান্থ, ছুটে রথ, উড়ে শুষ্ক ধূলি—
তখন সহসা হেরি মুদিয়া নয়ন
মহাজনারণ্যমাঝে অনন্ত নির্জন
তোমার আসনখানি—কোলাহল মাঝে
তোমার নিঃশব্দ সভা নিস্তব্ধে বিরাজে।

সব দুঃখে, সব সুখে, সব ঘরে ঘরে,
সব চিত্তে সব চিন্তা সব চেষ্টা-'পরে
যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু যায় দেখা
হে সঙ্গবিহীন দেব, তুমি বসি একা।

'নৈবেদ্যে'র এই চতুর্দ্দশপদী কবিতাটি যে শুধু 'নিত্যোঽনিত্যনাম্—' শান্ত শিব অদ্বৈত পরব্রহ্মের নিঃসঙ্গ রূপটিই প্রকাশ করিতেছে তাহা নহে, সংসারের সহস্র কর্মবন্ধনে জড়িত হইয়াও যে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ অন্তরের গভীর অন্তঃপুরে নিঃসঙ্গ একাকী ভাবে বিরাজ করিতেন—'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ'—সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ইহা যথাযথ চিত্রও বটে। রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির স্মৃতিতর্পণ প্রসঙ্গে একটি ভাষণে বলিয়াছিলেন—

"তার পর হিমালয়ের কথা। তীব্র শীতের প্রত্যুষে প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্তে তাঁকে দেখতুম, বাতি হাতে। তাঁর দীর্ঘ দেহ লাল একটা শালে আবৃত করে তিনি আমায় জাগিয়ে দিয়ে উপক্রমণিকা পড়তে প্রবৃত্ত করতেন। তখন দেখতুম আকাশে তারা, আর পর্বতের উপর প্রত্যুষের আবছায়া অন্ধকারে পূর্বাস্য ধ্যানমূর্তি, তিনি যেন সেই শান্ত স্তব্ধ আবেষ্টনের সঙ্গে একাঙ্গীভূত। এই ক'দিন তাঁর নিবিড় সান্নিধ্যসত্ত্বেও এটা আমার বুঝতে দেরি হত না যে, কাছে থেকেও তাঁকে নাগাল পাওয়া যায় না। তার পরে স্বাস্থ্যভঙ্গের সময় তিনি যখন কলকাতায় ছিলেন, তখন আমার যুবক বয়সে তাঁর কাছে প্রায়ই বিষয়কর্মের ব্যাপার নিয়ে যেতে হত। প্রতি মাসের প্রথম তিনটে দিন ব্রাহ্মসমাজের খাতা, সংসারের খাতা, জমিদারির খাতা নিয়ে তাঁর কাছে কম্পান্বিত কলেবরে যেতুম। তাঁর শরীর তখন শক্ত ছিল না, চোখে কম দেখতেন, তবুও শুনে শুনে অঙ্কের সামান্য ত্রুটিও তিনি চট ক'রে ধরে ফেলতেন। এই সময়েও তাঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ ঔদাসীন্য ও নির্লিপ্ততা আমায় বিস্মিত করেছে।

"আমাদের সকল আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে তিনি ছিলেন তেমনি একা যেমন একা

সৌরপরিবারে সূর্য—স্বীয় উপলব্ধির জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে তিনি আত্মসমাহিত থাকতেন।"[২৭]

'নৈবেদ্যে'র চতুর্দ্দশপদীটির সহিত এই অনুচ্ছেদটিকে মিলাইয়া পড়িলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, রবীন্দ্রনাথের উপাস্য 'সঙ্গবিহীন দেব' শুধুই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়ভূত অথচ নিঃসঙ্গ পরমাত্মতত্ত্বই নহেন, তাঁহার ইহজীবনের প্রত্যক্ষ আরাধ্য দেবতা পিতৃদেবও বটেন।[২৮]

৬. উপনিষৎ ও ব্রাহ্মসমাজ ॥

রবীন্দ্রনাথ যদিও ব্রাহ্ম পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি কোনও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি বা সংকীর্ণচিত্ততা তাঁহাকে মোহগ্রস্ত করিতে পারে নাই। ব্রাহ্মধর্মকে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মেরই একটি উপশাখারূপে কল্পনা করেন নাই[২৯]—তিনি ব্রাহ্ম-আন্দোলনকে ভারতের চিরন্তন উদার চিন্তার উৎস অভিমুখে জনগণের চিত্তকে আকৃষ্ট করিবার একটি অভিনব আয়োজন রূপে দেখিয়াছিলেন। 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' শীর্ষক ভাষণে তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"বর্তমানকালের সংঘর্ষে ব্রাহ্মসমাজে ভারতবর্ষ আপনার সত্যরূপ-প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। চিরকালের ভারতবর্ষকে ব্রাহ্মসমাজ নবীনকালের বিশ্বপৃথিবীর সভায় আহ্বান করেছে। বিশ্বপৃথিবীর পক্ষে এখনও এই ভারতবর্ষকে প্রয়োজন আছে। বিশ্ব মানবের উত্তরোত্তর উদ্ভিদ্যমান সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে বর্তমান যুগে ভারতবর্ষের সাধনাই সকল সমস্যার, সকল জটিলতার, যথার্থ সমাধান করে দেবে—এই একটা আশা ও আকাঙ্ক্ষা বিশ্বমানবের বিচিত্র কণ্ঠে ফুটে উঠছে।

"ব্রাহ্মসমাজকে, তার সাম্প্রদায়িকতার আবরণ ঘুচিয়ে দিয়ে, মানব-ইতিহাসের এই বিরাট ক্ষেত্রে বৃহৎ ক'রে উপলব্ধি করবার দিন আজ উপস্থিত হয়েছে।"[৩০]

ব্রহ্মোপাসনা যে শুধুই ঈশ্বরারাধনা এবং কতকগুলি নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠান ও আচার-পদ্ধতির প্রতি অন্ধ আনুগত্য নহে, সর্ববিধ কুসংস্কার,—ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি যাবতীয় চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ভেদবুদ্ধি ও বিরোধের অপসারণের দ্বারা একটি উদার সমন্বয়াত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষসাধনের দ্বারাই যে ব্রহ্মোপাসনার অন্তর্নিহিত সত্যকে আমরা স্বকীয় আচরণের সাহায্যে ইহজীবনে প্রকাশ করিয়া তুলিতে পারি, এবং তাহাই যে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এবং এখনও হওয়া উচিত, তাহা রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক আচার্যবৃন্দ উপনিষদের যে বাণীসমূহকে আপন-আপন ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি ও আলম্বনরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, সে-সকলের মধ্যে ভেদ ও বৈচিত্র্যকে অস্বীকার না করিয়া, একটি অদ্বিতীয় পরমার্থতত্ত্বের মধ্যে উহাদিগকে মিলাইয়া দেখিবার সাধনা লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের

দৃষ্টিতে এই সাধনাই ভারতের চিরন্তন সাধনা—ইহাই 'ব্রহ্মসাধনা'। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"আমরা ব্রহ্মকে স্বীকার করেছি এই কথাটি যদি সত্য হয়, তবে আমরা ভারতবর্ষকে স্বীকার করেছি এবং ভারতবর্ষের সাধনক্ষেত্রে সমুদয় পৃথিবীর সত্য-সাধনাকে গ্রহণ করবার মহাযজ্ঞ আমরা আরম্ভ করেছি।"[৩১]

এই চিরন্তন ব্রহ্মসাধনার ধারা ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসের কোনও কোনও পর্বে আবিল হইয়া উঠিয়াছে, কখনও বা জগৎ ও জীবনের বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করিয়া বিশুদ্ধ ঐক্য স্থাপন করিবার প্রয়াস দেখা গিয়াছে, আবার কখনও ঐক্যকে উপেক্ষা করিয়া বিরোধ ও বৈষম্যকেই একমাত্র সত্য বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টাও হইয়াছে। কিন্তু ইহার দ্বারা ভারতের সত্যসাধনা অবমানিত হইয়াছে। তাহার ব্যক্তিগত সামাজিক এবং জাতীয় জীবন সংকীর্ণতার দ্বারা কলুষিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সকল সঙ্কট মুহূর্তে ভারতের সাধকগণের কণ্ঠে যাহা চিরন্তন সত্যসাধনা—সেই ব্রহ্মসাধনার বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের আদি প্রবর্তকগণও ভারতীয় ঋষিগণের কণ্ঠনিঃসৃত উদার সত্যবাণীর ভিত্তিতে জগৎ ও জীবনের খণ্ড সত্যসমূহকে একটি চরম পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে সমন্বিত করিয়া দেখিবার সাধনার পথ সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। য়ুরোপেও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের প্রয়াস যুগে যুগে দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতের ব্রহ্মসাধনা হইতে তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের। রবীন্দ্রনাথ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের এই দুই বিপরীতমুখী সাধনার পার্থক্য নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদটিতে সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

"কিন্তু, এই বৃহৎ ব্যাপারকে কিসে ঐক্যদান করতে পারে? এই বিরাট যজ্ঞের যজ্ঞপতি কে? কেউ বা বলে স্বাজাত্য, কেউ বা বলে রাষ্ট্রব্যবস্থা, কেউ বা বলে অধিকাংশের সুখসাধন, কেউ বা বলে মানবদেবতা। কিন্তু, কিছুতেই বিরোধ মেটে না, কিছুতেই ঐক্যদান করতে পারে না, প্রতিকূলতা পরস্পরের প্রতি ভ্রূকুটি করে পরস্পরকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করে এবং যাকে গ্রহণ করতে দলবদ্ধ স্বার্থের কোনোখানে বাধে তাকে একেবারে ধ্বংস করবার জন্যে সে উদ্যত হয়ে ওঠে।...কিন্তু, এ কথা একদিন জানতেই হবে, বাহিরে যেখানে বৃহৎ অনুষ্ঠান অন্তরে সেখানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি না করলে কিছুতেই কিছুর সমন্বয় হতে পারবে না।...যা প্রবল অথচ প্রশান্ত, ব্যাপক অথচ গভীর, আত্মসমাহিত অথচ বিশ্বানুপ্রবিষ্ট সেই আধ্যাত্মিক জীবনসূত্রের দ্বারা না বেঁধে তুলতে পারলে অন্য কোনো কৃত্রিম জোড়াতাড়ার দ্বারা জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান, কর্মের সঙ্গে কর্ম, জাতির সঙ্গে জাতি যথার্থভাবে সম্মিলিত হতে পারবে না। সেই সম্মিলন যদি না ঘটে তবে আয়োজন যতই বিপুল হবে তার সংঘাতবেদনা ততই দুঃসহ হয়ে উঠতে থাকবে।"[৩২]

ব্রাহ্মসমাজের যিনি আদিপ্রবর্তক, রাজা রামমোহন রায়, তিনি তাই কোনও রাজনৈতিক ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া ভারতবর্ষে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী প্রচারে

ব্রতী হন নাই। তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন সেই চিরন্তন 'ব্রহ্মসাধনা'র সুদৃঢ় শাশ্বত ও বিশ্বজনীন ভিত্তির উপর, যাহা চিরপুরাতন অথচ চিরনবীন।

"মানুষের ঐক্যের বার্তা রামমোহন একদিন ভারতের বাণীতেই ঘোষণা করেছিলেন, এবং তাঁর দেশবাসী তাঁকে তিরস্কৃত করেছিল—তিনি সকল প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমন্ত্রণ করেছিলেন মুসলমানকে, খৃষ্টানকে, ভারতের সর্বজনকে হিন্দুর এক পংক্তিতে ভারতের মহা অতিথিশালায়। যে ভারত বলেছে—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

…তাঁর মৃত্যুর পরে আজ একশত বৎসর অতীত হল। সেদিনকার অনেক কিছুই আজ পুরাতন হয়ে গেছে, কিন্তু রামমোহন রায় পুরাতত্ত্বের অস্পষ্টতায় আবৃত হয়ে যান নি। তিনি চিরকালের মতোই আধুনিক। কেন না তিনি যে কালকে অধিকার করে আছেন তার সীমা পুরাতন ভারতে, কিন্তু সেই অতীত কালেই তা আবদ্ধ হয়ে নেই—তার অন্যদিক চলে গিয়েছে ভারতের সুদূর ভাবীকালের অভিমুখে। তিনি ভারতের সেই চিত্তের মধ্যে নিজের চিত্তকে মুক্তি দিতে পেরেছেন যা জ্ঞানেরপথে সর্বমানবের মধ্যে উন্মুক্ত। তিনি বিরাজ করছেন ভারতের সেই আগামী কালে, যে কালে ভারতের মহা ইতিহাস আপন সত্যে সার্থক হয়েছে, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান মিলিত হয়েছে অখণ্ড মহাজাতীয়তায়।"[৩০]

কিন্তু ব্রহ্মসাধনার এই জীবন্ত আদর্শ, উপনিষদের ঋষিগণের বাণীর মধ্যে যাহা বিধৃত, ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের মধ্য দিয়া রাজা রামমোহন রায় যাহাকে রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজের পরবর্তী ইতিহাসে রক্ষিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মকে যেমন একটি নিয়ত বিবর্তনশীল তত্ত্বরূপে দেখিয়াছেন, সেইরূপ ব্রাহ্ম-সমাজও সেই মানবের চরম লক্ষ্য ব্রহ্মতত্ত্বের মতই নিয়ত চলমান হইবে, ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের অন্তরের কামনা। সুতরাং ব্রাহ্ম-আন্দোলন এমন একটি আন্দোলন, যাহা মানব-মনকে সর্ববিধ জড়তা ও বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ, যাহার মূল ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক অভীপ্সা ও শক্তির চিরন্তন উৎস উপনিষদের ভূমির মধ্যে নিহিত, এবং যাহা ভবিষ্যতের অন্তহীন লক্ষ্যের দিকে আপন অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির সতত উল্লাসের সাহায্যে প্রসারিত—ইহাই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ব্রাহ্ম-আন্দোলনের স্বরূপ ও ভূমিকা ; এবং যেহেতু ইহা কোনও সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে, সেইজন্য ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সংকটের মুহূর্তে—এবং আধ্যাত্মিক সংকটই সামাজিক, ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সর্ববিধ অশুভ সম্ভাবনার উৎপত্তিস্থল,—উপনিষদের এই ব্রহ্মসাধনার আদর্শ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই ভারতবর্ষ আপনার মুক্তির সন্ধান পাইবে, যে-মুক্তি কর্মসন্ন্যাসের দ্বারা লভ্য নয়, যাহা একমাত্র জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির সুসমঞ্জস সমন্বয়ের দ্বারাই লভ্য। রবীন্দ্রনাথের নিকট এই উপলব্ধি এতই সত্য ছিল, অসন্দিগ্ধ ছিল যে, তিনি কুণ্ঠাহীন চিত্তে বলিতে পারিয়াছিলেন—

"ইতিহাসে দেখা গিয়েছে, ভারতবর্ষ বারম্বার নব নব ধর্মমতের প্রবল আঘাত সহ্য করেছে। কিন্তু, চন্দনতরু যেমন আঘাত পেলে আপনার গন্ধকেই আরও অধিক করে প্রকাশ করে তেমনি ভারতবর্ষও যখনই প্রবল আঘাত পেয়েছে তখনই আপনার সকলের চেয়ে সত্যসাধনাকেই, ব্রহ্মসাধনাকেই, নূতন করে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তা যদি না করত তা হলে সে আত্মরক্ষা করতেই পারত না।"[১৪]

তাই 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' শীর্ষক ভাষণের অন্তিম অনুচ্ছেদটিতে ঋষিকবির কণ্ঠ হইতে যে সতর্কবাণী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে যেমন কবির আধ্যাত্মিক বোধ অনুপম অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, সেইরূপ ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের গতিপথ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণার সহিত ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণচিন্তার একটি অপূর্ব সমন্বয়ও উহাতে লক্ষ্য করিবার মত—

"যে সাধনা সকলকে গ্রহণ করতে ও সকলকে মিলিয়ে তুলতে পারে, যার দ্বারা জীবন একটি সর্বগ্রাহী সমগ্রের মধ্যে সর্বতোভাবে সত্য হয়ে উঠতে পারে, সেই ব্রহ্মসাধনার পরিপূর্ণ মূর্তিকে ভারতবর্ষ বিশ্বজগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করবে এই হচ্ছে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস। ভারতবর্ষে এই ইতিহাসের আরম্ভ হয়েছে কোন্ সুদূর দুর্গম গুহার মধ্যে। এই ইতিহাসের ধারা কখনও দুই কূল ভাসিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, কখনো বালুকাস্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু কখনোই শুষ্ক হয় নি। আজ আমরা ভারতবর্ষের মর্মোচ্ছ্বসিত সেই অমৃতধারাকে, বিধাতার সেই চিরপ্রবাহিত মঙ্গল-ইচ্ছার স্রোতস্বিনীকে আমাদের ঘরের সম্মুখে দেখতে পেয়েছি—কিন্তু, তাই বলে যেন তাকে আমরা ছোটো করে আমাদের সাম্প্রদায়িক গৃহস্থালীর সামগ্রী করে না জানি, যেন বুঝতে পারি নিষ্কলঙ্ক তুষার-স্রুত সেই পুণ্যস্রোত কোন্ গঙ্গোত্রীর নিভৃত কন্দর থেকে বিগলিত হয়ে পড়ছে এবং ভবিষ্যতের দিকপ্রান্তে কোন্ মহাসমুদ্র তাকে অভ্যর্থনা করে জলদমন্দ্রে মঙ্গলবাণী উচ্চারণ করছে। ভস্মরাশির মধ্যে যে প্রাণ নিশ্চেতন হয়ে আছে সেই প্রাণকে সঞ্জীবিত করবার এই ধারা। অতীতের সঙ্গে অনাগতকে অবিচ্ছিন্ন কল্যাণের সূত্রে এক করে দেবার এই ধারা। এবং বিশ্বজগতে জ্ঞান ও ভক্তির দুই তীরকে সুগভীর সুপবিত্র জীবনযোগে সম্মিলিত করে দিয়ে কর্মের ক্ষেত্রকে বিচিত্র শস্য-পর্যায়ে পরিপূর্ণরূপে সফল করে তোলবার জন্যেই ভারতের অমৃত-কলমন্ত্র-কল্লোলিত এই উদার স্রোতস্বতী।"[১৫]

রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্ববোধ ॥

উপনিষদের ভাবধারা রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রতি স্তরে এমনভাবে প্রবাহিত ছিল যে, তাঁহার প্রত্যেক চিন্তা ও কর্ম সেই ঔপনিষদ অধ্যাত্মবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিল বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যে, সঙ্গীতে, প্রবন্ধে, ভাষণে যাহাকিছু লিখিয়াছেন বা বলিয়াছেন, সে-সকলই উপনিষদের মূল আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাঁহার বিচিত্র কর্মজীবনের প্রত্যেকটি কর্মের মধ্যে—তাহা সমাজ-উন্নয়নমূলক হউক,

শিক্ষা-সংস্কার-বিষয়ক হউক, অথবা রাজনৈতিকই হউক—সেই প্রাচীন আর্য আদর্শই প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। যে-সকল মন্ত্র রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় ছিল, যেমন গায়ত্রী মন্ত্র, 'যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু' ইত্যাদি মন্ত্র, তৈত্তিরীয় উপনিষদের 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি চ' মন্ত্র, ঈশাবাস্যোপনিষদের 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ' এবং 'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ' মন্ত্রদ্বয়, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শুনঃশেপোপাখ্যানের অন্তর্গত সেই প্রসিদ্ধ গাথাপঞ্চক যাহাতে অগ্রগতির আহ্বান অনুপমভঙ্গীতে উদ্ঘোষিত হইয়াছে, এবং সর্বশেষে বৃহদারণ্যকোপনিষদের অন্তর্গত মৈত্রেয়ীর সেই ব্যাকুল প্রার্থনা 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্'—এই বেদবচনগুলি শুধুই যে রবীন্দ্রনাথের মননের বিষয় ছিল, তাহা নহে। প্রত্যহ যেমন এই সকল বেদবচন তাঁহার শ্রবণপথে অমৃতধারা বর্ষণ করিত, সেইরূপ ইহাদের অন্তর্নিহিত উপদেশের সাহায্যে তিনি আপন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সতত যত্নশীল ছিলেন। উপনিষদে বলা হইয়াছে, যিনি ব্রহ্মবিদ্ তিনি স্বয়ং ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঋগ্‌বেদের প্রসিদ্ধ বাগাম্ভৃণীয় সূক্তে যেমন অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ বিশ্বের নিধানভূত শব্দব্রহ্ম বা পরমাত্মার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—

'অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ',

বিশ্বের বিচিত্র সৃষ্টির সর্বত্র যেমন তিনি আপন সত্তা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, সেইরূপ রবীন্দ্রনাথও আপন সত্তাকে ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জীবনের সংকীর্ণ প্রাচীরের মধ্যে পরিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারেন নাই, তিনি এই বিচিত্র বিশ্বপ্রকৃতির সর্বত্র, তরু-লতা, পশু-পক্ষী, আকাশ-জল-মৃত্তিকা, সর্বত্র, আপনার অপরিমিত শাশ্বত সত্তাকে প্রসারিত দেখিতে পাইয়া ধন্য হইয়াছেন—

তৃণে-পুলকিত যে মাটির ধরা
লুটায় আমার সামনে
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
কেন যে, কব তা কেমনে।
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে।
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে
লুটায় আমার সামনে।

নিশার আকাশ কেমন করিয়া
তাকায় আমার পানে সে।

লক্ষ যোজন দূরের তারকা
মোর নাম যেন জানে সে।
যে ভাষায় তারা করে কানাকানি
সাধ্য কী আর মনে তাহা আনি—
চিরদিবসের ভুলে-যাওয়া বাণী
কোন্ কথা মনে আনে সে।
অনাদি উষার বন্ধু আমার
তাকায় আমার পানে সে ॥[৩৬]

'উৎসর্গে'র এই কবিতাটির মধ্যে কি আমরা প্রাচীন ঋষিগণের কণ্ঠ-নিঃসৃত সেই প্রসিদ্ধ মন্ত্র

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥

তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতেছি না? 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বর্ষশেষ' কবিতার নিম্নোদ্ধৃত স্তবকত্রয়ে মহাকবির ঋষিসুলভ বিশ্ববোধ, যাহা ব্রহ্মসাধনার চরম পরিণতি, কী অপরূপ আবেগ ও গভীরতার সহিতই না প্রকাশিত হইয়াছে!

লভিয়াছি জীবলোকে মানবজন্মের অধিকার,
ধন্য এই সৌভাগ্য আমার।
যেথা যে-অমৃতধারা উৎসারিল যুগে-যুগান্তরে
জ্ঞানে কর্মে ভাবে, জানি সে আমারি তরে।
পূর্ণের যে-কোনো ছবি মোর প্রাণে উঠেছে উজ্জ্বলি
জানি তাহা সকলের বলি।

ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে
আলোকের অতীত আলোকে।
অণু হতে অণীয়ান, মহৎ হইতে মহীয়ান
ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান।
ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়া যবনিকা
অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা ॥

যেখানেই যে-তপস্বী করেছে দুষ্কর যজ্ঞযাগ
আমি তার লভিয়াছি ভাগ।

মোহবন্ধমুক্ত যিনি আপনারে করেছেন জয়
তাঁর মাঝে পেয়েছি আমার পরিচয়।
যেখানে নিঃশঙ্ক বীর মৃত্যুরে লঙ্ঘিল অনায়াসে
স্থান মোর সেই ইতিহাসে।

ইহাকে কবির অহঙ্কৃত আত্মশ্লাঘা বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। ইহা সেই অর্থে 'আত্মস্তুতি' যে-অর্থে বেদের আধ্যাত্মিক মন্ত্রসমূহকে আরাধ্য দেবতার সহিত তাদ্‌ভাব্যাপন্ন ঋষির আত্মস্তুতি বলিয়া নির্দেশ করা হয়। কেননা, এই বাণীর মধ্যে যে আত্মস্বরূপের স্ফূর্তি, তাহা পরিচ্ছিন্ন জীবের আত্মা নহে, তাহা সেই পরম আত্মতত্ত্ব যিনি 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ', যিনি নিত্য, যিনি সর্বগত, যিনি সর্বানুভূ।

উপনিষদের অধ্যাত্মবোধের ভিত্তি হইতে বিচার করিলে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যেও আমরা আর কোনও অসামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইব না। কেন না, রবীন্দ্রনাথ দেশপ্রেমিক হইয়াও সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধের পরম বিরোধী। তাঁহার আন্তরিক কামনা যে, ভারতবর্ষ আপনার বৈশিষ্ট্য হইতে যেন বিচ্যুত না হয়, ভারতবর্ষের নিজস্ব বাণী যেন কখনও স্তব্ধ হইয়া না যায়, অথচ বিশ্বের ঐকতান সংগীতের বিচিত্র মূর্চ্ছনা শ্রবণের জন্যও তাঁহার চিত্ত সতত ব্যাকুল। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে ঐক্য ও বৈচিত্র্যের নির্বিরোধ সহাবস্থান উপলব্ধি করিয়াছিলেন, রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাহারই প্রতিবিম্ব সংঘটিত হউক, ইহাই ছিল তাঁহার একান্ত বাসনা। কেননা, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে যথার্থ দেশাত্মবোধের সহিত বিশ্ববোধের কোনও বিরোধই নাই—

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কী বেশে।
দেখিনু তোমারে পূর্বগগনে,
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।
ললাট তোমার নীল নভতল
বিমল আলোকে চির-উজ্জ্বল,
নীরব আশিসসম হিমাচল
তব বরাভয় কর,
সাগর তোমার পরশি চরণ,
পদধূলি সদা করিছে হরণ,
জাহ্নবী তব হার-আভরণ
দুলিছে বক্ষ-'পর।
হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে,
হেরিনু আজিকে নিমেষে—

মিলে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা,
মোর সনাতন স্বদেশে।[৩৭]

এই বিশ্ববোধ তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয় ছিল বলিয়াই তিনি যেমন স্বদেশের নেতৃবৃন্দের সংকীর্ণ স্বাজাত্যবোধের সমালোচনা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই, সেইরূপ শক্তি-মদ-মত্ত পাশ্চাত্ত্য জাতিবৃন্দের ন্যাশনালিজ্‌ম্ বা জাতীয়তাবাদের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রূপবাণ ও অভিশাপবাণী বর্ষণ করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন হন নাই। আমেরিকার জনসভায় প্রদত্ত এক ভাষণে কবি তাই বলিয়াছিলেন—

India has never had a real sense of nationalism, Even though from childhood I had been taught that idolatry of the Nation is almost better than reverence for God and humanity, I believe I have outgrown that teaching, and it is my conviction that my countrymen will truly gain their India by fighting against the education which teaches them that a country is greater than the ideals of humanity.[৩৮]

"There is only one history—the history of man. All national histories are merely chapters in the larger one."[৩৯]—ইহা কোনও সংকীর্ণ দেশাত্মবোধসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতার বাণী নয়। ইহা সেই কবির বাণী যিনি ঋষিগণের মতই ত্রিকালদর্শী, এবং যাঁহার প্রতিভার অম্লানদর্পণে উপনিষদের অধ্যাত্মচিন্তা স্বমহিমায় প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল।

৮. উপসংহার ॥

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এক প্রসিদ্ধ ইংরেজী ভাষণে বলিয়াছেন—

My religion is essentially a poet's religion. Its touch comes to me through the same unseen and trackless channels as does the inspiration of my music. My religious life has followed the same mysterious line of growth as has my poetical life. Somehow they are wedded to each other, and though their betrothal had a long period of ceremony, it was kept secret from me.[৪০]

রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি যে মূলতঃ আধ্যাত্মিক, ইহা তাঁহার রচনাবলী যাঁহারা নিপুণভাবে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট নিঃসংশয়ভাবে প্রতীয়মান। তবে প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের আধ্যাত্মিক চিন্তার সহিত রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চিন্তার একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। অধ্যাত্মতত্ত্বের যাঁহারা ব্যাখ্যাতা, তাঁহারা তাঁহাদের আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ভাবনারাজিকে একটি সংহত, সুসমঞ্জস, যুক্তিসিদ্ধরূপে জিজ্ঞাসুগণের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থাপন করিবার জন্য সতত যত্নশীল। যে-সত্য তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাকে মননের দ্বারা পরিশোধিত করিয়া হেতুবিদ্যার প্রচলিত বিচারপদ্ধতির সাহায্যে অব্যাপ্তি অতিব্যাপ্তি অসম্ভব প্রভৃতি যাবতীয় যুক্তিদোষ পরিহারপূর্বক কতকগুলি সিদ্ধান্তের

আকারে পরিচ্ছন্নরূপে প্রকাশ করাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেহেতু কবি, সেইহেতু বিরোধ বা অসামঞ্জস্য পরিহার করিবার দিকে তাঁহার ততখানি আগ্রহ নাই। কেননা, যে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবচিত্তকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের সর্ববিধ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তার উদ্ভব ও আবর্তন, তাহার মধ্যে বিরোধের বৈষম্যের অসামঞ্জস্যের অন্ত নাই। 'শান্তিনিকেতনে'র একটি ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"আমার কাছে এইটেই বড়ো আশ্চর্য ঠেকে—একই কালে প্রকৃতির এই দুই চেহারা, বন্ধনের এবং মুক্তির; একই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের মধ্যে এই দুই সুর, প্রয়োজনের এবং আনন্দের; বাহিরের দিকে তার চঞ্চলতা, অন্তরের দিকে তার শান্তি; একই সময়ে এক দিকে তার কর্ম, আর-এক দিকে তার ছুটি; বাইরের দিকে তার তট, অন্তরের দিকে তার সমুদ্র।"[৪১]

এই যে চেতন ও জড়—উভয় কোটি লইয়া অখণ্ড প্রকৃতি নিয়ত লীলা করিয়া চলিতেছে, কবি ও সাধক রবীন্দ্রনাথ ইহার সৌন্দর্য্য ও মহিমায় মুগ্ধ ছিলেন। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশটিতে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মসাধনার সহিত কাব্যসাধনার নিবিড় একাত্মতা অপরূপ বাণীমূর্তি লাভ করিয়াছে—

শুধায়ো না মোরে তুমি, মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই।
আমি তো সাধক নই,
আমি কবি, আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি।
এ পারের খেয়ার ঘাটায়।
সম্মুখে প্রাণের নদী জোয়ার-ভাঁটায়
নিত্য বহে নিয়ে ছায়া আলো,
মন্দ ভালো,
ভেসে-যাওয়া কত কী যে, ভুলে যাওয়া কত রাশি রাশি
লাভ ক্ষতি কান্নাহাসি—
এক তীর গড়ি তোলে অন্য তীর ভাঙিয়া ভাঙিয়া;
সেই প্রবাহের 'পরে উষা ওঠে রাঙিয়া রাঙিয়া,
পড়ে চন্দ্রালোকরেখা জননীর অঙ্গুলির মতো;
কৃষ্ণরাতে তারা যত
জপ করে ধ্যানমন্ত্র; অস্তসূর্য রক্তিম-উত্তরী
বুলাইয়া চলে যায়; সে-তরঙ্গে মাধবী মঞ্জরী
ভাসায় মাধুরী ডালি,
পাখি তার গান দেয় ঢালি।

সে তরঙ্গ নৃত্যছন্দে বিচিত্র ভঙ্গীতে
চিত্ত যবে নৃত্য করে আপন সংগীতে
এ বিশ্বপ্রবাহে,
সে-ছন্দে বন্ধন মোর, মুক্তি মোর তাহে।
রাখিতে চাহি না কিছু, আঁকড়িয়া চাহিনা রহিতে,
ভাসিয়া চলিতে চাই সবার সহিতে
বিরহমিলনগ্রন্থি খুলিয়া খুলিয়া
তরণীর পালখানি পলাতকা বাতাসে তুলিয়া।[৪২]

রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁহার দিব্য প্রাতিভ দর্শনের (Intuition) ফলে কাব্যসত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই জগৎ ও জীবনের পরম স্বরূপও তাঁহার নিকট প্রাতিভ দর্শনের মধ্যেই ধরা দিয়াছিল—শুধু মননের মধ্যে নয়। উপনিষদের মন্ত্ররাজিও ঋষিগণের প্রত্যক্ষ দর্শনসঞ্জাত সত্য উপলব্ধির বাঙ্ময় প্রকাশমাত্র।[৪৩] তাই তাঁহারা অবিকম্পিত কণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারিয়াছিলেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

রবীন্দ্রনাথের কবিকণ্ঠেও সেই একই সুর ধ্বনিত হইয়াছে—

ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে
আলোকের অতীত আলোকে।
অণু হতে অণীয়ান মহৎ হইতে মহীয়ান
ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান।
ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়া যবনিকা
অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা।[৪৪]

বিশ্বের নিধানভূত সত্তা চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম বা আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি লাভ করিবার জন্য কবিচিত্তের কী ব্যাকুলতাই না নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশটিতে প্রকাশ পাইয়াছে!

বিশ্বের প্রাঙ্গণে আজি ছুটি হোক মোর,
ছিন্ন করে দাও কর্মডোর।
আমি আজ ফিরিব কুড়ায়ে
উচ্ছৃঙ্খল সমীরণ যে-কুসুম এনেছে উড়ায়ে
সহজে ধুলায়,
পাখির কুলায়
দিনে দিনে ভরি উঠে যে-সহজ গানে
আলোকের ছোঁওয়া লেগে সবুজের তম্বুরার তানে।
এই বিশ্বসত্তার পরশ,
স্থলে জলে তলে তলে এই গূঢ় প্রাণের হরষ

তুলি লব অন্তরে অন্তরে—
সর্বদেহে, রক্তস্রোতে, চোখের দৃষ্টিতে, কণ্ঠস্বরে,
জাগরণে, ধেয়ানে, তন্দ্রায়,
বিরামসমুদ্রতটে জীবনের পরম সন্ধ্যায়।
এ জন্মের গোধূলির ধূসর প্রহরে
বিশ্বরসসরোবরে
শেষবার ভরিব হৃদয় মন দেহ—
দূর করি সব কর্ম, সব তর্ক, সকল সন্দেহ,
সব খ্যাতি, সকল দুরাশা—
বলে যাব, 'আমি যাই, রেখে যাই, মোর ভালোবাসা।'[৪৫]

প্রাচীন ঋষিগণের সহিত এই প্রতিভা-সঞ্জাত সুগভীর সাজাত্যবশতই রবীন্দ্রনাথের নিকট উপনিষদের বাণীসমূহ এতখানি প্রিয় ছিল, সেগুলি তাঁহার জীবনের পরম সম্পদ্‌রূপে গণিত হইয়াছিল। ব্রাহ্ম-পরিবারে, বিশেষতঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সন্তানরূপে, জন্মগ্রহণ কবিচিত্তের এই আধ্যাত্মিকতার উন্মেষের পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু, কবি-প্রকৃতির সহজাত গঠনের দিক দিয়া বিচার করিলে, উহা একটি আকস্মিক, বহিরঙ্গ, কাকতালীয় ঘটনামাত্র।

বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ দর্শনের (intuition) মধ্য দিয়াই পরম সত্যের সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন; এবং যেহেতু তিনি কবি ছিলেন, সেইহেতু সেই স্বোপলব্ধ পরম সত্যকে প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার কবিচিত্তের নিরন্তর আকুতি ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সেই প্রকাশও তাঁহার কবিতারাজির মতই প্রজ্ঞার বাণীতেই রূপ-পরিগ্রহ করিয়াছে, মননের যুক্তি-তর্কপ্রধান বিশ্লেষণী ভাষার মাধ্যমে নয়। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজের স্বীকারোক্তিই উদ্ধারযোগ্য—

I have already confessed that my religion is a poet's religion; all that I feel about it is from vision and not from knowledge. I frankly say that I cannot satisfactorily answer questions about the problem of evil, or about what happens after death. And yet I am sure that there have come moments when my soul has touched the infinite and has become intensely conscious of it through the illumination of joy. It has been said in our Upanishads that our mind and our words come away baffled from the supreme Truth, but he who knows That, through the immediate joy of his own soul, is saved from all doubts and fears.[৪৬]

সুতরাং শাস্ত্রীয় বিচারশৈলী প্রয়োগ করিয়া রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা

ও ভাবনারাজিকে বিশ্লেষণ করিতে বসিলে, তাহাদের মধ্যে অনেক আপাত-বিরোধ, যুক্তির দুর্বলতা ও অস্পষ্টতা সহজেই ধরা পড়িবে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও সে-সম্বন্ধে সবিশেষ জাগরূক ছিলেন। কিন্তু উপলব্ধিরও একটি অতি সূক্ষ্ম ও গভীর যুক্তিপদ্ধতি আছে, তাহা লৌকিক মননের বা বিচারপদ্ধতির স্থূল, সহজ-গ্রাহ্য যুক্তি হইতে কোনও অংশেই দুর্বল নহে। উপনিষদের মন্ত্ররাজির মধ্যেও কি লৌকিক দৃষ্টিতে আপাত-বিরোধ নাই? এবং সেই বিরোধ অপসারণপূর্বক তাহাদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনই কি ভগবৎপাদ মহর্ষি বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্ররচনার উদ্দেশ্য ছিল না? কিন্তু সেই সমন্বয়ের প্রয়াস কতখানি সার্থক হইয়াছে, তাহা আমরা ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর-রামানুজ-নিম্বার্ক-মধ্ব প্রমুখ ভাষ্যকারগণের পরস্পর-বিরোধী ব্যাখ্যানসমূহের তুলনামূলক আলোচনা করিলেই কিছুটা বুঝিতে পারি। এই প্রসঙ্গে একজন সুবিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ মনীষীর উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—

"...The Upanisads are nothing but free and bold attempts to find out the truth without the slightest idea of a system; and to say that any one particular doctrine is taught in the Upanisads is unjustifiable in the face of the fact that in one and the same section of an Upanisad, we find passages one following the other, which are quite opposed in their purport. Bold realism, pantheism, theism, materialism are all scattered about here and there, and the chronological order of the Upanisads has not been sufficiently established on independent grounds, so as to justify us in claiming that one particular view predominating in a certain number of Upanisads (granting that this is possible) represents the teaching of the Upanisads. And to say that idealism represents the real teaching of the Upanisads because it is contained in a certain Upanisad which is relatively old and that the Upanisad is relatively old beause it contains a view of things with which philosophy should commence, is nothing but a logical seesaw. It may be true that if one insists on drawing a system from the Upanisads, replete as they are with contradictions and divergences, Samkara has succeeded the best, because his distinction of esoteric and exoteric doctrines like a sword with two edges can easily reconcile all opposites such as unity and plurality, assertion of attributes and their negation, in conection with one and the same being; but this is one thing and to say that the Upanisads taught Samkara's doctrine is quite another thing."[১]

রবীন্দ্রনাথও উপনিষদের বাণীসমূহকে শাস্ত্রকারগণের বিচারশৈলীর অনুকরণে একটি নির্দিষ্ট প্রস্থান বা system-এর অনুগামী করিয়া সমন্বয়ের সূত্রে গাঁথিয়া তুলিবার কোনও সচেতন প্রয়াস করেন নাই—কেননা, ইহা তাঁহার সহজাত কবিস্বভাবের বিরোধী ছিল। কিন্তু সেই কারণে রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ্-ব্যাখ্যানগুলিকে উপহাস করিবার কোনও হেতু নাই। তিনি তাঁহার কবিসুলভ উপলব্ধির সাহায্যে আর্য উপলব্ধির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অধ্যাত্মরসপিপাসু জনসাধারণের নিকট সহজগ্রাহ্যরূপে উহাদের তাৎপর্য্য বিবৃত করিয়াছেন, যাহাতে পাঠকসমাজও সেই আর্য উপলব্ধির অতি সামান্য অংশও আপন-আপন হৃদয়ের মধ্যে বরণ করিয়া ধন্য হইতে পারে। তিনি নিজেও যেমন উপনিষদের ঋষিবাণীগুলিকে মননের সামগ্রী বলিয়া পৃথক করিয়া রাখিতে চাহেন নাই, সেগুলিকে যেমন স্বকীয় জীবনচর্য্যার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছিলেন, সেই বিশ্বসত্তা, বিশ্বরসসরোবর, ও বিশ্বচৈতন্যের দর্শন, স্পর্শন ও আস্বাদন যেমন তিনি সকল ইন্দ্রিয় ভরিয়া লাভ করিবার সাধনায় সতত উৎকণ্ঠিত ছিলেন—

এই বিশ্বসত্তার পরশ,
স্থলে জলে তলে তলে এই গূঢ় প্রাণের হরষ
তুলি লব অন্তরে অন্তরে—
সর্বদেহে, রক্তস্রোতে, চোখের দৃষ্টিতে, কণ্ঠস্বরে,
জাগরণে ধেয়ানে তন্দ্রায়।...
বিশ্বরসসরোবরে
শেষবার ভরিব হৃদয় মন দেহ

ইহাই যেমন ছিল কবিচিত্তের আজন্ম অভীপ্সা, ভারত ও বিশ্বের অধিবাসী সকলেই সেই পরম অমৃতের আস্বাদন লাভ করিয়া আপনার 'হৃদয় মন দেহ' সঞ্জীবিত করিয়া তুলুক, এই উদ্দেশ্যেই তিনি উপনিষদের বাণীসমূহের অভিনব ব্যাখ্যানে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে উপনিষদের শিক্ষা বৈরাগ্যের শিক্ষা নয়, সন্ন্যাসের শিক্ষা নয়, কর্মত্যাগের শিক্ষা নয়, জীবনকে সংকীর্ণ সীমার মধ্যে সঙ্কুচিত করিবার শিক্ষা নয়; উপনিষদের শিক্ষা পরিপূর্ণ মানবতার উদ্‌বোধন ব্রতে দীক্ষিত হইবার শিক্ষা, বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র রহস্যকে অঙ্গীকার করিবার শিক্ষা, এবং আমাদের প্রাত্যহিক আচরণ ও জ্ঞানের বিষয়ীভূত যে-সকল খণ্ড সত্য, তাহারই মধ্য দিয়া পরিপূর্ণ সত্তা, পরিপূর্ণ চৈতন্য ও পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ যে ব্রহ্ম তাঁহারই চিরন্তন প্রকাশকে উপলব্ধি করিবার শিক্ষা। এই শিক্ষা যদি আমরা আমাদের জীবনে গ্রহণ করিতে পারি, তবে পারলৌকিক মুক্তি সাধিত হইবে কি না হইবে সে-বিষয়ে হয়ত সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে; কিন্তু, আমাদের এই জন্ম-মৃত্যুর উভয় সীমার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র জীবন যে-জ্ঞান কর্ম ও প্রেমে বিকশিত হইয়া এই দুঃখ-শোক-জরা-ব্যাধি-সমাকীর্ণ মর্ত্যলোকে অমর্ত্যলোকের আভাস—তাহা যতই ক্ষীণ হউক না কেন—আনিয়া

দিতে সহায়ক হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? সাধক রবীন্দ্রনাথের যেমন ইহাই নিরন্তর আকুতি, কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির সকল প্রেরণাও কি সেই একই লক্ষ্যের অভিমুখে উৎসারিত হইয়া উঠে নাই? কেননা, আমরা দেখিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের জীবনে কাব্যসাধনা ও অধ্যাত্মসাধনা একই উৎসের দুইটি সমান্তরাল শাখা মাত্র—উহাদের মধ্যে আত্যন্তিক কোনও বিচ্ছেদ বা বিরোধ নাই। রবীন্দ্রনাথের বিপুল সাহিত্যসৃষ্টির যে অংশই আমরা আলোচনা করি না কেন, সর্বত্রই সেই 'বিশ্বরস-সরোবরে'র আনন্দ-কণিকার আস্বাদন লাভ করিয়া আমরা ধন্য হই, খণ্ড সত্তার মধ্যেই অখণ্ড বিশ্বসত্তার স্ফূর্তি প্রত্যক্ষ করি। তাঁহার কর্মজীবনেও সেই একই অখণ্ডের সুর ধ্বনিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনের সকল কর্ম, সকল নর্ম, সকল সাধনার ভিতর দিয়া উপনিষদের 'অমৃত-কলমন্ত্র-কল্লোলিত উদার স্রোতস্বতী'কে প্রত্যেক বিশ্ববাসীর হৃদয়দ্বারে প্রবাহিত করিয়া দিবার ব্রতে আপনাকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, আমরা যেন সেই মন্দাকিনী-স্রোতে অবগাহন করিয়া ধন্য হইতে পারি, তাহাকে যেন বিদ্রূপ ও উপহাসভরে অবজ্ঞা না করি। কেননা, রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাধকগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই এই ভাগীরথীপ্রবাহকে বর্ত্তমান যুগের মানবমনের ঊষর ভূমিতে আবাহন করিয়াছিলেন। আপন অধ্যাত্মসাধনার বৈশিষ্ট্য খ্যাপন করিয়া তিনি নব ভগীরথের ভূমিকা গ্রহণ করিতে চাহেন নাই।[৪৮]

॥ টীকা ॥

১ দ্র° বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৮৮০ শক।

২ শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৩, 'সামঞ্জস্য'। বিশ্বভারতী হইতে দুই খণ্ডে প্রকাশিত 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধসংকলন আলোচ্য।

৩ শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০, 'প্রার্থনা'।

৪ ঐ. ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯১, ৩৯৪, 'অগ্রসর হওয়ার আহ্বান'।

৫ ঐ. ২য় খণ্ড. পৃ. ২, 'ভক্ত'।

৬ ঐ. ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৪-৫৫, 'জগতে মুক্তি'।

৭ ঐ. ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৩, 'মত'।

৮ ঐ. ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৮, 'নির্বিশেষ'।

৯ উৎসর্গ ২২।

১০ শান্তিনিকেতন ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৫, 'একটি মন্ত্র'।

১১ ঐ. পৃ. ৩৭৩-৩৭৪, 'একটি মন্ত্র'।

১২ ঐ ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০-৩৫, 'সামঞ্জস্য'।

১৩ ঐ. ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৯, 'আত্মবোধ'।

১৪ ঐ. ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭০ 'একটি মন্ত্র'। তু° ঐ. ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৮, 'স্বাভাবিকী ক্রিয়া'।

১৫ ঐ. ২য়খণ্ড, পৃ. ১৮৪, 'কর্মযোগ'। তু°—"প্রয়োজন থেকে, অভাব থেকে, আমরা যে কর্ম করি সেই কর্মই আমাদের বন্ধন ; আনন্দ থেকে যা করি সে তো বন্ধন নয়—বস্তুত সেই কর্মই মুক্তি।"—ঐ. ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৫, 'কর্ম'।

১৬ ঐ. ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬, 'প্রেম'।

১৬ক তু° "Yes, we must become Brahma. We must not shrink from avowing this....But can it then be said that there is no difference between Brahma and our individual soul ? Of course the difference is obvious...Brahma is Brahma, he is the infinite ideal of perfection. But we are not what we truly are ; we are ever to become true, ever to become Brahma. There is the eternal play of love in the relation between this being and the becoming ; and in the depth of this mystery is the source of all truth and beauty that sustains the endless march of creation."—*Sadhana* : 'The Realisation of the Infinite', p. 155. দ্র° শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮১-৮৪, 'হওয়া।

১৭ শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮২-৩, 'কর্মযোগ'।

১৮ ঐ. ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭, 'বিশ্ববোধ'। তু°—"We have often heard the Indian mind described by Western critics as metaphysical, because it is ready to soar in the infinite. But it has to be noted that the infinite is not a mere matter of philosophical speculation to India; it is as real to her as the sunlight. She must see it, feel it, make use of it in her life..."—*Lectures & Addresses* : 'What is Art ?', p. 92.

১৯ তু° "To the Buddhist, this world is transitory, vile and miserable; the flesh is a burden, desire an evil, personality a prison." —Laurence Binyon : *Painting in the Far East*, p. 22.

২০ শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৩-৩৪, 'সামঞ্জস্য'। আচার্য্য শঙ্করের মতবাদের সহিত রবীন্দ্রনাথের মতবাদের এই বৈষম্য লক্ষ্য করিয়াই ডঃ রাধাকৃষ্ণন্ মন্তব্য করিয়াছেন— "Between the stern philosophy of Sankara, with its rigorous logic and the ascetic ethic of inaction and the human philosophy of Rabindranath Tagore, it is war to the knife."—*The Philosophy of Rabindranath Tagore*, p. 114. (Macmillan & Co. Ltd. 1918).

২১ শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭, 'চিরনবীনতা'।

২২ *The Philosophy of Rabindranath Tagore*, p. 83.

২৩ শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৭-৩৯, 'সামঞ্জস্য'।

২৪ ঐ. ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৪।

২৫ চারিত্রপূজা, পৃ. ৮৭-৮৮।

২৬ শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪, 'সামঞ্জস্য'।

২৭ চারিত্রপূজা, পৃ. ১০১।

২৮ তু° "The writer has been brought up in a family where texts of the Upanishads are used in daily worship; and he has had before him the example of his father, who lived his long life in the closest communion with God, while not neglecting his duties to the world, or allowing his keen interest in all human affairs to suffer any abatement."—*Sadhana*, Preface, p. vii.

২৯ দ্র° "মহর্ষি ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মেরই একটি শাখা বলে প্রচার করতে উৎসুক ছিলেন। সেইজন্য মূর্তিপূজা বাদ দিয়ে হিন্দুসমাজের রীতি রক্ষা করে তাঁর সব অনুষ্ঠান-পদ্ধতি রচনা করেন। কিন্তু রবি-কাকা সেরকম কোনো পূর্বসংস্কারে আবদ্ধ ছিলেন না। তাঁর পারিবারিক জীবনেই তার প্রমাণ দিয়েছেন।..."—ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী : রবীন্দ্রস্মৃতি, পৃ. ৬১। তু° চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৪৩ [পত্রসংখ্যা ১০]।

৩০ শান্তিনিকেতন ২য় খণ্ড, পৃ. ২২০-২১।

৩১ ঐ. ২য় খণ্ড, পৃ. ২২১, 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা'।

৩২ ঐ ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৫-২৬, ঐ।

৩৩ দ্র° ভারতপথিক রামমোহন রায়, পৃ. ২২ (রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংস্করণ)।

৩৪ শান্তিনিকেতন ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৮, 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা'।

৩৫ ঐ. ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৬-২৭, ঐ।

৩৬ উৎসর্গ ১৪। দ্র° ছিন্নপত্র, সংযোজন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নিকট লিখিত কবির পত্র।

৩৭ উৎসর্গ ১৬।

৩৮ দ্র° Nationalism in India : *Lectures & Addresses* by Rabindranath Tagore (Selected by Anthony X. Soares, M. A., LL.B.). Macmillan & Co. Ltd. 1955, p. 105.

৩৯ ঐ পৃ. ১০২।

৪০ *The Religion of an Artist*, p. 10 (Visva Bharati).

৪১ শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৯, 'শ্রাবণসন্ধ্যা'।

৪২ পরিশেষ, 'পান্থ'।

৪৩ তু° 'দর্শনাদৃষয়ো বভূবুঃ।'

৪৪ পরিশেষ, 'বর্ষশেষ'।

৪৫ ঐ, 'জন্মদিন'।

৪৬ *The Religion of an Artist*, p. 12.

৪৭ দ্র° V. S. Ghate : *The Vedanta* : A Study of the Brahma-Sutras with the Bhasyas of Samkara, Ramanuja, Nimbarka, Madhva and Vallabha. Second Edition, 1960 (Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona). Introduction, p. 9. অপিচ তুলনীয় : "And life is not dogmatic ; in it opposing forces are reconciled—ideas of non-dualism and dualism, the infinite and the finite, do not exclude each other. Moreover the Upanisads do not represent the spiritual experience of any one great individual, but of a great age of enlightenment which has a complex and collective manifestation, like that of the starry world. Different creeds may find their sustenance from them, but can never set sectarian boundaries round them ; generations of men in our country, no mere students of philosophy, but seekers of life's fulfilment, may make living use of the texts. but can never exhaust them of their

freshness of meaning.—Rabindranath : *Foreword* to S. Radhakrishnan's *The Philosophy of the Upanisads.*

৪৮ এই প্রসঙ্গে ডঃ রাধাকৃষ্ণনের সারগর্ভ মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য—
"The ancient wisdom of India held renunciation to be only a factor and not the end in itself. The balanced harmony between the great affirmation and the great renunciation is emphasised by the humanist thinkers of the country. Rabindranath Tagore is the representative of the humanist school. The impression that Rabindranath's views are different from those of Hinduism is due to the fact that Hinduism is identified with a particular aspect of it—Samkara Vedanta, which, on account of historical accidents, turned out a world-negating doctrine. Rabindranath's religion is identical with the ancient wisdom of the Upanishads, the Bhagavadgita, and the theistic systems of a later day.

"Our conclusion is that in his *Sadhana* and other works, Rabindranath by his power of imagination has breathed life into the dry bones of ancient philosophy of India and made it live. His teaching is in no sense a mere borrowed product of Christianity ; indeed, it goes deeper in certain fundamental aspects than Christianity, as represented to us in the Wesc. And if Rabindranath's religion is something "better than the Christianity which came into it", it only shows that the ancient religion of India has not much to gain from Western Christianity."—*The Philosophy of Rabindranath Tagore,* p. 119.

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

বাংলাদেশে যাঁহারা বুদ্ধসম্বন্ধে সর্বপ্রথমে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ (বুদ্ধদেবচরিত নাটক), কবি নবীনচন্দ্র সেন (অমিতাভ কাব্য) এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বৌদ্ধধর্ম)। গিরীশচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের একমাত্র অবলম্বন ছিল সার এড্‌উইন আর্নল্‌ড্‌ রচিত, সে যুগে বিশ্বখ্যাত 'দি লাইট অভ এশিয়া' নামক ইংরেজি কাব্য— ইহা মহাযান-সংস্কৃত কাব্য ললিতবিস্তর-অনুসরণে লিখিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইতিমধ্যে হীনযান ও মহাযান শাস্ত্র অবলম্বনে বুদ্ধসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বিচারপদ্ধতি অবলম্বনে যাহা লিখিতেছিলেন, তাহার মধ্যে ইংরেজিতে লিখিত গ্রন্থাবলীর সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচিত ছিলেন।

অপর যে বাঙালী মনীষী বুদ্ধসম্বন্ধে সেইকালে বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছিলেন, তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের বুদ্ধসম্বন্ধীয় চিন্তা ও রচনার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল। পাশ্চাত্য চিন্তাশীল সমাজকে বুদ্ধের আত্মত্যাগী পরোপচিকীর্ষা এবং লোকহিতার্থে জীবনব্যাপী শ্রম যেরূপ মুগ্ধ করিয়াছিল তাহাতে বিবেকানন্দ বিশেষ অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। আত্মাবিরোধী ও ব্রহ্মবিষয়ে নিরুত্তর বুদ্ধের প্রতি বেদান্তপথিক ও কিছু পরিমাণে তান্ত্রিকভাবাপন্ন বিবেকানন্দের প্রগাঢ় ভক্তি বড়ই চিত্তপ্রসাদকর। এই ভক্তির কারণ, বিবেকানন্দের নিজ প্রকৃতিতে যে প্রেরণাগুলি বলবান ছিল, সমগ্র ভারতীয় সাধু-সন্ন্যাসীর ইতিহাসে বুদ্ধেই তিনি তাহার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখিয়াছিলেন— অর্থাৎ জ্ঞানবাদ, ত্যাগ, এবং সর্বোপরি লোকহিতে অক্লান্ত কর্মপরায়ণতা। কর্মহীন জ্ঞান ও পরদুঃখ-নিবারণে অনুৎসাহী নিজমুমুক্ষা, ভারতীয় সাধুসাধারণের এই মনোভাব বিবেকানন্দের প্রকৃতির বিশেষ প্রতিকূল ছিল।

বুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই ব্রহ্মবাদী আত্মাবিশ্বাসী বিবেকানন্দ নিরীশ্বর অনাত্মবাদী বুদ্ধের সাধনাক্ষেত্র কীটমশকসমাকুল বোধিদ্রুমমূলে ধ্যানাভ্যাস দ্বারা প্রেরণা-লিপ্সু হইয়াছিলেন। আরও আশ্চর্যের বিষয়, বিবেকানন্দ স্বপ্নে নয়, সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় একাধিকবার যাঁহার 'ভিশন' দেখিয়াছিলেন এবং বাণী শুনিয়াছিলেন, তিনি ব্রহ্মজ্যোতি নয়, কোনও পৌরাণিক দেবদেবী নয়, নিজগুরু শ্রীরামকৃষ্ণও নয়— পরন্তু বুদ্ধ। এই 'যাদৃশী ভাবনা যস্য' ও 'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ' হইতে বুঝা যায় তাঁহার অন্তঃপ্রকৃতি কি আকাঙ্ক্ষা করিত।

সেই কালে সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণও 'বুদ্ধদেব' নামক পুস্তক লিখিয়াছিলেন এবং পালি চর্চা করিয়াছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাযান গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধের প্রতি মহাশ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। বুদ্ধ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি তিনি বিশেষ জানিতেন; অনুবাদে ও মূলে কিছু হীনযান-মহাযান গ্রন্থাবলীর সঙ্গেও তাঁহার পরিচয় ছিল; তদুপরি তাঁহার অসামান্য মনীষা ও অন্তর্দৃষ্টি-বলে তিনি শাক্যপুত্রের যে পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি ভাষণে লেখনে কবিতায় প্রবন্ধে অদ্বিধায় বুদ্ধকে জগতের শ্রেষ্ঠমানব বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যে ধর্মমতবাদে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং যাহার অনুসরণ করিতেন তাহাতে কোনও মানুষকে গুরুরূপে অতিভক্তি এবং প্রতিমা প্রণামাদি নিন্দনীয় বলিয়া গণিত হয়, অথচ বুদ্ধকে শুধু জগতের শ্রেষ্ঠমানব-ঘোষণা নয়, Buddha, my Lord, my Master বলিতেও তিনি কোনও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। অধিকন্তু করুণাঘন বুদ্ধকে ধরণীতল কলঙ্কশূন্য করিবার জন্য, অত্যাচারীদের নিঃসীম অসম্মান নিজ-পুণ্য-আলোকে নিঃশেষে অবসান করাইবার জন্য, নিখিলভুবনময় অমৃতবারি সিঞ্চনের জন্য, বিশ্বে জ্ঞান ও প্রেম উদয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথ নিজ রচনাবলীতে যত প্রার্থনা জানাইয়াছেন তাহাতে অবতারবাদীগণের 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং, ধর্মসংস্থাপনার্থায়' অবতারস্তবের কথা মনে পড়ে।

২

রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'র বৌদ্ধকাহিনী অবলম্বনে রচিত হৃদয়গ্রাহী কবিতাগুলি বাংলাসাহিত্যের চিরসম্পদ, ইহা যুগে যুগে তরুণ মনকে উদ্দীপিত মুগ্ধ ও প্রভাবিত করিবে। তার পর বৌদ্ধসাহিত্যে বর্ণিত কত ঘটনার সূত্রে তিনি নাটকে কবিতায় গীতে বাংলাভাষায় মনোহারী রূপ ও রস সৃষ্টি করিয়াছেন।

'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ'। মানুষ পুত্রে নিজপরিপূর্তি দেখিতে চায়, পুত্রকে নিজের আদর্শের সাধনা করাইতে চায়, পুত্রে নিজের অপূর্ণ-কামনার তৃপ্তি আকাঙ্ক্ষা করে। পণ্ডিতবর বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে শুনিয়াছি তিনি যখন নবীনযুবাকালে প্রথম বোলপুর-ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগদান করেন তখন তিনি পৌরোহিত্যব্যবসায়ী-ভট্টাচার্যবংশজাত টুলোপণ্ডিতমাত্র, সামান্য কাব্যব্যাকরণে উপাধি ও কিছু বৈদিকসাহিত্যপরিচয়মাত্র তাঁহার বিদ্যাসম্বল। রবীন্দ্রনাথ একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "শাস্ত্রীমশায়, এই দেখুন আপনার জন্য বই কিনিয়াছি (Anderson's Pali Reader, Childers' Pali-English Dictionary এবং Geiger's Pali Grammar) আপনি রথীকে (পুত্র রথীন্দ্রনাথ) পালি শেখান!" ফলে দীর্ঘকাল অধ্যবসায়ের বলে বিধুশেখর শাস্ত্রী ভারতের একজন অগ্রগণ্য পালিপণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং উত্তরকালে চীনা ও তিব্বতী চর্চা করিয়া মহাযানশাস্ত্র সম্বন্ধে মূল্যবান কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কাছে উত্তম পালি শিক্ষা করিয়া এবং রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে সংস্কৃতবিদ পণ্ডিত শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী সিংহল প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করিয়া বৌদ্ধধর্মবিষয়ে বহু জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। ভারতের নানাস্থান হইতে পণ্ডিতেরা বিধুশেখর শাস্ত্রীর কাছে বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার জন্য আসিতেন। শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীতে বৌদ্ধ

চর্চার মূল উৎসে ছিল রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ ও উৎসাহ। একদা তিনি বাংলা ছন্দে ধম্মপদ নামক প্রসিদ্ধ বুদ্ধরচনাবলীর অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

প্রাচ্য এশিয়ার বৌদ্ধদেশগুলিতে ভ্রমণের সময়ে বৌদ্ধধর্মের যে উজ্জ্বল স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় উদিত হয়, তাহার পরিচয় তিনি বিবিধ রচনায় ও ভাষণে দিয়াছেন। বৌদ্ধদেশগুলির সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক সংযোগ পুনঃস্থাপনে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াসের ফলে এই-সকল দেশে মুদ্রিত বৌদ্ধশাস্ত্রাবলী যে কালে শান্তিনিকেতনে প্রেরিত হয়, সে কালে ভারতের অন্য কোথাও এই গ্রন্থাবলী এমন-কি পণ্ডিতেরাও কখনও দেখেন নাই।

রবীন্দ্রজীবনী-রচয়িতা এবং বিশ্বভারতীর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি একদা এক সিংহলী হীনযানী বৌদ্ধভিক্ষু প্রচারক শান্তিনিকেতনে আসিয়া একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ভিক্ষুবর পালিভাষাভিজ্ঞ ছিলেন এবং সামান্য কিঞ্চিৎ ইংরেজি ও অশুদ্ধ হিন্দি শিখিয়াছিলেন। এই তিন ভাষার অদ্ভুত সংমিশ্রণে, শ্রোতৃবর্গ দিশাহারা অসহায় হইয়া তাঁহার সুদীর্ঘ বৌদ্ধধর্মব্যাখ্যান শুনিয়া কেহই কিছু না বুঝিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন। জ্ঞানপিপাসু রবীন্দ্রনাথও বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিলেন এবং দেখা গেল তিনি সম্পূর্ণ অবিচলিত ও স্থিরভাবে অটুট ধৈর্য ও অসীম আগ্রহের সহিত বক্তার অবোধ্য বক্তব্য বুঝিবার চেষ্টায় মনোযোগ দিয়াছিলেন।

জ্ঞানীগণ জ্ঞানপিপাসু হন। জ্ঞানসংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় আসক্তি ছিল। কিন্তু সিংহলী ভিক্ষুর বক্তব্যবোধে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াস শুধু জ্ঞানসংগ্রহের আগ্রহবশতঃ হয় নাই, উহাতে প্রচুর কৌতূহলও ছিল মনে হয়। এই কৌতূহলের কারণ ছিল এই যে, তিনি বুদ্ধের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তায় বৌদ্ধধর্মের যে মূলতত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন তাহাতে হীনযানের সাধারণ-প্রচলিত অনেক মতবাদের সমর্থন হয় না, তাই তিনি বুঝিতে চাহিয়াছিলেন প্রচলিত মতবাদ স্বীকার ও অনুসরণ করিয়া যে হীনযানী রস ও তৃপ্তিবোধ করে, তাহার চিন্তার সূত্র ও ধারা কিরূপ।

এই যে বৌদ্ধমত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সংশয় ছিল, তাহা নির্বাণের অর্থ। বিষয়টি কঠিন। হীনযানিক মতে অনেক ক্ষেত্রে নির্বাণের প্রধান অর্থ দাঁড়াইয়াছিল দীপনির্বাণবৎ নিরবশেষ সর্বশূন্যতা। ইহা নাস্তিধর্মক 'নেগেটিভ' সংজ্ঞা। নির্বাণের অপরাপর ব্যাখ্যাও পালিশাস্ত্রে আছে, কিন্তু নিব্বানং পরমং সুখং, এ কথা স্বয়ং বুদ্ধই বলিলেও এবং মিলিন্দ-পঞ্‌হোর মত প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থেও নির্বাণকে অস্তিধর্মক 'পজিটিভ' সংজ্ঞারূপে উপস্থাপিত করা হইলেও বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের মতে বাস্তবিকই নির্বাণের অর্থ প্রায়শঃই মনে করা হইত পূর্ণবিলুপ্তি। মহাযানিকরাও এই ভাব সম্পূর্ণ পরিহার করিতে পারেন নাই। শোপেনহাউআর প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা নির্বাণের অর্থ যে complete extinction বুঝিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ অন্যায় হইয়াছিল বলা যায় না।

সাধনমার্গ ধর্মের আদর্শ অনুযায়ীই হয়। নির্বাণের অর্থ যদি উক্তরূপ হয় তবে

নির্বাণলাভের মার্গ অবশ্যই হইবে সকল প্রবৃত্তির, সকল সুকুমার হৃদয়বৃত্তিরও সমুলোৎখাত। এই মত স্বীকারে রবীন্দ্রনাথের প্রবল আপত্তি ছিল।

৩

বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের শূন্যতা অর্থে নির্বাণ-ধারণা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেহ বুদ্ধ-বচনে উহার পূর্ণ সমর্থন না পাইয়া ক্রমে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন নির্বাণের অর্থ সর্বরিক্ততা নয়। আজকাল পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ প্রায় সকলেই এ বিষয়ে একমত।

অধ্যাপক ফ্রীড্রিশ্ হাইলার তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে জার্মানির একজন বড় পণ্ডিত। প্রাচ্যধর্ম, বিশেষতঃ বৌদ্ধ ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি বিশেষজ্ঞ। সম্প্রতি তাঁহার সঙ্গে আলাপে জিজ্ঞাসা করিলাম বুদ্ধের নির্বাণ কি সত্যই সর্বরিক্ততা? স্বল্পভাষী পণ্ডিত বলিলেন, 'না'।

বুদ্ধের চিন্তায় কি বাস্তবিকই কোনও পরমসত্তার স্থান নাই?

—আছে।

তবে পরমাত্মা সম্বন্ধে বুদ্ধের নিরুত্তরতার অর্থ কি?

—মানুষের মন ঈশ্বর বিষয়ে তর্ক হইতে নৈতিক চরিত্র গঠনে নিয়োগ করিবার জন্য বুদ্ধ ঈশ্বর বিষয়ে জিজ্ঞাসায় উৎসাহ দেখাইতেন না।

এক দিকে অসংযত ইন্দ্রিয়ভোগ ও অন্য দিকে দারুণ কৃচ্ছ্র, এই দুই অন্ত পরিহার করিয়া বুদ্ধ যে মধ্যপথের কথা বলিয়াছিলেন তাহাতে সংসার সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয় এরূপ মনে হয় না, কিন্তু হীনযানে সন্ন্যাস বৈরাগ্য সংসারদ্বেষ প্রভৃতির এত গৌরব দেওয়া হইয়াছে কেন?

—সন্ন্যাসীরা শাস্ত্রকে ঐরূপ দাঁড় করাইয়াছেন।

অধ্যাপক মহাশয়ের মত সংক্ষেপে ব্যক্ত হইলেও চিন্তাশীল ঐতিহাসিকগণ উহার পোষকতা করিবেন। যাঁহারা এ বিষয়ে যথেষ্ট চর্চা করেন নাই তাঁহাদের জন্য অবশ্য বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচিত না হইলে সহজবোধ্য হইবে না।

পালিশাস্ত্রের বিবরণে দেখা যায় বুদ্ধ সাধারণতঃ গৃহস্থদিগকে সংসারের অসারতা শিক্ষাদানের পরিবর্তে গার্হস্থ্যধর্ম পালন শিক্ষা দিতেন, গৃহীগণকে বা সর্বসাধারণকে নির্বাণতত্ত্ব বুঝাইবার প্রয়াস করিতেন না, মাত্র সন্ন্যাসগ্রাহী বা সন্ন্যাসকামীকে সংসার-নির্বেদ শিক্ষা দিতেন, এবং কেবল যোগ্য প্রয়াসীকে নির্বাণ বিষয়ে প্রোৎসাহিত করিতেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন তিনি কর্মত্যাগ শিক্ষা দেন বটে কিন্তু সে কর্ম পাপকর্ম, এবং তিনি যাহার নাশ শিক্ষা দেন তাহা দম্ভ কাম পাপ ও অবিদ্যার নাশ, ক্ষমা প্রেম দয়া এবং সত্যের নাশ নয়।

অহিংসা সত্য অক্রোধ অদত্ত-অগ্রহণ ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতি যে 'শীল' পালন বুদ্ধ শিক্ষা দিতেন, যে 'আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ'কে তিনি ধর্মজীবনের সোপান বলিয়াছিলেন, যাহাকে তিনি যথার্থ 'মঙ্গললাভে'র প্রয়াস বলিতেন, সেই-সকল সুনীতিপালন জৈনশিক্ষায়ও উচ্চস্থান পাইয়াছিল। ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে দেখি যাগযজ্ঞ স্তবস্তুতি ক্রিয়াকাণ্ডের

দ্বারা দেবতার তুষ্টি সাধন করিয়া পরলোকে পুণ্যসঞ্চয় বা দেবজন্ম লাভ প্রভৃতির যে শিক্ষা সে যুগে প্রচলিত লোকধর্মে প্রবল ছিল এবং যাহার ব্যবসা করিয়া পুরোহিত-সম্প্রদায় উদরপূর্তি করিতেন, জৈনবৌদ্ধ শিক্ষায় তাহার পরিবর্তে শীল বা সুনীতি-পালনকে ধর্মজীবনের প্রথম সোপান বলা হইয়াছিল। শীল ও সুনীতিপালন ধর্মের বহিরাকার, সচ্চরিত্রতা ধর্মের মার্গ, দার্শনিক ভিত্তিতে ধর্মের প্রতিষ্ঠা— এই-সকল বিষয় জৈন-বৌদ্ধ শিক্ষায় যেরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল সেরূপ ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে সে যুগে করে নাই। উপনিষদের শিক্ষায়ও এই-সকল শিক্ষার আভাস আছে কিন্তু উপনিষদের চিন্তা ব্রাহ্মণ্য-সমাজে জন্মে নাই এবং কিছু পরবর্তীকালে এই চিন্তা ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়।

রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধের শীল চরিত্র মঙ্গল প্রভৃতির শিক্ষা ব্যাখ্যা করিয়া বুদ্ধের ধর্মের অর্থ ও লক্ষ্য বুঝাইয়াছেন।[১] অনেকে বুদ্ধের 'আর্য সত্য চতুষ্টয়' বা 'আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ' বা 'প্রতীত্য-সমুৎপাদ'-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া প্রভূত পাণ্ডিত্যপ্রসার করিয়া থাকেন এবং মনে করেন দার্শনিক বিশ্লেষণই বুঝি বুদ্ধের শিক্ষার চরমোৎকর্ষ। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও অন্তর্দৃষ্টি এই পাণ্ডিত্য পথ পরিহার করিয়া অন্য পথে বুদ্ধের শিক্ষার সারতত্ত্বে উপনীত হইবার প্রয়াস করিয়াছে এবং সেই সারতত্ত্বের আলোকে তিনি বুদ্ধের শিক্ষার যাহা চরমভূমি, সেই নির্বাণতত্ত্বও বুঝিয়াছেন। তাঁহার এই বোধ অতি সত্য ও অতি উজ্জ্বল মনে করি। এক শ্রেণীর বুদ্ধশিষ্যগণের শাস্ত্রে (হীনযান) যাহা উল্লিখিত হইলেও উপযুক্তভাবে উদ্ভাসিত হয় নাই, অপর এক শ্রেণীর শাস্ত্রে (মহাযান) যাহা অতিলৌকিকতা-প্রীতি ও অতিরঞ্জন-প্রবণতাবশতঃ কিছু পরিমাণে আচ্ছন্ন এবং হয়তো বিকৃতও হইয়াছে, বুদ্ধশিক্ষার সেই মর্ম উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে রবীন্দ্রনাথের মনীষা। ইহাতেও সুখবোধ হয় যে, রবীন্দ্রনাথ নিজ বক্তব্য সুস্পষ্ট করিয়াছেন শুধু মহাযানের ইঙ্গিতে নয়, হীনযানিকদেরই শাস্ত্রোক্তি হইতে।

বুদ্ধশিক্ষার সারমর্ম রবীন্দ্রনাথ পাইয়াছেন— এবং তাহারই আলোকে নির্বাণের অর্থ বুঝিয়াছেন নির্বাণ সর্বশূন্যতা নয়— বুদ্ধের 'মৈত্রীভাবনা'য় ও 'ব্রহ্মবিহারে'। ব্রহ্মশব্দের অর্থে অবশ্য বুদ্ধযুগের ভাষায় ভক্ত ঈশ্বরবাদীর ঈশ্বর বুঝাইত না, ব্রহ্মের মৌলিক অর্থ বৃহৎ বিশাল বিপুল। আচার্য শঙ্করও এই অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, যদিও অবশ্য তিনি তাহাতে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত আত্মাও বুঝিয়াছেন। বিহার শব্দের অর্থ অবস্থান— যেমন, 'সেই সময়ে ভগবান (বুদ্ধ) শ্রাবস্তীতে জেতবনে অনাথপিণ্ডদের আরামে (উদ্যানবাটিতে) বিহার করিতেছিলেন (অবস্থান করিতেছিলেন)'। সুতরাং ব্রহ্মবিহারের অর্থ বৃহৎ জীবন, বিশাল অস্তিত্ব প্রভৃতি।

---

১ বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষে (১৩৬৩ সাল) রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধসম্বন্ধীয় যাবতীয় গদ্য রচনা বক্তৃতা ও কবিতাবলী একত্র করিয়া বিশ্বভারতী হইতে বাংলা ও ইংরেজিতে 'বুদ্ধদেব' নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার উক্তি এই দুই পুস্তক হইতেই উদ্ধৃত করিব।

শীলনিয়ম পালনের দ্বারা বুদ্ধ মানুষকে জান্তবপ্রকৃতির দুর্বলতা ত্যাগ শিক্ষা দিয়াছিলেন, ষড়রিপু দমনের উপদেশ দিয়াছিলেন, যাহাতে মানুষের চিত্তশোধন হয়। রোগ নাশেই কি রুগ্নের পূর্ণস্বাস্থ্য লাভ হয় ? অবশ্যই না, রোগনাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে বলবৃদ্ধি করিতে হয়। বিনা রোগনাশে বলবৃদ্ধি সফল হয় না, বিনা বলবৃদ্ধিতে রোগনাশ সার্থক হয় না। আত্মিক স্বাস্থ্যলাভ, আত্মিক বলবৃদ্ধি হইতেছে আত্মার উন্নতি-পথ। এই পথের নির্দেশ বুদ্ধ করিয়াছিলেন মৈত্রীভাবনায় ও ব্রহ্মবিহারে।

মৈত্রীভাবনার সারকথা হইতেছে সকলের সুখলাভ আকাঙ্ক্ষা— যেমন নিজের সুখ আকাঙ্ক্ষা করি সেরূপ সর্বজীবের সুখ আকাঙ্ক্ষা, অর্থাৎ, আত্মভাবের প্রসার, 'অহং'তা মম'তার প্রসার, অপর সকলের সঙ্গে নিজের ঐক্যবোধ ও ঐক্যস্থাপনা দ্বারা অহং-এর বিলোপসাধন।

মৈত্রীভাবনার দ্বারা ব্রহ্মবিহার লাভ হয়। ব্রহ্মবিহারীর অনেক লক্ষণ, অনেক ধর্ম বুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান পুনরায় সেই একই কথা— সকল প্রাণী সুখী হউক, ক্ষেমী হউক, সুখিতাত্মা হউক, এই মনোভাব। এই চিন্তা কতদূর ব্যাপক করিতে হইবে বুঝা যায় বুদ্ধের এই উক্তিতে যে, যে-কোনও প্রকারেরই, যে-কোনও আকার বা প্রকৃতিরই, দৃষ্টই হউক অদৃষ্টই হউক, নিকটস্থই হউক দূরস্থই হউক, যাহারা জন্মিয়াছে এবং যাহারা জন্মিবে, সকল সত্তা সুখিতাত্মা হউক, এই চিন্তা করিতে হইবে। 'উর্ধ্বে অধোতে চারি-দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন হিংসাহীন শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে'। 'স্থির বা সচল, উপবিষ্ট বা শয়ান, নিদ্রিত না হওয়া পর্যন্ত সকল অবস্থায় এই স্মৃতিতে অধিষ্ঠানকে ব্রহ্মবিহার বলা হয়'।

মৈত্রীভাবনা ও ব্রহ্মবিহার সম্বন্ধে বুদ্ধের সকল উক্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যেটি সর্বাধিক প্রিয় ও যাহা তিনি পুনঃপুনঃ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা এই—'মা যেমন একটিমাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন, সমস্ত প্রাণীতে সেইপ্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করবে'। বিশ্বমৈত্রীর শুধু ব্যাপকতা নয়, গাঢ়তা ও তীব্রতা বুদ্ধ কিরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন, এই উক্তিতে তাহা অতি সুস্পষ্ট হয়। এই শিক্ষা প্রেমের শিক্ষা, সুতরাং বিশ্বপ্রেম, সমগ্র বিশ্বকে আত্মাবৎ অনুভূতি, ইহাই বুদ্ধপ্রচারিত ধর্মের লক্ষ্য। গীতার উক্তি মনে পড়ে—সর্বভূতাত্মভূতাত্মা (৫. ৭) ; সর্বভূতস্থম্ আত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি, ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ (৬.২৯) ; আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি (৬.৩২)।

হিন্দুশাস্ত্রে যাহাকে জীবন্মুক্তি বলা হয়, বুদ্ধের শিক্ষায় তাহাই ব্রহ্মবিহার। গীতা ইহাকে ব্রাহ্মী স্থিতি বলিয়াছেন (২.৭২)। ব্রাহ্মী স্থিতির দ্বারা যেমন গীতামতে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ হয়—'ইহাতে (ব্রাহ্মী স্থিতিতে) অন্তকালে পর্যন্ত অধিষ্ঠিত হইলে লোকে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করে'—(২.৭২), জীবন্মুক্তির দ্বারা যেমন পূর্ণ মুক্তি বা মোক্ষলাভ হয়, বুদ্ধের মতে সেইরূপ ব্রহ্মবিহার দ্বারা নির্বাণ লাভ হয়। মৈত্রীভাবনা ও ব্রহ্মবিহার আলোচনা

করিয়া রবীন্দ্রনাথ উত্তম বলিয়াছেন ব্রহ্মবিহার যদি নির্বাণমার্গ হয় তবে নির্বাণ অবশ্যই শূন্যতা হইতে পারে না, নির্বাণ পরিপূর্ণতার অবস্থা, পূর্ণ বিশ্বপ্রেমের অবস্থা— 'সর্বভূতের প্রতি প্রেম জিনিসটি শূন্য পদার্থ নহে···অতএব প্রেমের চরমে যে বিনাশ ইহা কোনোমতেই শ্রদ্ধেয় নয়' (বুদ্ধদেব, পৃ ৩৫) এবং 'যদি দুঃখ-দূরই চরম কথা হয় তা হলে বাসনালোপের দ্বারা অস্তিত্বলোপ করে দিলেই সংক্ষেপে কাজ শেষ হয়— কিন্তু মৈত্রীভাবনা কেন? মৃত্যুদণ্ডই যার উপর বিধান তার আর ভালোবাসা কেন, দয়া কেন? এর থেকে বোঝা যায় যে, এই ভালোবাসাটার দিকেই আসল লক্ষ— আমাদের অহং, আমাদের বাসনা স্বার্থের দিকে টানে— বিশুদ্ধ প্রেমের দিকে, আনন্দের দিকে নয়— এই জন্যই অহংকে নির্বাপিত ক'রে দিলেই সহজেই সেই আনন্দলোক পাওয়া যাবে' (বুদ্ধদেব, পৃ ৫৫), অপিচ 'এই অহংটার যেমনি নির্বাণ হবে অমনি অনির্বচনীয় আনন্দ এক মুহূর্তে আমাদের কাছে পরিপূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ হবেন। সেই আনন্দই যে বুদ্ধদেবের লক্ষ্য তা বোঝা যায় যখন দেখি তিনি লোকলোকান্তরের জীবের প্রতি মৈত্রী বিস্তার করতে বলেছেন। জগতে যে অনন্ত আনন্দ বিরাজমান তারও যে ওই প্রকৃতি— সে যে যেখানে যা-কিছু আছে সমস্তর প্রতি অপরিমেয় প্রেম। এই জগদ্‌ব্যাপী প্রেমকে সত্যরূপে লাভ করতে গেলে নিজের অহংকে নির্বাপিত করতে হয়, এই শিক্ষা দিতেই বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হয়েছিলেন— নইলে মানুষ বিশুদ্ধ আত্মহত্যার তত্ত্বকথা শোনবার জন্য কখনোই তাঁর চার দিকে ভিড় করে আসত না' (বুদ্ধদেব, পৃ ৫৬)।

এই চমৎকার যুক্তি কে অস্বীকার করিবে? এমন সুন্দর সুবোধ্য ভাবেই বা কে বুদ্ধবাণীর অর্থ প্রকাশ ও হৃদয়গ্রহণ করিয়াছেন?

৪

বুদ্ধ মঙ্গল শিক্ষা দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যুক্তি দেখাইয়াছেন 'মঙ্গল একটা উপায় মাত্র'। এই উপায়ের দ্বারা যাহা লভ্য হয় তাহা যদি পূর্ণতা হয়, তবে শূন্যতার দ্বারা পূর্ণতাপ্রাপ্তি কিরূপে সম্ভবপর হয়? 'মঙ্গলের মধ্যেও একটা প্রয়োজনের ভাব আছে। অর্থাৎ, তাতে একটা কোনো ভালো উদ্দেশ্য সাধন করে, কোনো-একটা সুখ হয় না সুযোগ হয়। কিন্তু, প্রেম যে সকল প্রয়োজনের বাড়া। কারণ, প্রেম হচ্ছে স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা' (বুদ্ধদেব, পৃ ১৭)। এই দৃষ্টিতে দেখিলেও বুঝা যায় প্রেমের শিক্ষা ও শূন্যতার শিক্ষা একই ব্যক্তি দিতে পারে না।

সংসারকে কি বুদ্ধ সর্বথা ত্যাজ্য মনে করিতেন? রবীন্দ্রনাথের উত্তর এই—'বিশ্বব্যাপী প্রেমের মধ্যে চিত্তকে প্রসারিত করাকেই বুদ্ধ ব্রহ্মবিহার বলিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে, বুদ্ধ ব্রহ্মকে প্রেমস্বরূপ বলিয়াই জানিয়াছেন, ব্রহ্ম তাঁহার কাছে শূন্যতা নহে। এই প্রেমকেই যদি সর্বব্যাপী পরম সত্য বলিয়া গণ্য করা হয় তবে সংসারকে একেবারে বাদ দিয়া বসিলে চলিবে কেন? করুণা বলো, প্রেম বলো, আপনাকে লইয়া আপনি থাকিতে

পারে না। প্রেমের বিষয়কে বাদ দিয়া প্রেমের সত্যতা নাই' (বুদ্ধদেব, পৃ ৩৯); এবং 'প্রেম যখন অহং'এর শাসন অতিক্রম করে বিশ্বের মধ্যে অনন্তের মধ্যে মুক্ত হয় তখন সে যা পায় তাকে যে নামই দাও-না কেন, সে কেবল ভাষার বৈচিত্র্য মাত্র, কিন্তু সেই-ই মুক্তি। এই প্রেম যা যেখানে আছে কিছুকেই ত্যাগ করে না ; সমস্তকেই সত্যময় ক'রে পূর্ণতম করে উপলব্ধি করে' (বুদ্ধদেব, পৃ ৫৩)।

এইরূপ চিন্তার ফলে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'তাঁরই শরণ নেব যিনি আপনার মধ্যে মানুষকে প্রকাশ করেছেন। যিনি সেই মুক্তির কথা বলেছেন, যে মুক্তি নঙর্থক নয়, সদর্থক ; যে মুক্তি কর্মত্যাগে নয়, সাধুকর্মের মধ্যে আত্মত্যাগে ; যে মুক্তি রাগদ্বেষবর্জনে নয়, সর্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীসাধনায়' (বুদ্ধদেব, পৃ ১২)।

ধর্মসাধনার চরমপদ নির্বাণকে চরমমুক্তি বলা যায়, বুদ্ধ বলিয়াছিলেন 'মহাসমুদ্রের একমাত্র রস যেমন লবণরস সেইরূপ এই ধর্ম বিষয়ের একমাত্র রস বিমুক্তিরস।' বুদ্ধের নির্বাণ ও বেদান্তের মোক্ষে বিশেষ পার্থক্য দেখি না। আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন মোক্ষ ও ব্রহ্ম সমার্থক। বুদ্ধের নির্বাণে ও বেদান্তের ব্রহ্মেই বা কি বিভেদ ?

নির্বাণকে পরমসুখ বলিলেও বুদ্ধ নির্বাণকে কোথাও ব্যক্তিত্ববান্ personal ভগবানরূপে বর্ণনা করেন নাই, ইহাকে পরম সত্তা বা অবস্থা বলিয়াছিলেন। ব্যক্তিত্ববান্ কোনও পরমসত্তার সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন কি না আমরা জানি না, যাহা আমরা জানি তাহা এই— তিনি সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। পরমাত্মা সম্বন্ধে প্রশ্নের তাঁহার কোনও উত্তর না দেওয়ারও নানারূপ ব্যাখ্যা করা যায়। তিনি যে-সকল বিষয়ে কিছু বলেন নাই সে-সকল বিষয়ে তিনি কিছু জানিতেন না তাহাও নয়, কারণ তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন তিনি যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহার অতিরিক্তও তিনি বহু বিষয় জানিতেন, কিন্তু তাহাতে মানুষের দুঃখবিমুক্তিরূপ গুরুতর প্রয়োজন নিষ্পন্ন হইবে না বলিয়া তিনি সে সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক বোধ করেন নাই। জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনাও তিনি প্রশ্রয় দিতেন না কারণ তাহাতে মানুষের দুঃখনিবৃত্তি হইবে তিনি মনে করিতেন না। দুঃখোৎপত্তির কারণ তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সেই বিষয়েই চিন্তা করিয়া সেই পথ অনুসরণ করিয়া তিনি দুঃখনাশরূপ নির্বাণলাভে মানুষকে প্রয়াসী হইতে বলিতেন। ধর্মসাধকগণের ইতিহাসে দেখা যায় তাঁহারা যাহা লাভে সাধনায় প্রবৃত্ত হন, সিদ্ধিও তাঁহাদের তদনুরূপ লাভ হয়— 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' (গীতা, ৪, ১১)। ঈশ্বর সন্ধানে বুদ্ধ তপস্যায় প্রবৃত্ত হন নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন দুঃখমুক্তির পথ জানিতে, পাইয়াছিলেনও তাহাই এবং শিক্ষা দিয়াছিলেনও তাহাই।

আত্মা বলিয়া আমাদের একটা নিজস্ব কিছু আছে, বুদ্ধ ইহা অস্বীকার করিতেন। কেহ ইহাকে তাঁহার ত্রুটি মনে করেন কিন্তু বৈদান্তিক মার্গে যে নির্বিকল্প-সমাধিকে ব্রহ্মলব্ধির চরমাবস্থা বলা হয় তাহাতে কি জীবাত্মার কোনও অস্তিত্ববোধ বা জীবাত্মা-পরমাত্মার পার্থক্যবোধ থাকে ?

'এক দিকে স্বার্থপর বাসনাকে ক্ষয় ও অন্য দিকে স্বার্থত্যাগী প্রেমকে সমস্ত সীমা অবলুপ্ত করিয়া বিস্তার করা এই দুই শিক্ষাই যেখানে প্রবল মাত্রায় একত্র মিলিত হইয়াছে, বুঝিতেই হইবে, শূন্যতাই সেখানে লক্ষ্য নহে।...মাটি চাষ করাটাকেই মুখ্য বলিয়া গণ্য করিব এবং ফসল বোনাটাকেই গৌণ বলিয়া উপেক্ষা করিব, ইহা হইতেই পারে না। এই ফসলের কথাটা যেখানে আছে সেইখানেই মানুষের মন বিশেষ করিয়া আকৃষ্ট হইয়াছে এবং সেই আকর্ষণেই কঠিন সাধনার দুঃখ মানুষ মাথায় করিয়া লইয়াছে। এক-দল তার্কিক এমনভাবে তর্ক করে যে, যেহেতু ক্ষেত্রকে দীর্ণ বিদীর্ণ করিতে বলা হইয়াছে, অতএব সমস্ত ফসল নষ্ট করিয়া ফেলাই এই উপদেশের তাৎপর্য। আগাছা উৎপাটন করিয়া ফেলাই যে তাহার উদ্দেশ্য সে কথা বুঝিতে বাকি থাকে না যখন শুনিতে পাই, প্রেমের বীজ মুঠা মুঠা দিকে দিকে ছড়াইয়া দিবে। এই প্রেমের ফসল নির্বাণ নহে, আনন্দ, সে কথা বলাই বাহুল্য' (বুদ্ধদেব, পৃ ৩৬)। 'বস্তুত বৌদ্ধধর্মের বিশেষত্বই এই যে, এক দিকে তাহার যেমন কঠোর ত্যাগ অন্য দিকে তাহার তেমনি উদার প্রেম। ইহা কেবলমাত্র জ্ঞানের ধর্ম, ধ্যানের ধর্ম নহে' (বুদ্ধদেব, পৃ ৩৭) 'The oil has to be burnt, not for the purpose of diminishing it, but for the purpose of giving light to the lamp' (*Buddhadeva*, p. 23)।

জ্ঞানের ধর্ম, ধ্যানের ধর্ম, বুদ্ধের যুগে অনেক ছিল। আজীবিকগণ নিগ্রন্থগণ (জৈন) এবং জৈনবৌদ্ধ শাস্ত্রে আরও যে-সকল তদানীন্তন লোকশিক্ষকের উল্লেখ আছে, তাঁহারা সকলেই এই-সকল মার্গের উপদেষ্টা ছিলেন। কেহ সুকর্মের সুফল স্বীকার করিতেন কিন্তু কর্মত্যাগের দ্বারা ভবিষ্যতের কর্মসঞ্চয় নিবারণ করিয়া এবং কৃচ্ছ্রের দ্বারা সঞ্চিত প্রাক্তন কর্ম নাশ করিয়া মুক্তির অন্বেষণ করিতেন। প্রেমের শিক্ষাকে যেমন বুদ্ধের মত প্রাধান্য সে যুগে আর কেহ দেন নাই তেমনি তাঁহার 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় লোকানুকম্পায়' কর্মানুষ্ঠানের শিক্ষাও সে যুগে বিরল ছিল। উত্তরকালে এই শিক্ষাই গীতার কর্মযোগে দেখা গিয়াছিল '(স্বার্থবুদ্ধিতে) কর্মে আসক্ত হইয়া অবিদ্বান্ ব্যক্তি যেরূপে কর্ম করে, বিদ্বান্ ব্যক্তি অনাসক্ত ভাবে লোকসংগ্রহ (জনকল্যাণ)-চিকীর্ষু হইয়া সেই রূপেই কর্ম করিবেন' (গীতা, ৩,২৫)।

৫

বুদ্ধের নির্বাণবাদ ও আচার্য শঙ্করের অদ্বৈত ব্রহ্মবাদে আমরা সারূপ্য দেখি। দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব ভক্তিমার্গিকরা শঙ্করের ব্রহ্মবাদকে নিন্দা করিয়া বলিয়াছিলেন 'মায়াবাদম্ অসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমতম্'। অর্থাৎ শঙ্করমতে, তাঁহারা বৌদ্ধমতের ছায়া দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধমত বলিতে যাহা বুঝিতেন তাহা শুদ্ধ বুদ্ধমত নাও হইতে পারে, কারণ উত্তরকালে বুদ্ধের মত সম্বন্ধে নানারূপ বিকৃত ধারণার উদ্ভব হইয়াছিল। খুব সম্ভব দ্বৈতবাদীরা

বৌদ্ধ মত বলিতে যাহা বুঝাইয়াছিলেন তাহা মহাযানিক দার্শনিকগণের, বা বিজ্ঞানবাদের, বিশেষতঃ নাগার্জুনের মাধ্যমিক মত।

নাগার্জুনের শূন্যবাদকে বুদ্ধের নির্বাণবাদের দার্শনিক পরিণতি বলা যায় এবং নাগার্জুনের 'শূন্য'ও পজিটিভ সত্তা। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা শঙ্করের ব্রহ্মবাদে নাগার্জুনের শূন্যবাদের প্রভাব দেখিয়া থাকেন। শুনিয়াছি ভারতীয় বেদান্তিক পণ্ডিতগণ কেহ ইহা অপ্রমাণের চেষ্টায় গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত আছেন। তাঁহারা বলেন উদ্দেশ্য দৃষ্টিভঙ্গি ও পন্থা, তিন বিষয়েই তৃতীয় শতকের নাগার্জুনে ও নবম শতকের শঙ্করে বহু বিভেদ। তাহা হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া শঙ্কর নাগার্জুন দ্বারা আদৌ প্রভাবিত হন নাই, ইহা সিদ্ধ হয় না। চিন্তায় মূলগত সাম্য থাকিলে, উদ্দেশ্য দৃষ্টিভঙ্গি ও পন্থার বিভিন্নতা থাকিলেও তাহাকে ঋণ বলিয়া স্বীকারে আপত্তিতে এক প্রকারের কার্পণ্য প্রকাশ পায়। নাগার্জুনের শূন্য ও শঙ্করের অদ্বৈত নির্গুণ ব্রহ্মে অনেক সাদৃশ্য দেখিয়াই, অপরাপর বিভেদ সত্ত্বেও, ঐতিহাসিক মতে বলিতে হয় শঙ্করের চিন্তায় নাগার্জুনের প্রভাব বিদ্যমান। বৈষ্ণবকবিগণের মত রাধাকৃষ্ণ-উপাসক না হইলেও রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবকবিতার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, ইহা কি সত্য নহে ?

অতএব মনে হয় এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সামান্য একটি কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা খুবই যুক্তিযুক্ত—'শঙ্করের অদ্বৈতবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়া কেহ কেহ নিন্দা করিয়াছেন। ইহা হইতে অন্তত এ কথা বুঝা যায় যে, বৌদ্ধদর্শনের সংঘাতে এবং অনেক পরিমাণে তাহার সহায়তায় শঙ্করের এই মতের উৎপত্তি হইয়াছে' (বুদ্ধদেব, পৃ ৩২)। রবীন্দ্রনাথ যাহাকে 'সংঘাত' এবং 'অনেক পরিমাণে সহায়তা' বলিয়াছেন তাহা চিন্তাজগতে কিরূপ বিস্তৃতপ্রসারী হয় তাহা গোঁড়ামির গোঁয়ারতুমি দ্বারা আবরণ করা যায় না।

বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও কয়েকটি বিষয় উদার ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, যেমন হীনযান-মহাযানের পরস্পর-সম্বন্ধ। হীনযানে জ্ঞানের এবং মহাযানে হৃদয়ের প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। দেশ কাল ও মানবপ্রকৃতির বিভিন্নতায় বুদ্ধের শিক্ষা কালবশে এই দুই প্রধান রূপ পাইয়াছিল। 'হীনযানের দিক যখন দেখি তখন মনে হয় বৌদ্ধধর্মে পূজাভক্তি বুঝি নাই, প্রত্যক্ষের অতীত কোনো মহৎসত্তাকে বৌদ্ধধর্ম বুঝি একেবারেই অস্বীকার করে— আবার মহাযানের দিকে তাকাইলে মনে হয় ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে বৌদ্ধধর্ম নানা বিচিত্র রূপ রস সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, কোথাও তাহার জ্ঞানের সংযম নাই। কিন্তু আসল কথা, বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এই দুটা দিকই আছে' (বুদ্ধদেব, পৃ ৩৫)।

সত্য, কিন্তু এ ভুল যেন কেহ না করেন যে দুইটা দিকের উভয়ই পূর্ণসত্য, কারণ উভয়েই বাহুল্য ও খর্বতা দুইই যুগপৎ আছে। তান্ত্রিক পদ্ধতির সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে বৌদ্ধধর্মে যোগাচার মত ও বজ্রযানের উদ্ভব হইয়াছিল। আজকাল অনেকে

বলিতেছেন শুধু হীনযান-মহাযানে নয়, বজ্রযানের গুপ্তবিদ্যায়ই বুদ্ধের শিক্ষার পূর্ণ পরিণতি। তন্ত্রশাস্ত্রে সাংখ্যদর্শন পাতঞ্জলযোগ বেদান্তদর্শন এবং ভক্তিবাদেরও অনেক কথা আছে, তাই বলিয়া যেমন তন্ত্রকে সাংখ্য পাতঞ্জল বেদান্ত বা ভক্তির চরম বলা যায় না, তেমনি বজ্রযানকেও বৌদ্ধধর্মের চরম পরিণতি বলা যায় না। তন্ত্রযুক্ত বৌদ্ধধর্ম বা বৌদ্ধতত্ত্বযুক্ত তন্ত্রের নাম বজ্রযান, ইহার অতিরিক্ত কিছু বলিলে অত্যুক্তি হ।

বুদ্ধ ভক্তিবাদ প্রচার করেন নাই, জ্ঞানবাদ ও কর্মবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। অপর কাহারও বা কিছুর উপরই নির্ভর না করিয়া তিনি লোককে আত্মনির্ভর আত্মপ্রয়াসী উদ্যমী অপ্রমাদী প্রভৃতি হইতে বলিয়াছিলেন, 'আত্মদীপ (কেহ বলেন দ্বীপ = আশ্রয়) আত্মশরণ অনন্যশরণ' হইতে বলিয়াছিলেন। ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, আর্যসত্যচতুষ্টয়ের প্রতি শ্রদ্ধা, আর্যাষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি তিনি শিক্ষা দিয়াছিলেন বটে কিন্তু সে শ্রদ্ধা ও ভক্তিবাদের ভগবদ্‌ভক্তিতে অবশ্য পার্থক্য আছে। জ্ঞানবাদে ভক্তির লাঘব অনিবার্য, আচার্য শঙ্কর বা সাংখ্য বা পাতঞ্জলযোগেও ভক্তির প্রকাশ নাই।

মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে কিন্তু ভক্তিপ্রবণতা থাকে। তাহা শুধু উচ্চতর তত্ত্বের প্রতি ভক্তিতে পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করে না। মানবমন কোনও উচ্চতর সত্তায় ভক্তি অর্পণ করিয়া তৃপ্তি কল্যাণ কামনাসিদ্ধি, এমন-কি ধর্ম ও মুক্তি পর্যন্ত যাচ্ঞা করে। রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন, 'বৌদ্ধধর্ম করুণাকে আদর করিয়াছে, কিন্তু ভক্তিকে অস্বীকার করিয়াছিল। সেই ভক্তি আসিয়া একদিন আপন অবমাননার প্রতিশোধ লইয়াছে' (বুদ্ধদেব, পৃ ৪৫)। ইহা ঘটিয়াছিল শুধু মহাযানের অসংযত উচ্ছ্বাসে নয়, হীনযানের জ্ঞানেও। সুবিখ্যাত বৌদ্ধ ত্রিশরণ-মন্ত্র 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি'র প্রথম ও তৃতীয় শরণটির উল্লেখ বুদ্ধবচনে নাই, উহা উত্তরকালের সংযোজনা। 'যে ধর্মের যেমন মতই হউক-না কেন, ভক্তির আশ্রয় কাড়িয়া লইলে ভক্তি যেমন করিয়া হউক আপনার একটা আশ্রয় খাড়া করিয়া লয়। বুদ্ধদেব তাঁহার উপদেশে স্পষ্ট করিয়া ভক্তির কোনো চরম আশ্রয় নির্দেশ করেন নাই। এইজন্য তাঁহার অনুবর্তীদের ভক্তিবৃত্তি তাঁহাকেই বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে এবং ভক্তির স্বাভাবিক চরম গতি যে পরমপুরুষে, বুদ্ধকে তাঁহার সঙ্গেই মিলাইয়া লইয়াছে' (বুদ্ধদেব, পৃ ৪১)। জৈনধর্মেও ঠিক এইরূপই ঘটিয়াছিল— নিরীশ্বর জ্ঞান ও কৃচ্ছ্রের এই ধর্মে কালবশে মহাবীর ও অপর তীর্থংকরেরা ভগবানের আসন পাইয়াছিলেন। মহাবীর সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চারিত্রকে মোক্ষমার্গ নির্দেশ করিয়াছিলেন (তত্ত্বার্থাধিগম-সূত্র, ১.১)। কিন্তু ভক্তেরা মহাবীরের প্রতি ভক্তিকে কিছুমাত্র ন্যূনতর মোক্ষমার্গ বিবেচনা করেন না।

রসলাভ হইতে ভক্তির জন্ম হয়। আদি বৌদ্ধধর্ম যদি নীরস নির্বাণের সাধনামাত্র হইত তবে তাহার প্রচারক ভক্তিলাভের পাত্র হইতেন না। বুদ্ধ নির্বাণের সুখের

কথা বলিতেন। নিজ জীবনের তিনি এই সুখ লাভও করিয়াছিলেন বলিতেন। সর্বজীবের প্রতি অহিংসা এবং পুণ্যকর্মের সুফল উপরন্তু প্রেম ও সুকর্মের প্রসার বুদ্ধ শিক্ষা দিতেন। বুদ্ধের প্রচারিত শিক্ষায় রসময়তা বশতঃই উহার প্রভাব বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাই রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন 'এই ধর্ম হইতে কেহ রস পায় নাই এমন কথা বলিতে পারি না। ইহার মধ্যে একটি গভীর রসের প্রস্রবণ আছে যাহা ভক্তচিত্তকে আনন্দে মগ্ন করিয়াছে' (বুদ্ধদেব, পৃ ৩১)।

অবতারবাদের আরম্ভ রবীন্দ্রনাথ মহাযানের ভক্তিতে দেখিয়াছেন। 'সংসারপাশে আবদ্ধ মানুষকে মুক্তিদান করিবার জন্য পরমদয়া যে মানবরূপে মর্তলোকে আবির্ভূত —এই ভাবটির উদ্ভব কি সর্বপ্রথমে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেই নহে ?' (বুদ্ধদেব, পৃ ৩২) 'কোনো বিশেষ একজন মানুষকে এমন করিয়া অসীম করিয়া দেখা বৌদ্ধধর্মে প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং যিশুকে ত্রাণকর্তা অবতাররূপে স্বীকার করা যে এই বৌদ্ধ মতেরই অনুসরণ করিয়া ঘটে নাই তাহা বলিতে পারিব না' (বুদ্ধদেব, পৃ ৩৩)।

এইরূপ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্মের ভক্তিবাদের একটি পরিণতি রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন বৈষ্ণবধর্মে—'দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জাপানে বৌদ্ধধর্মকে অবলম্বন করিয়া যে ভক্তির বন্যা দেশকে প্লাবিত করিয়াছিল তাহার সঙ্গে আমাদের দেশে বৈষ্ণবধর্মের আন্দোলনের বিশেষ প্রভেদ দেখি না' (বুদ্ধদেব, পৃ ৩১) এবং 'বৌদ্ধধর্মের এই অবতারবাদ, এই ভক্তিবাদের দিকটাই বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়া ভারতের বৌদ্ধধর্মের পরিণামরূপে বিরাজ করিতেছে এইরূপ আমার বিশ্বাস' (বুদ্ধদেব, পৃ ৩৩)।

রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তার যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে মনে করি। এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ তেমন আলোচনা করেন নাই। 'বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম বৈষ্ণবধর্মকে সৃষ্টি করে নাই। তাহার পুষ্টিসাধন করিয়াছে। গুরুতে দেবতা জ্ঞান করা এবং তাঁহার প্রসাদেই মুক্তি এই কথা স্বীকার করা, আমাদের আধুনিক পৌরাণিক ধর্মে দেখা যায়—আমার বিশ্বাস, এইরূপ গুরুবাদের উৎপত্তি বৌদ্ধধর্ম হইতে' (বুদ্ধদেব, পৃ ৪১)। বৈষ্ণব ভক্তিবাদের ইতিহাস সম্বন্ধে সামান্য যাহা পণ্ডিতেরা এ পর্যন্ত আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কাহারও চিন্তায় আসে নাই। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে যে ইঙ্গিত দিয়াছেন, সে পথে অনুসন্ধান ঐতিহাসিকগণের পক্ষে ফলদায়ক হইবে মনে করি।

পৌরাণিক শাস্ত্রে ও মহাযান শাস্ত্রে অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয়ে ভক্তিবাদ অবতারবাদ গুরুবাদ নামমাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয়ে বহু অতিরঞ্জন, জ্ঞানহীন যুক্তিহীন অবাধ কল্পনাবাহুল্য, সর্ববিষয়ে আতিশয্য প্রভৃতি দেখা যায়। গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধি এবং অবাস্তব ও অলৌকিকে উভয়েরই বিপুল আগ্রহ। উভয় শাস্ত্রই একই যুগের কল্পনাবিলাসী মনোভাবজাত বলিয়া মনে হয়। সুতরাং উভয়ের পরস্পর-সম্বন্ধে অবশ্যই অনুসন্ধানের অনেক অবকাশ আছে।

রূপকের ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীভবতোষ দত্ত

রবীন্দ্রকাব্যের নিবিষ্ট পাঠক মাত্রই নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, কবি কত অজস্র উপলক্ষে বিচিত্র রীতিতে রূপকের ব্যবহার করেছেন। প্রথম যুগের রচনা থেকে শেষ যুগের রচনা পর্যন্ত রূপককে কবি নানা প্রয়োজনে কাজে লাগিয়েছেন। কখনো কোনো কাব্যময় অনুভূতিকে জানাবার জন্যে কখনো কোনো সর্বজনীন তত্ত্বকে পরিস্ফুট করবার জন্যে, কখনো কোনো অরূপ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে স্পষ্ট করবার জন্যে রূপকের দরকার হয়েছে। কবিতায় নাটকে গদ্যরচনায় সুপ্রচুর প্রয়োগ দেখে স্বভাবতই জানতে ঔৎসুক্য জন্মে, রূপক কবির কল্পনারই অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ অথবা রচনার নেহাতই একটা অলংকরণ মাত্র। এক সময় রবীন্দ্রনাথ রূপকরীতির উপর একান্ত নির্ভর করে বহু কবিতা লিখেছিলেন 'সোনার তরী'-'চিত্রা'র যুগে। পরের যুগে রূপক নাটক লিখলেও দৃশ্যত রবীন্দ্রসাহিত্যের শেষের পর্যায়ে অলংকার হিসাবে রূপকচর্চা বিরল হয়ে এসেছে। নিছক কবিতা হিসাবে বিরলতারই বা কারণ কি? আবার, রূপককবিতার অপ্রাচুর্য যদি পরে ঘটেও থাকে তবু এটাও লক্ষ্য করা যায় যে রূপকের ধর্ম কবি কখনই একেবারে পরিত্যাগ করেন নি। কোনো-না-কোনো রকমে রূপকের আভাস রবীন্দ্রকাব্যে সব সময়েই আছে।

রূপক শব্দটিকে আমরা একটু ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করছি। সংস্কৃতে রূপক একটি অলংকার— দুটি বস্তুর মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে রূপকের সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে তুলনা নেই সেখানে সাধারণভাবে বক্তব্যকে উপস্থাপিত করা হয় মাত্র, কিন্তু যেখানে রূপগত ব্যঞ্জনা আনার দরকার হয়, সেখানেই আসে রূপক। কাব্যে রূপক রচনার উৎকর্ষ সৃষ্টির অন্যতম উপায়। একটা সময় ছিল, যখন এ রকম অলংকার যোজনাতেই সার্থক কাব্যসৃষ্টি হয় বলে মনে করা হত। কিন্তু অবশেষে অলংকরণকেই রসসৃষ্টির একমাত্র কারণ বলে স্বীকার করায় বাধা দেখা দিল। সেকালের রসিক গভীরতর কারণ সন্ধান করতে লাগলেন, যার পরিণাম হল ধ্বনিবাদে ও রসবাদে। ধ্বনি না হলে কাব্য হয় না, এটা যদি বা মেনে নেওয়া গেল, তখন সমস্যা দেখা দিল ধ্বনিটা কিসের। ধ্বনি তিন রকমেই হয়—বস্তুর, অলংকারের এবং রসের। প্রথম দুটি ধ্বনিতে চাতুর্য আছে কিন্তু রসের ধ্বনিতে আছে কাব্য। অলংকার এই ধ্বনি সৃষ্টিতে যেখানে সাহায্য করে, সেখানেই সে কাব্যের অপরিহার্য অঙ্গ। অলংকারের মধ্যে রূপক ধ্বনি-রচনার সবচেয়ে উপযোগী সহায়ক। রূপক বাক্যের মধ্যে অন্য একটা ভাবের অনুভূতি জাগিয়ে দেয় এবং এইভাবে কথার মধ্যে ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে। অকথিত বা অনির্বচনীয়কে রূপ দেয় বলেই সে রূপক। অনির্বচনীয়ের ব্যঞ্জনাই ধ্বনি। ধ্বনিময়তাই কাব্যের প্রাণ। এইজন্যই মনে হয় রূপক-ধর্ম সার্থক কাব্য-মাত্রেরই লক্ষণ।

এ কথা সত্য, রূপককে যখন নিছক অলংকার হিসাবেই দেখি, তখন সে অতখানি অনির্বচনীয়ের ব্যঞ্জনা আনে না। সে তখন অতিনিরূপিত। এই অতিনিরূপণ এর একটা স্থূল রূপ মাত্র। কিন্তু ধ্বনিময় রসবৎ কাব্যে রূপককে যে এতটা নিরূপিত ও স্পষ্ট হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। ভারতীয় রসতত্ত্ব যে কাব্যরহস্য বিচার করতে করতে ধ্বনিবাদে গিয়ে পৌঁছেছিল, এতে মনে হয় তত্ত্বজ্ঞেরা কবির সৃষ্টিকে এক অর্থে রূপক বলেই মনে করেছিলেন। আপাতবক্তব্যের অন্তরালে একটা কোনো ভাবের ব্যঞ্জনা সৃষ্টিকেই কাব্যসাফল্য বলে তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল। এই জন্য সাহিত্যে কথাবস্তুটা নিত্য সত্যের মর্যাদা পায় নি, পেয়েছে আপেক্ষিক সত্যের মর্যাদা। ব্যঞ্জিত ভাবটাই সত্য, যার সাহায্যে সেই ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হচ্ছে সেটাই চরম নয়—

"সাহিত্যিক রসপ্রতীতির স্থলে কবিবর্ণিত অর্থসমূহ সামাজিকগণের চিত্তে একান্ত আত্মগত অথবা একান্ত তটস্থ কোনরূপেই প্রতিভাত হয় না। বিভাব প্রভৃতি কাব্যবর্ণিত পদার্থসমূহ স্বপরবিকল্পের অতীতরূপে সর্বসাধারণভাবে সহৃদয়ের চিত্তে উপস্থিত হয়। সহৃদয় দর্শকের দৃষ্টিতে শকুন্তলা শকুন্তলারূপে, নিজের প্রেয়সীরূপে প্রতিভাত হন না। কবিকল্পিত শকুন্তলা পাঠকের অথবা প্রেক্ষকের নিকট শুধু একটি symbol মাত্র, আর কিছুই নহে। শকুন্তলা কেবলমাত্র কান্তারূপে সাধারণ সহৃদয়ের চিত্তভূমিতে অবতীর্ণা হন। কবিকল্পিত সীতাদেবী তাঁহার সমস্ত ঐতিহাসিকতা বিসর্জন দিয়া সহৃদয়ের রসানুভূতির বিভাবরূপে আবির্ভূত হন। তিনি তখন রাজর্ষি জনকের পুত্রী নন, মহারাজ দশরথের কুলপ্রদীপ রামচন্দ্রের প্রেয়সী ভার্যা নন। তিনি এখন দেশকালবিনির্মুক্ত নায়িকার আদর্শ প্রতীক, একটি universal idea মাত্র।"[১]

এই universal idea-তে নিয়ে যায় আলম্বন উদ্দীপন ইত্যাদি বিভাব। এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"আনন্দস্বরূপ আত্মার অভিব্যক্তিসাধনই সাহিত্যের চরম লক্ষ্য এবং যে ব্যাপারবশে আত্মার আনন্দাংশের এই আবরণভঙ্গ সম্ভবপর হয়, তাহাকে ধ্বনিবাদিগণ 'ব্যঞ্জনাব্যাপার' (function of suggestion) বলিয়া থাকেন। সাহিত্যবর্ণিত বিভাব অনুভাব প্রভৃতি অর্থেরই এই অসাধারণ ব্যাপার আছে, লৌকিক অর্থের নহে।"[২]

দেখা যায় রসশাস্ত্রে যাকে বিভাব ইত্যাদি বলা হয়েছে, কাব্যের সেই বিষয়বস্তু আপনাতে আপনি লক্ষ্যবদ্ধ নয়। বিষয়টা একটা কোনো নিত্যভাবের রূপক মাত্র। বিষয়টা পূর্ণ সত্য নয় বলেই বাস্তবের আনুগত্য রক্ষা করবারও দরকার হয় না। মম্মট ভট্ট এজন্য একে বলেছিলেন 'নিয়তিকৃতনিয়মরহিত'। ধ্বন্যালোকেও আছে—

অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ।
যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথৈব পরিবর্ততে॥

১. বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, 'সাহিত্যমীমাংসা' (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ) পৃ ৬০
২. ঐ, পৃ ৭৮

এক কথায় বলা যায় কাব্যে বিষয়টা হয়ে দাঁড়ায় চিরন্তন ভাবের রূপক। সংস্কৃত আলংকারিকেরা কবির সৃষ্টিকে প্রকারান্তরে কোনো নিত্য অপরিবর্তনীয় চিন্ময় ভাবের রূপক-সৃষ্টি বলেই নির্দেশ করেছেন। তাঁদের সম্মুখে ছিল ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস প্রভৃতির কাব্য এবং এই সব কাব্য সার্থক হয়েছে এক ধরণের ভাবের রূপসৃষ্টিতে।

আমাদের প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব যে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, তার যুক্তি এবং চিন্তাপ্রণালী সংগৃহীত হয়েছিল বিভিন্ন দর্শন থেকে। এই অনুসন্ধানে যাঁর মত সর্বশেষ প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়েছে, সেই অভিনবগুপ্ত বৌদ্ধ যোগাচার সম্প্রদায়ের বিজ্ঞানবাদকে অবলম্বন করেছিলেন। তাতে এই প্রমাণিত হয় যে একটা কোনো সামান্য ভারতীয় দৃষ্টি ছিল সর্বত্রই সমুজ্জ্বল। ভারতীয় মনের কাছে জীবন যেভাবে দেখা দিয়েছিল, তাতে ভাবের জগৎটাই চিরন্তন সত্য মর্যাদা লাভ করেছিল। ব্যাবহারিক জগৎটাকে ভাবের সত্যের অনুগত করে তুলবার জন্য প্রয়োজনমত পরিবর্তিত করে নিতে বাধা হয় নি। আমাদের দেবদেবীর মূর্তিকল্পনায় এর প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। এই সব কল্পনায় স্বভাবকে আমরা অবিকৃত রাখি নি। আমাদের সাহিত্যে, আমাদের লোকগাথায় এই বাস্তব বিকৃতির লক্ষণ খুবই সুলভ। ভারতবর্ষের কবি ও শিল্পীদের হাতে যেটুকু সৃষ্টি হয়েছে তা সার্থক হয়েছে ভাবের রূপকত্ব সৃষ্টিতে। তাঁদের সৃষ্টি কোনো-না-কোনো দিক দিয়ে ব্যাপক অর্থে রূপকে পরিণত হয়েছে। অ্যারিস্টট্লের অলংকারতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে বুচার গ্রীক-কল্পনা ও প্রাচ্য-কল্পনার যে পার্থক্য দেখিয়েছিলেন তা অর্থগভীর—

Pure symbolism is forbidden—those fantastic shapes which attracted the imagination of oriental nations, and which were known to the Greek themselves in the arts of Egypt and Assyria. The body of a lion with the head of a man and the wings and feathers of a bird was an attempt to render abstract attributes in forms which do not correspond with the idea. Instead of the concrete image of a living organism the result is an impossible compound which in transcending nature violates nature's laws.[৩]

এই ব্যাখ্যা যদি সত্য হয় তবে আমাদের অলংকারে যাকে 'সাধারণীকরণ' বলা হয়, তার সঙ্গে গ্রীক পন্থার পার্থক্য আছে। গ্রীক ভাস্কর্যে বা সাহিত্যে স্বভাবের ধর্মকে পরিবর্তিত করা হয় নি। কারণ তার পশ্চাৎপটে ভাব এত সূক্ষ্ম বা বৃহৎ ছিল না, যার প্রকাশের পক্ষে স্বভাব অনুপযুক্ত বিবেচিত হতে পারে। জীবনের বাস্তব রূপ থেকেই ভাববস্তু কল্পিত হয়েছে বলে তার রূপায়ণে অনৈসর্গিক রূপকের প্রয়োজন হয় নি। গ্রীক সাহিত্যশাস্ত্রে 'স্বভাবানুকরণ' কথাটা সুপরিচিত। অ্যারিস্টট্ল কথাটির মধ্যে নানা

৩. *Poetic Universality in Greek Literature*

বিচারের অবতারণা করেছিলেন। তাঁর যুক্তিকে অগ্রাহ্য করা কঠিন। তবু জীবনপ্রকৃতি বলতে তাঁরা যা বুঝেছিলেন, তার সঙ্গে ভারতীয় চিন্তার পার্থক্য স্বীকার করতেই হবে। ভারতীয় কল্পনায় ভাবটা আগে আসে, তারপর আসে ভাষা। গ্রীক-কল্পনায় জীবনের অভিজ্ঞতা আগে—তাকে যথাযথ রূপ দিতে গিয়ে আসে প্রকাশের ভাষা; তা ভাষার মধ্যে আমরা যাকে রূপক বলতে চাই, তার লক্ষণ থাকে না। অ্যারিস্টট্‌লের নিজের কথাতেই—

Poetry, therefore, is a more philosophical and a higher thing than history : for poetry tends to express the universal, history the particular. By the universal I mean how a person of a certain type will on occasion speak or act according to the *law of probability or necessity ;* and it is this universality at which poetry aims in the names she attaches to the personages.[৪]

সম্ভাব্যতার নীতির অনুগমন করেই নায়কের পরিকল্পনা করতে হবে, এই বিধানে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে গ্রীক সাধারণীকরণ নৈসর্গিক সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। অ্যারিস্টট্‌লের এই সূত্রটির সঙ্গে রামায়ণ রচনার কাহিনীটি মিলিয়ে দেখলেই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। প্রবাদ এই যে আমাদের কবি রাম-চরিত্রের কল্পনা রাম-জন্মেরও আগে করেছিলেন। কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু আদর্শ ভাবরূপ কল্পনা করে পরে রাম-নামক ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে অবলম্বন করা হয়েছিল, তা খুবই সম্ভব। সুতরাং কাব্যটা তারই রূপক হয়ে উঠেছে মাত্র। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই তত্ত্বটিকেই কাব্যরূপ দিয়েছেন। অ্যারিস্টট্‌লের 'সাধারণীকরণ' মতবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রোক্ত অভিমত 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা তা সব সত্য নহে'—এর দৃশ্যত মিল দেখা গেলেও পার্থক্যও মৌলিক। সেই পার্থক্য ভারতীয় ও গ্রীক জীবনদৃষ্টির পার্থক্য। অ্যারিস্টট্‌লের কাব্যতত্ত্ব আলোচনাপ্রসঙ্গে অন্য এক সমালোচকও বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন—

The Poet is not primarily looking into his heart, expressing his soul or mood or writing his autobiography, his grand confession. Nor is the poet a mystic visionary who "sees into the life of things" rises beyond reality to some transcendant absolute for which poetry is only a symbol or sign. Rather the poet reproduces reality by his art.[৫]

পাশ্চাত্য কবিদের যা অকার্য, তা সাহিত্যসৃষ্টিরই এক ভিন্নতর রীতি এবং ভারতীয় কবিরা সেই রীতি পালন করে গিয়েছেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত এখানেই শেষ হয় না।

৪. *Poetics* IX, 1451 b। উদ্ধৃতাংশে বক্রলিপি বর্তমান লেখকের।

৫. Rene Wellek, *A History of Modern Criticism,* vol. I. p. 14

পাশ্চাত্যে অ্যারিসটটলের সাহিত্যনীতি যে পরবর্তীকালেও অক্ষুণ্ণ ছিল, একথা অনেকে মনে করেন না। 'অনুকরণ'-মতবাদকে স্থানচ্যুত করেছে, 'সৃষ্টি'-মতবাদ। কবির কল্পনায় বস্তুরূপটা বদলে গিয়ে নতুন সৃষ্টি হয়। রেনাশাঁসের সময় থেকেই আস্তে আস্তে ব্যক্তিত্বের বাধা সরে যেতে থাকে। তখন কবিচিত্তের অনন্যতন্ত্র প্রকাশকে স্বীকার করতে হয়েছে। এই রীতিমুক্ত স্বাধীন আত্মপ্রকাশকে কাব্যে বলা হয়েছে সৃষ্টিকল্পনা বা Imagination। প্রশ্ন হতে পারে এই নূতন সৃষ্টিকল্পনার মূলে কি সেই স্বভাবের বন্ধন থেকে মুক্ত ভাবসত্যের প্রেরণা নেই— কোলরিজ যাকে বলেছিলেন 'অবিশ্বাসের স্বেচ্ছাসংবরণ' (willing suspension of disbelief)? এইভাবে বস্তু থেকে নিয়তিকৃতনিয়মের বাঁধন শিথিল করে নিয়ে মনোগত ভাবের রূপক দিয়ে কাব্য সৃষ্টি করা যায়। তাহলে এখানেও তো সেই রূপকপ্রবণতাই প্রকাশ পায়। রোমান্টিক সাহিত্যকলায় কতকটা যে এই লক্ষণ আছে, সে কথা সত্য। সাহিত্যের এই রোমান্টিক যুগ থেকেই সত্য সত্যই পাশ্চাত্যে রূপকসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। তার মধ্যে কাব্যও আছে, নাটকও আছে। কিন্তু আমাদের ধারণা, রূপকের ধর্ম সে দেশে ভারতবর্ষের মত জাতীয় স্বভাবের মূলে নিহিত নেই। কোনো সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক বিশ্বাসকেও সে ভাবে রূপ দেওয়া হয় নি। আমরা যে অর্থে রূপক কথাটির ব্যবহার করতে চাই, সেই অর্থে শেলির কবিতা একটি দৃষ্টান্তস্থল হতে পারে বটে। শেলির কল্পনারীতির সঙ্গে ভারতীয় কল্পনারীতির যে সাদৃশ্য আছে, তাও অনেকে লক্ষ্য করেছেন। তবে পাশ্চাত্যে রূপক সাধারণত আলংকারিক রীতিতে প্রযুক্ত মাত্র, চিন্তার একটা অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ নয়।[৬]

তেমনি আবার ভারতীয় রসতত্ত্ব শুধু যে স্বভাবাতিরিক্ত ভাবসত্যের প্রাধান্যই ঘোষণা করেছে, এ কথা সকলে হয়তো স্বীকার করতে চাইবেন না। ভারতীয় রসবাদিগণ জীবননিষ্ঠাকেও কাব্যে স্বীকার করেছেন। কাব্যে যে জীবননিষ্ঠার স্থান আছে, তা প্রমাণিত হয় 'বস্তুধ্বনি' দিয়ে। অভিনবগুপ্ত দেখাবার চেষ্টা করেছেন বস্তুধ্বনিও রসে পরিণত হতে পারে। বস্তুর মর্যাদা মেনে নেওয়ার অর্থ স্বভাবকে যথাযথ গ্রহণ করা। তেমনি পাশ্চাত্য 'অনুকরণ' এবং 'সৃষ্টি', এই দুই মতবাদ প্রতিফলিত হয়েছে আমাদের স্বভাবোক্তি এবং বক্রোক্তির মতবাদে।[৭] কিন্তু দুটোর কোনোটাই এককভাবে সাহিত্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে না। এইজন্যে যদি-বা কুন্তকের বক্রোক্তিতে কবির জীবনসচেতনতা অধিকতর প্রকাশ পেয়েছে, শেষ পর্যন্ত আমাদের দেশে এই মতটি সম্পূর্ণ সমর্থন পেয়েছে কি না সন্দেহ। সমর্থন না পাওয়াই স্বাভাবিক কারণ ভাবসত্যের প্রতি নিষ্ঠা ভারতীয়

৬. এই প্রসঙ্গে W. B. Yeats এর *The Land of Heart's Desire* এবং রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটক দুটির তুলনা কৌতূহলোদ্দীপক।

৭. এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য T. N. Srikantaiya, "Imagination in Indian Poetics", Indian Historical Quarterly, 1937, p. 70.

মনের অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য। রূপকের প্রতি তাই আমাদের অনিবার্য প্রবণতা আছে। বাস্তবের উপলব্ধিকে বৃহত্তর কোনো ভাবের রূপকে পরিণত করে দেখতেই আমরা অভ্যস্ত। জীবনের কাহিনীকে আমরা কোনো উচ্চতর সত্যের ইঙ্গিতবহ বলে কল্পনা করতে ভালোবাসি। এমন কি মহাভারতের মত মানবীয় রসপ্রধান মহাকাব্যকে গীতার আধ্যাত্মিক সত্যবোধের রূপক বলে ভেবে নিতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর রূপক ব্যাখ্যা না করে পারেন নি পাশ্চাত্য কাব্যরসপুষ্ট মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র। আমাদের পৌরাণিক যুগটা যে রূপকসৃষ্টিরই যুগ—, এ কথা সকলেই জানেন। দেশের জীবনে বিভিন্ন আদর্শ ও ভাবের সংঘাতে যে সমন্বয় সৃষ্টি হয়ে উঠেছিল, হিন্দু পুরাণগুলি তার নিদর্শন হয়ে আছে। অদ্ভুত অবাস্তব কাহিনীর ভিতর দিয়ে জাতির আধ্যাত্মিক সত্যসাধনার ইতিহাস লুকিয়ে আছে এই পুরাণগুলিতে। এই অর্থে পুরাণও ইতিহাস বলে পরিচিত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পুরাণ ও ইতিবৃত্তকে ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[৮] সম্ভবত ইতিবৃত্ত অর্থ কালপরম্পরাগত ঘটনা এবং পুরাণ অর্থ দেবতাসম্বন্ধীয় অথবা কিংবদন্তীমূলক কাহিনী। রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা'য় আমাদের দেশের পুরাণ উপপুরাণ মহাকাব্য প্রভৃতি কাহিনীগুলি থেকে রূপক অর্থ নির্ণয় করা হয়েছে। এই একটি প্রবন্ধ দিয়েই ভারতীয় জনজীবনের মানসপ্রবণতাকে প্রায় বোঝা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাখ্যা যা করেছেন, তার অনেকটাই রূপকাশ্রয়ী। উপনিষদে যে সব ছোট ছোট গল্প বা কথিকা আছে, সেগুলিকে নিছক গল্প বলে ধরা হয় না। এক-একটি চিরন্তন সত্যের রূপক হিসাবেই তাদের মূল্য। সত্যকাম-জাবালা, যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী, মৃত্যু ও নচিকেতা, বারুণি ভৃগু, উমা হৈমবতী, এক বৃক্ষে দুই পাখি প্রভৃতির গল্প—এগুলি স্পষ্টতই রূপক। এ সবের মূলে সত্য ঘটনার স্মৃতি হয়তো ছিল, কিন্তু বাস্তবতার প্রত্যয় এরা হারিয়েছে, পরে এগুলি নির্বিশেষ ভাবের সংকেত-মাত্রে পর্যবসিত হয়েছে।

রামায়ণের কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ যে রূপক মনে করতেন ভারতবর্ষের ইতিহাসের ব্যাখ্যায় এবং 'সাহিত্যসৃষ্টি'[৯] প্রবন্ধে তার প্রমাণ আছে। আরো প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ রেখে গিয়েছেন 'রক্তকরবী' নাটকের ব্যাখ্যায়। রক্তকরবী নাটকের কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ চিরকালের সত্য বলেই মনে করতেন। পরিহাস করে তিনি বলেছেন, আধুনিক কালের কাহিনীকে মহাকবি ধ্যানযোগে অপহরণ করেছিলেন। রাম মানে শান্তি এবং রাবণ

৮. পুরাণমিতিবৃত্তমাখ্যায়িকোদাহরণং ধর্মশাস্ত্রমর্থশাস্ত্রং চেতীতিহাসঃ।

—কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, 'বৃদ্ধসংযোগঃ'।

৯. 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধ ১৩০৪-এ রচিত এবং 'সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যেরও রূপক ব্যাখ্যা করেছেন।

মানে চিৎকার—এ সব ব্যাখ্যায় চমৎকারিত্ব আছে এবং ভারতীয় চিত্তের প্রবণতা মনে রাখলে এ সব ব্যাখ্যার সত্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহ জাগে না। পাশ্চাত্য মহাকাব্যের সঙ্গে তুলনায় এদের কাহিনীর সত্যের চেয়ে ভাবের সত্যটাই মনকে আবিষ্ট করে থাকে। রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের অসামান্যতা স্বীকার করলেও রামায়ণের দ্বারাই অধিকতর প্রভাবিত ছিলেন, তার কারণ রামায়ণের গীতিধর্ম। মহাভারত এক বিরাট চরিত্রশালা। এতে জীবনের নাট্যলীলা অনেক তীক্ষ্ণ এবং ভাবমুক্ত। তবু মহাভারতের অসংখ্য ছোট ছোট কাহিনীর মধ্যে জীবনের ভাবসত্যের রূপায়ণ রূপকের আকার নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—[১০]

"মহাভারতকে যেমন একই কালে কর্ম এবং বৈরাগ্যের কাব্য বলা যায় তেমনি কালিদাসকেও একই কালে সৌন্দর্যভোগের এবং ভোগবিরতির কবি বলা যাইতে পারে।"

ভোগের দীপ্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করে আবার তারই নশ্বরতায় কবি শ্মশানে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। মহাভারতের এই অন্তরের বাণীটিকে রবীন্দ্রনাথ অন্তত দুটি কবিতায় পরমাশ্চর্য কাব্যরূপ দিয়েছিলেন। একটি 'গান্ধারীর আবেদন', অন্যটি 'কর্ণকুন্তীসংবাদ'। দুটি প্রধান চরিত্রের সংলাপ প্রথমোক্ত কবিতাটিতে গভীরতর তত্ত্বের রূপকে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয় কবিতাটিতে চরিত্রের বস্তুধর্ম অধিকতর রক্ষিত হলেও জয়হীন চেষ্টার সংগীত এবং আশাহীন কর্মের উদ্যম মহাভারতীয় বৈরাগ্য-বাণীকেই সংকেতিত করেছে।

পাশ্চাত্য সমালোচকরা ভারতীয় সাহিত্যকে রোমান্টিক বলে অভিহিত করে থাকেন। সংস্কৃত সাহিত্যে বস্তুর চেয়ে ভাবের প্রাধান্য পাওয়াই এর কারণ। আমাদের প্রাচীন দুই মহাকাব্যের মধ্যে রামায়ণই এই কারণে রবীন্দ্রনাথকে অধিকতর আকর্ষণ করেছে। মহাকবি বাল্মীকির ভাষার যে মাধুর্য তা যেমন গীতিকাব্যের উপযোগী তেমনি চরিত্র ও ঘটনার সরলতারই উপযুক্ত। এই কাহিনীর মূল রসটি ক্রৌঞ্চ ও ক্রৌঞ্চীর ক্ষুদ্র গল্পটির মধ্যেই আভাসিত। কে বলতে পারে কবি কালিদাসও এই গুণেই রঘুবংশ-রচনায় রাম-কাহিনীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন কিনা।

কালিদাসের নিজের কাব্যই বা কি? রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কাব্যের বিশেষত মেঘদূত কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেই ব্যাখ্যা কালিদাসকে অনাস্বাদিত-পূর্ব মহত্ত্বে আমাদের কাছে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ভারতীয় মনের পটভূমিতে দেখলে এই ব্যাখ্যার পদ্ধতির সত্যতাতে সন্দেহ থাকে না।[১১] এই তিনখানি কাব্যই রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায় তিনটি রূপক কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। মেঘদূতের অপূর্ব ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

১০. প্রাচীন সাহিত্য, 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা'

১১. স্বর্গীয় অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলা-ব্যাখ্যা পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন নি। দ্রষ্টব্য *History of Sanskrit Literature*, vol I, Introduction, p. XXXVII। আমরা অবশ্য এখানে পদ্ধতির কথাই বলছি, সিদ্ধান্তের কথা নয়।

"পূর্ব মেঘে বহু বিচিত্রের সহিত সৌন্দর্যের পরিচয় এবং উত্তরমেঘে সেই একের সহিত আনন্দের সম্মিলন। পৃথিবীতে বহুর মধ্য দিয়া সেই সুখের যাত্রা এবং স্বর্গালোকে একের মধ্যে সেই অভিসারের পরিণাম।"[১২]

'মেঘদূত' নামক বিখ্যাত কবিতাটির শেষাংশে রবীন্দ্রনাথ যে ব্যাকুল প্রশ্নটি বসিয়েছেন তাতে সমস্ত কবিতাটিই এক অলৌকিক অর্থে রূপান্তরিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য এই যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মেঘদূতের যে চমৎকার ব্যাখ্যা করেছিলেন, তাতে কিন্তু সেই কাব্যের অন্তরঙ্গ তাৎপর্য আবিষ্কার করার চেষ্টা নেই। এই ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব ছিল বিশেষ কারণে। সে সম্পর্কে পরে আলোচনা করব। কিন্তু এটাও লক্ষ্য করা দরকার, বঙ্কিমচন্দ্র শকুন্তলার যে আলোচনা করেছিলেন, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ওই নাটকখানির ব্যাখ্যার পার্থক্যও ছিল এখানেই। বঙ্কিমচন্দ্র কালিদাসের নাটককে স্বভাবানুকারিতার দিক থেকেই দেখেছিলেন। সেইজন্যই তুলনায় শেক্সপীয়রের মিরাণ্ডাকে কোনো কোনো দিক থেকে তাঁর কাছে অধিকতর স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল। শকুন্তলার মধ্যে তিনি কবির কোনো গূঢ় অভিপ্রায় দেখতে পান নি। বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত সাহিত্য ঘনিষ্ঠভাবে পড়েছিলেন সত্য, কিন্তু রসবোধের দীক্ষা তিনি পেয়েছিলেন পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে। উত্তরচরিতের সমালোচনায় তিনি ভারতীয় আলংকারিকদের বিদায়-নমস্কার করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীমনও পাশ্চাত্য কবিদের মতোই বাস্তবনিষ্ঠ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যথার্থ ভারতীয় প্রতিভা। তাই তাঁর পক্ষে কালিদাসের কাব্যের রূপক ব্যাখ্যা করা সম্ভব ও স্বাভাবিক হয়েছিল বলেই মনে করি। রবীন্দ্রনাথ একটি গভীর অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ উক্তি করেছিলেন—[১৩]

"আমার দৃঢ়বিশ্বাস ধীবরের হাত হইতে আংটি পাইয়া যেখানে দুষ্যন্ত আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন, সেইখানেই ব্যর্থ পরিতাপের মধ্যে য়ুরোপীয় কবি শকুন্তলা নাটকের যবনিকা ফেলিতেন। শেষ অঙ্কে স্বর্গ হইতে ফিরিবার পথে দৈবক্রমে দুষ্যন্তের সহিত শকুন্তলার যে মিলন হইয়াছে, তাহা য়ুরোপীয় নাট্যরীতি অনুসারে অবশ্যঘটনীয় নহে। কারণ শকুন্তলা নাটকের আরম্ভে যে বীজ বপন হইয়াছে এই বিচ্ছেদই তাহার চরম ফল। তাহার পরেও দুষ্যন্ত-শকুন্তলার পুনর্মিলন বাহ্য উপায়ে দৈবানুগ্রহে ঘটাইয়া তুলিতে হইয়াছে। নাটকের অন্তর্গত কোনো ঘটনাসূত্রে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার কোনো ব্যবহারে এ মিলন ঘটিবার কোনো পথ ছিল না।"

তবু যে মিলন ঘটল এ মিলন বাস্তবসম্মত নয়। সুতরাং কাহিনীটি অবশ্যই কোনো ভাবসত্যের নির্দেশে পরিকল্পিত। এই সত্য যে কি তার ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্যে বিস্তৃত ভাবেই করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন রামায়ণ মহাভারত মেঘদূত

---

১২. বিচিত্র প্রবন্ধ, 'নববর্ষা'

১৩. প্রাচীন সাহিত্য, 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা'

কুমারসম্ভব শকুন্তলা— ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলি এই ভাবেরই রূপরচনা। এই ভাবের সত্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে স্থূল বাস্তবকে যদি কিছু বিকৃত করতে হয় সেটা এমন কিছু ধর্তব্যের বিষয়ই নয়। ভারতবর্ষের কবির কাছে ভাবের সত্যটাই যথার্থ সত্য, বাস্তবটা রূপকের আবরণ রচনা করে মাত্র। রবীন্দ্রনাথ আরও নানা জায়গায় নানা প্রসঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করেছেন। প্রাচীন ভারতের সব কাব্য বা কাহিনীকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব কিনা জানি না, কিন্তু ভারতীয় কবিপ্রতিভা যে মূলত রূপকধর্মী তাতে কোন সন্দেহ নেই। বৌদ্ধজাতক কাহিনীতে বেতালপঞ্চবিংশতিতে বাণভট্টের কাদম্বরীতে বস্তুত সার্থক ও গভীর শিল্পসৃষ্টি মাত্রেই এই লক্ষণ অত্যন্ত স্পষ্ট। এমন কি এই কল্পনাভঙ্গি আমাদের দেশে এমনই ছড়িয়ে আছে যে নব্যভারতীয় ভাষাসাহিত্যে এই লক্ষণ খাঁটি ভারতীয় মনঃপ্রকৃতির সঙ্গে এক অখণ্ড যোগ রচনা করেছে। বাংলার চর্যাপদকে যদি সার্থক সাহিত্য হিসাবে স্বীকার নাও করি, তবু স্বীকার করতে হবে যে উপনিষদের মন্ত্রের রূপকভঙ্গির সঙ্গে এদের মিল আছে। সাহিত্য হিসাবে সর্বস্বীকৃত বৈষ্ণব পদাবলীর ব্যাখ্যা বাহুল্য মাত্র। বৈষ্ণব ভক্তরা নাকি এদের রূপক বলে মনে করেন না, সত্য বলেই মনে করেন। যে অর্থে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মিলন রূপক নয়—, সত্য, যে অর্থে মদনভস্ম ও পার্বতীর তপস্যা ও সিদ্ধি রূপক নয়—, সত্য, সেই অর্থে বৈষ্ণব পদাবলীর কৃষ্ণকাহিনী শুধু কেন, মঙ্গলকাব্যে বেহুলার স্বামীকে শিবলোক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসাও রূপক নয়, সত্য। আমরা একাল থেকে সেকালের চিন্তার এই ভঙ্গিকে রূপকই বলব। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শুধু বৈষ্ণব পদাবলী বা মঙ্গলকাব্যে নয়, ছোট ছোট গাথায় গানেও এই ভঙ্গি ব্যাপ্ত। বাউলের গানগুলি তার চমৎকার দৃষ্টান্ত।

রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভায় এই ভারতীয় প্রকৃতির লক্ষণ পূর্ণমাত্রায় আছে। সেকালের আর কোনো কবিকেই এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস লিখেছিলেন। উপন্যাসের প্রকৃতি বিচার করলেও বুঝতে পারা যায় বঙ্কিমের শিল্পীপ্রতিভা রূপকের পন্থা অনুসরণ করে নি। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে যেমন শেক্সপীয়র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবি-নাট্যকার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন তেমনি তাঁর দৃষ্টিতে জীবনের কোনো অলৌকিক বা অতিলৌকিক সত্য ইন্দ্রিয়-জগতকে আচ্ছন্ন করে নি। তাঁর উপন্যাসে যে দুঃখবেদনা ও বিয়োগবিধুরতা আছে তা অন্য কোনো সত্যের রূপক হিসাবে আসে নি। জেবউন্নিসা-মবারকের ব্যর্থ প্রেমে অতিলৌকিক সান্ত্বনার শান্তি নেই। মৃত্যুগ্রস্ত কুন্দের মুখের হাসি ডেসডিমোনার আত্মস্থতারই মতো ট্র্যাজেডির চূড়ান্ত করে দেয়। বঙ্কিমের উপন্যাসে মানবভাগ্যের সাধারণ রূপ একটি নিশ্চয়ই আছে— সার্থক ট্র্যাজেডি মাত্রেই থাকে। কিন্তু সেটা প্রতিষ্ঠিত 'মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাম্'—, এই শরীরী চেতনার উপরেই। কোনো ভাবসত্যকে অন্তরে উদ্‌ভাসিত করে তারই নির্দেশে মানুষকে বা ঘটনাকে সাজাতে হয় নি।

তবু বঙ্কিমের উপন্যাসেও যে কোথাও রূপকের আভাস একেবারেই নেই তা নয়। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত তার মধ্যে একটি। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও ভারতীয় চিন্তার এক ধরণের প্রভাব আছে! দুঃখচেতনাকে তিনি যেমন শেক্সপীয়রীয় বাস্তব দৃষ্টিতে দেখেছেন তেমনি এই দুঃখচেতনা থেকে মুক্তির উৎকণ্ঠাও তিনি অন্তরে লালন করে এসেছেন। এই নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। কিন্তু আমাদের মনে হয় বঙ্কিম-মানসের এই দিকটা অপেক্ষাকৃত দুর্বল অর্থাৎ দুঃখচেতনাকে তিনি যত সত্য বলে ভাবতে পারেন, ঠিক ততখানি প্রত্যয় নিয়ে দুঃখমুক্তির কল্পনা করতে পারেন না। তা ছাড়া দুঃখ ও দুঃখমুক্তি বঙ্কিমের উপন্যাসে পরম্পরাক্রমে এসেছে। খাঁটি ভারতীয় দৃষ্টিতে ভাবসত্যের সর্বাতিশায়ী প্রভাব স্বভাবকে প্রথম থেকেই আচ্ছন্ন করে কবির সৃষ্টিকে রূপকে পরিণত করে। কিন্তু বঙ্কিমের উপন্যাসে যেটুকু রূপকের লক্ষণ আছে সেখানেও পাশ্চাত্য রীতিরই প্রয়োগ আছে। শেক্সপীয়রের নাটকের 'সুপারন্যাচারাল' যেমন আসলে 'ন্যাচারাল' বা ইন্দ্রিয়জীবনের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, বঙ্কিমের উপন্যাসের রূপকও তেমনি এক ধরণের যুক্তিবোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত। বঙ্কিমের উপন্যাস যেন তাই পাশ্চাত্য রীতিতে এ বিষয়ে সমর্থন পেয়েছে। এইজন্য তাঁর উপন্যাসে এটা খুব স্পষ্ট— অন্ধ অনুভূতির চেয়ে বুদ্ধিগতই বেশি।

রূপক যখন অত্যন্ত স্পষ্ট হয় তখন সেটা হয়ে পড়ে আলংকারিক (decorative)। আলংকারিক রূপক আমাদের দেশে এবং ইংরেজি সাহিত্যেও যথেষ্ট আছে। ইংরেজি 'অ্যালিগরি' এই রূপকের দৃষ্টান্ত। অ্যালিগরি নেহাতই অলংকার, অর্থাৎ চিন্তা তত্ত্ব বা কল্পনার অবিচ্ছেদ্য প্রকাশরীতি নয়। তত্ত্বকে বলা যায় আলাদা করেও, শুধু পাঠকের হৃদয়গ্রাহী করবার জন্যে রূপকের একটা আবরণ ব্যবহার করা হয় মাত্র। আমাদের দেশের এই শ্রেণীর আলংকারিক রূপকের দৃষ্টান্ত হিসাবে কৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সব চেয়ে লক্ষণীয় হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনার আগে আলংকারিক রূপকরীতির বহুল ব্যবহার। প্রবোধচন্দ্রোদয় সেকালে পাঠ্য থাকত। এর কয়েকটি অনুবাদও বেরিয়েছিল। প্রথম উল্লেখযোগ্য অনুবাদ ঈশ্বর গুপ্তের। 'বোধেন্দুবিকাস' নামে এই অনুবাদ গ্রন্থাকারে ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পরে বেরিয়েছিল ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। 'বোধেন্দুবিকাস' নাটকের অভিনয়ের চেষ্টা ঠাকুরবাড়িতে হয়েছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে তার বিবরণ দিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'স্বপ্নপ্রয়াণ' নামে অপরূপ রূপককাব্য লিখেছিলেন, তার মূলে বোধেন্দুবিকাসের প্রবর্তনা ছিল কিনা কে বলবে। রবীন্দ্রনাথ-যে অগ্রজের এই কাব্যে মুগ্ধ ছিলেন, এ কথা সকলেই জানেন।[১৪]

---

১৪. যদিও কবি বলেছেন "বড়োদাদার স্বপ্নপ্রয়াণের আমি ছিলুম অত্যন্ত ভক্ত কিন্তু তাঁর বিশেষ কবিপ্রকৃতির সঙ্গে আমার বোধহয় মিল ছিল না, সেইজন্য ভালো লাগা সত্ত্বেও তাঁর প্রভাব আমার কবিতা গ্রহণ করতে পারে নি।"

—রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ (বিশ্বভারতী), কড়ি ও কোমলের ভূমিকা

বোধেন্দুবিকাসের রূপকরীতি এইভাবে রবীন্দ্রনাথে সঞ্চারিত হয়ে মানসী থেকে সোনার তরী পর্যন্ত রূপকাশ্রয়ী কবিতা রচনায় যদি তাঁকে উদ্‌বুদ্ধ করে থাকে তবে বিস্ময়ের কিছুই নেই। বিশেষত রূপক কবিতা সেকালে একেবারেই দুর্লভ ছিল না। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'নির্বাসিতের বিলাপ' (১৮৬৮) যে রূপক সে কথা এই কাব্যের ভূমিকাতেই উল্লিখিত আছে। বলদেব পালিতের প্রথম কাব্য 'কাব্যমঞ্জরী'তে (১৮৬৮) অনেকগুলি রূপক কবিতা ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র নিজে এ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'যৌবনোদ্যান' রূপককাব্যখানিও ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। হেমচন্দ্রের দুখানি রূপককাব্য ছিল আশাকানন (১৮৭৬) এবং ছায়াময়ী (১৮৮০)। সন্ধান করলে আরো রূপককবিতা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। বর্তমান প্রসঙ্গে তার তালিকা অনাবশ্যক।

সোনার তরীর যুগে রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি রূপককবিতা লিখেছিলেন সেগুলি উনবিংশ শতাব্দীর রূপক রচনার ধারারই অনুসরণ করে এসেছে। একটা স্পষ্ট বক্তব্যকে পাঠকের কাছে তুলে ধরবার প্রয়াস আছে এই সব কবিতায়। উনবিংশ শতাব্দীর রূপকরীতি কল্পনার একটা স্বাভাবিক অনায়াসসাধ্য ভাষারূপে আসে নি—এ কথা আগেই বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই রূপককবিতাগুলিকে সেই অর্থে পুরোপুরি এদের শ্রেণীভুক্ত করা চলে না। কেননা এতে ভাব ও ভাষার একাত্মতা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। তবে পাশাপাশি রেখে চিন্তা করলে মনে হওয়া অসংগত নয় যে পূর্ববর্তী আলংকারিক রূপককেই রবীন্দ্রনাথ শোধন ও মার্জন করে তাঁর কবিস্বভাবের অঙ্গীভূত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের একটি রূপককবিতা বিশ্লেষণ করে দেখলেই এই অনুমানের কারণ বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের একটি সুপরিচিত কবিতা 'দুই পাখি'। বনের পাখি স্বাধীন মুক্ত জীবনের প্রতীক, খাঁচার পাখি সমাজ শাস্ত্র বা অনুরূপ বদ্ধ জীবনের প্রতীক। বদ্ধ জীবনের মধ্যে বহির্জীবনের আহ্বান এসে পৌঁছয়—বন্দী-প্রাণকে লুব্ধ করে কিন্তু অভ্যাসের নিশ্চিন্ত সুখ-আশ্রয় ছেড়ে যেতেও ভয়ের সীমা নেই। কবিতাটিতে একটা স্পষ্ট বক্তব্য এবং নির্দিষ্ট প্রতীক আছে। বক্তব্য যদিও শুধুই নীতিমূলক নয়, অনুভূতিমূলক, তবু সেই অনুভূতিটাকে আগে সচেতনভাবে স্বীকার করে নিয়ে, সচেতনভাবেই তার প্রতীকগুলি চিন্তা করে নেওয়া হয়েছে। 'হিং টিং ছট' 'পরশ পাথর' 'আকাশের চাঁদ' প্রভৃতি রূপক-কবিতাগুলি সম্পর্কে এই একই বক্তব্য। এগুলি বক্তব্যপ্রধান এবং রূপকসচেতন।

কিন্তু এই আলংকারিক পদ্ধতি পূর্বানুবৃত্তি হলেও রবীন্দ্রীয়, তার প্রমাণ এতে ব্যক্তিগত অনুভূতির আবেগও আছে। রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের কাহিনীতেই এই 'দুই পাখি'র ইতিহাস পাওয়া যাবে। আবার এ কথাও সত্য যে এই বক্তব্যের একটা নীতির দিকও আছে। আসল কথা রবীন্দ্রপূর্ব কবিরা নীতি বা তত্ত্বকে প্রধান রেখে রূপকালংকারে সজ্জিত করতেন আর রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বকে জীবনের সামগ্রিক উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত করেছেন। নীতির দিক থেকে বক্তব্যের দিক থেকে এবং স্পষ্ট প্রতীক ব্যবহারের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববর্তী ধারার অনুবর্তন করেছেন। আবার সামগ্রিক উপলব্ধির দিক থেকে তিনি

আত্মপ্রতিষ্ঠ হচ্ছিলেন। এই উপলব্ধিকে রবীন্দ্রনাথ ধরে দিয়েছেন চিরন্তন প্রকৃতির থেকে উপমান প্রতীক বা অন্য রকমের রূপ রং রেখার সংগ্রহে। ব্যক্তিগত তত্ত্বকে বিশ্বজনীন প্রকৃতিচেতনার সঙ্গে মিলিয়ে রবীন্দ্রকবিমানস নূতন রূপক সৃষ্টি করে তুলেছিল। রূপক রবীন্দ্রকাব্যে জীবনের একটা সাময়িক উপলক্ষে সীমাবদ্ধ নয়— সে একটা বৃহত্তর ভাবসত্যের প্রকাশক হয়ে উঠেছে। এই ভাবে সে এক অনির্দেশ্য ভাবনার দিকে অগ্রসর হয়েছে।

'সোনার তরী' কাব্যের এই বিশিষ্টতাই সমগ্রভাবে রবীন্দ্রকবিমানসের একটা মৌলিক লক্ষণে পরিণত হয়েছে। এই লক্ষণ আবার ভারতীয় কবিপ্রতিভারই লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথের যে কবিতাগুলি স্পষ্টত রূপক নয়, তারও মধ্যে সেই রূপকের ছায়া আছে, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে যা আমরা দেখেছি। রূপকপ্রবণতা রবীন্দ্রমানসের বৈশিষ্ট্য বলে বিষয় এবং বিচ্ছিন্ন উপমা— দুই দিকেই এর আভাস পাওয়া যায়। চিত্রা সোনার তরীর যুগে রবীন্দ্রকাব্যে অসামান্য রূপতন্ময়তার পরিচয় পাই—এ কথাও সত্য। সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন এই যে বাস্তব-রূপের পূর্ণ মর্যাদা যদি কবি রক্ষা করে থাকেন তবে ভারতীয় কবিদৃষ্টির সঙ্গে ঠিক এই দিক দিয়ে তার মিল কোথায়? প্রাচীন কবি বস্তুরূপকে নিয়তির নিয়ম থেকে মুক্তি দিয়ে ভাবের প্রতীকে পরিণত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কি প্রয়োজনবোধে বস্তুরূপকে সেই ভাবে পরিবর্তিত করেছেন? তার সঙ্গে প্রশ্ন এই যে, রবীন্দ্রনাথের সত্যধারণা কি বাস্তবের চেয়ে বড়—পূর্বনির্ধারিত? সমগ্রভাবে রবীন্দ্রমানসের বিশ্লেষণ করে এর উত্তর খুঁজে নিতে হয়। বর্তমানে সে আলোচনা দীর্ঘ এবং কিঞ্চিৎ অবান্তর হয়ে পড়ে। প্রয়োগরীতিই আমাদের বিচার্য। সেই হিসাবে কয়েকটি কবিতার দৃষ্টান্তই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বের খণ্ড সত্যগুলিকে সব সময়েই বড়ো সত্যের সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছেন—এ কথা সকলেই জানেন। একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় এর একটা বিশিষ্ট প্রণালী আছে। কোনো বস্তুরূপকে অবলম্বন করে তবে এক সর্বজনীন সত্যবোধে কবি পৌঁছতে পারেন। বস্তুর রূপটা সত্য, কিন্তু খণ্ড-সত্য। এই খণ্ড-সত্য যখন কোনো নির্বিশেষ অখণ্ড নিত্য সত্যবোধের আভাস দেয় তখনই সে কবির কাছে সার্থক হয়ে ওঠে। কবির এই প্রবণতা তাঁর প্রথম যুগের রচনা থেকেই লক্ষ্য করি। তাঁর বাল্যরচনার মধ্যে এই লক্ষণ স্পষ্ট হলেও প্রচলিত গদ্যরচনার প্রাচীনতর অংশে এই লক্ষণ সুলভ। 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র রচনাগুলিই এর দৃষ্টান্ত। কবি বলেছেন এদের গৌরব বিষয়বস্তুতে নয়, রচনারসসম্ভোগে। অকিঞ্চিৎকর বিষয়কে নির্বিশেষ সত্যের রূপকে পরিণত করতে পারাতেই আসলে রচনারসের সৃষ্টি হয়েছে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'পথপ্রান্তে' রচনাটি পাঠকের মনে পড়বে। এই পথ জীবনমৃত্যুর অন্তহীন যাত্রাপথের রূপক মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের বড় কবিতাগুলি এই প্রসঙ্গে আলোচনাযোগ্য। এই কবিতাগুলি আরম্ভ হয় বস্তুরূপের তীক্ষ্ণ বর্ণনা দিয়ে। 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় সাংসারিক গৃহস্থালীর

একটা অত্যন্ত বাস্তব বর্ণনা আছে। 'মানসসুন্দরী'র প্রথম দিকটা নায়ক-নায়িকার প্রণয়গুঞ্জনের উচ্ছল রসসৃষ্টি। 'বর্ষশেষ' কবিতার আরম্ভ আসন্ন ঝড়ের একটা স্পষ্ট রেখাসম্পন্ন চিত্ররূপ দিয়ে। 'এবার ফিরাও মোরে'-র আরম্ভ ক্ষুব্ধ কবিকণ্ঠের আর্ত বেদনা দিয়ে। বলাকার 'শাজাহানে'ও প্রথম দিকে আছে জীবনের মর্ত্যতায় ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতার মধ্যে বিভিন্ন যুগের কয়েকটি বড়ো কবিতার দৃষ্টান্ত বেছে নিলাম। দীর্ঘ কবিতার বিস্তার আমাদের বক্তব্য সহজে প্রতিপন্ন করে। ক্ষুদ্রায়তন কবিতায় বক্তব্যের অতিসংকোচন থাকে বলে বুঝবার পক্ষে কিঞ্চিৎ অসুবিধাজনক হতে পারে যদিও সাধারণ বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণই আছে।

বাস্তবের প্রতি এই নিষ্ঠা থাকলেও কবিতার শেষাংশে কবি খণ্ড-বাস্তবকে অতিক্রম করে নির্বিশেষ ভাবের মধ্যে পৌঁছে যান। তখন প্রারম্ভিক বস্তুবর্ণনাই সেই মূল ভাবের রূপকে পরিণত হয়। 'যেতে নাহি দিব'-তে কবির বিদেশযাত্রার মুহূর্তে চার বৎসর বয়সের কন্যাটির অবুঝ উক্তি—'যেতে আমি দিব না তোমায়' অবিলম্বেই কবির কাছে পৃথিবীমাতার চিরন্তন মমতার বাণীতে পরিণত হয়েছে এবং প্রথমাংশের কাহিনীটি নির্বিশেষ ভাবসত্যের রূপক হয়ে উঠেছে। যে বালিকা ব্যাকুলভাবে পিতাকে ধরে রাখতে চায়, সে স্থান ও কালের ব্যক্তিরূপ ত্যাগ করে মমতাময়ী বিচ্ছেদকাতরা বসুন্ধরার রূপকে পরিবর্তিত হয়। মানসসুন্দরীর ব্যক্তিপ্রেম নৈর্ব্যক্তিক প্রেমে রূপান্তরিত হয়। বর্ষশেষের ঝড় আসক্তির বন্ধনচ্ছেদী জগৎপ্রবাহের অনিবার্য আঘাতরূপে দেখা দেয়। 'এবার ফিরাও মোরে'-র বেদনা রূপ নেয় বিশ্বপ্রিয়ার আহ্বানে আর শাজাহান হয়ে ওঠে চিরযাত্রী মানবাত্মার প্রতীক। এই সব দীর্ঘ কবিতায় সে দিক থেকে বিচার করলে স্পষ্টত দুই ভাগ আছে। প্রথম ভাগের রূপসৃষ্টি দ্বিতীয়াংশের অরূপের আগ্রহে পরিণত। কেউ কেউ মনে করেছেন, কবিতার এই বিন্যাস আমাদের ভারতীয় সাহিত্যরীতিরই মতো। "পূর্বমেঘে বহু বিচিত্রের সহিত সৌন্দর্যের পরিচয় এবং উত্তরমেঘে সেই একের সহিত আনন্দের সম্মিলন"—রবীন্দ্রনাথের এই পূর্বোদ্ধৃত ব্যাখ্যাটি যেন প্রমাণীকৃত হয়েছে তাঁর নিজেরই কবিতায়। এমন কি এর পূর্বসূত্র পাওয়া যেতে পারে ঋষিবচনে—[১৫]

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বাঽসম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে॥

প্রকৃতির মর্যাদা রক্ষা করে তবে অমৃতের অধিকার লভ্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'জীবনকে এড়িয়ে গেলে চলে না, পেরিয়ে যেতে হয়'।

কিন্তু এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা অবশ্যস্বীকার্য। ভারতীয় রীতিতে আপাত-দৃষ্টিতে কাব্যে দুটি পর্যায় থাকলেও সবটা মিলে একটা সমগ্র স্থির সত্যেরই প্রকাশ হচ্ছে সৃষ্টি। খাঁটি অর্থে সত্য বিকাশশীল নয়, সত্য স্থির এবং অখণ্ড; কালিদাস যেমন বলেছেন

১৫. ঈশ ১৪

বাক্যকে অতিক্রম করে অর্থ নয়, বাক্যের সঙ্গেই অর্থ—দুয়ে মিলে একটিই। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সত্য ক্রমপ্রকাশ্য। আগে বস্তুরূপ তার পর সত্যোপলব্ধি। এইজন্য রবীন্দ্রনাথের কবিতায় রূপজগতের বর্ণনা নিখুঁত। সেখানে কোনো বিকৃতি নেই বরং থাকে প্রখর ইন্দ্রিয়ানুভূতির উচ্ছল রস। এ বর্ণনা যদিও রূপক হয়ে ওঠে তবু 'নিয়তিকৃতনিয়মরহিত' হয় না।

অতএব এ দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সাহিত্যের স্বভাবানুকরণ রীতির অনুসরণ করেছেন। কবির রূপপিপাসা যেমন চরিতার্থতা লাভ করেছে, তেমনি তার পরে তিনি প্রয়াণ করেছেন অরূপলোকে। স্বভাবতই মনে হয় ইংরেজী রোমানটিক কবিতায় তিনি এর ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি সাহিত্যসৃষ্টির অনুকরণ-বাদ রোমানটিক যুগে সৃষ্টি-বাদে এসে পরিবর্তিত হয়েছিল। এতে স্বভাবকে মেনে চলার কড়াকড়ি কমেছে কবিরই আত্মচেতনার স্বাধীনতার সুযোগে। কবিরা যে সত্যের কল্পনা করেছেন বস্তুরূপকে পরিণত করেছেন তারই রূপকে। যিনি যত বেশি আত্মমগ্ন ও ভাবাতুর তাঁর কাব্যে রূপকের প্রয়াস তত বেশি। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও শেলি দুজনেই এর চমৎকার দৃষ্টান্ত। কীটসের রূপনিষ্ঠা প্রবল; তবু তাঁর কল্পনাতেও নাইটিংগেল প্রতীকে পরিণত হয়ে যায়। ঝিঁঝির শব্দ হয়ে ওঠে মাটির গান। শেলির ঝড় তো একটা সমাজবিপ্লবের উচ্চকিত বাণী। তা হলেও এ কথা স্বীকার করতে হবে যে রোমান্টিক কবিদের রূপকরচনা কোনো আধ্যাত্মিক সত্যের নয়। দেহানুভূতি রূপরস ও আনন্দ সৃষ্টিতেই এই রূপকের সার্থকতা। এই ভাবনিষ্ঠ রোমানটিক সাহিত্য-কলাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভারতীয় প্রবণতার একধরনের প্রতিরূপ দেখতে পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য উপমাগুলি এই অর্থে রূপকধর্মী। তারা শুধু বহিরঙ্গ রূপটাকেই ফোটায় না, একটা ভাবের প্রতীক হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রকবিমানসের রূপকপ্রবণতা শুধু যে কবিতার ক্ষেত্রেই প্রকাশ পেয়েছে তা' নয়। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি এই জন্যেই ভাবনিষ্ঠ। শেষের দিকের রূপক নাটকগুলির কথাই শুধু বলছি না, তাঁর প্রথম দিকের রচনা 'রাজা ও রানী' 'বিসর্জন' 'মালিনী'— এ সব নাটকেও ভাবসত্য মুখ্য বক্তব্য। তারই প্রয়োজনে চরিত্র ও ঘটনা পরিকল্পিত। এজন্যে চরিত্রগুলিও পুরোপুরি জীবনধর্মী হয় নি এবং কখনও কখনও 'লিরিকের প্লাবন'ও এসে গিয়েছে। এরা কবির এক পূর্বকল্পিত আদর্শের রূপ রচনা করেছে। 'শারদোৎসব', 'ডাকঘর' বা 'অচলায়তন' প্রভৃতি খাঁটি রূপক নাটকের আলোচনা বাহুল্য মাত্র। রবীন্দ্রনাথের অনুপম সৃষ্টি গল্পগুচ্ছ, এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি উপন্যাস। মনে হয়, গল্পগুচ্ছে কবি ভাবনিষ্ঠাকে গৌণ করে রূপনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা দেশের জীবন স্বভাব মানুষকে তাদের বাস্তব রূপ রং নিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি তাদের রূপক করে তুলতে চান নি। তিনি নিজেও বলেছেন—[১৬]

---

১৬. রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪ (বিশ্বভারতী), পৃ ৫৩৮

"এক সময়ে ঘুরে বেড়িয়েছি বাংলার নদীতে নদীতে, দেখেছি বাংলার পল্লীর জীবনযাত্রা। একটি মেয়ে নৌকো করে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল তার বন্ধুরা ঘাটে নাইতে বলাবলি করতে লাগল, আহা যে পাগলাটে মেয়ে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ওর কি না জানি দশা হবে। কিংবা ধরো একটা খ্যাপাটে ছেলে সারা গ্রাম দুষ্টুমির চোটে মাতিয়ে বেড়ায়, তাকে হঠাৎ একদিন চলে যেতে হল শহরে তার মামার কাছে। এইটুকু চোখে দেখেছি, বাকিটা নিয়েছি কল্পনা করে।"

ছোটগল্প রচনার মূলে ছিল এই বাস্তব অভিজ্ঞতা। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি এই বাস্তবকেই কবি কবিতায় আর একটা কোনও সর্বজনীন ভাবের রূপক হিসাবে গ্রহণ করেছেন। গল্পগুচ্ছে তার লক্ষণ একেবারে যে নেই, তা নয়। অতিথি গল্পের তারাপদে কিংবা কাবুলিওয়ালা গল্পের নায়কের কল্পনায় এমনি বিশ্বজনীন ভাবের রূপকের আভাস পাওয়া যায়। বিশেষ করে শাশ্বত প্রকৃতির নিত্য রূপের ভূমিকা কবি বার বার নানা কৌশলে স্মরণ করিয়ে দেওয়ায়, গল্পগুচ্ছের অনেক গল্পেই একটা বৃহৎ জীবনের মৌন সঙ্কেত বেজে ওঠে। অবশ্য এই সব প্রমাণ সত্ত্বেও গল্পগুচ্ছে কবির রূপতন্ময়তাই বড়ো। রবীন্দ্রপ্রতিভার পক্ষে বাস্তবনিষ্ঠ হওয়া যতখানি সম্ভব ছিল, গল্পগুচ্ছে ও উপন্যাসে ততখানিই হয়েছে। 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির প্রথম অংশে যে বাস্তবনিষ্ঠা আছে তার সঙ্গে গল্পগুচ্ছের বাস্তবনিষ্ঠার সুস্পষ্ট মিল। কবিতার শেষাংশ বরং গল্পে ততখানি প্রাধান্য পায় নি যদিও তার আভাসও একেবারে যে নেই তা নয়। পোস্টমাস্টার গল্পের শেষাংশ স্মরণীয়। 'পলাতকা' 'লিপিকা এবং 'পুনশ্চে'র কথিকাগুলিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রমানসে নির্বিশেষের প্রতি আকর্ষণ আছেই। এ জন্য বস্তুও যে তাঁর কাছে নির্বিশেষ সত্যের রূপক হয়ে ওঠে এও আমরা দেখলাম। কিন্তু উত্তরকালে নির্বস্তুক তত্ত্ব চিন্তা ও সত্যবোধের প্রতি আকর্ষণ আরও প্রবল হয়েছে। 'বলাকা'তেই দেখি কাব্যের বিষয়টাই একটা নির্বিশেষ চিন্তা। সমাজচিন্তায়, রাষ্ট্রচিন্তায় সর্বত্রই নিরবয়ব বিশ্বজনীন সত্যের প্রতি কবির টান আর সব কিছুকেই অতিক্রম করে যেতে চায়। রূপনিষ্ঠাও তার তুলনায় কখনও কখনও ম্লান হয়ে গিয়েছে। সত্যই, পূর্বজীবনের কবিতায় কবির রূপমগ্নতা কীটসের ইন্দ্রিয়মগ্নতার (sensuousness) তুলনাই বার বার মনে পড়িয়ে দেয়। পরের যুগের কবিতায় এই লক্ষণ আর তত প্রবল নয়। উত্তরকালের এই নির্বিশেষের চিন্তা ও প্রাচীন ভারতীয় কবির ভাবনিষ্ঠা এক পর্যায়ের নয়। কারণ রবীন্দ্র-কবিমানসের এই নূতন অভিব্যক্তিতে কল্পনা অপেক্ষা চিন্তারই প্রাধান্য দেখা যায়। বুদ্ধিগত চিন্তাও নির্বিশেষ। রবীন্দ্রনাথের নূতন চিন্তা বুদ্ধিগত উপলব্ধি থেকেই পাওয়া। তাই এ সত্য জীবনাতিক্রান্ত নয়, মানুষ এবং মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিতব্য। 'মুক্তধারা' বা 'রক্তকরবী'র মতো নাটক রূপক হলেও, সে-রূপক অতীন্দ্রিয় ভাবসত্যের রূপক নয়—মানুষের সমাজ ও জীবনের প্রয়োজনেই কল্পিত। এদের রূপকধর্ম আধুনিক পাশ্চাত্য নাটকের রূপকের

মতোই নির্দিষ্ট বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং স্পষ্ট। রবীন্দ্রকাব্যের পূর্বযুগ ও পরযুগের মধ্যে কাব্য-প্রকৃতিগত এই ভেদ চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না।

এ কথাও সত্য নয় যে কবি পূর্বের ধর্ম সম্পূর্ণ বর্জন করে ধর্মান্তর গ্রহণ করেছেন। রূপকের রীতি তাঁর স্বভাবগত। বলাকার 'বলাকা' বা 'ঝড়ের খেয়া'য় পূরবীর 'তপোভঙ্গ' বা 'সাবিত্রী'তে পুনশ্চের 'শিশুতীর্থে' এর দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু বলাকা-পরবর্তী কবিতা পড়লে বোঝা যায় আগে এসেছে চিন্তা তার পর এসেছে তার উপযুক্ত ভাষা। আগের মতো আর বলা যায় না যে বস্তুর থেকেই ভাবের আভাস ফুটে উঠছে। এইজন্য এ যুগের কবিতায় উপমা ইত্যাদি খণ্ড চিত্রগুলিতে রূপকের লক্ষণ বিচ্ছিন্নভাবে দেখা দিলেও সমগ্রভাবে কবিতার ভাবটা আগের মতো রূপক-ধর্ম অর্জন করে নি। বলাকার 'চঞ্চলা' কবিতাটি থেকেই এর দৃষ্টান্ত পেতে পারি। এতে বহু উপমা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতি চিত্ররূপই এক একটি গুণকে আভাসিত করে তুললেও সমগ্রভাবে কবিতার ভাববস্তু একটি অখণ্ড রূপ সৃষ্টি করে না। রক্তকরবী নাটকেও প্রতি ঘটনা বা চরিত্র প্রতীক হিসাবে যথার্থ কিন্তু সমগ্র ভাবটি অখণ্ড বাস্তবসৃষ্টি হিসাবে অসংগত না হলেও অস্বাভাবিক এ কথা কে অস্বীকার করবে? উত্তরজীবনে রূপ ও বর্ণের বৈভব বিলীন হল। সূর্যের মতো রবীন্দ্রকবিমানস বর্ণবৈচিত্র্যকে সংহরণ করে প্রকাশিত হল নিরঞ্জন শুভ্রতায়।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের তিন জগৎ : মুক্তবেণী

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

রবীন্দ্রনাথের জীবনে কি ভাবে ও কোন্ ক্রমে প্রকৃতি, মানুষ ও ব্রহ্মের উপলব্ধি ঘটিল, 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের তিন জগৎ' আলোচনায় অন্যত্র[১] আমরা তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কলিকাতা, শিলাইদহ ও শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই তিন জগৎ কিংবা প্রকৃতি, মানুষ ও ব্রহ্ম এই তিন মূল উপাদান রবীন্দ্র-সাহিত্যের। উপলব্ধির কাল ও গুরুত্ব-বিচারে প্রকৃতি, মানুষ ও ব্রহ্ম এই ক্রমেই উপাদানগুলি সজ্জিত হওয়া আবশ্যক। তবে একটু বিশেষ আছে। প্রকৃতির উপলব্ধি জন্মসূত্রে প্রাপ্ত, অপর দুটি সাধনার দ্বারা আয়ত্ত। এই তিনটি ধারা কি ভাবে একে একে আসিয়া কবির উপলব্ধির বিষয় হইতে লাগিল, তার পরে কি ভাবে তিনে এক একে তিন হইয়া মিলিয়া মিশিয়া এক বেণী রূপে প্রবাহিত হইল আর এই ত্রিবেণী সঙ্গমের তীরে তীরে কি ভাবে গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালির তীর্থকাব্যগুলি গড়িয়া উঠিল অন্যত্র তাহা আমরা বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু ইহাই সব নয়। যুক্তবেণীর পরে আছে মুক্তবেণী। উত্তর-ভারতের মানচিত্রের দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে যে প্রয়াগে আসিয়া গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী মিলিত হইয়াছে, সেই মিলিত ধারা অনেকটা পথ অব্যাহত গতিতে চলিবার পরে সমুদ্রের কাছে আসিয়া আবার বাঁধন আলগা করিয়া দিয়া বেণীমুক্ত পদে সমুদ্রসংগমে ছুটিয়াছে। মানচিত্রের এই ছবি রবীন্দ্রমানসচিত্রেরই যেন ছবি। রবীন্দ্রবাণী একদা বেণী-সংহার করিয়া কি যেন এক পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, কিছুকাল এইভাবে কাটিল, তার পরে আবার আসিল বেণী খুলিবার সময়। রবীন্দ্রবাণীর বেণীবন্ধন ও বেণীবন্ধনের ইতিহাস যেমন মনোরম তেমনি গভীর জিজ্ঞাসার স্থল। বেণীবন্ধনের ইতিহাস অন্যত্র বলিয়াছি, এবারে বেণীমোচন। বোধ করি দুয়ের মধ্যে শেষেরটাই গভীরতর জিজ্ঞাসার স্থল।

বনফুল কাব্য রচনার সময় হইতে রবীন্দ্রবাণী ধীর মন্থরগতিতে, ক্ষীণ অপুষ্ট ধারায় প্রবাহিত হইতেছিল। অনুরাগী ও সুহৃদ্‌বর্গের আশা-কৌতূহল জাগ্রত করিয়া পুরোগামিগণের স্নেহ-ভরসা উদ্রিক্ত করিয়া, তীরে তীরে দেখা দিতে লাগিল কবিকাহিনী, সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, প্রকৃতির প্রতিশোধ নাট্যকাব্য, রাজর্ষি, বউঠাকুরানীর হাটের অর্ধ-রোমান্স, এ দিকে বয়স সাতাশে আসিয়া ঠেকে। কবি হঠাৎ সচেতন হইয়া আক্ষেপ করেন, বয়স সাতাশে ঠেকিল, তেমন কিছুই তো লেখা হইয়া

১. রবীন্দ্রায়ণ, প্রথম খণ্ড

উঠিল না।[২] কবির আক্ষেপ করিবার বিষয় বটে। সাতাশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইলে কি তাঁহার পরিচয় থাকিত, রবীন্দ্র-প্রতিভার যে বিপুল ফসল পরবর্তীকালে ফলিয়াছে তাহার স্থচনাও দেখা দেয় নাই ঐ সব রচনায়, অমরত্বের কি দাবি তিনি করিতে পারিতেন। অথচ ঐ বয়সে অমরত্বের দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এমন কবি বিরল নন। শেলি ও কীট্‌স্‌ যে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অধিকতর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তাহা নয়—অথচ সাতাশের দু বছর এদিকে, দু বছর ওদিকে তাঁহাদের মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা কবিশ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হইয়া থাকেন। তবে রবীন্দ্র-প্রতিভার এই ধীর স্ফুরণের কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়, সম্ভাবনারূপে বিশাল প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও জীবনের বাস্তব রূপের সঙ্গে কবির পরিচয় ঘটে নাই। তরুণ গরুড় মহাশূন্যে বৃথা পাখা ঝাপটাইয়া মরিতেছিল, লোকপাল বিষ্ণু তখনও তাহার উপরে ভর করেন নাই। জীবনের সঙ্গে মুখোমুখী পরিচয়, গায়ে গায়ে সংস্পর্শ, আকাঙ্ক্ষায় আকাঙ্ক্ষায় সংঘর্ষ ঘটিল শিলাইদহের জগতে, যখন নাকি কবি ও সুখ দুঃখ বিরহ মিলন -পূর্ণ মানুষ পরস্পরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এতদিন যে বিরাট প্রতিভা সম্ভাবনারূপে কুঁড়িতে আবদ্ধ ছিল জীবনের উষ্ণস্পর্শে তাহা একরাত্রে যেন পূর্ণবিকশিত হইয়া উঠিল।[৩] সাধারণ কার্যকারণের সূত্রে বা প্রতিভা বিবর্তনের নিয়মে প্রতিভার এই অকস্মাৎ মধ্যাহ্নদীপ্তির ব্যাখ্যা সম্ভবে না। অকস্মাতের মূলে আছে জীবনের আকস্মিক সংঘাত, অন্ধকারে ভ্রাম্যমাণ দুই উল্কাপিণ্ডের পরস্পরের সংঘর্ষে জলিয়া ওঠা। শিলাইদহের জগতে কবি যে দশবৎসরকাল[৪] বাস করিয়াছিলেন কি প্রাচুর্যে, কি বৈচিত্র্যে, কি গুণগত উৎকর্ষে সেই সময়কার রবীন্দ্র-ফসলের তুলনা হয় না পরবর্তী আর-কোনো দশকের ফসলের সঙ্গে। নবজাগ্রত পূর্ণ-উদ্বুদ্ধ রবীন্দ্র-প্রতিভার কোটালের বন্যা নিছক সাহিত্যগুণের যে উচ্চ সীমারেখাকে এই সময়ে স্পর্শ করিয়াছে, পরবর্তীকালে তাহাকে আর অতিক্রম করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ।[৫]

---

২. ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৮

৩. মানসী কাব্যেও আংশিক পরিণতি লক্ষিত হয়, তাহারও কারণ জীবনের উষ্ণস্পর্শ। কবির গাজিপুর-বাসের অভিজ্ঞতা ও তৎস্থানে লিখিত কবিতাগুলি স্মরণীয়।

৪. ১৮৯১-১৯০১ সাল

৫. এই দশকের বিভিন্ন পর্যায়ের রচনার একটা মোটামুটি তালিকা আমার সপক্ষে সাক্ষ্যদান করিবে আশায় এখানে প্রদত্ত হইল—

কাব্য ॥ সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, কথা, কল্পনা, নৈবেদ্য, ক্ষণিকা, কণিকা

কাব্যনাট্য ॥ চিত্রাঙ্গদা, কাহিনী, মালিনী

ছোটগল্প ॥ গল্পগুচ্ছের অন্তর্গত চুরাশিটি গল্পের প্রথম চল্লিশটি

প্রহসন ॥ বৈকুণ্ঠের খাতা

গদ্য ॥ পঞ্চভূতের ডায়ারি, ছিন্নপত্রাবলী

কবি কলিকাতায় যে প্রকৃতির পরিচয় পাইয়াছিলেন আর শিলাইদহে যে মানুষের পরিচয় পাইলেন, দুয়ে সহজেই মিলাইয়া লইতে পারিলেন। বাংলাদেশের প্রকৃতিও যেমন সরল অমিশ্র ও স্নিগ্ধ, বাংলাদেশের মানুষও তেমনি, জলের সহিত জল অনায়াসে মিলিয়া গেল। "দ্বৌ অপি অত্র আরণ্যকৌ।" এ দেশে মানুষ ও প্রকৃতিতে প্রতিযোগিতা নাই, আছে সহৃদয় সহযোগিতা। এই সহযোগিতার ভাবটি কবির বড় ভালো লাগিল, এই সহযোগিতার ভিত্তির উপরে সোনার তরী চিত্রা চৈতালি কাব্য এবং গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি গড়িয়া উঠিল। মানুষে প্রকৃতিতে মিলিত সুরে যখন কবির বীণা ধ্বনিত হইতেছিল সেই সময়ে নূতন একটি সুর গভীরতর একটি সম্ভাবনাকে বহিয়া দেখা দিল। চৈতালি কাব্যে প্রাচীন ভারত সংক্রান্ত কবিতাগুলি যাহার সূচনা তাহারই বৃহৎ পরিণাম কল্পনা, কথা ও নৈবেদ্য কাব্যে। এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয় কিছু আগে পরে লিখিত কাব্যনাট্যগুলি।[৬]

এইসব নাটকের মূল জিজ্ঞাসা, ধর্ম কি? ইহাও প্রাচীন ভারতে মানস ভ্রমণের একটি পরিণাম। এক দিকে লৌকিক ধর্ম, যেমন কুলধর্ম রাজধর্মক্ষাত্রধর্ম প্রভৃতি; অন্য দিকে নিত্যধর্ম। সমস্ত কাব্যনাট্যগুলি ধর্মের এই দুই রূপের লীলাস্থল। এখানে দেখিতে পাই যে সীমা ও অসীম লৌকিকধর্ম ও নিত্যধর্মের রূপান্তর লাভ করিয়াছে। আর যেহেতু সীমা ও অসীমের দ্বন্দ্বের সমাধান সম্ভব হয় নাই, নিত্যধর্ম ও লৌকিকধর্মও অসমন্বিত রহিয়া গিয়াছে। সত্যই কি লৌকিকধর্ম ও নিত্যধর্ম অ-সমন্বয়যোগ্য? অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ তাহাই মনে করেন আর সেইজন্যই নিত্যধর্ম মানুষকে দুঃখের অতিরিক্ত আর-কোনো প্রতিশ্রুতি দানে অসমর্থ। ধর্ম কি, ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া গান্ধারী যে উত্তর দিতেছেন তাহা কবির মন্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিলে অন্যায় হইবে না।

ধৃতরাষ্ট্র। কি দিবে তোমারে ধর্ম?
গান্ধারী। দুঃখ নব নব।

আবার—

ধর্ম নহে সম্পদের হেতু
মহারাজ, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু,
ধর্মেই ধর্মের শেষ।

দুঃখ ছাড়া আর-কিছু দানের সাধ্য যাহার নাই, তেমন ধর্ম লোকে স্বীকার করিবে কেন বুঝিতে পারা সহজ নয়। তবে কি সুখ ধার্মিকের জন্য নয়? তবে কি সুখ পরকালের ব্যাপার? এ ধর্ম পিউরিট্যান সম্প্রদায়ের ধর্ম হইতে পারে, উপনিষদ-রসে পুষ্ট মনীষী ইহাকে ধর্ম বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিবেন কেন? আসলে, সীমা ও অসীমের দ্বন্দ্ব মেটে নাই বলিয়াই তাহাদের রূপান্তর লৌকিকধর্ম ও নিত্যধর্মের দ্বন্দ্বও

---

৬. গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস, কর্ণকুন্তীসংবাদ, মালিনী।

অব্যাহত রহিয়াছে। দ্বন্দ্বের রণক্ষেত্র আর যাহাই হোক সুখকর যে নয় তাহা তো সহজবোধ্য। আমার মনে হয় ধর্ম সম্বন্ধে তৎকালে কবির অসম্পূর্ণ ধারণার ইহাই মূলীভূত কারণ।[৭]

কবির মনের যখন এই-রকম অবস্থা তখন আবার নূতন পট-পরিবর্তন ঘটিল তাঁহার জীবনে। শিলাইদহের বাস তুলিয়া স্থায়ীভাবে তিনি জনপদবিরল, নিসর্গের বাহুল্যবিরল শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে চলিয়া আসিলেন। এতদিনে বহির্মুখী মন অন্তর্মুখী হইবার সুযোগ পাইল। ধর্ম কি, এই পূর্বসূত্রের জের টানিয়া ধর্মস্বরূপের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিলেন। কিন্তু সে পথেও বাধা অল্প নহে। অনেকটা সময় অনেকখানি মনীষা গেল সেই সব বাধা অতিক্রম করিতে।[৮] সাধনার অন্তে যখন তিনি গীতাঞ্জলির আনন্দলোকে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তখন সামান্য কয়েকটি বছরের জন্য সীমা ও অসীমের দ্বন্দ্বের সমাধান হইল তাঁহার জীবনে। নিত্যধর্ম ও লৌকিকধর্মের যে অসমন্বয়ের কথা বলিয়াছি, যে অসমন্বয় হইতে খেয়া কাব্যে দুঃখবাদের সৃষ্টি, এতদিন পরে তাহারও অবসান ঘটিল। আমরা ১৯১১ সালে আসিয়া পড়িয়াছি, আবার পট উঠিবার সময় আসিল তাঁহার জীবনে। এবারে নূতন তীর্থে নূতন তীরে।

১৯১২ সালে কবি ইংলণ্ড যান আর ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি দেশ পর্যটন করিয়া সতেরো মাস পরে দেশে ফিরিয়া আসেন। এই সময়ে পাশ্চাত্য দেশ যে তাঁহার কবি-

৭. তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব পূর্ণতর ও অনেক বাস্তবসম্মত।—

শিষ্য। আপনাকে বলিতে শুনিয়াছি ধর্মেই সুখ। কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় পরম ধার্মিক ব্যক্তি, ইহা সর্ববাদিসম্মত। অথচ তাঁহার মত দুঃখীও আর কেহ নাই, ইহাও সর্ববাদিসম্মত।

গুরু। হয় তাঁর কোন দুঃখ নাই, নয় তিনি ধার্মিক নন।

—অনুশীলন, প্রথম অধ্যায়

শিষ্য। অনুশীলনকে ধর্ম বলা যাইতে পারে, ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। অনুশীলনের ফল সুখ, ধর্মের ফলও কি সুখ ?

গুরু। না তো কি ধর্মের ফল দুঃখ? যদি তা হইত, তাহা হইলে আমি জগতের সমস্ত লোককে ধর্ম পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতাম।

শিষ্য। ধর্মের ফল পরকালে সুখ হইতে পারে, কিন্তু ইহকালেও কি তাই ?

গুরু। তবে বুঝাইলাম কি! ধর্মের ফল ইহকালে সুখ ও যদি পরকাল থাকে, তবে পরকালেও সুখ। ধর্ম সুখের একমাত্র উপায়। ইহকালে কি পরকালে অন্য উপায় নাই।

—অনুশীলন, তৃতীয় অধ্যায়

৮. দ্রষ্টব্য পূর্বোল্লিখিত 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের তিন জগৎ' : 'শান্তিনিকেতন'

পরিচয় পাইল কেবল তাহাই নয়, তিনিও পাশ্চাত্যের যে পরিচয়টি পাইলেন আগে তাহা পান নাই। এই পরিচয়ের ফলটি তাঁহার মনের ও কবিপ্রতিভার উপরে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিল। এই পরিচয়ের মুখ্য ফল দুইটি; গত বিশ বৎসরের চেষ্টায় ও সাধনায় মানুষ প্রকৃতি ও ব্রহ্মের মধ্যে যে একটি সমন্বয়ের ধারা কবির মনে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা শিথিল হইয়া গেল; আর এই শিথিলতার প্রতিক্রিয়ায় তাঁহার কল্পনা নূতন সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা দেখা দিল।

উনবিংশ শতকের মন, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে একটি ধ্রুব সিদ্ধান্তে আসিয়াছিল, তাহাতে কোথাও সামান্য নড়চড় হইবার উপায় ছিল না। ইংলণ্ডের ইতিহাস ভিক্টোরীয় সাহিত্য ও ভিক্টোরীয় সমাজ এই ধ্রুবত্বের বাসুকি-শীর্ষে বিধৃত হইয়া পরম নিশ্চিন্ত ছিল। এমন সময়ে ডারবিন ক্রমবিকাশতত্ত্বের বজ্রাঘাত করিলেন। হঠাৎ একদিন প্রভাতে মধ্য-ভিক্টোরীয় শিক্ষিতসমাজ আবিষ্কার করিল যে সমস্তই কেমন নড়বড় করিতেছে। কিন্তু এ আঘাতটাও যে নিদারুণ হয় নাই, তাহার কারণ ভিক্টোরীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যের বনিয়াদ তখনো অটল ছিল। বুয়র সংগ্রামে সেই বনিয়াদে ফাটল দেখা দিল। তার পরে ঘটনার দশকুশি পদক্ষেপ ক্রমেই দ্রুততর হইয়া উঠিল, জাপানের নিকটে রাশিয়ার পরাজয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইত্যাদি। ভিক্টোরীয় যুগের পুত্রপৌত্রগণ সত্রাসে আবিষ্কার করিল বাসুকির শীর্ষ নয়, ঘটনার দোলায়মান শীর্ষ হইতে শীর্ষান্তরে নিক্ষিপ্ত পৃথিবী নিরন্তর সদ্যঃপাতিতার মুখে। আমাদের দেশও ধ্রুবত্ব হইতে অধ্রুবত্বে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে তবে তাহার প্রকৃতি ও ক্রম ভিন্ন। ডারবিনের তত্ত্বে আমাদের মন বিচলিত হয় নাই, কেননা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমরা স্বাধীন। তাহা ছাড়া জন্মান্তরে বিশ্বাসের ফলে একপ্রকার ক্রমবিকাশবাদ আমরা স্বীকার করিয়া লইতে অভ্যস্ত। আমাদের আঘাত আসিল অন্য দিক হইতে, যে দিক সম্বন্ধে আমরা সব চেয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম। কোম্পানির শাসন, ইংরাজি শিক্ষা ও সরকারী চাকুরি এই তিনকোণা পৃথিবী ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির। আমরা ধরিয়া লইয়াছিলাম 'লেখাপড়া করে যেই গাড়িঘোড়া চড়ে সেই', আর এই কার্যকারণের মধ্যে যোগসূত্র জানিতাম 'যেমন-তেমন চাকরি ঘি-ভাত', আরও জানিতাম যে কোম্পানির চাকরি একবার হইলে যায় না আর মাসের পয়লা তারিখে নগদ তনখায় বেতন মেলে। ইহার চেয়ে আর অধিক ধ্রুব কি হইতে পারে। বড়ই নিশ্চিন্ত ছিলাম। তার পরে যখন মনে পড়ে যে সিপাহি বিদ্রোহের পর হইতে হিন্দু ছিল কোম্পানির সুয়োরানী তখন সুখের ষোলো কলা পূর্ণ হইয়াছে দেখিতে পাই। কিন্তু জগতে এমন কোন্ চন্দ্র আছে যাহা হ্রাস-বৃদ্ধির নিয়মের অতীত। কালক্রমে সুয়োরানীর পুত্রদের নখদন্ত বাহির হইল। বিস্মিত ও ভীত ইংরাজ সরকার মুসলমান-প্রশ্রয়ের নীতি গ্রহণ করিল। ভাঙা বাংলা জোড়া লাগিল বটে কিন্তু ভাঙা কপাল আর জোড়া লাগিল না। ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে অপসৃত হইল, সেই সঙ্গে অবসিত হইল বাঙালির সুখের দিন। এ ১৯১২ সালের কথা। ১৯১২ সাল কবির বিলাত যাত্রার সময়

আগেই বলিয়াছি। ঘরের মধ্যে যে ফাটল দেখা দিল তাহার অনেক চিহ্ন সমকালীন রবীন্দ্র-সাহিত্যে আছে, কিন্তু এবারে দীর্ঘকাল বহির্জগতে ভ্রমণ করিয়া যন্ত্রজীবী সভ্যতার যে বাস্তব নিষ্ঠুর ও আত্মঘাতী মূর্তি দেখিতে পাইলেন, তাহার প্রভাবে ও প্রতিক্রিয়ায় এক দিকে যেমন বান ডাকিল কবির সাহিত্যপ্রেরণায়, তেমনি সে সাহিত্যে দেখা দিল নূতন অর্থ নূতন দৃষ্টি নূতন দিগন্ত।

কবির ত্রিশ বৎসর বয়সে সাহিত্যপ্রেরণায় একটা প্রকাণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়াছিল, যখন শিলাইদহে আসিয়া মানবজীবনের সহিত তাঁহার প্রথম সংঘাত ঘটিল। এবারে বৃহত্তর মানবজীবনের সংঘাতে আর-একটা বিস্ফোরণ ঘটিল তাঁহার সাহিত্যপ্রেরণায় যাহার বাস্তব ফলের মূল্য অপরিসীম। পাদটীকায় প্রদত্ত তালিকা হইতে বিষয়টির গুরুত্ব সহজেই অনুমিত হইবে।[৯] কবিজীবনের তৃতীয় দশকে লিখিত সাহিত্য ধ্রুববিশ্বাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত জীবনের রচনা। আর কবিজীবনের পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে লিখিত সাহিত্য, সত্যকথা বলিতে কি পঞ্চাশের পর হইতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ অবধি লিখিত সাহিত্য, আংশিক নাড়া-খাওয়া বিশ্বাসের সৃষ্টি। ভিতরে ভিতরে অপ্রত্যাশিত নাড়া খাইয়া কবি আবিষ্কার করেন যে শিলাইদহের সরল পল্লীর মানুষগুলিই মানুষের একমাত্র রূপ নয়, এমন মানুষও আছে যন্ত্রের কৃপায় যাহার গায়ে বর্ম ও নখরে তীক্ষ্ণতা দেখা দিয়াছে; আবিষ্কার করেন যে ব্যক্তিজীবনের মধ্যে ভগবানের যে লীলার অবাধ আসর সমষ্টিজীবনের মধ্যে আর তাহার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না; আর বিশ্বপ্রকৃতি! তাহার নখদন্ত হইতে রক্ত ঝরিয়া না পড়িলেও তাহার ছলনাও বড় সহজ নয়। সরল বিশ্বাসের সম্মুখে সে মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পাতিয়া রাখে। মোটের উপরে এই তাঁহার নাড়া-খাওয়া মনের চেহারা, আর কবিজীবনের শেষ ত্রিশ বৎসরের রচনা এই নাড়া-খাওয়া মনের সৃষ্টি। এবারে নাড়া খাইবার বিবরণ ও ইতিহাসটি সবিশেষ দেখা যাক।

"আমরা আছি সভ্যতার সেই যুগে, যেটার নাম দেওয়া যেতে পারে সরকারি

৯. কাব্য ॥ বলাকা, ১৯১৬; পলাতকা, ১৯১৮; শিশু ভোলানাথ ১৯২২; পূরবী, ১৯২৫
নাটক ॥ ফাল্গুনী, ১৯১৬; মুক্তধারা, ১৯২২; নটীর পূজা, ১৯২৬; রক্তকরবী, ১৯২৬
গল্প ও উপন্যাস ॥ গল্পসপ্তক, ১৯১৬; পয়লা নম্বর, ১৯২০; ঘরে বাইরে, ১৯১৬; চতুরঙ্গ, ১৯১৬; লিপিকা, ১৯২২
প্রবন্ধাদি ॥ জাপান-যাত্রী, ১৯১৯; কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, ১৯১৭

এখানে প্রকাশের সাল প্রদত্ত হইল কিন্তু রচনার কাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অল্পবিস্তর আগে। যেমন বলাকা ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হইলেও তাহার প্রথমতম রচনাগুলি ১৯১৪ সালে লিখিত। ঐ সালটাই কবি-মনে দিক পরিবর্তনের সুনিশ্চিত সময়, যদিচ ছোটোখাটো লক্ষণ আরও দু-এক বছর আগেও দেখিতে পাওয়া যায়।

যুগ। রেলগাড়ি বল, স্টিমার বল, হোটেল বল আর পাগলা গারদ বল, সমস্তই পিণ্ড-পাকানো প্রকাণ্ড ব্যাপার। এখনকার সভ্যতা বলেছে বহুকে দলন করে যে পিণ্ড হয়, সেই পিণ্ডই আমার বরাদ্দ অন্ন। প্রত্যেকের পুরা ব্যবস্থা করবার উপযুক্ত স্থান এবং সামর্থ্য আমার নেই। এইরকম সরকারি ব্যবস্থা ও নিষ্ঠুরতা কী সাম্রাজ্যে কী সমাজে প্রতিদিন স্তূপাকার হয়ে উঠছে।"[১০]

এই নিষ্ঠুরতার বীভৎসতর রূপ একই রচনার আর-একটু পরেই আছে।—

"আমাদের যাত্রার আরম্ভে জাহাজ অল্প কিছু মন্থরগমনে চলছে বলে যাত্রীরা দুঃখবোধ করছিল। মন্থরতার কারণ শোনা গেল এই যে, এঞ্জিনের জঠরানলে কয়লা জোগান দেবার ভার যাদের সেই হতভাগ্য 'স্টোকার' দল নূতন ব্রতী, তারা পুরাদমে কাজ করতে পেরে উঠছে না। শোনা গেছে বোম্বাইয়ে বিশেষ এক তারিখে ঘাটের খালাসিদের ধর্মঘট করবার কথা ছিল। সেই তারিখের আগে কোনোক্রমে জাহাজ ঘাটে পৌঁছিয়ে দেবার জন্যে অতিরিক্ত মজুরির প্রলোভন দিয়ে স্টোকারদের অতিরিক্ত কাজ করানো হয়েছিল। একজন স্টোকার হাতার কয়লা নিয়ে দারুণ শ্রান্তি এবং অসহ্য উত্তাপে এঞ্জিনের সামনে পড়ে মারা গেল।"

সভ্যতার পিণ্ডগ্রাস বা হতভাগ্য স্টোকারের মৃত্যু যন্ত্রযুগের অপরিহার্য অঙ্গ কিন্তু কবির পক্ষে এসব যেন নূতন আবিষ্কার, মনটা অতর্কিতে নাড়া খায়। হয়তো এইরকম দু-চারিটা বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্তে মন দু-একবার নড়িয়া উঠিয়া তাল সামলাইয়া লইত, এমন সময়ে আসিল কালবৈশাখীর ঝড়ের মতো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, তার পর হইতে অভাবিতের ধাক্কা বাড়িয়াই চলিল, ফলে নড়িয়া-ওঠা মন আর পূর্বতন ভারসাম্য ফিরিয়া পাইল না।

"আজ এই যে যুদ্ধের আগুন জ্বলেছে, এর ভিতরে সমস্ত মানুষের প্রার্থনাই কেঁদে উঠেছে— বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব— বিশ্বপাপ মার্জনা করো। আজ যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে সে যেন ব্যর্থ না হয়। রক্তের বন্যায় যেন পুঞ্জীভূত পাপ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যখনই পৃথিবীর পাপ স্তূপাকার হয়ে উঠে, তখনই তো তার মার্জনার দিন আসে। আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে দহনযজ্ঞ হচ্ছে, তার রুদ্র আলোকে এই প্রার্থনা সত্য হোক— বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। আজ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এই প্রার্থনা সত্য হয়ে উঠুক।

"আমরা প্রতিদিন সংবাদপত্রে টেলিগ্রাফে যে একটু-আধটু খবর পাই, তার পশ্চাতে কি অসহ্য সব দুঃখ রয়েছে আমরা কি তা চিন্তা করে দেখি। যে হানাহানি হচ্ছে তার সমস্ত বেদনা কোন্‌খানে গিয়ে লাগছে! ভেবে দেখো কত পিতামাতা তাদের একমাত্র ধনকে হারাচ্ছে, কত ভাই ভাইকে হারাচ্ছে। এইজন্যই তো পাপের আঘাত এত নিষ্ঠুর। কারণ যেখানে বেদনাবোধ সব চেয়ে বেশি, যেখানে প্রীতি সব চেয়ে

১০. বিচিত্র, পথের সঞ্চয়, প্রথম সংস্করণ। ১৯১২-১৩ সালের মধ্যে লিখিত।

গভীর, পাপের আঘাত সেইখানেই যে গিয়ে বাজে। যার হৃদয় কঠিন সে তো বেদনা অনুভব করে না। কারণ সে যদি বেদনা পেত, তবে পাপ এমন নিদারুণ হতেই পারত না। যার হৃদয় কোমল, যার প্রেম গভীর, তাকেই সমস্ত বেদনা বইতে হবে। এইজন্যেই যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের রক্তপাত কঠিন নয়, রাজনৈতিকদের দুশ্চিন্তা কঠিন নয়, কিন্তু ঘরের কোণে যে রমণী অশ্রুবিসর্জন করছে তারই আঘাত সব চেয়ে কঠিন।

সেইজন্যে মন এক-একসময় এই কথা জিজ্ঞাসা করে— যেখানে পাপ সেখানে কোন শাস্তি হয় না। সমস্ত বিশ্বে কেন পাপের বেদনা কম্পিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এই কথা জেনো যে, মানুষের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই, সমস্ত মানুষ যে এক। সেইজন্য পিতার পাপ পুত্রকে বহন করতে হয়, বন্ধুর পাপের জন্য বন্ধুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, প্রবলের উৎপীড়ন দুর্বলকে সহ্য করতে হয়। মানুষের সমাজে একজনের পাপের ফলভোগ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয়; কারণ, অতীতে ভবিষ্যতে দূরে দূরান্তে হৃদয়ে হৃদয়ে মানুষ যে পরস্পরে গাঁথা হয়ে আছে।"[১১]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন সবে আরম্ভ হইয়াছে। তাহারই প্রতিক্রিয়া উপরিউক্ত রচনা। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় মানুষের সমষ্টি-চিন্তা। "মানুষের সমাজে একজনের পাপের ফলভোগ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয়, কারণ অতীতে ভবিষ্যতে দূরে দূরান্তে হৃদয়ে হৃদয়ে মানুষ যে পরস্পরে গাঁথা হয়ে আছে।" এ এক নূতন উপলব্ধি কবিজীবনে। নীতি হিসাবে ব্যাপারটা তিনি যে না জানিতেন তাহা নয়, কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হিসাবে চোখের উপরে দেখিয়া প্রত্যয় সত্য হইয়া উঠিল। বলাকার অনেকগুলি কবিতা এই প্রত্যয়ের সৃষ্টি।[১২]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-সংবাদের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল তাঁহার মনে, কিন্তু ঐ সংবাদ আসিয়া পৌঁছিবার আগেই তাঁহার মনে যে পূর্বগামিনী ছায়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এবারে তাহার বিবরণ শোনা যাক।[১৩]

"১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস। হিমালয় রামগড়ে আছি; মীরা ও বৌমা আছেন সঙ্গে। আমার মনের মধ্যে একটা দারুণ বেদনা। সে সব কথা তাঁরা জানবেন কেমন করে? তার কিছু খবর জানতেন এণ্ড্রুজ সাহেব। তিনি যখন রামগড়ে আমার কাছে এসে আমার অন্তরের কথা জিজ্ঞাসা করলেন তখন আমি আমার বেদনা তাঁকে জানালাম। খবর পাই নি, প্রমাণ পাই নি, তবু মনে হচ্ছিল সারা জগৎ জুড়ে যেন একটা প্রলয়কাণ্ড আসছে। বিশ্বব্যাপী একটা ভাঙাচোরা প্রলয়কাণ্ডের উদ্যোগপর্ব চলেছে।

১১. "পাপের মার্জনা", শান্তিনিকেতন, ১৯১৪, ১৩২১ ভাদ্র

১২. "সর্বনেশে", "আহ্বান", "শঙ্খ", "পাড়ি"; ১১, ১৬, ৩৭, ৪৫ সংখ্যক

১৩. ক্ষিতিমোহন সেন, বলাকা-কাব্যপরিক্রমা, প্রথম সংস্করণ

৫ই জ্যৈষ্ঠ হতে ১২ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে আমার দুই, তিন, চার নম্বর কবিতা একে একে এলো। বলাকার মতোই একে একে এরা আমার মানসলোক হতে বেদনাহত হয়ে কোন্ নিরুদ্দেশে যাত্রা করেছে। এদের মধ্যেও ভিতরে ভিতরে বলাকার মতোই একটি পংক্তিগত যোগ রয়েছে। তাই এই কবিতাগুলির বলাকা নাম সার্থক হয়েছে।

"তখনও য়ুরোপের মহাযুদ্ধের খবর এ দেশে আসে নি— আমার চার নম্বর কবিতা লেখবার পর যুদ্ধের খবর পেলাম। তবু কি এক অব্যক্ত কারণে আমার মনের সেই বেদনা এই কবিতাগুলিতে বেরিয়ে এসেছে।

"য়ুরোপের দারুণ যুদ্ধের খবর এলো। দারুণ প্রলয়ের সূচনা হল। যুদ্ধের শঙ্খ বাজল। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সর্বজাতিকে সর্বনাশা মহামরণের যজ্ঞে যোগ দিতেই হল। মহাভারতের সেই মহাযুদ্ধের পর তবু তো শান্তি ও স্বর্গারোহণ-পর্ব এসেছিল, কিন্তু এই যুদ্ধে আর তা হবার নয়। বিশ্বব্যাপী সংঘর্ষ মহাপ্রলয় আসছে, এখন কোথায় শান্তি, কোথায় স্বর্গ?

"তাঁর শঙ্খ রইল পড়ে। একদিন ইংলণ্ডে শেলি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি মনীষীর দল যে বিশ্বব্যাপী সাধনার কথা বলেছিলেন তা আজ কিপলিং প্রভৃতির সংকীর্ণ বাণীতে চাপা পড়ে গেছে। ভৌগোলিক ও জাতীয়তার দেবতার কাছে বহু নরবলি চাই। বড় আদর্শ যাঁদের, তাঁদের দুঃখ অপমান ও নির্যাতনেরশেষ নেই। কিন্তু তাঁরাই তো ভবিষ্যৎ যুগ তৈরি করছেন। সেই-সব ভবিষ্যৎ যুগের স্রষ্টার দল এখন যেন চাকভাঙা মৌমাছির দলের মতো নিরাশ্রয় ও পদে পদে অপমানিত। এই যুদ্ধের যোদ্ধাদের চেয়েও এঁরা অনেক বেশি আহত ও ব্যথিত। এঁরা বিধাতার সেই শঙ্খধ্বনি শুনেছেন, মানব-সংস্কৃতির নূতন চাক এঁরা বাঁধতে যাচ্ছেন। এই-সব সাধক নানা দেশেই ছড়িয়ে রয়েছেন। রোমাঁ রোলাঁ, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতি মনীষীরা এই দলের লোক। যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে এঁরা অপমানিত তিরস্কৃত অবরুদ্ধ। এঁদের পিছনে আরও কত অজ্ঞাত অখ্যাত লোক রয়েছেন যাঁরা আজ ভবঘুরের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তবু তাঁরা বলছেন— 'ঐ যে প্রভাত আসছে, ঐ তো অরুণোদয় হয়ে এল।' পাখির মতো এঁরা কি জানি কেমন করে আগে হতে নবযুগের প্রভাতের খবর পেয়েছেন। ভোর না হতে ভোরের খবর তাঁদের কাছে এসেছে।

"জগতে যুগে যুগে হঠাৎ অজ্ঞাত কারণে বিধাতার এই উদ্বোধন আসে। [সিলভ্যাঁ] লেভি সাহেব বলেন খ্রীস্টের হাজারখানেক কি হাজার দেড়েক বছর পূর্বে আর্যজাতির মধ্যে এই উদ্বোধন একবার এসেছিল। মিশর দেশেও এক সময়ে এই উদ্বোধন দেখা গিয়েছে। এই দুঃখের দিনেও যদি সেই উদ্বোধন আজ এসে থাকে তবে তাকে প্রণাম করে বলতে হবে—

প্রণমহ কলিযুগ সর্বযুগসার।

"মানবের এমন মহাযুগ এমন মহাক্ষণ আর আসে নি।

"মন্থনে দুধ থেকে মাখন বেরিয়ে আলাদা হয়ে উঠে আসে। আজও দুঃখের মন্থনে প্রাচীনতা হতে নবীনের সাধনা উঠে আসবে। সেই নবীনও যদি প্রাচীনের বন্ধনে জীর্ণতার মোহপাশে বদ্ধ হয়ে থাকে তবে জগতে কারা আনবে মুক্তি ?

"এই জগৎজোড়া সাগরমন্থনের মধ্যে শুধু বিষ দেখলেই চলবে না। এতে অমৃতও উঠেছে। কিন্তু অযোগ্য রাহু-কেতুরা সেই অমৃত দাবি করছে। এখনও প্রাচীন জীর্ণ লুব্ধের দল এই সুধারই ভাগ চায়। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ য়ুরোপের লীগ অব নেশনস। য়ুরোপের সে-সব ঝানু বৃদ্ধ রাজনীতিওয়ালার দল পাকেপ্রকারে যুদ্ধটি বাধিয়ে দিলেন, তাঁরাই বেলজিয়ামের উপর অত্যাচারের কথা জোরগলায় ঘোষণা করে নবীনদের ডাক দিলেন যুদ্ধে নামবার জন্য। এদিকে এঁরা লুকিয়ে লুকিয়ে অবাধে poison gas, বোমা ইত্যাদি তৈরি করেছেন ও নির্বিচারে তা চালাচ্ছেন, আবার মুখে ধর্মের দোহাই দিতেও এঁরা ছাড়ছেন না। কিন্তু এখন আর এই-সব কূটনীতি দিয়ে এঁরা থই পাচ্ছেন না।

"এই-সব দারুণ নীচতা ও ভণ্ডামি কত কাল চলবে ? এর মধ্যে শিব কি আর আসবেনই না ? দেব দৈত্য দুইয়ে মিলেই বিশ্বব্যাপী মন্থন কি চিরদিনই চলবে ?

"তা হতে পারে না। ভালো মন্দ নানা ফলই ক্রমে ক্রমে দেখা দেবে। মন্থন হয়ে গেলে দেখা যাবে সাগরের অন্তরে লুকোনো সুধা ও বিষ দুই-ই উঠে এসেছে, মণিমাণিক্যের ঐশ্বর্য ও ভস্ম-করা প্রলয়ের আগুন দুই-ই দেখা দিয়েছে। য়ুরোপের ঝানু রাজনীতিওয়ালারা চান, সুবিধামতো জিনিসগুলি বিশেষ বিশেষ দেশের জন্য তুলে রেখে যুদ্ধের নামে যত দুর্গতি তা সারা জগতে যত নিঃসহায় নিরুপায়দের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। কিন্তু উদার বিশ্বব্যাপী বিধাতার বিধানে এই ছলচাতুরী কতকাল চলবে ? ঝুনো ঝুনো রাজনীতিওয়ালার দল সাম্রাজ্যবাদীর দল চান যে এই মন্থনে বাসুকির লেজের দিকটা সুবিধামতো তাঁরা ধরে থাকবেন আর যত সুবিধার অমৃতটুকু আদায় করে নেবেন। আর হতভাগাদের দিতে চান বাসুকির মুখের দিকটা, যেন তারা মন্থনের বিষেই পুড়ে মরে যায়, অমৃতের ভাগ তারা যেন আর না পায়। যুদ্ধে মরবে হতভাগার দল, কিন্তু তার ঐশ্বর্য পাবে ঐ সব ঝুনোদের দল ! ধর্মের যা অধিকার, পাপ এসে চায় তা কেড়ে নিতে। সেবার দৈত্যদের দেবতারা ঠকিয়েছিলেন, এবারে যেন দৈত্যরাই সকলকে ঠকাতে এসেছেন !

"১৯১৮ সালে এই মহাযুদ্ধ শেষ হল, কিন্তু দুঃখের দুর্গতির তো শেষ হল না। দেশে দেশে দুর্গত নিপীড়িতদের দারুণ বেদনা রাজনীতিওয়ালা ঝুনোদের বহু চেষ্টাতেও চাপা দিয়ে রাখা যাচ্ছিল না। সেই বেদনা ক্রমাগত আমার মনকে নাড়া দিচ্ছিল।

"হঠাৎ বিশেষ কোনো-একদিনের কোনো-এক উত্তেজনার বশে আমার বলাকা লেখা নয়। তা হলে এর মূল্য হয়তো অনেক কম হত। বলাকার ব্যাকুল কবিতাগুলি এক বৈশাখে (১৫ বৈশাখ ১৩২১) আরম্ভ হল, মাঝে এক বৈশাখ গেল, তার

বৈশাখে তা শেষ হল। অর্থাৎ দুটি বছর লাগল তা শেষ হতে। এক হিসাবে বলাকার আরম্ভে ও শেষে মিল আছে। এর আরম্ভ ও অবসান দুইই বৈশাখের নবারম্ভের জ্বলন্ত গতিতে। গানের যেখানে আরম্ভ সেইখানে এসে তার অবসান, এই ধ্রুবযোগ রয়েছে বলেই ধুয়ার ধ্রুবত্ব। দেবপরিক্রমা করতে হলেও যেখানে আরম্ভ সেইখানে এসে প্রদক্ষিণ শেষ করতে হয়। বলাকায় যেন একটি প্রদক্ষিণ পুরো সমাপ্ত হয়েছে। অগ্নিময় আরম্ভের সমাপ্তিও অগ্নিতে।"

বলাকা-রচনাকালীন মনোভাব কবিকর্তৃক ১৯২১ সালে বিবৃত হইলেও ইহাকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন অভিজ্ঞতা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এই অভিজ্ঞতার টুকরা রূপ তাঁহার রচনায় অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যাইবে কিন্তু এমন উজ্জ্বল আয়ত রূপ আর কোথাও নাই বলিয়া এখানে সবিস্তারে উদ্ধৃত হইল। এই মনোভাবটি বলাকা কাব্যের ৩৭ সংখ্যক কবিতায় সুব্যক্ত হইয়াছে—

ওরে ভাই কার নিন্দা কর তুমি। মাথা করো নত
এ আমার এ তোমার পাপ।

কাজেই পাপের প্রায়শ্চিত্তও সকলকে মিলিয়া করিতে হইবে।

মনুষ্যত্বের আদর্শ সম্বন্ধে ঊনবিংশ শতকের মন যে উচ্চ ধারণাকে পোষণ করিতেছিল, ধ্রুব বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথেরও সেই মন, সেই মহত্ত্ব ও ধ্রুবত্ব এবারে ভাঙিয়া পড়িবার মুখে। ইহার পরে ১৯১৬ সালে কবি জাপানে যাত্রা করিলেন। পৃথিবীর বাণিজ্যের ঘাটে ঘাটে বাণিজ্যিক সভ্যতার যে বিকট ও বীভৎস রূপ তাঁহার চোখে পড়িতে লাগিল তাহাতে এহেন সভ্যতার স্রষ্টা মানুষের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কি রকম পীড়িত হইতে লাগিল, নিম্নে সংগৃহীত অংশগুলি হইতে সহজে ও সাকুল্যে বুঝিতে পারা যাইবে।

এক সময়ে কবি হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্মের সমর্থন করিয়াছিলেন, এখন জাহাজের কামরার মধ্যে সেই বর্ণাশ্রমধর্মাশ্রয়ী হিন্দুর দুরবস্থা দেখিয়া কবি বুঝিতে পারিলেন মানবসমাজের আমদরবারে হিন্দু কি অসহায় কি কৃপার পাত্র।

"এরা অনেকেই হিন্দু, সুতরাং এদের পথের কষ্ট ঘোচানো কারো সাধ্য নয়। কোনোমতে আখ চিবিয়ে চিঁড়ে খেয়ে এদের দিন যাচ্চে। একটা জিনিস ভারি চোখে লাগে, সে হচ্ছে এই যে, এরা মোটের উপর পরিষ্কার— কিন্তু সেটা কেবল বিধানের গণ্ডির মধ্যে— বিধানের বাইরে এদের নোংরা হবার কোনো বাধা নেই। আখ চিবিয়ে তার ছিবড়ে অতিসহজেই সমুদ্রে ফেলে দেওয়া যায়, কিন্তু সেটুকু কষ্ট নেওয়া এদের বিধানে নেই— যেখানে বসে খাচ্ছে তার নেহাৎ কাছে ছিবড়ে ফেলছে। এমনি করে চারিদিকে কত আবর্জনা যে জমে উঠছে তাতে এদের ভ্রূক্ষেপ নেই ; সব চেয়ে আমাকে পীড়া দেয় যখন দেখি থুথু ফেলা সম্বন্ধে এরা বিচার করে না। অথচ, বিধান অনুসারে শুচিতা রক্ষা করবার বেলায় নিতান্ত সামান্য বিষয়েও এরা অসামান্য রকম

কষ্ট স্বীকার করে। আচারকে শক্ত করে তুললে বিচারকে ঢিলে করতেই হয়। বাইরে থেকে মানুষকে বাঁধলে মানুষ আপনাকে আপনি বাঁধবার শক্তি হারায়।...

"...আদবকায়দা হচ্ছে সমস্ত মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের সাধারণ নিয়ম। মনুতে পাওয়া যায়, মা মাসি মামা পিসের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করতে হবে, গুরুজনের গুরুত্বের মাত্রা কার কতটুকু, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের মধ্যে পরস্পরের ব্যবহার কী রকম হবে; কিন্তু সাধারণভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কী রকম হওয়া উচিত তার বিধান নেই...।"[১৪]

এবারে উদ্ধৃত অংশগুলির বিস্তার কিছু বেশি। ইচ্ছা করিলেই বিস্তার কমানো যাইতে পারিত, কিন্তু তাহাতে কবির কলমে কবির মনোভাব জানিবার অসুবিধা ঘটিত। বাণিজ্যশায়ী সভ্যতার ধারক বাহক মানুষের উপরে ঊনবিংশ শতকের মনের অবস্থা সহজে বিচলিত হইতে চাহে না কিন্তু অবিচলিত থাকাও কঠিন, প্রমাণগুলা সবই প্রতিকূল। কবির বক্তব্য এই যে বাণিজ্য বিস্তারে সংসার যে কেবল বীভৎস হইয়া উঠিতেছে তাহাই নয়, এই বীভৎসা মানুষের অন্তর্লোকের প্রতিবিম্ব।

"আসল কথা, পৃথিবীতে যে-সব শহর সত্য তা মানুষের মমতার দ্বারা তৈরি হয়ে উঠেছে। দিল্লী বল, আগ্রা বল, কাশী বল, মানুষের আনন্দ তাকে সৃষ্টি করে তুলেছে। কিন্তু বাণিজ্যলক্ষ্মী নির্মম, তার পায়ের নীচে মানুষের মানস-সরোবরের সৌন্দর্য-শতদল ফোটে না। মানুষের দিকে সে তাকায় না, সে কেবল দ্রব্যকে চায়; যন্ত্র তার বাহন। গঙ্গা দিয়ে যখন আমাদের জাহাজ আসছিল, তখন বাণিজ্যশ্রীর নির্লজ্জ নির্দয়তা নদীর দুই ধারে দেখতে দেখতে এসেছি। ওর মনে প্রীতি নেই বলেই বাংলাদেশের এমন সুন্দর গঙ্গার ধারকে এত অনায়াসে নষ্ট করতে পেরেছে।

"আমি মনে করি, আমার পরম সৌভাগ্য এই যে, কদর্যতার লৌহবন্যা যখন কলকাতার কাছাকাছি দুই তীরকে, মেটেবুরুজ থেকে হুগলি পর্যন্ত, গ্রাস করবার জন্য ছুটে আসছিল আমি তার আগেই জন্মেছি। তখনো গঙ্গার ঘাটগুলি গ্রামের স্নিগ্ধ বাহুর মতো গঙ্গাকে বুকের কাছে আপন করে ধরে রেখেছিল, কুঠির নৌকাগুলি তখনো সন্ধ্যাবেলায় তীরে তীরে ঘাটে ঘাটে ঘরের লোকগুলিকে ঘরে ঘরে ফিরিয়ে আনত। এক দিকে দেশের হৃদয়ের ধারা, আর-এক দিকে দেশের এই নদীর ধারা, এর মাঝখানে কোনো কঠিন কুৎসিত বিচ্ছেদ এসে দাঁড়ায় নি।

"তখনো কলকাতার আশেপাশে বাংলাদেশের যথার্থ রূপটিকে দুই চোখ ভরে দেখবার কোনো বাধা ছিল না। সেইজন্যেই কলকাতা আধুনিক শহর হলেও কোকিলশিশুর মতো তার পালনকর্ত্রীর নীড়কে একেবারে রিক্ত ক'রে অধিকার করে নি। কিন্তু তার পরে বাণিজ্যসভ্যতা যতই প্রবল হয়ে উঠতে লাগল ততই

১৪. জাপান-যাত্রী

দেশের রূপ আচ্ছন্ন হতে চলল। এখন কলকাতা বাংলাদেশকে আপনার চারি দিক থেকে নির্বাসিত করে দিচ্ছে; দেশ ও কালের লড়াইয়ে দেশের শ্যামল শোভা পরাভূত হল, কালের করাল মূর্তিই লোহার দাঁত নখ মেলে কালো নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগল।

"এক সময়ে মানুষ বলেছিল—'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।' তখন মানুষ লক্ষ্মীর যে পরিচয় পেয়েছিল সে তো কেবল ঐশ্বর্যে নয়, তাঁর সৌন্দর্যে। তার কারণ, বাণিজ্যের সঙ্গে তখন মনুষ্যত্বের বিচ্ছেদ ঘটে নি। তাঁতের সঙ্গে তাঁতির, কামারের হাতুড়ির সঙ্গে কামারের হাতের, কারিগরের সঙ্গে তার কারুকার্যের মনের মিল ছিল। এইজন্যে বাণিজ্যের ভিতর দিয়ে মানুষের হৃদয় আপনার ঐশ্বর্যে বিচিত্র করে সুন্দর করে ব্যক্ত করত। নইলে লক্ষ্মী তাঁর পদ্মাসন পেতেন কোথা থেকে। যখন থেকে কল হল বাণিজ্যের বাহন, তখন থেকে বাণিজ্য হল শ্রীহীন। প্রাচীন ভেনিসের সঙ্গে আধুনিক ম্যাঞ্চেস্টরের তুলনা করলেই তফাতটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে। ভেনিসে সৌন্দর্যে এবং ঐশ্বর্যে মানুষ আপনারই পরিচয় দিয়েছে, ম্যাঞ্চেস্টরে মানুষ সব দিক থেকে আপনাকে খর্ব করে আপনার কলের পরিচয় দিয়েছে। এইজন্য কলবাহন বাণিজ্য যেখানে গেছে, সেখানেই আপনার কালিমায় কদর্যতায় নির্মমতায় একটি লোলুপতার মহামারী সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তীর্ণ করে দিচ্ছে। তাই নিয়ে কাটাকাটি-হানাহানির আর অন্ত নেই। তাই নিয়ে অসত্যে লোকালয় কলঙ্কিত এবং রক্তপাতে লোকালয় পঙ্কিল হয়ে উঠল। অন্নপূর্ণা আজ হয়েছেন কালী; তাঁর অন্ন পরিবেশণের হাতা আজ হয়েছে রক্তপান করবার খর্পর। তাঁর স্মিতহাস্য আজ অট্টহাস্যে ভীষণ হল। যাই হোক, আমার বলবার কথা এই যে, বাণিজ্য মানুষকে প্রকাশ করে না, প্রচ্ছন্ন করে।..."

"...সেই খিদিরপুরের ঘাট থেকে আরম্ভ করে আর এই হংকং-এর ঘাট পর্যন্ত, বন্দরে বন্দরে বাণিজ্যের চেহারা দেখে আসছি। সে যে কি প্রকাণ্ড, এমন করে তাকে চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। শুধু প্রকাণ্ড নয়, সে একটা জবড়জঙ ব্যাপার। কবিকঙ্কণচণ্ডীতে ব্যাধের আহারের যে বর্ণনা আছে—সে এক-এক গ্রাসে এক-এক তাল গিলছে, তার ভোজন উৎকট, তার শব্দ উৎকট, এও সেই রকম; এই বাণিজ্যব্যাধটাও হাঁসফাঁস করতে করতে এক-এক পিণ্ড মুখে যা পুরছে, সে দেখে ভয় হয়। তার বিরাম নেই, আর তার শব্দই বা কী! লোহার হাত দিয়ে মুখে তুলছে, লোহার দাঁত দিয়ে চিবচ্ছে, লোহার পাকযন্ত্রে চিরপ্রদীপ্ত জঠরানলে হজম করছে, এবং লোহার শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়ে তার জগৎজোড়া কলেবরের সর্বত্র সোনার রক্তস্রোত চালান করে দিচ্ছে।

"একে দেখে মনে হয় যে, এ একটা জন্তু, এ যেন পৃথিবীর প্রথম যুগের দানবজন্তুগুলোর মতো। কেবলমাত্র তার ল্যাজের আয়তন দেখলেই শরীর আঁতকে ওঠে। তার পরে, সে জলচর হবে, কি স্থলচর হবে, কি পাখি হবে, এখনো তা স্পষ্ট ঠিক হয় নি; সে খানিকটা সরীসৃপের মতো, খানিকটা বাদুড়ের মতো, খানিকটা গণ্ডারের মতো। অঙ্গসৌষ্ঠব বলতে যা বোঝায়, তা তার কোথাও কিছুমাত্র নেই। তার গায়ের চামড়া

ভয়ংকর স্থূল ; তার থাবা যেখানে পড়ে, সেখানে পৃথিবীর গায়ের কোমল সবুজ চামড়া উঠে গিয়ে একেবারে তার হাড় বেরিয়ে পড়ে ; চলবার সময় তার বৃহৎ বিরূপ ল্যাজটা যখন নড়তে থাকে, তখন তার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সংঘর্ষ হয়ে এমন আওয়াজ হতে থাকে যে দিগঙ্গনারা মূর্ছিত হয়ে পড়ে। তার পরে, কেবলমাত্র তার এই বিপুল দেহটা রক্ষা করবার জন্য এত রাশি রাশি খাদ্য তার দরকার হয় যে, ধরিত্রী ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে। সে যে কেবলমাত্র থাবা থাবা জিনিস খাচ্ছে তা নয়, সে মানুষ খাচ্ছে— স্ত্রী পুরুষ ছেলে কিছুই সে বিচার করে না।

"কিন্তু জগতের এই প্রথম যুগের দানবজন্তুগুলো টিকল না। তাদের অপরিমিত বিপুলতাই পদে পদে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়াতে বিধাতার আদালতে তাদের প্রাণদণ্ডের বিধান হল। সৌষ্ঠব জিনিসটা কেবলমাত্র সৌন্দর্যের প্রমাণ দেয় না, উপযোগিতারও প্রমাণ দেয়। হাঁসফাঁসটা যখন অত্যন্ত বেশি চোখে পড়ে, আয়তনটার মধ্যে যখন কেবলমাত্র শক্তি দেখি, শ্রী দেখি নে, তখন বেশ বুঝতে পারা যায় বিশ্বের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য নেই ; বিশ্বশক্তির সঙ্গে তার শক্তির নিরন্তর সংঘর্ষ হতে হতে একদিন তাকে হার মেনে হাল ছেড়ে তলিয়ে যেতে হবেই। প্রকৃতির গৃহিণীপনা কখনই কদর্য অমিতাচারকে অধিকদিন সইতে পারে না ; তার ঝাঁটা এসে পড়ল বলে। বাণিজ্যদানবটা নিজের বিরূপতায়, নিজের প্রকাণ্ড ভারের মধ্যে নিজের প্রাণদণ্ড বহন করছে। একদিন আসবে যখন তার লোহার কঙ্কাল-গুলোকে আমাদের যুগের স্তরের মধ্য থেকে আবিষ্কার করে পুরাতত্ত্ববিদরা এই সর্বভুক দানবটার অদ্ভুত বিষমতা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করবে।

"প্রাণীজগতে মানুষের যে যোগ্যতা, সে তার দেহের প্রাচুর্য নিয়ে নয়। মানুষের চামড়া নরম, তার গায়ের জোর অল্প, তার ইন্দ্রিয়শক্তিও পশুদের চেয়ে কম ছাড়া বেশি নয়। কিন্তু সে এমন একটি বল পেয়েছে যা চোখে দেখা যায় না, যা জায়গা জোড়ে না, যা স্থানের উপর ভর না করেও সমস্ত জগতে আপন অধিকার বিস্তার করছে। মানুষের মধ্যে দেহপরিধি দৃশ্যজগৎ থেকে সরে গিয়ে অদৃশ্যের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে। বাইবেলে আছে, যে নম্র সেই পৃথিবীকে অধিকার করবে ; তার মানেই হচ্চে, নম্রতার শক্তি বাইরে নয়, ভিতরে ; সে যত কম আঘাত দেয়, ততই সে জয়ী হয়। সে রণক্ষেত্রে লড়াই করে না ; অদৃশ্যলোকে বিশ্বশক্তির সঙ্গে সন্ধি করে সে জয়ী হয়।

"বাণিজ্যদানবকেও একদিন তার দানবলীলা সংবরণ করে মানব হতে হবে। আজ এই বাণিজ্যের মস্তিষ্ক কম, ওর হৃদয় তো একেবারেই নেই ; সেইজন্যে পৃথিবীতে ও আপনার ভার বাড়িয়ে চলেছে। কেবলমাত্র প্রাণপণ শক্তিতে আপনার আয়তনকে বিস্তীর্ণতর করে করেই ও জিততে চাচ্ছে। কিন্তু একদিন যে জয়ী হবে তার আকার ছোট, তার কর্মপ্রণালী সহজ— মানুষের হৃদয়কে সৌন্দর্যবোধকে ধর্মবুদ্ধিকে সে মানে, সে নম্র, সে সুশ্রী, সে কদর্যভাবে লুব্ধ নয় ; তার প্রতিষ্ঠা অন্তরের সুব্যবস্থায়, বাইরের

আয়তনে না; সে কাউকে বঞ্চিত ক'রে বড় নয়, সে সকলের সঙ্গে সন্ধি ক'রে বড়। আজকের দিনে পৃথিবীতে মানুষের সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে এই বাণিজ্যের অনুষ্ঠান সব চেয়ে কুশ্রী; আপন ভারের দ্বারা পৃথিবীকে সে ক্লান্ত করছে, আপন শব্দের দ্বারা পৃথিবীকে বধির করছে, আপন আবর্জনার দ্বারা পৃথিবীকে মলিন করছে, আপন লোভের দ্বারা পৃথিবীকে আহত করছে। এই যে পৃথিবীব্যাপী কুশ্রীতা, এই যে বিদ্রোহ—রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ এবং মানবহৃদয়ের বিরুদ্ধে—এই যে লোভকে বিশ্বের রাজসিংহাসনে বসিয়ে তার কাছে দাসখত লিখে দেওয়া, এ প্রতিদিনই মানুষের শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বকে আঘাত করছেই, তার সন্দেহ নেই। মুনাফার নেশায় উন্মত্ত হয়ে বিশ্বব্যাপী দ্যূতক্রীড়ায় মানুষ নিজেকে পণ রেখে কতদিন খেলা চালাবে? এ খেলা ভাঙতেই হবে। যে খেলায় মানুষ লাভ করবার লোভে নিজেকে লোকসান করে চলেছে, সে কখনোই চলবে না।···

"যেদিন থেকে কলকাতা ছেড়ে বেরিয়েছি, ঘাটে ঘাটে দেশে দেশে এইটেই খুব বড় করে দেখতে পাচ্ছি। মানুষের দরকার মানুষের পূর্ণতাকে যে কতখানি ছাড়িয়ে যাচ্ছে, এর আগে কোনোদিন আমি সেটা এমন স্পষ্ট করে দেখতে পাই নি। এক সময়ে মানুষ এই দরকারকে ছোট করে দেখেছিল। ব্যবসাকে তারা নীচের জায়গা দিয়েছিল; টাকা রোজগার করাটাকে সম্মান করে নি। দেবপূজা ক'রে, বিদ্যাদান ক'রে, আনন্দদান ক'রে যারা টাকা নিয়েছে, মানুষ তাদের ঘৃণা করেছে। কিন্তু আজকাল জীবনযাত্রা এতই বেশি দুঃসাধ্য এবং টাকার আয়তন এবং শক্তি এতই বেশি বড় হয়ে উঠেছে যে, দরকার এবং দরকারের বাহনগুলোকে মানুষ আর ঘৃণা করতে সাহস করে না। এখন মানুষ আপনার সকল জিনিসেরই মূল্যের পরিমাণ টাকা দিয়ে বিচার করতে লজ্জা করে না। এতে করে সমস্ত মানুষের প্রকৃতি বদল হয়ে আসছে—জীবনের লক্ষ্য এবং গৌরব, অন্তর থেকে বাইরের দিকে, আনন্দ থেকে প্রয়োজনের দিকে অত্যন্ত ঝুকে পড়ছে। মানুষ ক্রমাগত নিজেকে বিক্রি করতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করছে না। ক্রমশই সমাজের এমন একটা বদল হয়ে আসছে যে, টাকাই মানুষের যোগ্যতারূপে প্রকাশ পাচ্ছে। অথচ এটা কেবল দায়ে পড়ে ঘটছে, প্রকৃতপক্ষে এটা সত্য নয়। তাই এক সময়ে যে মানুষ মনুষ্যত্বের খাতিরে টাকাকে অবজ্ঞা করতে জানত, এখন সে টাকার খাতিরে মনুষ্যত্বকে অবজ্ঞা করছে। রাজ্যতন্ত্রে সমাজতন্ত্রে ঘরে বাইরে সর্বত্রই তার পরিচয় কুৎসিত হয়ে উঠছে। কিন্তু বীভৎসতাকে দেখতে পাচ্ছি নে, কেননা লোভে দুই চোখ আচ্ছন্ন।···"

"কল যেখানে নিজের জোরে প্রকৃতিকে উপেক্ষা করতে পারে সেইখানেই সেই ঔদ্ধত্যে মানুষের রচনা কুশ্রী হয়ে উঠতে লজ্জামাত্র করে না। কলের জাহাজে পালের জাহাজের চেয়ে সুবিধে আছে, কিন্তু সৌন্দর্য নেই। জাহাজ যখন আস্তে আস্তে বন্দরের গা ঘেঁসে এল, যখন প্রকৃতির চেয়ে মানুষের দুশ্চেষ্টা বড় হয়ে দেখা দিল, কলের

চিমনিগুলো প্রকৃতির বাঁকা ভঙ্গিমার উপর তার সোজা আঁচড় কাটতে লাগল, তখন দেখতে পেলুম মানুষের রিপু জগতে কি কুশ্রীতাই সৃষ্টি করছে। সমুদ্রের তীরে তীরে, বন্দরে বন্দরে, মানুষের লোভ কদর্য ভঙ্গীতে স্বর্গকে ব্যঙ্গ করছে— এমনি করেই নিজেকে স্বর্গ থেকে নির্বাসিত করে দিচ্ছে।"[১৫]

উদ্ধৃতি দ্বারা পুঁথি বাড়াইবার আর প্রয়োজন আছে মনে হয় না। জীবনের শেষ ত্রিশ বৎসর কবি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য -খণ্ডের নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন আর সর্বত্রই "বিষয়-বিষবিকারজীর্ণ" মানুষের অধঃপতন দেখিয়া যুগপৎ শঙ্কিত ও দুঃখিত হইয়াছেন। শেষ বয়সে লিখিত যাবতীয় ভ্রমণকাহিনী একাধারে মানুষের অধোগতির ও তজ্জনিত কবির দুঃখের বিবরণে পূর্ণ।[১৬]

শুধু দেশভ্রমণ নয়, মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার রশ্মির সন্ধানে তিনি নানা রাষ্ট্রে গমন করিয়াছেন। আশার ছলনাতেই তিনি মুসোলিনির ইটালিতে গিয়াছিলেন কিন্তু সম্বিৎ পাইয়া বুঝিলেন আশার ছলনাময়ী বিশেষণ মিথ্যা নয়। এককালে পরাধীন ভারতের বহু শিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় কবিও বিশ্বাস করিতেন যে এশিয়ার মুখপাত্ররূপে জাপান পৃথিবীর সাম্রাজ্যলোলুপ রাষ্ট্রগুলিকে সংযত ও সাবধান করিবে। কিন্তু সে আশা ভঙ্গ হইতেও বিলম্ব হইল না। জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণে কবি বুঝিলেন, জাপানও আপাতলাভের পন্থাটাই বাছিয়া লইল। সোভিয়েট রাশিয়া মানুষের মুক্তির কর্ণধার হইতে চলিয়াছে, এই আশা তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে রাশিয়ায়। কিন্তু অল্পদিন পরেই বলশেভিজমের অন্তর্নিহিত স্বরূপ তিনি বুঝিতে পারিলেন।[১৭]

আশা দুর্মর। শেষকালে সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় আচরণ সম্বন্ধে তাঁহাকে লিখিতে হইল— "ফিনল্যাণ্ড ধ্বংস হল সোভিয়েট বোমার বর্ষণে।"

শেষ ভরসা ছিল ইংরাজ, জাতি হিসাবে যাহাকে তিনি সব চেয়ে শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু সেই শেষ ভরসাও উজাড় করিয়া দিয়াছেন সভ্যতার সংকট প্রবন্ধে—

"জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের

১৫ জাপান-যাত্রী

১৬ যাত্রী, ১৩৫৩ সংস্করণ: পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি পৃ. ৮৮-৯৬, ১০৬-১০৭; জাভাযাত্রীর পত্র পৃ. ১৭৮-১৭৯, ১৮৬-১৮৮। পারস্যে, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২, ১৩৫৩ সং, পৃ. ৪৪০, ৪৪৩, ৪৪৬, ৪৫৫

কিন্তু ইহাই সব নয়। কালান্তর গ্রন্থের অনেকগুলি প্রবন্ধে কবির উত্তেজিত মনোভাব দেখিতে পাওয়া যাইবে—

লড়াইয়ের মূল, ১৩২১ (১৯১৫); ছোটো ও বড়ো, ১৩২৪ (১৯১৭); স্বাধিকারপ্রমত্ত, ১৩২৪ (১৯১৮); বাতায়নিকের পত্র, ১৩২৬ (১৯১৯); শূদ্রধর্ম, ১৩৩২ (১৯২৫); কালান্তর, ১৩৪০ (১৯৩৩)।

১৭. চিঠিপত্র ৪, ১৩৫০ সংস্করণ, পৃ. ১৭৯-১৮০

সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।"

মানুষ সম্বন্ধে এতটুকু আশাভরসা মনে রাখেন নাই, যদিচ তার পরেই বলিয়া উঠিয়াছেন—"কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।" এ কি সত্যই বিশ্বাসের বাণী না অন্ধকারে পথ-হারানো মানুষের 'পথ হারাই নি' আত্মস্তোক-বাক্য! যে ভাবেই লওয়া যাক, কবি যে বিশ্বাসের প্রত্যন্তে আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। জীর্ণ জীবনমঞ্চের যেখানেই তিনি ভর দিতে চেষ্টা করেন, মাচা মড়্ মড়্ করিয়া ওঠে। কিন্তু ইহাও সব নয়। আরো আছে।

মানুষের আচরণ দেখিয়া বিধাতার অভিপ্রায় সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলে অন্যায় বলা যায় না। যাহারা নিছক জড়বাদী তাহাদের দায়িত্ব সরল, ইতিহাসের ঘটনাপুঞ্জকে জড় কার্যকারণের দ্বারা তাঁহারা ব্যাখ্যা করিয়া খালাস। কিন্তু যাঁহারা ভগবৎ-সত্তায় বিশ্বাসী তাঁহারা এত সহজে দায়মুক্ত হইবেন কিরূপে? এই ভগবদ্‌বিশ্বাসীগণের মধ্যে যাঁহারা ভক্তের হৃদয়কেই ভগবৎ-লীলার একমাত্র আসর মনে করেন, ইতিহাসের মধ্যে তাঁহার পদক্ষেপ স্বীকার করেন না বা পদক্ষেপ সম্বন্ধে উদাসীন, তাঁহাদের কর্তব্যও সহজ। কিন্তু যাঁহারা ভগবানকে ভক্ত ও ভগবানের খেলাঘরেই আবদ্ধ রাখেন না, মনে করেন যে বৃহৎ ইতিহাসের উত্থানপতনেও তাঁহারই লীলা তরঙ্গিত, কবিবর্ণিত সর্বজনীন বীভৎসা ও ব্যভিচারের মধ্যে কি ভাবে ভগবদভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে তাহা ব্যাখ্যা করিবার দায়িত্ব তাঁহাদের। কিন্তু কাজটি সহজ নয়। কার্যকারণের সূত্রে মিলাইয়া ব্যাখ্যা আর যখন সম্ভবে না তখন অস্তিত্বের গভীর কন্দর হইতে অসহায় প্রশ্ন ধ্বনিত হইতে থাকে—

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু,
নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ
তুমি কি বেসেছ ভালো?

খুব সম্ভব প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর নিহিত, না তুমি তাহাদের ভালোবাস নাই। কিংবা এই নৈতিক ব্যভিচারকে বজ্রকণ্ঠে ধিক্কৃত করিবার শক্তির প্রার্থনা জাগে মনে।[১৮]

অবশেষে হাতে হাতে প্রতিকার যখন মেলে না তখন—

বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

কিন্তু এ-সব তো ব্যাখ্যা নয়, বিশ্বাস নয়, ভগবদভিপ্রায়কে স্বীকার নয়—এ সব নৈরাশ্যের যুক্তি, অন্ধকারে উদ্‌ভ্রান্ত শিশুর লক্ষ্যহীন হাতপা-ছোঁড়া। এখানেই শেষ নয়।

১৮. ১৭ সংখ্যক কবিতা, প্রান্তিক

মানুষের আচরণের ফলে ভগবানের অভিপ্রায় সম্বন্ধে কবির মনে একটা বিক্ষোভের ভাব সৃষ্টি হইয়াছে সত্য হইলেও কখনো কখনো দেখিতে পাওয়া যায় যে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের মধ্যেও ভগবদভিপ্রায় সম্বন্ধে কবির মনে বিক্ষোভের, বিদ্রোহের, অশান্তির ভাব।

"ওর [কবির একমাত্র দৌহিত্রের] একটি ডায়ারি পেয়েছি, অতি অল্প কিছুই লিখেছে, সেটুকু লেখার মধ্যে এমন একটি পরিচয় আছে তাতে ও যে নেই সেটাকে একটা নিষ্ঠুর অন্যায় বলে মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।"[১৯]

আবার আছে—

"মৃত্যুকেই আমরা সকলের চেয়ে ভুলে থাকি, অথচ মৃত্যু যখন ঘরের মধ্যে দেখা দেয় তখন বুঝতে পারি আমরা কী অসহায়—একেবারে চরম আঘাত, কোথাও কোনো আপিল নেই।"[২০]

আরো আছে—

"বুঝতে পারচি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ে সুরেন পেরে উঠবে না। এত কষ্টও পাচ্চে। নানা রকম কষ্টের ভিতর দিয়ে ওর জীবনটা গেল। অমন মানুষের ভাগ্যে এত কষ্ট ঘটতে পারে এ কথা ভাবলে অত্যন্ত ধিক্কার জন্মায় বিশ্ববিধানের উপরে।"[২১]

বিশ্ববিধানের উপরে বিদ্রোহী হইয়া ওঠা এবং বিশ্ববিধানের উপরে ধিক্কারের ভাব অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ। তবু ইহা সত্য। এখন যে সম্ভব হইল তাহার কারণ বৃহৎ ইতিহাসের মাতালের উন্মত্ত আচরণ ও স্খলিতপদ গতি দেখিতে দেখিতে ভগবানে বিশ্বাস না হারাইয়াও ভগবদ্‌বিধানের ধ্রুবত্ব সম্বন্ধে অটলতা সম্বন্ধে কবির যেন সন্দেহ জন্মিয়াছিল, যেন ধারণা হইয়াছিল মাতালের পা টলিতেছে না, টলিতেছে বিশ্ববিধানটাই।

এতক্ষণ ধরিয়া তথ্যপ্রমাণাদিযোগে আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে গীতাঞ্জলির সমকালে মানব, প্রকৃতি ও ভগবৎ-সত্তার ত্রিধারায় যে মিলন ঘটিয়াছিল পরবর্তীকালে তাহা ব্যাহত ও শিথিল হইয়া আলাদা হইয়া গেল। 'মানুষের উপরে বিশ্বাস হারানো পাপ' কথাটা যতই উচ্চস্বরে বলুন না কেন বেশ বুঝিতে পারা যায় আগের সে ধ্রুব বিশ্বাস আর নাই। আবার মানুষের উপরে বিশ্বাস শিথিল হইবার ফলেই ভগবানের প্রতি বিশ্বাস না হারাইয়াও তাঁহার সর্বশুভময়তা সম্বন্ধে কেমন যেন সাময়িক বিভ্রান্তি ঘটিয়াছে। আগের মতো দুয়ের মধ্যে আর তেমন প্রেমের সহযোগিতা নাই, এখন কতকটা যেন প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বীর ভাব ; আগে তিনে এক হইয়া যে ধারাকে সুপুষ্টভাবে বহিতে দেখিয়াছিলাম, এখন তাহা তিনে তিন, কবির মানসলোকের মানচিত্রখানা বহুস্রোতে বিভক্ত। কেবল আগের প্রেম ও বিশ্বাস অটুট আছে বিশ্বপ্রকৃতির উপরে। তাহাও শেষ পর্যন্ত থাকিবে

১৯. চিঠিপত্র ৫, প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত, পত্রসংখ্যা ১১১

২০. চিঠিপত্র ৫, প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত, পত্রসংখ্যা ১১৪

২১. চিঠিপত্র ২, আষাঢ় ১৩৪৯, পৃ. ১২২

কি না যথাসময়ে দেখা যাইবে। এখন পঞ্চাশোত্তর রবীন্দ্রজীবনের এই বাস্তব পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন না হইলে তাঁহার শেষ বয়সের কাব্যের রস গ্রহণে অসুবিধা হওয়া একান্ত স্বাভাবিক।

রবীন্দ্র-সাহিত্যপ্রবাহে কয়েকটি কুটস্থান আছে, যেগুলি না বুঝিলে রবীন্দ্র-সাহিত্য ও তাহার বিবর্তন অনুধাবন কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। কালানুক্রমিক তাহাদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথম, (কবির মতে) নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ রচনার অভিজ্ঞতা; তার পরে শিলাইদহ অঞ্চলে বাস্তব জীবনের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়; কিছুকাল পরেই "প্রাচীন ভারতে" মানস ভ্রমণ ও প্রত্যাবর্তন; আর সর্বশেষে বলাকা কাব্য রচনার অব্যবহিত পূর্বে, সময়ে ও পরে বৃহৎ জগতের অন্তর্গত আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয়। জীবদেহের পক্ষে যেমন গ্ল্যাণ্ডগুলি, রবীন্দ্র-সাহিত্যের পক্ষে তেমনি এই কুটস্থানসমূহ। রবীন্দ্র-সাহিত্যের রহস্য ইহাদের মর্মে নিহিত।

শেষোক্ত অভিজ্ঞতার ফলে ও পরে সীমা ও অসীমের সমন্বয় বিশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে কবির জীবনে, এ কথা আগে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এই বিশ্লেষের পরে সীমা ও অসীমের ব্যবধান বাড়িতে বাড়িতে এমন দুস্তর হইয়া পড়িয়াছে যে 'শান্তিপারাবারের' নিকটে আসিয়া আর দুই স্থল একসঙ্গে চোখে পড়ে না। শেষ ত্রিশ বছরের কাব্যে সীমাও আছে অসীমও আছে কিন্তু আগের মতো আর একত্র নাই, সীমার গুণও আছে অসীমের গুণও আছে কিন্তু আর সমন্বিত হইয়া নাই। তত্ত্বের ক্ষেত্রে তিনি এক, রসের ক্ষেত্রে তিনি অনেক— এই ভাবেই আছেন, কিন্তু আগের মতো আর 'সীমার মাঝে অসীম তুমি' হইয়া নাই। এই দ্বিধা রবীন্দ্র-সাহিত্যে তত্ত্বগত মূল্য কমাইয়াছে কি না জানি না, তবে নিশ্চয় জানি এই দ্বিধাভাবের আলো-আঁধারের আনাগোনায় ইহার রসগত মূল্য অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। একটি উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে। মহুয়া কাব্যে নাম্নী কবিতাগুচ্ছে সতেরোটি কবিতা আছে, নারী-রূপের সতেরোটি দিগ্‌দর্শন।[২২] কোথাও পড়িয়াছিলাম লেখক এই কবিতাগুচ্ছকে নারীর বিশ্বরূপ দর্শন বলিয়াছেন। তখন কথাটা ভালো লাগিয়াছিল। পরে ভাবিয়া দেখিলাম কাব্য হিসাবে ইহাদের যে মূল্যই হোক নারীর বিশ্বরূপ দর্শনরূপে অর্থাৎ ইহার তত্ত্বমূল্য নিতান্ত সীমাবদ্ধ। নাম্নী কাব্যের সতেরো জনই তরুণী, সুন্দরী, বিরহ বিভ্রম বিলাসে লালসে চতুরা মুখরা। সুন্দর। কিন্তু ইহাই কি আদ্যাশক্তির সাকুল্য রূপ?[২৩] সীমার জগতে বীভৎস আছে, কুশ্রী আছে, নিষ্ঠুর আছে, নিদারুণ আছে,

২২. শ্যামলী, কাজলী, হেঁয়ালী, খেয়ালী, কাকলী, পিয়ালী, দিয়ালী, নাগরী, সাগরী, জয়তী, ঝামরী, মুরতী, মালিনী, করুণা, প্রতিমা, নন্দিনী, উষসী।

২৩. যিনি দশমহাবিদ্যার পরিকল্পনা করিয়াছেন, তিনি সুমহতী কবিকল্পনার অধিকারী। এই দশ জনের মধ্যে যেমন ষোড়শী ও কমলা আছেন, তেমনি ধূমাবতী ও ছিন্নমস্তাও আছেন। আদ্যাশক্তির তত্ত্বমূল্যবিচারে দশমহাবিদ্যা-পরিকল্পনা পূর্ণ, নাম্নী নিতান্তই অসম্পূর্ণ।

ক্যালিবান আছে, ঘটোৎকচ আছে। আবার মহাকবির হাতে পড়িলে দেখা যায় যে ইহাদের মধ্যেই আছে সৌন্দর্য করুণা মহত্ত্ব, আত্মনিবেদনের সংকল্প। এগুলি স্থূল বস্তুজগতের গুণ নয়, বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই ইহাদের অস্তিত্ব, তৎসত্ত্বেও ইহারা বস্তুর অর্থাৎ সীমার অতীত। রবীন্দ্রনাথ যে বীভৎস কুশ্রী নিষ্ঠুর নিদারুণ প্রভৃতির মধ্যে সৌন্দর্য মহত্ত্ব করুণা প্রভৃতি গুণ উদ্ধার করিতে অক্ষম তাহার কারণ একই সঙ্গে এ দুটি, সীমা ও অসীম, তাঁহার ধারণার অতীত। ব্যাস বাল্মীকি শেক্সপীয়র দান্তে হোমার প্রভৃতি কবিতে এ গুণ সুপ্রচুর ও সহজাত।

কালিদাসের মতোই রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে সুন্দর করুণ কোমল ললিতগুণাবলীর পক্ষপাতী। এই কারণেই লক্ষ্মী কাব্যে নারীর সাকুল্যরূপ স্থান পায় নাই, ধূমাবতী ছিন্নমস্তা প্রভৃতিতে আদ্যাশক্তির যে রূপের প্রকাশ রবীন্দ্র-কল্পনা তাহার পক্ষপাতী নয়, হয়তো বা এ সব ধারণাই করিতে পারে না।

আরো দুটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা ও ছবি। বনস্পতি বটবৃক্ষ ঝুরি নামাইয়া দেয় মৃত্তিকা স্পর্শ করিবার উদ্দেশ্যে। রবীন্দ্র-বনস্পতি গদ্যকবিতা ও ছবি রূপ ঝুরি নামাইয়া দিয়াছে সীমার জগৎকে, প্রত্যহের জগৎকে স্পর্শ করিবার উদ্দেশ্যে। সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে মনে হয় না। গদ্যকবিতার ঝুরি মৃত্তিকার অতিশয় কাছে নামিয়াও মাটি স্পর্শ করিতে পারে নাই কেশ-ব্যবধানে দোদুল্যমান হইয়া আছে। আর ছবিতে তিনি মৌলিক উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, প্রত্যহের জগৎকে পার হইয়া গিয়া রবীন্দ্রনাথের ছবি মগ্নচৈতন্যের রহস্য উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে। গদ্যকবিতা সীমার জগৎকে স্পর্শ করে নাই, ছবি সীমার জগৎকে গ্রাহ্য করে নাই, ফলে সীমার জগৎ যেমন ছিল তেমনি আছে, তাহার পরম রহস্য রবীন্দ্র-সাহিত্যে নিঃশেষে ধরা পড়ে নাই। তাঁহার ছবি সম্বন্ধে এক সময়ে যাহা লিখিয়াছিলাম, এখানে তাহা উদ্ধার করিয়া দিলেই আমার বক্তব্য প্রকাশ পাইবে।

কবির রহস্যলোক অবরোহণের তিনটি ধাপ বর্তমান— গদ্যকবিতা, চিত্র ও শেষ বয়সে লিখিত কয়েকটি গল্প ; সবগুলিই তাঁর শেষ বয়সের কীর্তি। তাঁহার অন্যান্য রচনার সঙ্গে ইহাদের প্রভেদ এই যে, প্রথম বয়সের রচনাগুলি পর্বে পর্বে, ধাপে ধাপে উন্নীত হইয়াছে, আর শেষ বয়সের রচনাগুলি, তন্মধ্যে চিত্রও অন্যতম, মনোরহস্যের রসাতলে অবরোহণমুখী। প্রথম বয়সের রচনা উচ্চেতনমুখী। উচ্চেতন বলিতে বুঝি ব্যক্তিগত চৈতন্যের ঊর্ধ্বে যে বিশ্বব্যাপী চৈতন্যলোক আছে তাহাই, ইহাকে বলিতে পারি বিশ্বচৈতন্য। আর অবচেতনা থাকে ব্যক্তিগত মনের অস্পষ্ট অন্ধকারে, জ্ঞানের সাধারণ আলোক সেখানে প্রবেশ করে না বলিয়া সেই রহস্যলোক সাধারণত অজ্ঞাত রহিয়া যায়। বিশ্বচৈতন্য উন্নীত হইতে যেমন অনুপ্রেরণার আবশ্যক, অনুপ্রেরিতের পক্ষে দুই-ই দুষ্প্রবেশ্য। রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণার বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, দুই জাতীয় অনুপ্রেরণাই তাঁহার জীবনে কার্যকর হইয়াছে— উচ্চেতনমুখী প্রথম দিকে, আর অবচেতনমুখী শেষ দিকে।

শেষোক্ত অনুপ্রেরণার ইতিহাস বর্তমান তাঁহার গদ্যকবিতায়, চিত্রাবলীতে এবং তিন সঙ্গী জাতীয় গল্পে।

তবে সবগুলিতেই অনুপ্রেরণার তেজ সমান প্রবল নহে, গদ্যকবিতায় অপেক্ষাকৃত মৃদু, তাহার দ্বিধা যেন সম্পূর্ণ কাটে নাই; চিত্রে ল্যাবরেটরি গল্পে প্রবল, তখন সে নিঃসংশয়। রবীন্দ্রনাথ কেবল ত্রিকালদর্শী নহেন, ত্রিলোকদর্শীও বটেন। চেতন উচ্চেতন ও অবচেতন তিন লোকেরই সংবাদ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

গদ্যকবিতায় যে-জাতীয় বিষয়বস্তু তিনি অবতারণা করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ববর্তী কাব্যে তাহা নাই, এমন-কি ছোট গল্পেও বিরল। অভিজ্ঞতার নূতন ক্ষেত্রে বিচরণের উদ্দেশ্যেই কবিতার গদ্যময় রূপটি তিনি সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন। "কিনু গোয়ালার গলি" নামে পরিচিত কবিতাটিতে রবীন্দ্র-রচনার সহিত তাঁহার একটা আন্তরিক অমিল আছে। তাঁহার পরিচিত সংসারের একান্তে দুর্ভাগ্যের যে আঁস্তাকুড় বর্তমান, সেখানে তিনি প্রথম পদার্পণ করিয়াছেন— অবচেতন লোকে নামিবার গুহাদ্বারটা যে ঐ আঁস্তাকুড়ের নিকটেই। কিন্তু পূর্বতন সংস্কার কাটাইয়া না উঠিতে পারিবার ফলে সেখানে একবার মাত্র পা ফেলিয়াই তিনি আবার উচ্চেতনলোকে ফিরিয়া গিয়াছেন। এই কারণেই কবিতাটির সমাপ্তি তাহার সূত্রপাতকে সমর্থন করে না। এটা যেন উচ্চেতন ও অবচেতন লোকের সীমান্ত।

রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্রগুলি অবচেতন-লোকের বার্তাবাহী। ছবিগুলির কালানুক্রমিক বিবর্তন আলোচনা করিলেও খুবসম্ভব একটা ক্রমবিকাশের চিহ্ন পাওয়া যাইবে— কিন্তু মোটের উপরে ইহাদের অবচেতন-বার্তাবাহিতা নিঃসংশয়। রবীন্দ্রচিত্রে নরনারীর স্বাভাবিক রূপ বিরল, যাহা আছে তাহাও যেন গুপ্ত অভিজ্ঞতার আলোতে বিকৃত। স্বাভাবিক গাছপালার চিত্র অল্প হইলেও মানবমূর্তির চেয়ে সংখ্যায় বেশি। সংখ্যাগৌরবে প্রাগৈতিহাসিক জন্তুজানোয়ারের রূপ সুপ্রচুর। কিন্তু বোধ করি সংখ্যায় সব চেয়ে অধিক এমন সব জন্তুজানোয়ার ও উদ্ভিদ যাহাদের অনুরূপ মানুষের অভিজ্ঞতার বাহিরে। তাহারা কোনো-কিছুর অনুরূপ নয়— তাহারা নিছক রূপ। শিল্প-বিচারে Imitation Theory বলিয়া একটা পথ আছে, Imitation বস্তুসাপেক্ষ, তাহা বস্তু-আশ্রয়ী সত্য, কিন্তু এই ছবিগুলির মূলে কোনো বস্তুভিত্তি না থাকায় ইহা কোনো-কিছুর Imitation নয়, কোনো-কিছুর সত্য নয়, ইহা নিছক সত্য। এ যেন এমন কতকগুলি বস্তু যাহাদের ছায়া পড়ে না। কোনো-কিছুর সঙ্গে তুলনা করিবার উপায় না থাকাতে ইহাদের অবাস্তব মনে হওয়া অসংগত নয়। কিন্তু বস্তু ও তাহার ছায়ার মধ্যে ছায়াটাই কি অধিকতর বাস্তব? ছায়াটাই তো অপেক্ষাকৃত অবাস্তব। ছায়া লইয়া যাহাদের কারবার, সেই অবাস্তববিলাসীদের জন্য প্লেটো তাঁহার 'রিপাবলিকে' একটু স্থানও রাখেন নাই। গুরুর এই একদেশদর্শিতার প্রতিবাদেই যেন অ্যারিস্টটলকে Imitation Theory খাড়া করিয়া শিল্প ও সাহিত্যকে সমর্থন করিতে হইয়াছিল। শিল্পবিচারের Imitation Theory বা Criticism of Life Theory, কোনো থিয়োরিই

অবচেতন লোকের শিল্পবিচার সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। শেষোক্ত থিয়োরির অনুসারেও বিচারের জন্য একটা অনুরূপ আবশ্যক। এই অনুরূপকেই ম্যাথ্যু আর্নল্ড moral ideas বলিয়াছেন। তাঁহার মতে application of ideas to life-দ্বারাই কাব্যের মহত্ত্ব প্রমাণ হয়— আর application of ideas to life বলিতে দুটা বস্তু বোঝায়, idea ও life। কিন্তু বস্তু যেখানে দুটা নয়, মাত্র একটা, সেখানে Criticism of Life থিয়োরি সম্পূর্ণ অচল। কারণ এ-সব ছবিতে life ও idea দুটা নাই, মাত্র ideaটাই আছে এবং সে ideaটাও অবচেতন লোকের idea (খুব সম্ভব সেখানে idea ও reality অভিন্ন), সেখানে সাহিত্য ও শিল্প-বিচারের মাপকাঠি অচল। রবীন্দ্রনাথের ছবি এমন এক জগৎ যাহার মাপকাঠি ও কম্পাস এখনও অনাবিষ্কৃত। এখানকার নদী নদীমাত্র, তাহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার জানিবার উপায় নাই; এখানকার জন্তুজানোয়ার রূপ মাত্র, তাহার অধিক নয়; এখানকার স্বল্পসংখ্যক নরনারীও নিছক রূপ, অতিরিক্ত কিছুই নয়। ইহা নিছক রূপময় জগৎ। রবীন্দ্রনাথ জাগতিক রূপ হইতে অরূপ লোকে উত্থিত হইয়াছেন— ইহাই রবীন্দ্র-সাহিত্য ও শিল্পের সাধারণ পরিচয়। জাগতিক রূপে ও অরূপে একটা সম্বন্ধ বিদ্যমান। কিন্তু তাঁহার ছবির জগতে কেবল রূপটাই আছে, কোনো অরূপলোকের সঙ্গে তাহাকে equate করা সম্বন্ধযুক্ত করা সম্ভব নহে। ইহা কি তাঁহার প্রতিভার ঐকান্তিক অরূপসাধনার nemesis ?[২৪]

এবারে আমরা কবিজীবনের শেষ দশকে আসিয়া পড়িয়াছি। এই দশকের দুটি প্রধান ঘটনা ১৯৩৭ সাল এবং ১৯৪০ সালের কঠিন পীড়া। এই কঠিন পীড়া ও পীড়াসম্ভূত অভিজ্ঞতা কয়েকখানি কাব্যে পরিণত হইয়াছে। এখানে তাহাদের পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই উপলক্ষে একটা বিষয়ের আলোচনা হওয়া আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের, বিশেষ শেষ দশকের কোনো কোনো কবিতার সাক্ষ্যে অনেকে বলিতে শুরু করিয়াছেন যে কবি শেষ জীবনে ঈশ্বর সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার ধর্মচিন্তার সূত্র শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ কেহ আরো অগ্রসর হইয়া গিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে তিনি নিরীশ্বরবাদী হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমার বিবেচনায় অভিযোগটি আদৌ সত্য নহে। তবে যে আদৌ এমন কথা উঠিয়াছে তাহার কারণ, গীতাঞ্জলি প্রভৃতি তিন খানি কাব্যের পরে প্রত্যক্ষ ভগবদ্‌বিষয়ক গানের স্বল্পতা, বক্তাগণের একদেশদর্শন, আর কোনো কোনো কবিতার ভুল অর্থ গ্রহণ।

গীতাখ্য কাব্যত্রয়ে কবির মুখ্যতঃ ভক্তের সহিত ভগবানের লীলার সম্বন্ধ; আর সে লীলার আসর ভক্তের হৃদয়। ব্যক্তিগত উপলব্ধিবলে কবি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু তার পরে যখন তিনি বৃহৎ ইতিহাসের সম্মুখীন হইলেন তখন দেখিতে

২৪. সোহিনী, 'বাংলা সাহিত্যের নরনারী' গ্রন্থ

পাইলেন যে পূর্বতন সিদ্ধান্ত অচলপ্রায়। ব্যক্তি ও ভগবান সম্বন্ধে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হইলেও সাধারণভাবে মানবসমাজ সম্বন্ধে তাহা প্রয়োগ করা চলে না। তখন প্রশ্ন ওঠে সমষ্টিবদ্ধ মানবসমাজের সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধটা কি? অর্থাৎ ভগবৎ-অভিপ্রায় ইতিহাসের মধ্যে কি ভাবে প্রকাশিত হইতেছে? এই যে অনাচার অত্যাচার, বীভৎসা, নিষ্ঠুরতা ক্রমে স্ফীততর হইয়া উঠিতেছে— ইহার সহিত ভগবৎ-অভিপ্রায়ের কি সম্পর্ক? যাহারা ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে শয়তানে বিশ্বাস করে তাহাদের কাজ অনেক সরল; এ সব শয়তানের কীর্তি বলিলেই চলে। কিন্তু হিন্দুর পক্ষে সে পথটা বন্ধ। অথচ ব্যাখ্যার একটা পথেরও আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ কুড়ি-পঁচিশ বছর, বিশেষ ভাবে শেষ দশক এই পথটা সন্ধান করিয়া মরিয়াছেন। ভগবানে অবিশ্বাস হইলে ভগবদ্ অভিপ্রায়ের সন্ধান নিশ্চয় তিনি করিতেন না। তাঁহার সমস্যা দ্বিমুখী— এক দিকে ভগবানে বিশ্বাস, অপর দিকে ইতিহাসের ঘটনার উত্থান পতনের মধ্যে ভগবৎ-অভিপ্রায় আবিষ্কারে ব্যর্থতা। এই পর্বে প্রত্যক্ষভাবে ভগবদ্‌বিষয়ক কবিতার স্বল্পতার কারণ এই যে, প্রত্যক্ষভাবে ভগবদ্ সন্ধান তিনি করেন নাই, করিবার প্রয়োজন ছিল না; পরোক্ষে ইতিহাসের মধ্যে তাঁহাকে সন্ধান করিয়াছেন। আমার নিজের ধারণা সমষ্টিবদ্ধ মানুষের সঙ্গে ভগবানের কি সম্বন্ধ, ইতিহাসের মধ্যে তাঁহার অভিপ্রায় কি ভাবে ব্যক্ত হইতেছে, এ বিষয়ে কবি কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই। এই অনিশ্চয়তার পীড়া তাঁহার সমকালীন কাব্যের মধ্যে তৃণদলে শিশিরকণার মতো ছড়াইয়া আছে কিংবা এই শিশিরকণার রস শোষণ করিয়াই শেষ জীবনের অনেক কবিতার সৃষ্টি। এ এমন একটা রস যাহা পঞ্চাশ-পূর্ব কাব্যে নাই বলিলেও চলে। শেষ জীবনের কাব্যের এ এক অভিনব সম্পদ্। অনেকে বিষয়টি বোঝেন নাই বলিয়া নিরীশ্বরবাদিতার অভিযোগ আনিয়াছেন। প্রকৃত ব্যাপার ঠিক উল্‌টা। শুধু ব্যক্তিগত জীবনের নয়, ইতিহাসের প্রত্যেক ক্রান্তিপাতকে ভগবৎ-অভিপ্রায়ের সহিত সমন্বিত করিবার প্রয়াস ভগবৎ-সত্তায় ঐকান্তিক বিশ্বাস না থাকিলে কখনোই সম্ভব হইত না। ইহার উপরে আছে কোনো কোনো কবিতার ভুল ব্যাখ্যা, বিশেষ কবিজীবনের অন্ত্যম কবিতাটির।[২৫]

আগে বলিয়াছি যে মানুষ সম্বন্ধে তাঁহার ধ্রুব ধারণা বিচলিত হইয়া গিয়াছে; মানুষের আচরণে ভগবানের মঙ্গলকরতা সম্বন্ধেও সন্দেহ জাগিয়াছে; এক ধ্রুব ছিল বিশ্বপ্রকৃতিতে বিশ্বাস। এই কবিতাটিতে সেই বিশ্বাসেও যেন ফাটল ধরিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতিকে তিনি সরাসরি অবিশ্বাস করেন নাই, কিন্তু তাহার সৌন্দর্যকে, ঐশ্বর্যকে ছলনা ও মায়ার ফাঁদ বলিয়াছেন। কবিতাটির এই অর্থ গৃহীত হইলে একটি কবিতা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হয় বটে কিন্তু সেই সঙ্গে মহা অনর্থের সৃষ্টি হয়। বিশ্বপ্রকৃতি সংক্রান্ত তাঁহার সারা জীবনের ধারণা কি কবি শেষ মুহূর্তে পরিত্যাগ করিলেন? যে বিশ্বপ্রকৃতি ছিল ভগবৎ-উপলব্ধির

২৫. "তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি", শেষ লেখা

সহায়, ভগবদ্‌বিভূতিতে মণ্ডিত, অবশেষে সে-ই কি "ছলনাময়ী" প্রতিপন্ন হইল ? ইহার প্রকৃত তাৎপর্য কি ? এই অর্থের সম্ভাবনা কতদূর গড়ায় ? জগৎকে অস্বীকার না করিয়াও জাগতিক ব্যাপারকে অস্বীকার করা কি ? চিন্তার ক্ষেত্রে যিনি অদ্বৈতবাদী, রসের ক্ষেত্রে যিনি দ্বৈতবাদী, এইভাবে জগৎকে আংশিক অস্বীকার করিয়া শেষ মুহূর্তে কি তিনি দুয়ের ব্যর্থ সমন্বয়ের চেষ্টা পরিহার করিয়া অদ্বৈতের দিকে আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া গেলেন। সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের ব্যর্থ প্রয়াস সারা জীবন করিবার পর জীবন-মৃত্যুর চৌকাঠের উপরে যখন তিনি আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলেন, তখনই কি সীমার ছিলার সংস্পর্শ সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া অসীমের ধনুর্দণ্ড সতেজে আপন বিজয় ঘোষণা করিল ? প্রকৃতি, মানুষ ও ভগবানের ত্রিধারার মধ্যে যে ব্যবধান ধীরে ধীরে বাড়িতেছিল অতলে আত্মসমর্পণ করিবার আগে সেই শিথিলপ্রায় যুক্তবেণী অকস্মাৎ খুলিয়া গিয়া সম্পূর্ণ মুক্তবেণী রূপে অকূলে উধাও হইয়া গেল ? অন্তরের গভীরে যে অদ্বৈতের আকাঙ্ক্ষা কবি পোষণ করিতেছিলেন, শেষ মুহূর্তের হাত বাড়ানোতে তাহা কি করায়ত্ত হইল ? এ সব গভীর ও গুহানিহিত প্রশ্নের উত্তর দানের সাধ্য আমার নাই। তাই প্রাসঙ্গিক সংশয় জাগাইয়া দিয়া এই আলোচনার শেষ করিলাম।

শম্ভু সাহা -কর্তৃক গৃহীত চিত্র

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য

শ্রীক্ষুদিরাম দাস

যেমন সমকালীন তেমনি প্রাচীন বহু সাহিত্যিক ভাবধারা, বস্তু এবং রীতি রবীন্দ্র-চিত্তবৃত্তিতে গৃহীত ও স্বীকৃত হয়ে প্রায়শঃ রূপান্তরিত হয়ে পড়েছে। এই বক্তব্যটিকে সূত্ররূপে ধরে নিয়ে আমরা প্রথম এই আলোচনার প্রকৃতি ও সীমা নির্ণয় করছি। পরে, আমাদের আজ পর্যন্ত যা অধ্যয়ন, মোটামুটি তারই উপর নির্ভর করে, সংক্ষেপে সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্র-সাহিত্যের আত্মীয়তা নির্দেশে প্রবৃত্ত হচ্ছি।

উল্লিখিত মন্তব্যে রবীন্দ্র-সমকালীন বলতে ঊনবিংশ এবং কিয়দংশে বিংশ শতকের কথা ভাবতে হবে। এই আধুনিক কাল শুধু বাঙলার নয়, শুধু ভারতেরও নয়, য়ুরোপেরও। প্রাচীন য়ুরোপ বরং আধুনিক বাঙলার প্রথম কবি মধুসূদনকে অনুপ্রাণিত করেছে। মধুসূদন য়ুরোপীয় রীতির মহাকাব্য রচনা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর কবিচিত্ত তাই সমানধর্মা কবিদের কাব্যভূমিতেই সঞ্চরণ করতে চেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ গীতিকবি ব'লেই বিদেশীয় প্রাচীন তাঁকে আকর্ষণ করে নি। অথচ বিদেশীয় আধুনিক অর্থাৎ য়ুরোপের চলমান রোম্যান্টিক গীতিকাব্যের যুগ তাঁকে সর্বাংশে অর্থাৎ ভাবুকতাময় দার্শনিক চিন্তন-সহ উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। স্বদেশীয় প্রাচীন তাঁর কবিস্বভাবের কাছে অনুধাবনযোগ্য হয়েছিল দুটি প্রবল কারণে। একটি কারণ, জাতীয় ঐতিহ্য, যা যে-কোনও কবির পক্ষে অত্যাজ্য, আর-একটি কারণ, প্রাচীনের কাব্যরীতির মধ্যে যেখানে উচ্চ কল্পনা বা গীতিকাব্যোচিত ভাবুকতা প্রকাশ পেয়েছে তার প্রতি আধুনিক মহা-গীতিকবির স্বাভাবিক আকর্ষণ। এদেশীয় প্রাচীন বলতে বাঙ্‌লা পদাবলী এবং সংস্কৃত কাব্যনাটকাদির অংশবিশেষ অথবা একটি সামগ্রিক ভাবাত্মকতাকে আমরা গ্রহণ করতে পারি। বর্তমান আলোচনা আমরা শুধু সংস্কৃতের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখছি। উপনিষদকেও এ প্রসঙ্গে আমরা গ্রহণ করছি না, কারণ, তা হলেও আলোচনার ক্ষেত্র অতি ব্যাপক হয়ে পড়ে, তা ছাড়া, আমাদের ধারণায় উপনিষদের দার্শনিক উপলব্ধি রবীন্দ্র-কবিস্বভাব গঠনে ততটা মৌলিক প্রভাব বিস্তার করে নি, যতটা করেছিল এদেশীয় পদাবলী ও সংস্কৃত কাব্য এবং বিদেশীয় আধুনিক রোম্যান্টিক কাব্যভাবুকতা।

সংস্কৃত কাব্যকে এই প্রসঙ্গে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে দেখা কর্তব্য। একটি ভাগে পড়বে কালিদাসের সাহিত্যকীর্তি, বাণভট্টের কাদম্বরী এবং কিছু পরিমাণে ভবভূতির উত্তররামচরিত। দ্বিতীয় বিভাগে ধরা যাক ঘটকর্পরের যমক-কাব্য, জয়দেবের গীতগোবিন্দ, অর্বাচীন কবিতাকারদের মুক্তক কবিতা, গীতিকবিতা এবং হংসদূত, উদ্ধবদূত প্রভৃতি। তৃতীয় বিভাগে রামায়ণ ও বিশেষতঃ মহাভারতকে। মনে হয় মাঘ, অথবা শ্রীহর্ষের কাব্য-নাটক এবং ভবভূতির মালতীমাধব প্রভৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আদ্যন্ত পরিচিত ছিলেন না,

সংগ্রাহকদের গ্রন্থ থেকে এঁদের রচিত দু-চারটি বিচ্ছিন্ন শ্লোক হয়ত মনে রেখেছিলেন। সংস্কৃতে রচিত পুরাণ অথবা প্রচলিত ধর্মীয় পুরাণকথা কবিকে অভিভূত করতে পারে নি। রামায়ণ এবং মহাভারত বরং জীবনসংঘর্ষময় কথাবস্তুর দ্বারা কবিচিত্তকে আকর্ষণ করেছে, যেমন করেছে কিছু বৌদ্ধগাথা পরোক্ষভাবে। সাহিত্যিক ভাবধারা বলতে আমরা মনে করতে পারি কবিদের মানস-উৎসের একটি বিশিষ্ট দিক্-মুখে বহমানতা কবি-সম্প্রদায়ের প্রবণতা ও রুচি অথবা একটি আদর্শবোধ যার স্ফুরণে রচনা কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়— যেমন বলা যেতে পারে, কবি কালিদাসের সৌন্দর্যবোধ, বৈষ্ণবকবিকুলের প্রেমভাবুকতা। বস্তু শব্দের দ্বারা চিহ্নিত করা যেতে পারে কোনও আখ্যান বা আখ্যানের অংশ, কোনও বিশিষ্ট সৌন্দর্য-চিত্র, বর্ণিত কোনও চরিত্রের আচরণ প্রভৃতি। সাহিত্যরীতি বলতে মনে করা হয়েছে বিশেষ বাগ্‌ভঙ্গি, অলংকারপ্রয়োগ বা ছন্দোধর্মকে। রবীন্দ্র-চিত্ত বলতে রবীন্দ্র-কবিমানসকেই বুঝতে হবে, তাঁর মননশীল বা বহির্মুখ চিত্তবৃত্তিকে নয়। গৃহীত এবং স্বীকৃত হওয়ার মূলে কবিপ্রতিভার মৌলিক ধর্ম কাজ করে। কবিপ্রতিভা যেন তার কল্পনার উপাদান সংগ্রহের জন্য প্রত্যক্ষ নিসর্গ এবং মানবজীবনের মধ্যে, পরোক্ষ কবিদের সৃষ্ট সৌন্দর্যরাজ্যে পরিভ্রমণ করে ; কবিস্বভাব-অনুসারে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ উপাদানই কবির আন্তর অনুরাগের মধ্যে আত্মীয়রূপে স্বীকৃত হয়। রবীন্দ্রনাথের মত অত্যন্ত কল্পনাশীল গীতিকবির অন্তর্মুখ ভাববিহ্বলতা স্বতঃসিদ্ধ হলেও সেই বিচিত্র ভাবসমূহের উদ্দীপন এবং প্রকাশের অভিলাষ ঐন্দ্রিয়ক বহিঃপ্রেরণার প্রতীক্ষা করেছে। এ প্রেরণা কখনও প্রচ্ছন্ন, কখনও সুপ্রকাশ। তাই গ্রহণ শব্দে কবির সজ্ঞান অথবা জ্ঞাননিরপেক্ষ অনায়াস গ্রহণকেই বুঝতে হবে। একেই আমরা অন্যত্র 'কবিপ্রতিভার স্ববশে গৃহীত পদার্থনিচয়' ব'লে উল্লেখ করেছি। প্রসঙ্গতঃ বলতে পারি, সুকবি-বিরচিত যথার্থ কাব্যের এইরকম গ্রহণ ও স্বাঙ্গীকরণ সম্পর্কে আলোচনাকালে 'প্রভাব' শব্দটির প্রচলিত অর্থে ব্যবহার থেকে নিবৃত্ত হওয়া শ্রেয়ঃ। এরকম আলোচনায় সমভাবাত্মক অংশের (parallel passage) অনুসন্ধানও আমাদের কর্তব্য নয় ; মূলকে পরিস্ফুট করবার জন্য এ টীকাকারের বা ব্যাখ্যাকারের কাছে বরংচ প্রয়োজনীয় হতে পারে।

এইবার রূপান্তরসাধন। রূপান্তর অর্থে কিছু অংশে ভাবান্তরও বুঝতে হবে। পুরাতন ভাব ও বস্তু প্রায়শই অবিকৃত ভাবে কবির চিত্তে প্রতিষ্ঠিত ও মুদ্রিত হয় না। কবির বাসনা ও রুচির দ্বারা অধিবাসিত হয়ে তা নূতন ভাব ও অর্থ উদ্ভাবিত করে। এক্ষেত্রেও কবিস্বভাব নিয়ামক শক্তিরূপে কাজ করে। ফলে পুরাতন কাব্য কালে কালে ও কবি-অনুসারে নূতনতর সৌন্দর্যও বহন করে থাকে, আনন্দবর্ধন-প্রদত্ত উপমা অনুসারে, বৃক্ষ ও শাখাদি এক হলেও নব নব বসন্তে নব নব মূর্তি পরিগ্রহ করে। কবিস্বভাব এবং যুগধর্মের দ্বন্দ্বে পরিবর্তনের প্রকৃতি নিয়মিত হয়। রূপান্তরীভবন সম্বন্ধে এটি সাধারণ তত্ত্ব হলেও রবীন্দ্রনাথে কিছু বিশেষ ঘটেছে। রবীন্দ্রের প্রাচীন সাহিত্য-সম্পর্ক অন্বেষণের কালে এই বিশেষ অবস্থার দিকেও আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। তাঁর স্বাধীন কবিস্বভাব এবং অত্যুগ্র

কল্পনাশীলতা কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রাচীন বস্তু বা ভাবের যথাস্থিত স্বরূপ থেকে কবিনির্মিতিকে বহুদূরে নিয়ে গেছে, কখনও এত দূরে যে কবির সমানধর্মা চিত্তবৃত্তি নিয়ে অগ্রসর না হলে নির্ণয় করা সুসাধ্য নয় কবি কোন্ সৌন্দর্য বা প্রণয়ের চিত্রকে অবলম্বন করে কোন্ কল্পলোকে ধাবিত হয়েছেন। সংস্কৃত জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কবিদের মুক্তক গীতিকবিতাগুলিই কবির এরকম আকাশ-বিহারের সঙ্গে বেশি সংযুক্ত। কবির এমন বহু কবিতা বা গান রয়েছে যার উপাদান পাওয়া যায় এক-একটি সংস্কৃত শ্লোক বা শ্লোকাংশে।

রবীন্দ্রকবিচিত্তের আশ্চর্য প্রসারধর্মের দিকটি স্মরণে রেখে আমরা যেন কবির সৃষ্টিশক্তির যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ যাই গ্রহণ করুন-না কেন, তাঁর উদার কল্পনাশীলতার এবং সর্বগ্রাসী মায়াময় কবিস্বভাবের বশবর্তী হয়েই করেছেন এ কথা মনে না রাখলে প্রাচীন সাহিত্যের অথবা পূর্ববর্তী বা পরবর্তী যে-কোনও উপাদানের মূল্য অযৌক্তিকভাবে বর্ধিত হয়ে পড়তে পারে। ঠিক এই ব্যাপারটিই ঘটেছে উপনিষদের সঙ্গে রবীন্দ্রসম্পর্ক আলোচনাকালে। উপনিষদের মন্ত্রগুলি রবীন্দ্রনাথ নিজ কবিস্বভাবের মধ্যে বহুলাংশে পরিবর্তিত অর্থেই গ্রহণ করেছেন। উপনিষদের মাত্র কিছু কিছু বচন রবীন্দ্রনাথ নিজভাবের সমর্থকরূপেই গ্রহণ করেছেন—উপনিষদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এরূপ সম্পর্ক নির্দেশই রবীন্দ্রকবিস্বরূপ নির্ণয়ের যুক্তিসংগত পন্থা। উপনিষদ রবীন্দ্র-কবিমানসের গঠনে খুব সাহায্য করেছে মনে ক'রে যাঁরা তাঁর কবিতায় উপনিষদকে অতিব্যাপ্ত ক'রে পাঠ করেন তাঁরা রবীন্দ্রকাব্যের প্রতি সুবিচার করেন না বলেই আমাদের ধারণা। এক্ষেত্রে আমরা বরং এদেশীয় সংস্কৃত সাহিত্য ও পদাবলী এবং য়ুরোপের রোম্যান্টিক সাহিত্যধারা ও নব্য-হেগেলীয় দর্শনভাবুকতাকে পুরোবর্তীরূপে দেখবার প্রয়াসী। তথাপি, সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক অধ্যায়টি যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক-না কেন, তার প্রভাবে বা অনুবাদে কবি বিশেষ বিশেষ কবিতা বা নাট্য রচনা করেছেন এ ধারণা প্রামাদিক বলে আমরা মনে করি।

প্রাসঙ্গিকভাবে এ কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, বিস্তৃত রবীন্দ্রকাব্যজীবনের প্রধানতঃ কোনও একটি অংশেই কবির সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রবল আত্মীয়তা ঘটেছিল, সর্বাংশে নয়। এটি তাঁর কাব্যজীবনের যৌবনকাল। মোটামুটি 'চিত্রাঙ্গদা' রচনায় এর ভূমিকা, 'কল্পনা' কাব্যে এর পরিস্ফুট প্রকাশ এবং 'কথা ও কাহিনী' ও 'ক্ষণিকা' রচনায় এর পূর্ণতা। এই সময়কার যাবতীয় প্রবন্ধ রচনায় বা ভাষণেও জাতীয় প্রাচীন জীবনাদর্শের প্রতি কবির অনুরাগ লক্ষণীয়। এই অধ্যায়ের কিছু পূর্বে লেখা 'মেঘদূত' কবিতায় ও 'মেঘদূত' প্রবন্ধে কালিদাসের ঐ কাব্যের প্রতি কবির প্রগাঢ় অনুরক্তি অথচ ঐ কাব্যকে অবলম্বন করেই কবির কল্পনামূলক চিরবিরহরাজ্যে পরিভ্রমণের পরিচয় অবশ্য পাওয়া যায়। জয়দেব ও কালিদাসের কাব্য পাঠ কবির কৈশোরেই প্রারব্ধ হয়েছিল। এঁরা কবিকে প্রৌঢ়ত্বেও অর্থাৎ তাঁর ঋতুনাট্যরচনার সময়েও ভাব এবং রীতির দিক থেকে উদ্বোধিত

করেছেন। কিন্তু কালিদাসেতর অর্বাচীন কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় সঙ্গ ঘটেছিল তাঁর 'কল্পনা'-'ক্ষণিকা' কাব্যরচনার সময়ে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাত প্রায় সহস্রকবির মুক্তক রচনা বিভিন্ন সংস্কৃত কাব্যসংগ্রহে ধৃত হয়েছে। হেবর্‌লিন্‌-সম্পাদিত কাব্যসংগ্রহ গ্রন্থটি যে রবীন্দ্রনাথ যত্নের সঙ্গে পাঠ করেছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই কাব্যসংগ্রহে রয়েছে মেঘদূত ও অন্য দু-একটি দূতকাব্য, অমরুশতক, ঘটকর্পরের যমক-কাব্য, বহু নীতিকবিতা, প্রহেলিকাদি, এবং চৌরপঞ্চাশিকা। কিন্তু এই কাব্যসংগ্রহে পাওয়া যায় না এমন বহু প্রকীর্ণ কবিতার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় যে ছিল তার আভাস আমরা নানা স্থানেই পাচ্ছি। এই সব অর্বাচীন সংস্কৃত গীতিকবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব'লে আমরা মনে করি। এর হয়তো অতি সামান্য অংশ মাত্র আমরা ধরতে পারছি। অধিকাংশই পারছি না, নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন ও মনঃসংযোগের অভাবে। কল্পনা-কথা-ক্ষণিকার যুগে রবীন্দ্রনাথ যেন সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন কাব্য-প্রবৃত্তির উজ্জীবকরূপে দেখা দিয়েছেন। প্রাচীন কাব্যের মধ্যে যা চিত্তাকর্ষক, যা প্রণিধানযোগ্য তা তিনি এমন অনায়াসে এমন কৌশলে আমাদের গোচরে এনেছেন যে তাঁর কাব্যপাঠে বিস্মৃত প্রাচীন সৌন্দর্যরাজ্য মুহূর্তে আমাদের চিত্তে উদ্ভাসিত হয়ে আমাদের বিহ্বল করে তোলে এবং পুরাতন নিসর্গ এবং মানবজীবনের জন্য আকাঙ্ক্ষায় অধীর করে। রবীন্দ্রনাথ কালিদাস-বাণভট্টের কালের নিসর্গ-সৌন্দর্য এবং প্রণয়কলার যুগ থেকে ক্রমে মানবজীবনের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের মধ্যে উপনীত হতে চেয়েছেন এবং ঐ অভিলাষের বশেই মহাভারত-কথাকে অবলম্বন করতে চেয়েছেন। ভারতকথার রূপান্তরের মধ্যে কবির যে আদর্শভাবুকতা মিশ্রিত দেখা যায় (গান্ধারীর আবেদন, কর্ণকুন্তীসংবাদ, কচ ও দেবযানী প্রভৃতি দ্রষ্টব্য) তা কবির এই প্রাচীনানুসরণ-প্রবৃত্তির মধ্যে গৌণভাবে সংযুক্ত হয়ে পড়েছিল বলে আমরা মনে করি। এর স্বল্প পরে লেখা কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার আলোচনায় কবি স্পষ্টতঃ ভারতীয় জীবনাদর্শের দিক থেকে ঐ দুই গ্রন্থের মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন। কল্পনা-ক্ষণিকার যুগে কবি প্রাচীন নিসর্গ-ভাবুকতা ও প্রণয়বন্ধনের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যে-আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন তার সারবস্তু তাঁর ঋতুনাট্যরচনার কালে (শেষবর্ষণ, বসন্ত, বনবাণী, তপোভঙ্গ কবিতা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য) পরিচ্ছন্ন অথচ সূক্ষ্মভাবে অনুবৃত্ত হয়েছে। কুমারসম্ভব ও শকুন্তলায় পরিদৃষ্ট প্রেমাদর্শ 'মহুয়া' ও 'তপতী' রচনায় তাঁকে সাহায্য করেছে। তা ছাড়া ঐ তপতী নাটকের এবং ঋতুনাট্যগুলির নির্মাণে কবি তাঁর যৌবনকালের সংস্কৃতনাট্যপাঠকে যতদূর সম্ভব কাজে লাগিয়েছেন। পাঠক সহজেই লক্ষ্য করতে পারবেন যে ঐ সব নাট্যের অন্তর্গত রাজা, বিদূষক, চেটী, কঞ্চুকী, কবিশেখর প্রভৃতি চরিত্র এবং অন্তঃপুর, উদ্যান প্রভৃতির চিত্র তাঁর ঐসব রচনায় একটি যথাযথ প্রাচ্য পরিবেশ সৃষ্টি করেছে এবং ঐ রচনাগুলিকে স্বাদে আধুনিকের আবহাওয়ার মধ্যে অভিনব করে তুলেছে। কয়েকটি ছোটগল্পেও রবীন্দ্রনাথ

এইভাবে আমাদের প্রাচীনের স্বাদ দিয়েছেন। এই সব কারণে রবীন্দ্রকবিপুরুষের প্রাচীনানুসরণের এই অধ্যায়টি আমরা অতিশয় মূল্যবান বলে মনে করি।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রাচীনানুরাগের বিষয়টিকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আর একটু ব্যাপক পটভূমির মধ্যে দেখা যাক। এই প্রবৃত্তি যেন ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যেরই একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের পর থেকে সংস্কৃতে সাহিত্য রচনার ধারা প্রায় বিলুপ্ত হলেও ভাষার মধ্যেই সংস্কৃত সাহিত্যিকতা আত্মপ্রকাশের পথ গ্রহণ করেছে। কৃষ্ণকীর্তন আখ্যায় প্রচলিত বাঙলার প্রথম কাব্য শুধু পুরাণ এবং জয়দেবেরই অনুসরণ করে নি, প্রকীর্ণ-কবিতাকারদের বহু কবিতা আত্মসাৎ করেছে। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত উৎকৃষ্ট বহু পদের এবং গোবিন্দদাসাদির উল্লেখযোগ্য পদের পশ্চাতে আমরা সংস্কৃত অর্বাচীন কবিতাবলীর ছায়া লক্ষ্য করেছি। আমাদের অনুমান, বিখ্যাত সংগ্রহ-গ্রন্থে স্থান পায় নি এমন বহু সংস্কৃত মুক্তক কাব্য তৎকালের বিদ্বৎ-সমাজে প্রচলিত ছিল এবং বিশিষ্ট বাঙালি সাহিত্যিকদের জানা ছিল। এ ছাড়া প্রাচীন বাঙলার অন্যান্য শাখার কবিদের, যেমন ধর্মমঙ্গলের রূপরাম, শিবায়নের রামকৃষ্ণ, চণ্ডীমঙ্গলের মুকুন্দরাম ও দ্বিজ রামদেব এবং অন্নদামঙ্গলের ভারতচন্দ্রের রচনায় স্থানে স্থানে কালিদাসাদি ও অর্বাচীন সংস্কৃত কবিদের অনুসরণ এবং প্রাচীন-রীতিনিষ্ঠা লক্ষিত হয়। আধুনিক বাঙলার প্রথম কবি পাশ্চাত্ত্য ভাবদীক্ষিত মধুসূদন তাঁর বিখ্যাত মহাকাব্যে এবং বীরাঙ্গনাকাব্যে প্রয়োজনবশে কালিদাস ভবভূতির রচনা থেকে অংশবিশেষ প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করে নিজ বর্ণনাকে সমৃদ্ধ করার প্রয়াস যদিচ করেছেন, তাঁর নাট্যরচনায় সংস্কৃত নাটকের সংলাপ-পদ্ধতি এমন-কি চরিত্রবিশেষ অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছেন। ফলতঃ এ কথা স্বীকার্য যে বাঙলার উল্লেখযোগ্য কবিমাত্রেই প্রাচীনের সাহিত্যসম্পদের আকর্ষণ থেকে নিজকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত রাখতে পারেন নি। আর রবীন্দ্রনাথ প্রাচীনানুসরণের দিক দিয়ে সব চেয়ে অধিক ব্যাপকতা ও বৈশিষ্ট্য যে দেখাতে পেরেছেন সে তাঁর সুমহৎ কবিধর্মেরই ফল।

রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতকাব্যশিক্ষা ইংরেজি ও অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বাল্যেই প্রারব্ধ হয়েছিল। প্রারম্ভে শিক্ষকের কাছে কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞান-শকুন্তল, বাল্মীকি রামায়ণের আদিকাণ্ড, সম্ভবতঃ ঋতুসংহারের কিছু কিছু অংশ, কিছু নীতিকবিতা এবং ভবভূতির উত্তর-রামচরিত। পরে স্বকৃতভাবে কবি অধ্যয়ন করেছিলেন গীতগোবিন্দ, মেঘদূত এবং কালিদাসের অন্য দুটি নাটক, কাদম্বরী, অমরুশতক, ঘটকর্পরের বর্ষাবর্ণন, চৌরপঞ্চাশিকা, হংসদূত, উদ্ধবদূত এবং অগণিত প্রকীর্ণ কবিতা। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা প্রথমে জয়দেব, কালিদাস ও বাণভট্টের রচনা, পরে ঘটকর্পর, অমরু প্রভৃতির কাব্য এবং প্রকীর্ণ কবিতার অনুসরণ দেখাচ্ছি, শেষে মহাভারতের কথাবস্তুর স্বাঙ্গীকরণ ও রূপান্তরের বিষয়টি প্রতিপন্ন করছি।

বৈষ্ণবপদকর্তাদের পদাবলীর সঙ্গে গীতগোবিন্দ এবং মেঘদূতের মাত্র বিষয়বস্তুর উল্লেখ

পাই প্রথম 'মানসী' কাব্যের 'একাল ও সেকাল' এবং 'কুহুতান' কবিতায়। গীতগোবিন্দের অবতরণিকা শ্লোকটির প্রথম চরণের অতি সংক্ষিপ্ত বর্ষার নিসর্গবর্ণন কবিকে বিশেষ মুগ্ধ করেছিল। এর উল্লেখ কবি বিভিন্ন স্থানে করেছেন। গীতগোবিন্দের প্রণয়কলাবিলাস তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল এমন মনে হয় না, কিন্তু গীতগোবিন্দের অনুপ্রাসময় ললিত ভাষারীতি তাঁর কাব্যকলায় সামগ্রিকভাবে অনুস্যূত হয়েছে।

কালিদাসের মেঘদূতের সঙ্গে কবির পরিচয়ের একটি পূর্ণরূপ পেলাম 'মেঘদূত' কবিতায়। এই কবিতাটির রচনার পশ্চাতে যে কবিস্বভাব বিদ্যমান রয়েছে তা রবীন্দ্রনাথের একান্ত স্বকীয়; কারণ, একটি অনির্দেশ্য বিরহব্যাকুলতাবোধ এই কবিতাটির ভাববীজ, কিন্তু 'মেঘদূত' কাব্য যে প্রবল উদ্দীপনের কাজ করেছে তা কবির উক্তির মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। পূর্বমেঘের বিখ্যাত চিত্রগুলির এবং অলকাপুরীর বিরহিণীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে কবি বলছেন—

সেথা কে পারিত
লয়ে যেতে তুমি ছাড়া করি অবারিত
লক্ষ্মীর বিলাসপুরী—অমর ভুবনে।...
কবি, তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হয়ে যায়
রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা।
লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক।

যে অনির্দেশ্য বিরহকাতরতা অথবা নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য-বিরহ কবির একালের একটি উল্লেখনীয় প্রবৃত্তি তার প্রথম সুস্পষ্ট কবিতা হল 'মেঘদূত'। এ ক্ষেত্রে কেউ যদি এমন কথা বলেন যে কালিদাসের মেঘদূতই কবির এই চিত্তবৃত্তির নিয়ামক তা হলে প্রতিবাদ করা কঠিন, কারণ, কালিদাস অলকাপুরীর বর্ণনায় যে সৌন্দর্য ও আনন্দের চিত্রের অবতারণা করেছেন এবং বিরহিণী যক্ষপ্রিয়ার যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে একটি অপ্রাপণীয় সৌন্দর্যলোক এবং 'সৌন্দর্যের আদিসৃষ্টি' মানসী প্রিয়তমার জন্য অভিলাষ সহজেই চিত্তে জাগরিত হয়ে ওঠে। 'মেঘদূত' কবিতা রচনার খুব কাছাকাছি সময়ে সংস্কৃত কাব্যনাটক নিয়ে কবিহৃদয়ের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ দেখছি না; এখন ঐ মনোভঙ্গি নিয়ে শুধু কল্পলোকে বিচরণের পালা। তবু 'সোনার তরী' কাব্যের 'নিদ্রিতা' এবং 'সুপ্তোত্থিতা' কবিতার স্খলিতাঞ্চলা রাজকন্যার বর্ণনায়, রাজপুরী ও নিসর্গের চিত্রে মালবিকাগ্নিমিত্র এবং বিক্রমোর্বশীয়কে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

সংস্কৃতের প্রসাদ ও মাধুর্যগুণ সমন্বিত স্টাইল, নাট্যোচিত বক্রোক্তিময় সংলাপ এবং প্রণয়কলা ও নিসর্গের চিত্রে যে-বিশিষ্ট রমণীয়তার স্বাদ পাওয়া যায় তার একটি পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্যে প্রথম পরিস্ফুট হয়েছে। এই নাট্যকাব্যের রচনার মূলে নিঃশেষে 'কাদম্বরী'-কথা বিদ্যমান। মহাভারতে অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার প্রণয়ের ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। চিত্রাঙ্গদা-নাট্যের প্লটবিন্যাস কবির স্বকীয়। মদন এবং বসন্তের মধ্যস্থতায়

চিত্রাঙ্গদার রূপযৌবনপ্রাপ্তি থেকে অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার মোহভঙ্গ পর্যন্ত অধ্যায়টির মধ্যে শৃঙ্গাররসের যে-আলম্বন এবং উদ্দীপনের চিত্রের অবতারণা করা হয়েছে তা সর্বপ্রযত্নে ক্লাসিক্যাল এবং কাদম্বরীর চন্দ্রাপীড়-মহাশ্বেতা-পুণ্ডরীক অধ্যায়টিরই সূক্ষ্ম অনুসরণক্রমে গঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে অর্জুনের সরসীদর্শন এবং চিত্রাঙ্গদা-দর্শন চন্দ্রাপীড় কর্তৃক অচ্ছোদ সরোবরের এবং মহাশ্বেতার বর্ণনা থেকে কল্পিত হয়েছে। অবশ্য মহাশ্বেতার তপস্বিনীমূর্তিকে কবি গ্রহণ করেন নি। সম্ভাব্য মানবীমূর্তিকেই অবলম্বন করেছেন। এর মধ্যে কাদম্বরীর হাবভাব বা পার্বতীর রূপ মিশ্রিত থাকাও বিচিত্র নয়। এরই সঙ্গে একত্র 'বিজয়িনী' কবিতার ('অচ্ছোদসরসীনীরে রমণী যেদিন নামিলা স্নানের তরে,') নারীসৌন্দর্য এবং বসন্তোদ্ভব লীলাবিলাসের কথা চিন্তা করতে হবে। নবরূপপ্রাপ্তা চিত্রাঙ্গদা এবং দৈহিক সুষমার সারভূতা বিজয়িনীর চিত্র দুটি একই নির্মাণের ভিন্ন আধারে প্রকাশ মাত্র। উভয়ের প্রেক্ষাপটে যে সমীরমর্মরিত গুঞ্জনগীতিময় বসন্ত রয়েছে, তার সূত্ররূপে যেমন কুমারসম্ভবের অকালবসন্তের কথা স্মরণ করতে হবে তেমনি মহাশ্বেতার বচনে গ্রথিত মধুমাসদিবসের বর্ণনাও মিলিয়ে নিতে হবে—'অথ বিজৃম্ভমাণনবনলিনবনেষু অকঠোর-চূতকলিকাকলাপকৃতকামুকোৎকলিকেষু কোমলমলয়মারুতাবতারতরঙ্গিতানঙ্গধ্বজাংশুকেষু ...মধুমাসদিবসেষ্বেকদাহমম্বয়া সহ মধুমাসবিস্তারিতশোভং প্রোৎফুল্লনবনলিনকুবলয়-কহ্লারমিদমচ্ছোদং সরঃ স্নাতুমভ্যাগমম্।' চিত্রাঙ্গদার ব্রতধারী অর্জুন মহাশ্বেতার প্রণয়ী তাপসকুমার পুণ্ডরীকের সঙ্গে তুলনীয়। 'ভস্মসুপ্ত অগ্নি যথা' প্রভৃতি অর্জুনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নোদ্ধৃত অংশ থেকে উদ্দীপ্ত হওয়া স্বাভাবিক—'অতিতেজস্বিতয়া প্রচলত্তড়িল্লতা-পঞ্জরমধ্যগতমিব গ্রীষ্মদিবসদিবসকরমণ্ডলোদরপ্রবিষ্টমিব জলদনলজ্বালাকলাপমধ্যস্থিতমিব বিভাব্যমানম্' এবং চিত্রাঙ্গদার উক্তি 'যখন প্রথম দেখিলাম তারে, যেন মুহূর্তের মাঝে অনন্ত বসন্ত ঋতু পশিল হৃদয়ে' প্রভৃতির সঙ্গে 'রূপৈকপক্ষপাতী নবযৌবনসুলভঃ কুসুমায়ুধঃ কুসুম-সময়মদ ইব মধুকরীং পরবশামকরোৎ' প্রভৃতি তুলনীয়। সরসীতীরে শিবালয়ের নিকটে সমাসীন অর্জুনের চিন্তা—

> সংসারের মূঢ় খেলা দুঃখ সুখ উলটি পালটি ;
> জীবনের অসন্তোষ ; অসম্পূর্ণ আশা,
> অনন্ত দারিদ্র্য এই মর্ত্য মানবের।

প্রভৃতির সঙ্গে সিদ্ধায়তনে রোদনমুখী মহাশ্বেতার সমীপে উপবিষ্ট চন্দ্রাপীড়ের চিন্তা তুলনীয়—'অহো দুর্নিবারা ব্যসনোপনিপাতানাং...সর্বথা ন ন কঞ্চন স্পৃশতি শরীরধর্মাণ-মুপতাপাঃ বলবতী হি দ্বন্দ্বানাং প্রবৃত্তিঃ' ইত্যাদি। এ ছাড়া চিত্রাঙ্গদার রূপযৌবনের সঙ্গে মিশ্রিত অকারণ বিষাদের ভাবটি মহাশ্বেতার রূপবর্ণনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত বিষাদের ছায়ার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।

'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যের বক্রোক্তিময় সংলাপের বিভিন্ন স্থান অভিজ্ঞান-শকুন্তল প্রভৃতি নাটক থেকে একেবারে প্রত্যক্ষভাবে গৃহীত। ফলতঃ 'চিত্রাঙ্গদা' যে প্রাচীন সাহিত্যানুশীলনের

একটি অমৃতাস্বাদময় ফল তাতে সন্দেহ নেই। এর শৃঙ্গাররসবর্ণনে যে প্রাচীন রীতি অবলম্বিত হয়েছে সেদিকে লক্ষ্য না করেই কোনও রসদর্শী এতে রুচিবিকার দেখেছেন। চিত্রাঙ্গদার পরবর্তী 'বিদায়-অভিশাপ' কাব্যনাট্যেও কবি স্থানে স্থানে অভিজ্ঞান-শকুন্তলের তপোবন-বর্ণনার সাহায্য নিয়েছেন। এর মূল কবিকৃতিটি মহাভারত অনুসরণে হলেও মহাভারত থেকে এর পার্থক্যও গুরুতর। সে কথা পরে আলোচিত হচ্ছে।

এর পর কাদম্বরী কাব্যের অনুসরণ 'আবেদন' কবিতায় ('আবেদন আছে মহারানী··· আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর') এবং পূর্বোল্লিখিত 'বিজয়িনী' কবিতায় পরিস্ফুট। 'বিজয়িনী'র পরাভূত মদন এবং 'আবেদন' কবিতার রানীর মালঞ্চের মালাকর, চারিত্রের দিক থেকে, মহাশ্বেতার অনুবর্তমান অভিভূত এবং সশ্রদ্ধ চন্দ্রাপীড়ের আচরণ স্মরণ না করিয়ে পারে না। অলৌকিক রূপবতী অথচ তাপসী মহাশ্বেতার বর্ণনায় পরাকৃত যৌবনের প্রসঙ্গ স্মরণীয়—'যৌবনেন নির্বিকারবিনীতেন শিষ্যেণেব উপাস্যমানা'। 'আবেদন' কবিতায় কবির যে দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ তাকে সাধারণভাবে বলা চলতে পারে ওরিএন্টাল। প্রাচীন সাহিত্যের চিত্রসৌন্দর্যের সঙ্গে যিনি পরিচিত তিনি 'আবেদন' কবিতার নিম্নলিখিত পরিচিত পঙ্‌ক্তিগুলির নির্মাণদৃষ্টে নিশ্চয়ই অধিকতর মুগ্ধতা অনুভব করবেন—

বিজনে বিরলে
হেথা তব দক্ষিণের বাতায়নতলে
মঞ্জরিত ইন্দুমল্লী-বল্লরীবিতানে,
ঘনচ্ছায়ে, নিভৃত কপোত-কলগানে
একান্তে কাটিবে বেলা ; স্ফটিকপ্রাঙ্গণে
জলযন্ত্রে উৎসধারা কল্লোলক্রন্দনে
উচ্ছ্বসিবে দীর্ঘদিন ছল ছল ছল—

রবীন্দ্রনাথও প্রাচীনের এই মালঞ্চের নিপুণ আধুনিক মালাকর। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এতে নায়িকা কাদম্বরী এবং তার ভবনের পরিপার্শ্বই মুখ্যভাবে চিত্রিত হয়েছে। তা ছাড়া মালবিকাগ্নিমিত্রের রাজোদ্যান-বর্ণনা এবং কুমারসম্ভবের নিসর্গেরও ক্ষীণ ছায়াপাত ঘটেছে। এই নিসর্গসম্পর্কযুক্ত, প্রত্যক্ষতা থেকে দূরবর্তী স্বপ্নরাজ্যে অবস্থানের অভিলাষ এখন থেকে বর্ধিত হয়ে 'ক্ষণিকা'র কাল পর্যন্ত পরিস্ফুটভাবে প্রসারিত হয়েছে এবং আরও পরবর্তী কালে স্বল্প আদর্শানুভবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, ঋতুসংগীত ও ঋতুনাট্যের মধ্যে পরিণাম ও সমাপ্তি লাভ করেছে। 'আবেদন' কবিতায় নায়িকা রাণীর যে রূপ ও আচরণ কবি তুলে ধরেছেন অথবা 'বিজয়িনী' কবিতায় যে নারীসৌন্দর্যকে কবি বিভাবিত করেছেন তার প্রতিকৃতি একালের বাস্তব থেকে গৃহীত এ কথা আশা করি রসিক পাঠক মনে করবেন না—

কনকমুকুর অঙ্কে, শুভ্র পদ্ম করে
বিনাইবে বেণী। কুমুদসরসীকূলে

বসিবে যখন সপ্তপর্ণতরুমূলে
মালতীদোলায়, পত্রচ্ছদ-অবকাশে
পড়িবে ললাটে চক্ষে বক্ষে বেশবাসে
কৌতূহলী চন্দ্রমার সহস্র চুম্বন···

কালিদাসের ‘বিক্রমোর্বশীয়’ নাটকের স্মৃতি ‘উর্বশী’ কবিতায় পরিস্ফুটভাবে রূপ পরিগ্রহ করেছে। আমরা বলি, বিক্রমোর্বশীয় পাঠে উদ্‌বুদ্ধ হয়েই কবি উর্বশী কবিতা রচনা করেছেন। বস্তুতঃ কালিদাসের কাব্যকল্পনার প্রতিধ্বনি রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতানুগ রচনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক— তাঁর যৌবনকাব্যোন্মেষ থেকে পরিপাকের অবস্থা পর্যন্ত নানাস্থানে তা বিক্ষিপ্ত আকারে রয়েছে এবং এ অত্যন্ত স্বাভাবিকও সন্দেহ নাই। তবু পরিস্ফুট প্রকাশের দিক থেকে এবং আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য মোটামুটি গ্রন্থ অনুসারে একটা বিভাগ আমরা ধরে নিয়েছি মাত্র। বিখ্যাত ‘উর্বশী’ কবিতায় কবির একালের সৌন্দর্য-অভিলাষের একটা পরিণামের অবস্থা। ‘মণিহর্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা’ যে ‘সৌন্দর্যের আদিসৃষ্টি’র জন্য একটা ব্যাকুলতা ‘মেঘদূত’ কবিতায় প্রারব্ধ হয়েছিল সেই নারীমূর্তিকে কবি এখন উর্বশীর মধ্যে লক্ষ্য করছেন। ঐ কবিতাটিতে সুইন্‌বার্নের আফ্রোদিতের এবং ভারতীয় পৌরাণিক কথার ছায়াপাত ঘটলেও কবির সৌন্দর্যের প্রতি আগ্রহ এবং বিরহস্বভাবটিকে নিয়মিত করেছে বিক্রমোর্বশীয় নাটকের পুরুরবার মুখে উচ্চারিত উর্বশীর অলৌকিক সৌন্দর্যের বর্ণনা এবং তার বিরহকাতরতা। কালিদাস এই স্বর্গীয় অপ্সরের বর্ণনায় যথাসাধ্য অ-লৌকিকত্ব রক্ষা করেছেন। উর্বশীর নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যাওয়ার মধ্যে এবং পুরুরবার উন্মত্ত বিরহ অনুভব করার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কল্পিত সৌন্দর্যময়ী থেকে কল্পিত বিরহই সূচিত হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যরসিক মনোযোগ সহকারে বিক্রমোর্বশীয় পাঠ করলে উভয়ত্র একই রীতির অলৌকিক নারীরূপের প্রেরণা অনুভব করতে পারবেন। উর্বশীর চিত্রনির্মাণেও বিক্রমোর্বশীয় বহুল পরিমাণে উপাদান নির্বাহ করেছে। এই উর্বশীর বর্ণনার ‘নূপুর গুঞ্জরি যাও আকুল-অঞ্চলা বিদ্যুৎচঞ্চলা’ প্রভৃতি পঙ্‌ক্তির সঙ্গে ‘চিত্রা’ নামীয় কবির সৌন্দর্যবিষয়ক অপর কবিতার ‘মুখর নূপুর বাজিছে সুদূর আকাশে’ প্রভৃতি একত্র ক’রে বিক্রমোর্বশীয়ের—‘গূঢ়ং নূপুরশব্দমাত্রমপি মে কান্তং শ্রুতৌ পাতয়েৎ’ এবং ‘অচিরপ্রভা-বিলাসিতৈঃ পতাকিনা’ প্রভৃতি বর্ণনা স্মরণ করতে হবে এবং উর্বশীর অলৌকিক রূপ বর্ণনার দিকটি বিক্রমোর্বশীয়ের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত উপাদানের মধ্যে ধরতে হবে।

‘চিত্রা’র পর ‘চৈতালি’ কাব্যে কবির কালিদাসপ্রীতি, তপোবনপ্রীতি, নিসর্গনিষ্ঠা, আধুনিক নাগর-সভ্যতার প্রতি বিতৃষ্ণা এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবনাদর্শের প্রতি আগ্রহ প্রভৃতি প্রবৃত্তিনিচয়কে একত্র মিলিত ক’রে অনুধাবন করতে হবে যে, সংস্কৃত-সাহিত্যানুরাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন নিসর্গাশ্রিত জীবনের উপর কবির প্রীতিপক্ষপাত ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। ‘চৈতালি’তে কালিদাস এবং তাঁর কাব্যনাটককে নিয়ে লেখা

সাতটি সনেট রয়েছে। সেগুলি হ'ল ঋতুসংহার, মেঘদূত, মিলনদৃশ্য, কালিদাসের প্রতি, কুমারসম্ভব গান, মানসলোক এবং কাব্য। তা ছাড়া অন্য দু-চারটি সনেটেও কালিদাসীয় জীবনবোধ এবং নিসর্গ-আত্মীয়তার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই সনেটগুচ্ছ কালিদাসের ও প্রাচীন ভারতের প্রতি কবির স্থায়ী ও অন্যকবি-দুর্লভ অনুরাগের নিদর্শন। এরই ফলে কবি অতীতের তপোবনাশ্রিত মুক্ত জীবনের আদর্শে নবজীবনের দীক্ষা গ্রহণ করতে চেয়েছেন নৈবেদ্যের কাল পর্যন্ত রচিত বহু কবিতায় ও প্রবন্ধে।

'চৈতালি'র পরই 'কল্পনা' থেকে সংস্কৃতানুসরণের নূতন অধ্যায়ে প্রবিষ্ট হচ্ছি। এই অধ্যায়ে কালিদাসের মেঘদূত, ঋতুসংহার, বিক্রমোর্বশীয় এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ তো আছেই, অধিকন্তু ঘটকর্পরের বর্ষাবর্ণন, অমরুবিরচিত প্রণয়মূলক গীতিকাব্য এবং সংস্কৃত অর্বাচীন কবিসম্প্রদায়ের প্রকীর্ণ কবিতার স্পর্শ পাওয়া যায়। কবির কল্পনা-বাহিত প্রাচীন সাহিত্যের স্বপ্নরাজ্যে নিঃশেষে প্রবেশের দিকটি যেন 'স্বপ্ন' কবিতার প্রথম কয়েক পঙ্‌ক্তির মধ্যে ধরা পড়েছে—

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।

এই কয়টি পঙ্‌ক্তি যেন সংগীতের ধ্রুবপদের মত কবির একালের রচনায় বারংবার আবৃত্ত হয়েছে। 'কল্পনা' থেকে 'ক্ষণিকা' পর্যন্ত আকর্ষণীয় কবিতাগুলির মধ্যেকার চিত্র এবং সুর দুইই প্রাচীন সাহিত্যের, তার উপর সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিমাধুর্য এবং স্থানবিশেষে দীপ্তিময় ওজোগুণ এসে যোগ দিয়েছে। আমাদের ধারণায় এতকাল অর্থাৎ 'কল্পনা' রচনার পূর্ব পর্যন্ত সংস্কৃতের অনুপ্রাস সৌন্দর্য এবং শব্দের মার্জন সম্বন্ধে কবির মুগ্ধতা থাকলেও নিজ কবিতায় এর পরীক্ষামূলক প্রয়োগ সম্পর্কে কবি সচেষ্ট হন নি। কল্পনার নিসর্গ কবিতাগুলিতে ধ্বনির মাধুর্যের ও দীপ্তির সঞ্চারে এক নূতন কল্পলোকই কবি আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত ক'রে দিয়েছেন ('বর্ষামঙ্গল', 'বৈশাখ' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য), আর এরই অধিকতর নৈপুণ্যময় আবৃত্তি চলেছে আপাতত 'কথা' ও 'ক্ষণিকা' রচনা পর্যন্ত। ধ্বনিবক্রতা বিষয়ে যেন আতিশয্যময় পরীক্ষামূলকতার চিহ্ন বহন করছে 'দুঃসময়' ও 'অসময়' শীর্ষক কবিতা দুটি। এতে নির্বিচার অথচ সজ্ঞান অনুপ্রাস-প্রয়োগ অনেক সময় এমন পঙ্‌ক্তির উদ্ভব ঘটিয়েছে যাকে বলা যেতে পারে 'শব্দচিত্র' কাব্য অথবা ব্যঞ্জনাগুণহীন বাগ্‌বিকল্প মাত্র। কিন্তু এই পরীক্ষণ-প্রয়াসের পরে লেখা 'বর্ষামঙ্গল', মদনভস্মের পূর্বে ও পরে প্রভৃতি কবিতার প্রাচ্য শৃঙ্গাররসচিত্রের সঙ্গে তদুচিত গুণানুকূল বর্ণরচনা শ্রুতির মাধ্যমে আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করেছে। এর পরিমিতিময় পূর্ণতা সাধিত হয়েছে অবশ্য 'কথা' কাব্যে এবং 'ক্ষণিকা'র কয়েকটি কবিতায়। ললিতমাধুর্যময় অনুপ্রাস

প্রয়োগের দিক্ থেকে মুখ্যতঃ জয়দেব কবিকে অনুপ্রাণিত করেছেন ব'লে আমরা মনে করি।

'বর্ষামঙ্গল' কবিতাটির মধ্যে ঋতুসংহার, মেঘদূত এবং ঘটকর্পরের বর্ষাবর্ণনের ছায়াপাত ঘটেছে। 'উতলা কলাপী কেকাকলরবে' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তি ঘটকর্পরের 'মেঘশব্দ-মুদিতাঃ কলাপিনঃ' এবং 'নবাম্বুমত্তাঃ শিখিনো নদন্তি' পঙ্‌ক্তিদ্বয়, আর 'শশিতারাহীনা অন্ধতামসী যামিনী' ঘটকর্পরের 'মেঘাবৃতং নিশি ন ভাতি নভো বিতারং' 'রবিচন্দ্রাবপি নোপলক্ষিতৌ' প্রভৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়। সংস্কৃত অগণিত কাব্য-কবিতায় পঞ্চশরের যে প্রতাপ কীর্তিত হয়েছে তারই যেন সারাংশ নিয়ে রচিত হয়েছে মদনভস্মের পূর্বে এবং পরে। এ ছাড়া 'ভ্রষ্টলগ্ন', 'স্বপ্ন' এবং 'ঝড়ের দিনে' প্রভৃতি কবিতায় প্রাচীনের নায়িকাদের সঙ্গে কবি স্বপ্নে ও কল্পনায় মিলনের অভিলাষ করেছেন। 'স্বপ্ন' কবিতার প্রস্ফুট রোম্যান্টিক বিরহস্বভাবটি যদিচ কবির স্বকীয়, সেই বিরহে প্রাচীন সাহিত্যের কল্পনার মধ্যে সঞ্চরণ ঐ সাহিত্যের সঙ্গে কবির নিবিড় আন্তরিক যোগই সূচিত করে। 'স্বপ্ন' কবিতার প্রারম্ভে ও শেষে মেঘদূত এবং মধ্যে বিক্রমোর্বশীয় ও মালবিকাগ্নিমিত্রের সন্ধ্যাগমের ও নারীদের প্রসাধনের ছবি দেওয়া হয়েছে। 'স্পর্ধা' ('সে আসি কহিল, প্রিয়ে মুখ তুলে চাও') এবং 'ভ্রষ্টলগ্ন' ('শয়নশিয়রে প্রদীপ নিবেছে সবে') কবিতা দুটি অমরু অথবা অনুরূপ কোনও কবির প্রকীর্ণ কবিতায় প্রদর্শিত ব্রীড়াপরমা মুগ্ধা নায়িকার চিত্র থেকে গৃহীত ব'লে অনুমান করি। 'পসারিণী', 'প্রণয়স্বপ্ন' এবং 'লীলা' কবিতাত্রয় কোন্ কোন্ কবিতাংশ থেকে পুষ্ট হয়েছে কে জানে। কিন্তু 'কেন যামিনী না যেতে' প্রভৃতি পরিচিত গানটির রচনামূলে আমরা নিঃসন্দেহে দু-একটি প্রভাত-বর্ণন বা মানিনী-বর্ণনের চিত্রের অনুবর্তন লক্ষ্য করেছি। 'কোনোমতে আছে পরাণ ধরিয়া কামিনী শিথিল সাজে' চরণে শুধু কালিদাসের 'আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশঃ' ইত্যাদির কথাই মনে পড়ে না, অমরুর বিপ্রলব্ধাবর্ণনার 'কিসলয়মৃদুর্জীবেদেবং কথং প্রমদাজনঃ' পঙ্‌ক্তিও অবশ্য স্মৃতিতে জাগরিত করে। দেখতে হবে, রবীন্দ্র-প্রযুক্ত 'কামিনী' শব্দটি শ্লিষ্ট, অর্থাৎ তা যেমন কামিনী ফুলের কথা বলছে তেমনি নারীর অর্থাৎ ঐ নায়িকার কথাও ব্যঞ্জিত করছে। ঐ গীতের আকুল 'কবরী'র উল্লেখে উমাপতিধরের 'প্রিয়ায়াঃ প্রত্যূষে গলিতকবরী-বন্ধনবিধৌ'এর অনুসরণ এবং 'নিবিয়া বাঁচিল নিশার প্রদীপ উষার বাতাস লাগি, রজনীর শশী গগনের কোণে লুকায় শরণ মাগি' এ দুই পঙ্‌ক্তির নির্মাণে উদ্ভট কবির 'গতপ্রায়া রাত্রিঃ কৃশতনুশশী শীর্যত ইব, প্রদীপোঽয়ং নিদ্রাবশমুপগতো ঘূর্ণত ইব' এ দুই পঙ্‌ক্তির চিত্র কবির অভিপ্রেত সিদ্ধ করেছে। কিন্তু ঐ নায়িকা কর্তৃক 'বধূ চলে জলে লইয়া গাগরি' উক্তির মধ্যে অন্য নারীর উল্লেখে তো আদিরসাত্মক সৌন্দর্য রক্ষিত হ'ল না। ফলতঃ এ কথা মনে করতেই হয় যে শৃঙ্গাররসাত্মক প্রকীর্ণ কবিতায় বহুলপরিদৃষ্ট পরকীয়াপ্রীতিই এখানে কবিকে উদ্দীপিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথের একালের সংস্কৃত কাব্যানুরাগের অপর দৃষ্টান্ত হল 'চিরকুমার সভা'র

'রসিক'-এর চরিত্র এবং তার উচ্চারিত রসব্যঞ্জক সংস্কৃত কবিতা। এগুলি অমরুশতক, হংসদূত, চৌরপঞ্চাশিকা, মালতীমাধব প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে অথবা সংগ্রহ-গ্রন্থ থেকে সমাহৃত। হেবর্‌লিন সম্পাদিত কাব্যসংগ্রহে এর কয়েকটি মাত্র রয়েছে। 'চিরকুমার সভা'র প্রধান চরিত্র অক্ষয়ের সংলাপেও সংস্কৃত বাগ্‌ভঙ্গির অনুসরণ দ্রষ্টব্য। বস্তুতঃ একালটি পূর্ণভাবে সংস্কৃতকে স্বীকরণের কাল। রবীন্দ্রের কবি-অভিপ্রায় প্রাচীনকে আশ্রয় ক'রে এই যে কলানৈপুণ্যময় ভাষার সৃষ্টিতে এবং চিত্র বা চিত্রকল্প যোজনায় আত্মনিয়োগ করলে এর ফল সুদূরপ্রসারী হল। দেখা যায়, একালেই প্রাচীনের কথাবস্তু নিয়ে লেখা 'কথা' কাব্যের রচনায়— ব্রাহ্মণ, পরিশোধ, পূজারিণী, অভিসার প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় ভাষা ও অর্থের, শব্দ ও চিত্রের শোভাশালী 'সাহিত্য' সংসাধিত হয়েছে। 'নগরীর নটী চলে অভিসারে যৌবনমদে মত্তা', 'শূন্য নগরী নিরখি নীরবে হাসিছে পূর্ণচন্দ্র', 'ঝরিছে মুকুল, কূজিছে কোকিল, যামিনী জোছনামত্তা' প্রভৃতি একাধারে ভাষারীতি ও চিত্রকল্পযোজনার নিদর্শন। 'কথা'য় 'কল্পনা'র মত সংস্কৃত পঙ্‌ক্তির আক্ষরিক কোনও অনুসরণ ঠিক চোখে পড়ে না, তবু মনে হয় দু-একটি অলংকার নির্মাণে বা বাকৃরীতিতে সংস্কৃত তার আদর্শ দান করেছে— যেমন, 'এ কেবল দিনরাত্রে জল ঢেলে ফুটাপাত্রে' ইত্যাদির মূল হিসেবে গ্রহণীয় 'আয়ুঃ স্রবতি ভিন্নঘটাদিবাম্ভঃ' এবং 'মধুরাতে কত মুগ্ধ হৃদয় স্বর্গ মেনেছে এ দেহখানি' প্রভৃতি বর্ণনার মধ্যে 'স্বর্গপ্রাপ্তিরনেনৈব দেহেন বরবর্ণিনী' উক্তির মর্ম অনুসন্ধানযোগ্য। একালের পূর্বেকার রচনায় এরকম অনুসরণও কম, কেবল 'ঝলিতেছে জল তরল অনল, গলিয়া পড়িছে অম্বরতল' অথবা 'উড়ায়ে চঞ্চল পাখা পুষ্পরেণুগন্ধমাখা দক্ষিণ সমীর' প্রভৃতির মধ্যে কুমার-সম্ভবের সন্ধ্যাবর্ণন ও অকালবসন্তের ছায়াপাত লক্ষণীয়। আর পরবর্তীকালেও সংকীর্ণ দু-একটি ক্ষেত্রে হয়ত সংস্কৃতের অলংকারচিত্র অনায়াসে অথচ প্রত্যক্ষভাবে কবিকে প্রেরণা দিয়েছে, যেমন 'ও যেন জুঁইফুলের বাগান সন্ধ্যাছায়ায় ঢাকা' ইত্যাদিতে কাদম্বরীর অনার্যকন্যার রূপবর্ণনার অনুস্মৃতি লক্ষণীয়।

'কথা' কাব্যের একটি বিশেষ বহিরঙ্গ লক্ষণ হল এর চরণে মধ্যানুপ্রাস ও অন্ত্যানুপ্রাস যোজনার একান্ত নৈপুণ্য। এই কৌশল 'ক্ষণিকা' কাব্যকেও উচ্চকোটির গীতিকাব্যের রূপ দিতে সাহায্য করেছে। 'ক্ষণিকা'য় কবি যদিচ সাধারণভাবে লৌকিক বা তদ্ভব বাঙ্‌লাতেই তাঁর ক্ষণিকতাময় গীতিকাব্যোচিত মনোভাবের প্রকাশ অবারিত ক'রে দিয়েছেন, এবং লৌকিক বাংলাতেই বাঙ্‌নির্মাণশক্তির সীমা দেখিয়েছেন, এমন কবিতাও অন্ততঃ কয়েকটি রয়েছে যাতে সংস্কৃতের প্রৌঢ়ি অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে। নববর্ষ, অবিনয়, আবির্ভাব প্রভৃতি কবিতা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু 'ক্ষণিকা'র তদ্ভব-বাঙলা-প্রীতি যদিও পল্লীপ্রাণ ও ক্ষণাহ্লাদভাবুক গীতিকবির পক্ষে সহজ ও শ্রেয়স্কর, এ রীতির সার্থকতার পশ্চাতে সংস্কৃতের ধ্বনিসৌন্দর্যে কবির ব্যুৎপত্তি অর্জনের বিষয়টি নিহিত রয়েছে। 'ক্ষণিকা'র আশ্চর্য মিলবিন্যাসচাতুর্য তার পূর্ববর্তী 'কল্পনা' ও 'কথা'র প্রাচীন গুণধর্ম থেকে সংক্রমিত এই কথাই মনে করতে হয়। 'কল্পনা'র মত

'ক্ষণিকা'র কয়েকটি কবিতার পশ্চাতেও সম্ভাব্য শ্লোকাত্মক গীতিকবিতার প্রেরণা সূক্ষ্মভাবে কাজ করেছে। 'জন্মান্তর' ('আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি') কবিতাটি পড়তে পড়তে আমাদের হংসদূত এবং উদ্ধবদূতে অঙ্কিত বৃন্দাবনের কয়েকটি চিত্র মনে পড়েছে। ঐ চিত্রকেই মুগ্ধভাবে আশ্রয় ক'রে অপ্রয়োজনের আনন্দের কবি বাস্তব জীবনের রূঢ় পরিবেশ থেকে পরিত্রাণ চেয়েছেন। 'ভর্ৎসনা' এবং 'আবির্ভাব' কবিতার রচনায় ক্ষীণভাবে কোনও না কোনও বিক্ষিপ্ত শ্লোকরচনা কাজ করেছে। আমরা পূর্বেই নির্দেশ করেছি যে রবীন্দ্রনাথের অত্যুগ্র কল্পনাশীল কবিমানস মূলভাবকে অবলম্বন ক'রে সুদূর ভাবান্তরে অনায়াসেই যাত্রা করেছে।

অতঃপর কবিকর্তৃক প্রাচীনের স্বাঙ্গীকরণ ও রূপান্তরসাধন বিষয়ে আমরা মহাভারতের কথাকে লক্ষ্য করতে পারি। মহাভারতের আখ্যান এবং উপাখ্যান 'কাহিনী' নাট্যকাব্যের অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে। রামায়ণের ভূমিকাংশ অবলম্বন ক'রে 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতা এবং ঋষ্যশৃঙ্গ-উপাখ্যানের আশ্রয়ে 'পতিতা' কবিতা নির্মিত হয়েছে। উভয়ত্রই রবীন্দ্রনাথ নিজ বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করেছেন রামায়ণের কাহিনীর আশ্রয়ে। এর পূর্বে 'সোনার তরী' রচনার কালে কবির রামায়ণ-মহাভারত সম্পর্কে সাহিত্যিক অনুভবের পরিচয় পাচ্ছি 'পুরস্কার' কবিতার মধ্যে। আরও পূর্বেকার 'অহল্যা' কবিতায় অহল্যার পাষাণত্বপ্রাপ্তির ব্যাপারটি কবিকে তাঁর বিশিষ্ট নিসর্গ ও পৃথিবী সম্পর্কে আত্মীয়তায় উদ্‌বুদ্ধ করেছে দেখতে পাই। কৈশোরশেষের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতি-নাট্যরচনা বিহারীলালের 'সারদামঙ্গলে'র দ্বারা উদ্‌বোধিত হলেও বাল্মীকি-রামায়ণের সঙ্গে তাঁর আকৈশোর পরিচয়েরই প্রমাণ দেয়। মহাভারত অবলম্বনে তাঁর প্রথম রচনা হল 'চিত্রাঙ্গদা' যার বিষয় পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। স্বল্প পরে লেখা হয় 'বিদায়-অভিশাপ'।

'বিদায়-অভিশাপে' কচ ও দেবযানীর আখ্যানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সংক্ষিপ্ত হলেও গুরুতর পরিবর্তন সাধন করেছেন। মূলে রয়েছে, দেবকার্যসাধনদক্ষ কচ বিদ্যা আয়ত্ত করবার জন্যে সংগীতের দ্বারা, দূতমুখে, কুশলপ্রশ্ন দ্বারা এবং পুষ্পফল উপহার দিয়ে শুক্র-কন্যা দেবযানীকে সন্তুষ্ট করতেন। সরলা দেবযানী কচের ছদ্মপ্রণয় বুঝতে না পেরে তার প্রতি অনুরক্তা হয়েছিলেন। বিদ্যা সমাপ্ত হলে বিদায় নেবার সময় দেবযানী যখন কচের কাছে তাঁর অন্তরের ভাব উন্মুক্ত ক'রে অনুনয় জানাচ্ছেন—'সেই থেকে তোমার উপর আমার অনুরাগ জন্মে গেছে, এখন কোন্ ধর্মানুসারেই বা তুমি আমাকে ত্যাগ করবে' তখন কচ অত্যন্ত অসার উপদেশ ও যুক্তি দিয়ে এমন-কি রূঢ়ভাষা ব্যবহার ক'রে দেবযানীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। দেবযানী অভিশাপ দিলে কচও প্রত্যভিশাপ দিয়েছেন—'তুমি ধর্ম বিবেচনা না ক'রে কামাচ্ছন্ন হয়ে এই যে শাপ দিলে তাতে তুমি স্বীয় বাসনার অনুরূপ পতিলাভ করবে না, কোনও ঋষিকুমার তোমার পাণিগ্রহণ করবেন না।' রবীন্দ্রনাথ নিজ কাব্যোদ্দেশ্য সাধন করতে সমস্ত পরিস্থিতি পরিবর্তিত ক'রে নিয়েছেন, কচের চিত্তেও প্রণয় দেখিয়েছেন এবং প্রত্যভিশাপ দেওয়ান নি। কিন্তু রবীন্দ্র-নির্মিত দেবযানীর উক্তির

মধ্যেই এমন একটু অবকাশ রয়ে গেছে যাতে মূলের ব্যাপারটি ধরিয়ে দেয়। সে অংশটুকু হল—

বুঝেছি এখন,
আমারে করিয়া বশ পিতার হৃদয়ে
চেয়েছিলে পশিবারে—কৃতকার্য হয়ে
আজ যাবে মোর কিছু দিয়ে কৃতজ্ঞতা,...

এইটিই মহাভারতের কচ-দেবযানী শৃঙ্গারাভাসের যথার্থ স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথ ভিন্নতর কাব্য, যথার্থ প্রণয়মূলক ট্রাজেডি রচনা করেছেন।

'গান্ধারীর আবেদন' নাট্যকাব্য মহাভারতের মুখ্যতঃ সভাপর্বের কয়েকটি অধ্যায় থেকে গঠিত। গান্ধারীর বক্তব্য ও চরিত্রের বিন্যাস এই অংশটির প্রধান সম্পাদ্য হ'লেও ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের পক্ষও কবিকে প্রায় সমান গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপিত করতে হয়েছে। ঐ চরিত্রগুলির মূল ভাব প্রায় অবিকৃত রেখে সেগুলিকে আধুনিক কবি সংক্ষিপ্ত ক'রে আরও উজ্জ্বল করতে চেষ্টা করেছেন, অথচ ঘটনাসংস্থান ও সংলাপ বিষয়ে অনেকটা স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ধৃতরাষ্ট্র-চরিত্রের মুখে ভীষ্ম-দ্রোণের কিছু কিছু উক্তিও প্রকাশিত হয়েছে, কর্ণকথিত কোন কোন বাক্য দুর্যোধন উচ্চারণ করছেন, এবং গান্ধারীর মুখে কুন্তী ও বিদুর-কথিত বাক্যও প্রযুক্ত হয়েছে। এরূপ সংলাপের পাত্রান্তরীকরণ কিছুমাত্র অসংগত ও অস্বাভাবিক হয় নি, এসবই প্রাচীনানুসারী পরবর্তী যুগের কবিদের অবশ্যকরণীয়, অনুকরণ তাঁদের কবিকৃতির লক্ষ্য হতে পারে না। ঘটনাবিন্যাসের দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথ বহুল পরিমাণে স্বকীয়তা রক্ষা করেছেন। গান্ধারীর আবেদন বা ধৃতরাষ্ট্রকে গান্ধারীর উপদেশ দান অংশটি মহাভারতে রয়েছে প্রথম দ্যূতক্রীড়ার পর, দ্বিতীয় ক্রীড়া আরম্ভ হওয়ার পূর্বে। প্রথম দ্যূতে দ্রৌপদীর অবমাননার মত হীনকার্য সংঘটিত হয়ে গেছে এবং ঐ সময়ে নানা দুর্লক্ষণ দেখে গান্ধারী ও বিদুর ভীত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট ঐ সব দুর্নিমিত্তের কথা জ্ঞাপন করেছিলেন। তা ছাড়া দেখা যায় দ্রৌপদীকে সভায় আকর্ষিত করার সময় কুরুবংশীয় ভার্যারা গান্ধারীকে পুরোবর্তিনী ক'রে ভয়ংকর আক্রোশ প্রকাশ করছেন। গান্ধারী যখন দেখলেন যে অন্যায়কারী পুত্র দ্বিধাগ্রস্ত পিতাকে বশীভূত ক'রে পুনরায় পাশা খেলার আয়োজন করছে তখন 'মহাপ্রাজ্ঞা গান্ধারী' নিতান্ত উদ্‌বিগ্ন হয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিলেন দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে। এইটিই 'গান্ধারীর আবেদনে'র মূল অংশ। রবীন্দ্রনাথ নানা দিক বিবেচনা করে দ্বিতীয় দ্যূতের পর পাণ্ডবদের বনগমনের কালে গান্ধারীর আবেদন উপস্থাপিত করেছেন। এর স্বল্পকাল পরেই গান্ধারী পুনশ্চ এসেছেন উদ্‌যোগপর্বে। কৃষ্ণের শান্তিদৌত্য ব্যর্থ হলে, গান্ধারীর কথায় দুর্যোধন যুদ্ধ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হতে পারে, এই আশায় দুর্যোধনকে উপদেশ দেওয়ার জন্য ধৃতরাষ্ট্র ধর্মদর্শিনী গান্ধারীকে আহ্বান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গান্ধারীর উক্তির মধ্যে এই অংশটির ভাবও বিবেচিত হয়েছে।

রবীন্দ্র-রচিত গান্ধারীর সঙ্গে ভানুমতী ও দ্রৌপদীর কথোপকথন অংশ মূলে নেই, বনগমনে উদ্যত যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি সান্ত্বনাবাক্যও নেই। মূলে বনগমনোদ্যত পাণ্ডবদের প্রতি বিদুরের আশ্বাস ও আশীর্বাদ রয়েছে, আর দ্রৌপদী কুন্তীর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করছেন, গান্ধারীর কাছ থেকে নয়।

নাট্যকাব্যের প্রারম্ভে দেখা যায় দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে তাঁর জয়লাভের অভিলাষ প্রকাশ করছেন, রাজধর্মের মূলনীতি ব্যাখ্যা করছেন এবং রাজধর্মের সঙ্গে লোকধর্মের পার্থক্য দেখিয়ে ঐরূপ রাজধর্ম অনুসরণ করতে চাইছেন। এই অংশটি ধৃতরাষ্ট্রসমীপে দুর্যোধন কথিত বার্হস্পত্য নীতিবাক্যের অনুরূপ। দুর্যোধন বলছেন—'লোকধর্ম রাজধর্ম এক নহে, পিতঃ।···রাজধর্মে ভ্রাতৃধর্ম বন্ধুধর্ম নাই, শুধু জয়ধর্ম আছে;' ইত্যাদি। মূলে দুর্যোধনের উক্তি হল—

> লোকবৃত্তাদ্ রাজবৃত্তমন্যদাহ বৃহস্পতিঃ।
> তস্মাদ্ রাজ্ঞা প্রযত্নেন স্বার্থশ্চিন্ত্যঃ সদৈব হি॥
> ক্ষত্রিয়স্য মহারাজ জয়ে বৃত্তিঃ সমাহিতা।
> স বৈ ধর্মস্ত্বধর্মো বা স্ববৃত্তৌ কা পরীক্ষণা॥

দুর্যোধনের 'ক্ষুদ্র সুখে ভরে নাকো ক্ষত্রিয়ের ক্ষুধা,' 'ক্ষুদ্র নহে, ঈর্ষা সুমহতী' প্রভৃতি উক্তির মূল হল—

> অশ্নাম্যাচ্ছাদয়ামীতি প্রপশ্যন্ পাপপূরুষঃ।
> নামর্ষং কুরুতে যস্তু পুরুষঃ সোঽধমঃ স্মৃতঃ॥
> ন মাং প্রীণাতি রাজেন্দ্র লক্ষ্মীঃ সাধারণী বিভো।
> জ্বলিতামেব কৌন্তেয়ে শ্রিয়ং দৃষ্ট্বা চ বিব্যথে॥

অর্থাৎ 'খেয়ে প'রে বেশ আছি, এই মনে ক'রে যে ব্যক্তি দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত না হয়, সে অধম। মহারাজ, সাধারণ সম্পৎ আমাকে তৃপ্তি দিতে পারছে না, পাণ্ডবদের উজ্জ্বল ঐশ্বর্যশিখা আমাকে পীড়িত করছে।' 'আবেদনে' ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের পাণ্ডববিদ্বেষের নিন্দা করছেন এবং বলছেন—

> ধিক্ তোর ভ্রাতৃদ্রোহ!
> পাণ্ডবের কৌরবের এক পিতামহ,
> সে কি ভুলে গেলি?

অথবা, 'অখণ্ড রাজত্ব জিনি সুখ তোর কই, রে দুর্মতি?' ইত্যাদি। এ রকম উক্তি মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রবাক্য থেকে সম্পূর্ণ গৃহীত—

> ত্বং বৈ জ্যেষ্ঠো জ্যৈষ্ঠিনেয়ঃ পুত্র মা পাণ্ডবান্ দ্বিষ।
> দ্বেষ্টা হ্যসুখমাদত্তে যথৈব নিধনং তথা॥

অথবা—

> পাণ্ডোঃ সুতান্ মা দ্বিষস্বেহ রাজন্
> তথৈব তে ভ্রাতৃধনং সমগ্রম্।

মিত্রদ্রোহে তাত মহানধর্মঃ
পিতামহা যে তব তেঽপি তেষাম্ ॥

'আবেদনে'র দুর্যোধন ভ্রাতৃদ্রোহ অভিযোগের নিম্নপ্রকার উত্তর দিচ্ছেন—

ভুলিতে পারি নে সে যে,
এক পিতামহ তবু ধনে মানে তেজে
এক নহি। যদি হ'ত দূরবর্তী পর,
নাহি ছিল ক্ষোভ।

জ্ঞাতিত্বের দিক থেকে পাণ্ডবেরা মিত্র হলেও তারা যে কার্যতঃ শত্রু এই বিষয়টি মূলে রাজনীতিজ্ঞ দুর্যোধন পিতাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন এবং এই ভাবে তাঁর মিত্রদ্রোহ-অভিযোগের উত্তর দিচ্ছেন—

শত্রুশ্চৈব হি মিত্রঞ্চ ন লেখ্যং ন চ মাতৃকা।
যো যং সন্তাপয়তি চ স শত্রুর্নেতরো জনঃ ॥···
নাস্তি বৈ জাতিতঃ শত্রুঃ পুরুষস্য বিশাংপতে।
যেন সাধারণী বৃত্তিঃ স শত্রুর্নেতরো জনঃ ॥

অর্থাৎ, 'কে শত্রু কে মিত্র এ বিষয়ে কোনও শাস্ত্রনির্দেশও নেই, লৌকিক প্রথাও নেই, যে যাকে পীড়া দেয়, সেই তার শত্রু হয়।···কেউ কারও শত্রু হয়ে জন্মায় না, কর্মক্ষেত্রে সমকক্ষ ব্যক্তিরাই একে অপরের শত্রু হয়ে থাকে।' আবেদন অংশে দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্র-আনীত কপটদ্যূতের অভিযোগ এইভাবে খণ্ডন করতে চেয়েছেন—

প্রচ্ছন্নো বা প্রকাশো বা যোগো যোঽরিং প্রবাধতে।
তদ্বৈ শস্ত্রং শস্ত্রবিদাং ন শস্ত্রং ছেদনং স্মৃতম্ ॥

অর্থাৎ, গুপ্তকৌশল প্রয়োগে হোক, অথবা প্রকাশ্য বলের দ্বারা হোক, শত্রুকে ঠেকাতে পারলেই কাজ। শস্ত্রবিদ্‌দের কাছে তাই হল শস্ত্র। যা প্রত্যক্ষ ছেদন করে, কেবল তাকেই শস্ত্র বলে না।

গান্ধারী মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রমুখেই মহাপ্রাজ্ঞা, ধর্মদেশিনী প্রভৃতি বিশেষণে কীর্তিত হয়েছেন। রবীন্দ্র-রচিত গান্ধারীর উক্তিপ্রত্যুক্তি মহাভারতের দু-একটি স্থানের ভাব অবলম্বনে স্বকীয়ভাবে বিস্তৃত। 'গান্ধারীর আবেদন' অংশে ধর্ম সম্পর্কে গান্ধারীর যে উল্লেখযোগ্য ভাষণ রয়েছে মূলে তা নেই। অথচ গান্ধারী-চরিত্রের প্রবল ধর্মভাবুকতার পরিচয় মূলে সর্বত্র বিক্ষিপ্ত রয়েছে। সেই সব অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ গান্ধারীর একটি সম্পূর্ণ ধর্মভাবুক এবং তেজস্বী ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছেন। মূলে ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে গান্ধারীর প্রার্থনা বা উপদেশে গান্ধারী যা বলেছেন তাতে দুর্যোধনের পাপাচরণ ও দুর্বুদ্ধিতার কথা প্রকাশ পেয়েছে। আর রয়েছে বংশনাশের আশঙ্কার কথা—

অথাব্রবীন্মহাপ্রাজ্ঞা ধৃতরাষ্ট্রং নরেশ্বরম্।
পুত্রস্নেহাদ্‌ধর্মপূর্বং গান্ধারী শোককর্ষিতা ॥

জাতে দুর্যোধনে ক্ষত্তা মহামতিরভাষত।
নীয়তাং পরলোকায় সাধ্বয়ং কুলপাংসনঃ ॥

মা নিমজ্জীঃ স্বদোষেণ মহাপ্সু ত্বং হি ভারত।
মা বালানামশিষ্টানামনুমংস্থা মতিং প্রভো।
মা কুলস্য ক্ষয়ে ঘোরে কারণং ত্বং ভবিষ্যসি ॥
বদ্ধং সেতুং কো নু ভিন্দ্যাদ্ধমেচ্ছান্তং চ পাবকম্।
শমে স্থিতান্ কো নু পার্থান্ কোপয়েদ্ ভরতর্ষভ।
স্মরন্তং ত্বামাজমীঢ়ং স্মারয়িষ্যাম্যহং পুনঃ ॥
শাস্ত্রং ন শাস্তি দুর্বুদ্ধিং শ্রেয়সে চেতরায় চ।
ন বৈ বৃদ্ধো বালমতির্ভবেদ্ রাজন্ কথঞ্চন ॥
ত্বন্নেত্রাঃ সন্তু তে পুত্রাঃ মা ত্বাং দীর্ণাঃ প্রহাসিষুঃ।
তস্মাদয়ং মদ্বচনাত্ত্যজ্যতাং কুলপাংসনঃ ॥
তথা ন তে কৃতং রাজন্ পুত্রস্নেহান্মহামতে।
তস্য প্রাপ্তং ফলং বিদ্ধি কুলান্তকরণায় হ ॥

'শোককর্ষিতা মহাপ্রাজ্ঞা গান্ধারী তাঁর পুত্রগণের বিপদ আশঙ্কা করে ধর্মপূর্ণ এই কথা বললেন। দুর্যোধন জন্মাবার পর শৃগালের মত বিকৃত স্বরে চীৎকার করেছিল। মহামতি বিদুর তখন বলেছিলেন যে এর থেকে বংশনাশ ঘটবে, একে মেরে ফেলুন। আপনি নিজের দোষে ডুববেন না এবং মুর্খ অশিক্ষিত ব্যক্তির বুদ্ধিতে চালিত হয়ে বংশনাশের কারণও হবেন না। মৈত্রেস্থিত পাণ্ডবদের ক্রোধ উদ্রেক করা আর যে-সেতুবদ্ধ হয়েছে তাকে ভেঙে ফেলা একই কথা। কোন মূঢ় নির্বাপিত অগ্নিকে জ্বালিয়ে তোলার চেষ্টা করে? এ সব কথা আপনি ভালো করেই জানেন, আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি মাত্র। শাস্ত্রের শাসন দুর্বুদ্ধি মানে না, আর বৃদ্ধ কখনও শিশুমতি হয়ে পড়েছে এও শোনা যায় না। পুত্রেরা আপনার নির্দেশ-মতই চালিত হউক তারা যেন আপনাকে হেয় না করে। অতএব বংশনাশকারী দুর্যোধনকে ত্যাগ করুন। পুত্রস্নেহবশত পূর্বে আপনি তা করেন নি। এখন তার ফল বংশক্ষয় আপনি স্বচক্ষে দেখতে থাকুন।'

সুতরাং কেবল 'গান্ধারীর প্রার্থনা' অংশই নয়, সমস্ত মহাভারতেই গান্ধারী-চরিত্রের যে সব পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে তার সারাংশ গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ স্বল্পপরিসরে গান্ধারীকে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছেন। তথাপি নাট্যকাব্যের গান্ধারীর কয়েকটি উক্তিতে মহাভারতের কয়েকটি স্থানের স্পষ্ট অনুসরণ রয়েছে। যেমন 'ধর্ম-কথা তোমাকে কী বুঝাইব স্বামী' প্রভৃতি 'স্মরন্তং ত্বামাজমীঢ়ং' প্রভৃতি উক্তির 'ত্যাগ করো এইবার' প্রভৃতি 'ত্যজ্যতাং কুলপাংসনঃ' প্রভৃতির প্রতিধ্বনি। 'আবেদন' অংশে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর আবেদন গ্রহণ করতে অসামর্থ্য জানালে পর গান্ধারী দারুণ দুর্বিপাক উপলব্ধি করে কালের

কার্য প্রত্যক্ষ করলেন—'সেই মত কাল যবে জাগে, তারে সভয়ে অকাল কহে সবে' ইত্যাদি। মহাভারতে এই কালের কথা ধৃতরাষ্ট্রকে সচেতন করতে গিয়ে সঞ্জয় বলেছেন—

ন কালো দণ্ডমুদ্যম্য শিরঃ কৃন্ততি কস্যচিৎ।
কালস্য বলমেতাবদ্ বিপরীতার্থদর্শনম্॥

অর্থাৎ কাল স্বয়ং দণ্ড ধারণ করে কারও মাথা কাটে না। কালের কার্যকারিতায় মানুষ বিপরীতার্থ দর্শন করে অর্থাৎ উল্টা বুঝে এইমাত্র। দ্রৌপদীর মুখে উচ্চারিত কালের শান্তি ও শান্তিময় নির্বৃতির কথা রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় ও অতিপ্রিয় জীবনদর্শনের কথা, যা তাঁর নানা রচনায় লক্ষ্য করা যায়। আবেদনে 'যুধিষ্ঠিরের প্রতি গান্ধারী'র বক্তব্য এই—

সৌভাগ্যের দিনমণি
দুঃখরাত্রি-অবসানে দ্বিগুণ উজ্জ্বল
উদিবে, হে বৎসগণ। বায়ু হতে বল,
সূর্য হতে তেজ, পৃথ্বী হতে ধৈর্য ক্ষমা
করো লাভ, দুঃখব্রত পুত্র মোর।

এই উক্তি মূলে যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি বিদুরবাক্য—

যুধিষ্ঠির বিজানীহি মমেদং ভরতর্ষভ।
নাধর্মবিজিতঃ কশ্চিদ্ব্যথতে বৈ পরাজয়াৎ॥
সোমাদাহ্লাদকত্বং ত্বমদ্ভ্যশ্চৈবোপজীবনম্।
ভূমেঃ ক্ষমাঞ্চ তেজশ্চ সমগ্রং সূর্যমণ্ডলাৎ।
বায়োর্বলঞ্চাপ্নুহি ত্বং ভূতেভ্যশ্চাত্মসম্পদঃ॥

বিদায়গ্রহণকালে দ্রৌপদীর প্রতি কুন্তীর বাক্য এখানে দ্রৌপদীর প্রতি গান্ধারীবাক্যের রূপ গ্রহণ করেছে—

কুন্তী

ন ত্বাং সন্দেষ্টুমর্হামি ভর্তৄন্ প্রতি শুচিস্মিতে।
সর্বৈগুর্ণসমাধানৈর্ভূষিতং তে কুলদ্বয়ম্॥
সভাগ্যাঃ কুরবশ্চেমে যে ন দগ্ধাস্ত্বয়াঽনঘে।
অরিষ্টং ব্রজ পন্থানং মদনুধ্যানবৃংহিতা॥
ভাবিন্যর্থে হি সৎস্ত্রীণাং বৈক্লব্যং নোপপদ্যতে।
গুরুধর্মাভিগুপ্তা চ শ্রেয়ঃ ক্ষিপ্রমবাপ্স্যসি॥

গান্ধারী

যাও বৎসে, পতি-সাথে অমলিনমুখ,
অরণ্যেরে করো স্বর্গ, দুঃখে করো সুখ।
বধূ মোর, সুদুঃসহ পতিদুঃখব্যথা
বক্ষে ধরি সতীত্বের লভো সার্থকতা।

'শ্রেয়ঃ ক্ষিপ্রমবাপ্স্যসি' এই কুন্তীবাক্যের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় গান্ধারী উচ্চারিত 'গভীর কল্যাণসিন্ধু করুক মন্থন' প্রভৃতি উক্তিতে।

মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্র ধর্মবেত্তা অথচ পুত্রস্নেহকাতর সুতরাং দ্বিধাগ্রস্ত এবং দৈবনির্ভর চিত্রিত হয়েছেন। দেখা যায়, প্রথম দ্যূতক্রীড়ার প্রস্তাবে ধৃতরাষ্ট্র যুক্তির দ্বারা দুর্যোধনকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৌশলী দুর্যোধন অভিমানসহকারে মৃত্যু ইচ্ছা করলে পর স্নেহান্ধ হয়ে মত দিয়েছেন—

আর্তবাক্যন্তু তৎ তস্য প্রণয়োক্তং নিশম্য সঃ।
ধৃতরাষ্ট্রোব্রবীৎ প্রেষ্যান্ দুর্যোধনমতে স্থিতঃ॥

বৈশম্পায়ন আরও বলছেন—

দ্যূতে দোষাংশ্চ জানন্ স পুত্রস্নেহাদকৃষ্যত—

দ্যূতের দোষ জেনেও তিনি পুত্রস্নেহবশতঃ এই কাজ করলেন। রবীন্দ্রনাথ সংক্ষিপ্ত অংশে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের এই স্নেহান্ধতা ও ধর্মবোধের দ্বন্দ্বের দিকটি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। মহাভারতে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট করা হয়নি—

অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে
চিরদিন— তোরে লয়ে প্রলয়তিমিরে
চলিয়াছি— বন্ধুগণ হাহাকার-রবে
করিছে নিষেধ, নিশাচর গৃধ্র-সবে
করিতেছে অশুভ চীৎকার, পদে পদে
সংকীর্ণ হতেছে পথ, আসন্ন বিপদে
কণ্টকিত কলেবর, তবু দৃঢ়করে
ভয়ংকর স্নেহে বক্ষে বাঁধি লয়ে তোরে
বায়ুবলে অন্ধবেগে বিনাশের গ্রাসে
ছুটিয়া চলেছি মূঢ় মত্ত অট্টহাসে
উল্কার আলোকে—শুধু তুমি আর আমি,
আর সঙ্গী বজ্রহস্ত দীপ্ত অন্তর্যামী—
নাই সম্মুখের দৃষ্টি, নাই নিবারণ
পশ্চাতের, শুধু নিম্নে ঘোর আকর্ষণ
নিদারুণ নিপাতের।

মহাভারতে গান্ধারীর প্রার্থনার প্রত্যুত্তর ধৃতরাষ্ট্র খুব সংক্ষেপে দিয়েছেন। তিনি অক্ষম, পুত্রকে নিবৃত্ত করার সাধ্য তার নাই, সুতরাং, বংশের বিনাশ হয় হোক, তিনি আর কী করবেন?

অথাব্রবীন্মহারাজো গান্ধারীং ধর্মদর্শিনীম্।
অন্তঃ কামং কুলস্যাস্তু ন শক্নোমি নিবারিতুম্॥

ধৃতরাষ্ট্রের এই অক্ষমতার দিক্‌টি রবীন্দ্রনাথ অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং মূলানুসারে ধৃতরাষ্ট্রের দৈবনির্ভরতাও চমৎকার দেখিয়েছেন—

প্রিয়ে, সংহর, সংহর
তব বাণী। ছিঁড়িতে পারি নে মোহডোর,
ধর্মকথা শুধু আসি হানে সুকঠোর
ব্যর্থ ব্যথা। পাপী পুত্র ত্যাজ্য বিধাতার,
তাই তারে ত্যজিতে না পারি…
এখন তো আর
বিচারের কাল নাই, নাই প্রতিকার,
নাই পথ— ঘটেছে যা ছিল ঘটিবার,
ফলিবে যা ফলিবার আছে।

পাণ্ডবদের বনগমনকালে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে ধর্ম ও ভবিতব্যের দিক্‌টি সম্বন্ধে নিবেদন জানিয়েছেন। ধৃতরাষ্ট্র তখন সঞ্জয়কে তার ঐ স্নেহদুর্বলতার কথা জ্ঞাপন করেছিলেন— 'বিদুর এ রকম ধর্ম ও ন্যায়সংগত কথা বললেও পুত্রগণের হিতেচ্ছু হয়ে আমি তা শুনি নি— উক্তবান্ ন গৃহীতঞ্চ ময়া পুত্রহিতেপ্সুনা।' মোটের উপর রবীন্দ্রনাথের ধৃতরাষ্ট্র মূলের উজ্জ্বলতর প্রতিরূপ হয়েছে।

কর্ণকুন্তীসংবাদে কর্ণ ও কুন্তীর সংলাপ ও চরিত্র নির্মাণে রবীন্দ্রনাথ মূল থেকে বহু নূতনত্ব দেখিয়েছেন। আবার স্থানবিশেষে মূলের প্রয়োজনীয় অনুসরণ করেছেন। কর্ণ-চরিত্রে মাতৃস্নেহব্যাকুলতা, সুদূর ও অজ্ঞাতের জন্য রহস্যময় আকর্ষণ মূলের উপর আধুনিক রোমান্টিক গীতিকবির অনুরঞ্জন। কর্ণের স্নেহব্যাকুল হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে কবি সম্ভবতঃ কুন্তীর মাতৃধর্মপালন না করার নিষ্ঠুরতার দিকটি প্রচ্ছন্নভাবে জানাতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কর্ণ তাঁর পরিত্যাগ সম্পর্কে অভিমান প্রকাশ করেছেন মাত্র, কিন্তু মহাভারতের কর্ণ কুন্তীর কাছে দৃঢ় অভিযোগ এনেছেন এবং পরিশেষে বুঝিয়ে দিয়েছেন কেন পাণ্ডবপক্ষে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। আবার উভয়ত্রই কর্ণ বীর, বিবেচক উদার এবং নিজ ক্ষাত্রধর্মরক্ষায় যত্নবান। মহাভারতের কর্ণের মমতা রাধার উপর, কুন্তীর উপর কর্ণের মাতৃভক্তির সংস্কার নাই, যদিও কুন্তীর পক্ষে বাৎসল্যসংস্কার স্বাভাবিকভাবেই হয়ত কিঞ্চিৎ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কর্ণের চিত্তে মাতৃস্নেহতৃষার পরিচয় দিয়ে কাব্যগত চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করেছেন। মহাভারতের কর্ণ কুন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পূর্বেই তাঁর নিজ পরিচয় জেনে ফেলেছেন। এমন-কি কয়েকদিন আগে কৃষ্ণ যখন শান্তি স্থাপন করতে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন পথে তিনি কর্ণকে ডেকে রথের উপর তুলে নিয়ে কর্ণের জন্মপরিচয় বিবৃত করলে কর্ণ বললেন, 'এ কথা আমি পূর্বেই জেনেছি।' রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নিজপরিচয় সম্বন্ধে কর্ণের সম্যগ্‌জ্ঞানের অভাবের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন— 'শুনিয়াছি লোকমুখে জননীর পরিত্যক্ত আমি।' কুন্তী কর্ণের পরিচয় জ্ঞাপন করলে সংশয়

ও বিশ্বাসের মধ্যবর্তী বিস্মিত কর্ণ বলছেন—'শুনি স্বপ্নসম, হে দেবী, তোমার বাণী।' কর্ণ-চরিত্রের বাকী অংশ মূলের প্রায় একান্ত অনুগত।

মহাভারতের কুন্তী হস্তিনাপুরে অস্ত্র-পরীক্ষায় কর্ণ ও অর্জুনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রস্তুত দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। সেখানে মহর্ষি ঠিক কুন্তীর স্নেহব্যাকুলতার কোন পরিচয় দেন নি। আর যুদ্ধের পূর্বাহ্নে কুন্তী যখন কর্ণের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন তখন তিনি বহুল পরিমাণে স্বার্থপ্রণোদিত হয়েই গিয়েছিলেন। কর্ণের বীরত্ব এবং পাণ্ডববিদ্বেষ বিশেষতঃ অর্জুনের উপর অসূয়া ও ক্রোধের কথা আর দুর্যোধনের দিকে পক্ষপাতিত্ব কুন্তীর জানাই ছিল। সুতরাং কর্ণকে যদি পাণ্ডবপক্ষে নিয়ে আসা সম্ভব হয় তা হলে পাণ্ডবদের জয় যেমন সুনিশ্চিত হয়, তেমনি স্বভ্রাতৃবিরোধেরও সমাপ্তি ঘটে— কর্ণের কাছে যাওয়ার মূলে কুন্তীর এইরকম ভাবনা কাজ করেছিল। মহাভারতকার বলছেন—"দুর্যোধন-পরিচালিত কর্ণই আমার উদ্‌বেগ জন্মাচ্ছে, কর্ণ তার নিজের ও ভ্রাতাদের হিতকর কথায় কান দিতেও পারে এই মনে করে ও দৃঢ়ভাবে কর্তব্য স্থির করে কুন্তী গঙ্গার অভিমুখে গমন করতে লাগলেন।" কুন্তীর উক্তির মধ্যে স্নেহের আতিশয্য প্রকাশিত হয় মহাভারতে এমন উক্তি নেই বললেও চলে। হয়ত মহাভারতের কুন্তী ভেবেছিলেন যে স্নেহের প্রকাশ অত্যন্ত অসংগত, এবং অশোভন হবে। যাই হোক, কুন্তী জানতেন না যে কর্ণ তাঁর জন্মকথা পূর্বাহ্নেই জানেন, আর এ বিষয়ে কর্তব্য-অকর্তব্যও ঠিক করে ফেলেছেন। মূল মহাভারতের কুন্তীর চরিত্রে এইভাবে কিছু বৈশিষ্ট্য যোজনা করে রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের রূঢ় পরিবেশ থেকে যেমন তাঁর কাব্যকে মুক্ত করতে চেয়েছেন তেমনি মাতৃত্বের দিকটি প্রকাশ করে বাঙালিমনের উপযোগী করতেও চেষ্টা করেছেন।

ঘটনাসংস্থানের দিক থেকেও রবীন্দ্রকাব্যে স্বল্প নূতনত্ব রয়েছে। মহাভারতের কুন্তী কর্ণের কাছে গিয়েছিলেন দিবা দ্বিপ্রহরের সময়। রবীন্দ্রনাথ সে ক্ষেত্রে সন্ধ্যার ভূমিকা রচনা করে কর্ণের আবিষ্টতা-বিহ্বল মনের উপযোগী পরিবেশ রচনা করতে চেয়েছেন।

মহাভারতকার উদ্‌যোগপর্বে কর্ণের সঙ্গে কুন্তীর সাক্ষাৎকার এইভাবে বর্ণনা করেছেন,—কুন্তী গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়ে দেখলেন কর্ণ সূর্যের ধ্যানে নিরত রয়েছেন। কর্ণের নিয়ম এই ছিল যে পূর্বমুখ হয়ে জপ করার সময় সূর্য যতক্ষণ না তাঁর পৃষ্ঠদেশে কিরণ বিস্তার করত সে পর্যন্ত তিনি জপ থেকে বিরত হতেন না। জপ তখনো শেষ হয় নি এমন সময় কুন্তী উপস্থিত হলেন। তখন—

প্রাঙ্মুখস্যোর্ধ্ববাহোঃ সা পর্যতিষ্ঠত পৃষ্ঠতঃ।
জপ্যাবসানং কার্যার্থং প্রতীক্ষন্তী তপস্বিনী॥
অতিষ্ঠৎ সূর্যতাপার্তা কর্ণস্যোত্তরবাসসি।
কৌরব্যপত্নী বার্ষ্ণেয়ী পদ্মমালেব শুষ্যতী॥

আপৃষ্ঠতাপাজ্জপ্ত্বা স পরিবৃত্য যতব্রতঃ।
দৃষ্ট্বা কুন্তীমুপাতিষ্ঠদভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ॥

'পূর্বমুখ ঊর্ধ্ববাহু কর্ণের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে প্রয়োজনসাধনেচ্ছু কুন্তী জপের অবসান প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কৌরবপত্নী বৃষ্ণিবংশোদ্ভাবা সেই কুন্তী সূর্যতাপপরিক্লিষ্টা হয়ে কর্ণের উত্তরীয়বাসের নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন। রবিতাপ পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করলে পর কর্ণ জপ সাঙ্গ করে পিছনে ফিরতেই কুন্তীকে দেখে অভিবাদন করে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর কথার অপেক্ষা করতে লাগলেন।' এর পর কুন্তী যা যা বললেন ও কর্ণ যা যা উত্তর দিলেন রবীন্দ্রনাথের রচনায় তা যথাসম্ভব প্রতিফলিত হয়েছে। কর্ণের উক্তি—

রাধেয়োঽহমাধিরথিঃ কর্ণস্ত্বামভিবাদয়ে।
প্রাপ্তা কিমর্থং ভবতী ব্রূহি কিং করবাণি তে॥

'কর্ণ নাম যার,
অধিরথসূতপুত্র, রাধাগর্ভজাত,
সেই আমি— কহো মোরে তুমি কে গো মাতঃ'।

কুন্তীর উক্তি—

কৌন্তেয়স্ত্বং ন রাধেয়ো ন তবাধিরথঃ পিতা।
নাসি সূতকুলে জাতঃ কর্ণ! তদ্বিদ্ধি মে বচঃ॥…
স ত্বং ভ্রাতৄনসংবুধ্য মোহাদ্ যদুপসেবসে।
ধার্তরাষ্ট্রান্ ন তদ্‌যুক্তং ত্বয়ি পুত্র বিশেষতঃ।

'ফিরাতে এসেছি তোরে নিজ অধিকারে।
সূতপুত্র নহ তুমি, রাজার সন্তান,
দূর করি দিয়া, বৎস, সর্ব অপমান
এসো চলি যেথা আছে তব পঞ্চভ্রাতা।'

এর পর কুন্তী বোঝালেন—

এতদ্‌ধর্মফলং পুত্র নরাণাং ধর্মনিশ্চয়ে।
যত্তুষ্যন্ত্যস্য পিতরো মাতা চাপ্যেকদর্শিনী॥
অর্জুনেনার্জিতাং পূর্বং হৃতাং লোভাদসাধুভিঃ।
আচ্ছিদ্য ধার্তরাষ্ট্রেভ্যো ভুঙ্ক্ষ যৌধিষ্ঠিরীং শ্রিয়ম্॥

'পিতৃপুরুষেরা এবং মাতা তুষ্ট হন এই তো মানুষের ধর্ম। সুতরাং অর্জুন যে রাজ্যশ্রী জয় করেছে, আর অসাধু ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ যা কেড়ে নিয়ে ভোগ করছে তা ছিনিয়ে নাও আর যুধিষ্ঠিরের প্রাপ্য সেই রাজ্যশ্রী ভোগ কর।' কুন্তীর এই সব হিতবাক্য শ্রবণ করেও কিন্তু— 'চচাল নৈব কর্ণস্য মতিঃ সত্যধৃতেস্তদা।' সত্যাশ্রয়ী কর্ণের মন এতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হল না। কর্ণ বললেন—

ন চৈতৎ শ্রদ্দধে বাক্যং ক্ষত্রিয়ে ভাষিতং ত্বয়া।
ধর্মদ্বারং মমৈতৎ স্যাৎ নিয়োগকরণং তব॥

'তোমার বাক্যের সমাদর করতে পারছি না, কারণ আমি মনে করি না যে তোমার আজ্ঞা-পালনে আমার ধর্মাচরণ হবে।' এরপর মহাভারতের কর্ণ কুন্তীকে তীব্র ভর্ৎসনাবাক্য শুনিয়েছেন এবং পরিশেষে বলছেন—

ন বৈ মম হিতং পূর্বং মাতৃবৎ চেষ্টিতং ত্বয়া।
সা মাং সংবোধয়স্যদ্য কেবলাত্মহিতৈষিণী॥

'অতএব আমার হিতের চেষ্টা পূর্বেই না করে এখন যে আমাকে বোঝাতে এসেছেন সে কেবল নিজের মঙ্গল লক্ষ্য করেই।" কর্ণের এই ভর্ৎসনাসূচক কথা মনে রেখেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

হে বৎস, ভর্ৎসনা তোর শতবজ্রসম
বিদীর্ণ করিয়া দিক এ হৃদয় মম
শতখণ্ড করি।

কিন্তু এই মাত্র। রবীন্দ্রনাথের গঞ্জনাবাক্য মূলের মত অত তীব্র নয়—

সিংহাসন! যে ফিরালো মাতৃস্নেহপাশ
তাহারে দিতেছ, মাতঃ, রাজ্যের আশ্বাস!
একদিন যে সম্পদে করেছ বঞ্চিত
সে আর ফিরায়ে দেওয়া তব সাধ্যাতীত।
মাতা মোর, ভ্রাতা মোর, মোর রাজকুল
এক মুহূর্তেই মাতঃ, করেছ নির্মূল
মোর জন্মক্ষণে।

মাতার প্রতি যথোচিত ভর্ৎসনাবাক্য প্রয়োগের পর মহাভারতের কর্ণ কেন পাণ্ডবপক্ষে যাবেন না তা বীরোচিতভাবে বুঝিয়ে কুন্তীকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করছেন—

অভ্রাতা বিদিতঃ পূর্বং যুদ্ধকালে প্রকাশিতঃ।
পাণ্ডবান্ যদি গচ্ছামি কিং মাং ক্ষত্রং বদিষ্যতি॥
সর্বকামৈঃ সংবিভক্তঃ পূজিতশ্চ যথাসুখম্।
অহং বৈ ধার্তরাষ্ট্রাণাং কুর্যাং তদফলং কথম্॥…
মম প্রাণেন যে শত্রূন্ শক্তাঃ প্রতি সমাসিতুম্।
মন্যন্তে তে কথং তেষামহং ছিন্দ্যাং মনোরথম্॥
ময়া প্লবেন সংগ্রামং তিতীর্ষন্তি দুরত্যয়ম্।
অপারে পারকামা যে ত্যজেয়ং তানহং কথম্॥

"আমি পাণ্ডবদের ভ্রাতা বলে আগে কেউ জানে না, আজ যদি হঠাৎ যুদ্ধকালে এ কথা প্রকাশ পায়, আর আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দি' তা হলে আমাকে কেউ ক্ষত্রিয়

বলবে ? দুর্যোধনেরা আমার সর্ববিধ অভিলাষ পূরণ করছে, আমাকে সর্বপ্রকারে পূজা করছে, তাদের এই প্রীতিকে কি আমি ব্যর্থ করতে পারি ? আমি পক্ষে থাকলে যে-কোনও শত্রুর সম্মুখীন হওয়া যায় এ যারা মনে করে তাদের অভিলাষ আমি পূরণ না করি কী করে ? আমাকে তরণী করে যারা সমাগত ভীষণ রণনদী উত্তীর্ণ হবে ঠিক করে রেখেছে আজ বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের কোনমতেই ত্যাগ করতে পারছি না।"

রবীন্দ্রনাথ এই অংশের ভাব সংক্ষেপে নিবদ্ধ করেছেন—

স্তজননীরে ছলি
আজ যদি রাজজননীরে মাতা বলি—
কুরুপতি-কাছে বদ্ধ আছি যে বন্ধনে
ছিন্ন করে ধাই যদি রাজসিংহাসনে—
তবে, ধিক্ মোরে।…
যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।"

কর্ণের সঙ্গে কৃষ্ণের আলাপের কোনো কোনো অংশ রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্ণকুন্তীসংবাদে ব্যবহার করেছেন। কর্ণচরিত্রের ক্ষাত্রমহিমার ভাবটি ফুটিয়ে তুলতেও রবীন্দ্রনাথ ঐ অংশের সাহায্য নিয়েছেন। কৃষ্ণ যখন কর্ণকে অতুল রাজ্যশ্রী ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতার সেবাসৌভাগ্যলাভের বিষয় উল্লেখ করে পাণ্ডবপক্ষে ফেরাবার প্রয়াস করলেন তখন কর্ণ যেসব কথা বলে কৃষ্ণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন তা তাঁর চরিত্রের মহিমা আরও পরিস্ফুট করেছে। কর্ণ বললেন—দেখ, যাতে আমার কোনো মঙ্গল না হয় এমনভাবেই কুন্তী আমাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। এদিকে আমার প্রতি স্নেহবশতঃ রাধার স্তনে দুগ্ধক্ষরণ হয়েছিল। তিনি আমার মলমূত্র ধারণ করেছিলেন। আমি ধর্মজ্ঞ হয়ে তাঁর পিণ্ড লোপ করি কী করে ? আর অধিরথ আমাকেই তাঁর পুত্র বলে জানেন, আমিও তাঁকেই পিতা বলে জানি। তিনি আমার জাতসংস্কার করিয়েছেন, 'বসুষেণ' নামকরণ করিয়েছেন। তা ছাড়া স্তকুলে আমি বিবাহ করেছি, আমার সন্তানাদিও হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত সুবর্ণরাশির বিনিময়ে অথবা কী আনন্দে কী ভয়ে কোনোমতেই এই সম্পর্ক মিথ্যা করা যায় না। তার পর দেখ, দুর্যোধনকেই বা আমি ত্যাগ করি কী ক'রে ? তাঁরই আশ্রয়ে আজ তেরো বছর নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করছি। দুর্যোধন আমার আশাতেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছে, দ্বৈরথ যুদ্ধে অর্জুনের প্রতিপক্ষ হিসেবে আমাকেই বরণ করেছে। বধ অথবা বন্ধন অথবা অন্য যে প্রকার ভয়ে কি লোভের বশবর্তী হয়ে তাঁর সে আশা তো ব্যর্থ করতে পারি না—ইত্যাদি।

কর্ণকুন্তীসংবাদের নিম্নলিখিত দুটি অংশ কৃষ্ণ-কর্ণ-সংলাপ থেকে নেওয়া। কুন্তী কর্ণের স্বরাজ্যসুখ বর্ণনা করছেন—

ঢুলাবেন ধবল ব্যজন যুধিষ্ঠির,
ভীম ধরিবেন ছত্র, ধনঞ্জয় বীর
সারথি হবেন রথে, ধৌম্য পুরোহিত
গাহিবেন বেদমন্ত্র।

মূলে কৃষ্ণকর্তৃক উত্থাপিত প্রলোভন—'এস, আজই তোমার অভিষেকের ব্যবস্থা করি'—

অগ্নিং জুহোতু বৈ ধৌম্যঃ শংসিতাত্মা দ্বিজোত্তমঃ।
যুবরাজোঽস্তু তে রাজা ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
গৃহীত্বা ব্যজনং শ্বেতং ধর্মাত্মা সংশিতব্রতঃ॥...
ছত্রঞ্চ তে মহাশ্বেতং ভীমসেনো মহাবলঃ।
অভিষিক্তস্য কৌন্তেয়ো ধারয়িষ্যতি মূর্ধনি
কিঙ্কিণীশতনির্ঘোষং বৈয়াঘ্রপরিবারণম্।
রথং শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তমর্জুনো বাহয়িষ্যতি॥
অভিমন্যুশ্চ তে নিত্যং প্রত্যাসন্নো ভবিষ্যতি।

নাট্যকাব্যের উপসংহারের দিকে কর্ণ কুন্তীকে সান্ত্বনাদান প্রসঙ্গে যে ভাবী পরিণামের কথা বলছেন তা বস্তুতঃ কৃষ্ণ-কর্ণ-সংলাপের মধ্যেকার কর্ণের ভবিষ্যদ্বাণী—

কহিলাম পাণ্ডবের হইবে বিজয়।
আজি এই রজনীর তিমির ফলকে
প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র-আলোকে
ঘোর যুদ্ধফল।

মূলে রয়েছে—

রাজানো রাজপুত্রাশ্চ দুর্যোধনবশানুগাঃ।
রণে শস্ত্রাগ্নিনা দগ্ধাঃ প্রাপ্স্যন্তি যমসাদনম্॥...
পরাজয়ং ধার্তরাষ্ট্রে বিজয়ঞ্চ যুধিষ্ঠিরে।
শংসন্ত ইব বার্ষ্ণেয় বিবিধা রোমহর্ষণাঃ॥
প্রাজাপত্যং হি নক্ষত্রং গ্রহস্তীক্ষ্ণো মহাদ্যুতিঃ।
শনৈশ্চরঃ পীড়য়তি পীড়য়ন্ প্রাণিনোঽধিকম্॥
কৃত্বা চাঙ্গারকো বক্রং জ্যেষ্ঠায়াং মধুসূদন।
অনুরাধাং প্রার্থয়তে মৈত্রং সঙ্গময়ন্নিব॥
নূনং মহদ্ভয়ং কৃষ্ণ কুরূণাং সমুপস্থিতম্।

অর্থাৎ—'দুর্যোধনপক্ষের রাজগণ ও রাজপুত্রগণ যুদ্ধে নিহত হবে। নানা রোমহর্ষক দুর্নিমিত্ত কৌরবপক্ষের পরাজয় এবং পাণ্ডবপক্ষের জয় সূচিত করছে। মঙ্গল গ্রহ বক্রী হয়ে সূর্যের সঙ্গে অনুরাধা নক্ষত্রে মিলিতে যাচ্ছে'।' এই হ'ল রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত কর্ণের নক্ষত্রালোকে যুদ্ধফল পাঠ করা।

হস্তিনায় অস্ত্রপরীক্ষার দিনের ঘটনা রবীন্দ্রনাথ যথাসম্ভব মূলানুসরণে বিবৃত করেছেন। কুন্তীর মাতৃস্নেহের অভিব্যক্তি আধুনিক কবির কাব্যকুশলতাময় অনুরঞ্জন। মূলে রয়েছে, অর্জুনের অস্ত্রকৌশল প্রদর্শনে যখন রঙ্গস্থলে কেউ বা চমৎকৃত কেউ বা বিষণ্ণ তখন প্রবল বাহ্বাস্ফোট করতে করতে কর্ণ প্রবেশ করলেন এবং বললেন অর্জুন যে যে কৌশল প্রদর্শন করছেন সে সবই আমি দেখাতে পারি এবং তিনি অর্জুনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। কর্ণ ও অর্জুন দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার উপক্রম করলে—

দ্বিধা রঙ্গঃ সমভবৎ স্ত্রীণাং দ্বৈধমজায়ত।
কুন্তিভোজসুতা মোহং বিজ্ঞাতার্থা জগাম হ॥

কুন্তী বিক্রিয়ার এইটুকু বর্ণনামাত্র মহাভারতে রয়েছে। সন্তান পরিত্যাগের পর এই কুন্তী তাকে প্রথম দেখছেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধনিয়মসম্বন্ধে অভিজ্ঞ কৃপ তখন কর্ণকে প্রশ্ন করছেন—

অয়ং পৃথায়াস্তনয়ঃ কনীয়ান্ পাণ্ডুনন্দনঃ।
কৌরবো ভবতা সার্ধং দ্বন্দ্বযুদ্ধং করিষ্যতি॥
ত্বমপ্যেবং মহাবাহো মাতরং পিতরং কুলম্।
কথয়স্ব নরেন্দ্রাণাং যেষাং ত্বং কুলভূষণম্॥
ততো বিদিত্বা পার্থস্ত্বাং প্রতিযোৎস্যতি বা ন বা।
বৃথাকুলসমাচারৈর্ন যুধ্যন্তে নৃপাত্মজাঃ॥

'যবে কৃপ আসি' প্রভৃতি উক্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এর সংক্ষেপ করেছেন। কর্ণের অবমানিত ও লজ্জিত অবস্থা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'আরক্ত আনত মুখে না রহিল বাণী, দাঁড়ায়ে রহিলে।' মূলে রয়েছে—

এবমুক্তস্য কর্ণস্য ব্রীড়াবনতমাননম্।
বভৌ বর্ষাম্বুবিক্লিন্নং পদ্মমাগলিতং যথা॥

অর্থাৎ 'বর্ষাবারিবিমলিন অবনত পদ্মের মত কর্ণের মুখ লজ্জায় আনত হ'ল।'

অঙ্গরাজ্যে অভিষেক সমাপ্ত হলে অধিরথ রঙ্গশালায় প্রবেশ করছেন, তার বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিতভাবে দিচ্ছেন—

হেনকালে করি পথ
রঙ্গ-মাঝে পশিলেন সূত অধিরথ
আনন্দ বিহ্বল। তখনি সে রাজসাজে
চারি দিকে কুতূহলী জনতার মাঝে
অভিষেকসিক্ত শির লুটায়ে চরণে
সূতবৃদ্ধে প্রণমিলে পিতৃসম্ভাষণে।

মূলে রয়েছে—

ততঃ স্রস্তোত্তরপটঃ সপ্রস্বেদঃ সবেপথুঃ।
বিবেশাধিরথো রঙ্গং যষ্টিপ্রাণো হ্বয়ন্নিব॥

তমালোক্য ধনুস্ত্যক্তা পিতৃগৌরবযন্ত্রিতঃ।
কর্ণোভিষেকার্দ্রশিরঃ শিরসা সমবন্দত ॥

"তখন লাঠিতে ভর দিয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে অধিরথ ঘর্মাক্ত কলেবরে ও কম্পিতদেহে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে স্বাভাবিক পিতৃসম্মান-প্রবণতাবশে কর্ণ ধনু ত্যাগ ক'রে অভিষেকসিক্ত শিরে প্রণাম করলেন।"

মূলে কর্ণের প্রতি ভীমের পরিহাসবাক্য রয়েছে—

ন ত্বমর্হসি পার্থেন সূতপুত্র রণে বধম্।
কুলস্য সদৃশস্তূর্ণং প্রতোদো গৃহ্যতাং ত্বয়া ॥

রবীন্দ্রনাথ এর ভাব অবলম্বন করে লিখেছেন—

'ক্রূরহাস্যে পাণ্ডবের বন্ধুগণ সবে ধিক্কারিল' ;

এইভাবে প্রাচীনকে অবলম্বন ও অনুসরণ ক'রে রবীন্দ্রনাথ নবকাব্য নির্মাণ করেছেন। এর স্বীকরণ এবং নির্মিতি, দুটি দিকই অপূর্ব চিত্তাকর্ষক হয়েছে শুধু এইমাত্র বলা যায়।

রবীন্দ্র-দর্শন-প্রসঙ্গ

শিশিরকুমার মৈত্র

রবীন্দ্রনাথ ও গেটে

বিশ্বমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তির সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে তুলনার আশ্রয় গ্রহণ করাই সব চেয়ে সহজ উপায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে-কাজটাও সহজ নহে। রবীন্দ্রনাথের মত সর্বমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তি, যাঁহার সহিত তাঁহার তুলনা করা যাইতে পারে, খুঁজিয়া পাওয়াও কঠিন। আমার খুঁজিবার কাজটা পশ্চিমের মনীষীদের ভিতরেই করিয়াছিলাম। তাহার একটা কারণ আছে। নিজের দেশের মনীষীদের মধ্যে খোঁজ করিলে, হয়ত আরও শীঘ্র সেরূপ ব্যক্তির সন্ধান পাইতাম, যেরূপ ব্যক্তিকে খুজিতেছিলাম। কিন্তু তাহা হইলে যে জন্য আমি খুঁজিতেছিলাম, সে-কাজের পক্ষে আমার তেমন সুবিধা হইত না। কেননা তাহা হইলে ইহা বলা যাইতে পারিত যে, একই মাটি এবং একই আবহাওয়ায় অনেকটা একই রকম প্রকৃতির লোকের তো জন্মগ্রহণ হইবেই। কিন্তু যদি একেবারে ভিন্ন মাটির এবং ভিন্ন আবহাওয়ায় বর্ধিত ব্যক্তির সহিত মিল হয়, তাহা হইলে সেই মিলের গুরুত্ব অনেক বেশী। এইজন্যই পশ্চিম দেশের মনীষীদের মধ্যেই আমি অনুসন্ধান করি, এবং অনুসন্ধানের ফলে জর্মান কবি গেটেকে অবিষ্কার করি।

গেটের বিখ্যাত নাটক "ফাউষ্ট" (Faust) তাঁহার জীবনের প্রকৃত ছবি বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া তিনি এই নাটক লেখেন। লেখেন, কাটেন আবার লেখেন— এইরূপ করিয়া পঞ্চাশ বৎসর তাঁহার লাগে এই নাটক সম্পূর্ণ করিতে। ইহার নায়ক ফাউষ্ট সম্বন্ধে সকলেই বলে, "Faust is Goethe and Goethe is Faust" "ফাউষ্ট গেটে এবং গেটেই ফাউষ্ট"। এই ফাউষ্টের জীবনের চিত্রাঙ্কনের ভিতর গেটে তাঁহার সমস্ত কবিত্ব এবং দার্শনিক তত্ত্ব ঢালিয়া দিয়াছেন। এই "ফাউষ্ট" নাটকের চরম কথা কি? যখন দেবতারা ফাউষ্টের মৃত্যুর পর তাঁহার দেহকে স্বর্গে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, তখন তাহারা এই কথা বলিতে বলিতে যাইতেছিল, "Wer immer strebend sich bemüht, den konnen wir erlosen." "যিনি সকল সময় কাজে লিপ্ত থাকিয়া, অবশেষে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা মুক্ত করিতে পারি।" এখানে ফাউষ্টের মুক্তি পাইবার দাবী দেখানো হইয়াছে এই যে, তিনি সকল সময় সকল অবস্থায়, যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহা ঘাড় পাতিয়া লইয়াছেন তজ্জন্য এক মুহূর্তের তরেও তিনি তাঁহার নির্দিষ্ট কর্ম হইতে বিরত হন নাই। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কখনও কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই— এই সার্টিফিকেটের জোরেই তিনি স্বর্গে প্রবেশ

করিতে পারিলেন। ফাউষ্ট দুঃখকষ্ট সব ঘাড় পাতিয়া লইয়াছেন, কখনও তজ্জন্য কর্ম হইতে বিরত হন নাই। এই যে ভাল মন্দ সকল রকম অভিজ্ঞতাকে বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করা, গেটে ইহাকেই এখানে সব চেয়ে বড় জিনিস বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা ক্রুশের আদর্শ।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এখানে গেটের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। এই কথাই কয়েক বৎসর পূর্বে একজন লেখক আমাদিগকে বিশেষ করিয়া জানান খুব রসাল ভাষায়, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জোয়ান বোয়েরের উক্তি, "He is India bringing to Europe a new divine symbol, not of the Cross, but the Lotus" ('রবীন্দ্রনাথ কমলেরকবি, ক্রুশের কবি নহেন'), উদ্ধৃত করিয়া আমি এই উক্তির সমালোচনা কয়েক বৎসর পূর্বে 'উত্তরা' পত্রিকায় করিয়াছি। আমি ইহার সমালোচনায় বলিয়াছিলাম: 'এ কথাটা খুবই সত্য, এবং ইহা হইতে রবীন্দ্রনাথের মানবতা সম্বন্ধে ধারণার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ মানবতার এইটাই শ্রেষ্ঠ লক্ষণ মনে করেন নাই যে, ইহা কেবল আত্মবলিদান করিবে। এই আদর্শ ক্রুশের আদর্শ যাহা আমরা যীশু খ্রীষ্টের জীবনে দেখিতে পাই।…রবীন্দ্রনাথ আত্মবলিদানকে খুব বড় জিনিস মনে করেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাকে মানুষের চরম লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। মানুষের চরম লক্ষ্য কমলের মত তাহার হৃদয়কে উন্মীলিত করে, দিব্য আলোকে তাহার সমগ্র সত্তাকে উদ্‌ভাসিত করে, দিব্যশক্তি দ্বারা তাহার দেহমনকে উদ্‌বুদ্ধ করা। দুঃখতাপ তো আছেই, কিন্তু সেইটাই জগতের চরম কথা নহে। তাহার উপরে রহিয়াছে ভাগবতী শক্তি ও দিব্য কল্যাণ। মানুষের হৃদয়কমলকে এই ভাগবতী শক্তি দ্বারা প্রস্ফুটিত করিতে হইবে। এইখানেই মানবের সার্থকতা, কেবল ঘাড় পাতিয়া দুঃখের বোঝা বহন করা নহে।'

আমি এখানে এইটুকু আরও বলিতে ইচ্ছা করি যে, যদিও রবীন্দ্রনাথ আত্মবলিদানের ভিতর দিয়াই মুক্তি অন্বেষণ করিতে হইবে— এই কথার সমর্থন করিতে পারেন নাই, তথাপি আবশ্যক হইলে আত্মবলিদান করিতে মানুষকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে এ কথা তিনি খুব জোরের সহিত স্বদেশী ও বয়কট-যুগের অনেক পূর্বেই ঘোষণা করিয়াছিলেন, যখন তিনি বলিয়াছিলেন—

যদি মান পেতে চাও, প্রাণ পেতে চাও, প্রাণ আগে কর দান॥

আমাদেও আর্যসংস্কৃতি আত্মবলিদানের পক্ষে নহে। গীতা এবং উপনিষদে যাহা ত্যাগ করিতে বলে, তাহা বাসনা ত্যাগ, অথবা ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ। ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে—

'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥'

'ত্যক্তেন' শব্দের অর্থ 'ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগের দ্বারা', 'আত্মবলিদান দ্বারা' নহে। গীতার অনাসক্তিযোগও এই ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগের কথাই বলিয়াছে, আত্মবলিদানের কথা নহে। মহাভারতের শান্তিপর্বে, যেখানে সহদেব তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার বনগমনের সংকল্প ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন—

ন বাহ্যং দ্রব্যমুৎসৃজ্য সিদ্ধির্ভবতি ভারত।
শারীরং দ্রব্যমুৎসৃজ্য সিদ্ধির্ভবতি বা ন বা॥
বাহ্যদ্রব্যবিমুক্তস্য শারীরমনুগৃহ্যতঃ।
যো ধর্মো যৎ সুখং বা স্যাৎ দ্বিষতাং তৎ তথাস্তু নঃ॥
শারীরং দ্রব্যমুৎসৃজ্য পৃথিবীমনুশাসতঃ।
যো ধর্মো যৎ সুখং বা স্যাৎ সুহৃদাং তৎ তথাস্তু নঃ॥

—শান্তিপর্ব, ১৩ অধ্যায়, নির্ণয়সাগর সংস্করণ

'বাহ্যবস্তু ত্যাগের দ্বারা সিদ্ধি হয় না, হে ভারত! অন্তর্নিহিত বস্তু, যথা কাম ক্রোধ মদ মাৎসর্য প্রভৃতি ত্যাগের দ্বারাই সিদ্ধি হইয়া থাকে। বাহ্যবস্তু ত্যাগ করিয়া এবং অন্তর্নিহিত বস্তুকে (কাম ক্রোধ ইত্যাদিকে) আঁকড়াইয়া থাকিয়া যে ধর্ম অথবা যে সুখ লাভ হয়, তাহা আমাদের শত্রুদের যেন হয়। আর অন্তর্নিহিত দ্রব্য (কাম ক্রোধ ইত্যাদি) ত্যাগ করিয়া পৃথিবী শাসন করিয়া যে ধর্ম অথবা যে সুখ লাভ হয়, সেই ধর্ম এবং সেই সুখ যেন আমাদের মিত্রদের হয়!'
তখন তিনি এই ভিতরকার বৃত্তিগুলি, যথা অহংকার হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি ত্যাগ করিতেই উপদেশ দিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আত্মবলিদান আমাদের আর্যসংস্কৃতির মতে কর্তব্য নহে। ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগই আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি মানুষের কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে। গেটের মত সুতরাং দেখা যাইতেছে আমাদের আর্য-সংস্কৃতি দ্বারা অনুমোদিত নহে।

যদিও রবীন্দ্রনাথ ফাউষ্ট নাটকে গেটে যে মত পোষণ করিয়াছেন এবং যাহা এই ক্রুশের ধর্মেরই এক রূপ, গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই, তথাপি এই মতের ভিতর আর একটা যে কথা আছে, অর্থাৎ কর্মজীবন ত্যাগ করিয়া নহে, তাহার ভিতর দিয়াই, মুক্তির অন্বেষণ করিতে হইবে, তাহা তিনি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। নৈবেদ্য গ্রন্থে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

সোনার তরী গ্রন্থেরও অনেকগুলি কবিতাতে তিনি এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের মুক্তি-শীর্ষক কবিতায় তিনি বলিয়াছেন—

চক্ষু কর্ণ বুদ্ধি মন সব রুদ্ধ করি
বিমুখ হইয়া সর্ব জগতের পানে,
শুদ্ধ আপনার ক্ষুদ্র আত্মাটিরে ধরি
মুক্তি-আশে সন্তরিব কোথায় কে জানে!

পার্শ্ব দিয়ে ভেসে যাবে বিশ্বমহাতরী
অম্বর আকুল করি যাত্রীদের গানে,
শুভ্র কিরণের পালে দশ দিক ভরি,
বিচিত্র সৌন্দর্যে পূর্ণ অসংখ্য পরাণে।...
বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে,
আমি একা বসে রব মুক্তি-সমাধিতে?

এই গ্রন্থের 'খেলা' নামক আর একটি কবিতাতেও তিনি এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন:

হোক খেলা, এ খেলায় যোগ দিতে হবে
আনন্দকল্লোলাকুল নিখিলের সনে।
সব ছেড়ে মৌনী হয়ে কোথা বসে রবে
আপনার অন্তরের অন্ধকার কোণে!

এই গ্রন্থের 'মায়াবাদ' ও 'বন্ধন' নামক আরও দুইটি কবিতাতেও তিনি এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ সুতরাং গেটের সহিত এই বিষয়ে একমত যে, কর্ম ত্যাগ করিয়া নহে, কর্মের ভিতর দিয়াই মুক্তির সন্ধান করিতে হইবে, যদিও তিনি গেটের মতের অপর অংশটি, অর্থাৎ ঘাড় পাতিয়া দুঃখকষ্ট সব সহ্য করিয়া যাইতে হইবে, গ্রহণ করিতে সক্ষম হন নাই।

গেটে তাঁহার ফাউষ্ট নাটকে আর একটি কথা বলিয়াছেন, যাহাকে আমরা এই নাটকের— এবং কেবল এই নাটকের নহে, গেটের নিজের দর্শনের— প্রধান কথা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি; এবং এই কথা বলিয়া গেটে তাঁহার নাটক সমাপ্ত করিয়াছেন, অতএব ইহা তাঁহার এই নাটকের প্রধান কথাও বটে এবং শেষ কথাও বটে। কথাটা এই (আমি ইহা মূল জর্মাণ ভাষাতেই দিতেছি): "Das Ewig—Weilliche Zieht uns hinan" ("সেই চিরনারী আমাদের ঊর্ধ্বে টানিয়া লইতেছে")। এই 'চিরনারী' ভগবৎপ্রেম ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমি *The Meeting of the East and the West in Sri Aurobindo's Philosophy* শীর্ষক গ্রন্থে সংক্ষেপে ইহার আলোচনা করিয়াছি[১]। ইহাকেই গেটে যাবতীয় অভিব্যক্তির মূলতত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা তর্ক দ্বারা লব্ধ কোনো সত্য নহে। ইহা একটি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, যাহার স্থান তর্কের অনেক ঊর্ধ্বে। ইহা নিয়মের শৃঙ্খলা নহে। ইহা প্রেমের মাধুর্য[২]। ইহা এই নাটকের এবং গেটের দর্শনের সর্বপ্রধান এবং সর্বশেষ কথা।

১. পৃ. ৩৮০-৩৮১ দ্রষ্টব্য।

২. শ্রীমতী বেয়ার্ড টেলার ফাউষ্ট নাটকের যে ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছেন (প্রকাশক Ward, Locke & Bowden) তাহাতে (চতুর্থ সংস্করণ, ৬৯৬ পৃষ্ঠা) তিনি গেটের এই উক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার ভাবার্থ এই যে, কি পৃথিবীতে,

রবীন্দ্রনাথও সত্যের মূর্তির মধ্যে নারীমূর্তি অবলোকন করিয়াছেন। এবং এই মূর্তি আমাদের নিকট ব্যক্ত করিবার সময় বলিয়াছেন—

'যাজ্ঞবল্ক্য যখন গৃহত্যাগ করবার সময় তাঁর পত্নীদুটিকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করে যেতে উদ্যত হলেন তখন মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, বলো তো এ-সব নিয়ে কি আমি অমর হব? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন,' "না, তা হবে না, তবে কিনা উপকরণবন্তের যেমনতর জীবন তোমার জীবন সেইরকম হবে। সংসারীরা যেমন করে তাদের ঘরদুয়ার গোরুবাছুর অশনবসন নিয়ে স্বচ্ছন্দে দিন কাটায় তোমরাও তেমনি করে দিন কাটাতে পারবে।"

'মৈত্রেয়ী তখন এক মুহূর্তে বলে উঠলেন, "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্!" যার দ্বারা আমি অমৃতা না হব তা নিয়ে আমি কী করব? এ তো কঠোর জ্ঞানের কথা নয়— তিনি তো চিন্তার দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা, কোন্‌টা নিত্য কোন্‌টা অনিত্য তার বিবেক-লাভ করে এ কথা বলেন নি। তাঁর মনের মধ্যে একটি কষ্টিপাথর ছিল যার উপরে সংসারের সমস্ত উপকরণকে একবার ঘসে নিয়েই তিনি বলে উঠ্‌লেন, "আমি যা চাই এ তো তা নয়!"

'উপনিষদে সমস্ত পুরুষ ঋষিদের জ্ঞানগম্ভীর বাণীর মধ্যে একটিমাত্র স্ত্রীকণ্ঠের এই একটিমাত্র ব্যাকুল বাক্য ধ্বনিত হয়ে উঠেছে এবং সে ধ্বনি বিলীন হয়ে যায় নি। সেই ধ্বনি তাঁদের মেঘমন্দ্র শান্ত স্বরের মাঝখানে অপূর্ব একটি অশ্রুপূর্ণ মাধুর্য জাগ্রত করে রেখেছে। মানুষের মধ্যে যে পুরুষ আছে উপনিষদে নানা দিকে নানা ভাবে আমরা তারই সাক্ষাৎ পেয়েছিলুম। এমন সময়ে হঠাৎ এক প্রান্তে দেখা গেল মানুষের মধ্যে যে নারী রয়েছেন তিনিও সৌন্দর্য বিকীর্ণ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

'আমাদের অন্তরপ্রকৃতির মধ্যে একটি নারী রয়েছেন। আমরা তাঁর কাছে আমাদের সমুদয় সঞ্চয় এনে দিই। আমরা ধন এনে বলি, এই নাও। খ্যাতি এনে বলি, এই তুমি জমিয়ে রাখো। আমাদের পুরুষ সমস্ত জীবন প্রাণপণ পরিশ্রম করে কত দিক্ থেকে কত কী যে আনছে তার ঠিক নেই; স্ত্রীটিকে বলছে, এই নিয়ে তুমি ঘর ফাঁদো, বেশ গুছিয়ে ঘরকন্না করো, এই নিয়ে তুমি সুখে থাকো। আমাদের অন্তরের তপস্বিনী এখনো স্পষ্ট করে বলতে পারছে না যে, এ-সবে আমার কোনো ফল হবে না। সে মনে করছে, হয়তো আমি যা চাচ্ছি তা বুঝি এই-ই।'

—শান্তিনিকেতন ১, 'প্রার্থনা'

কবি এখানে আরও দেখাইয়াছেন যে, যে-অমৃতত্বের কথা মৈত্রেয়ী বলিয়াছেন, এ অমৃতত্ব মানে নহে, দেহের অমরতা বা আত্মার নিত্যতা। ইহা অন্যরকমের অমৃতত্ব নির্দেশ করিতেছে। কবির মতে মৈত্রেয়ীর এই কথা বলাই উদ্দেশ্য ছিল—

'সংসারে আমরা তো কেবলই একটার ভিতর দিয়ে আর-একটাতে চলেছি— কিছুতেই তো স্থির হয়ে থাকতে পারছি নে। আমার মনের বিষয়গুলোও সরে যায়, আমার

কি স্বর্গে, প্রেমই একমাত্র সকল মানুষকে উন্নত এবং মুক্ত করিতে পারে, এবং এই পৃথিবীতে আমরা এই প্রেমের প্রকৃত রূপ নারীর ভিতর দেখিতে পাই।

মনও সরে যায়। যাকে আমার চিত্ত অবলম্বন করে তাকে যখন ছাড়ি তখন তার সম্বন্ধে আমার মৃত্যু ঘটে। এমনি করে ক্রমাগত এক মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আর মৃত্যুতে চলেছি—এই যে মৃত্যুর পর্যায় এর আর অন্ত নেই। অথচ আমার মন এমন কিছুকে চায় যার থেকে আর নড়তে হবে না যেটা পেলে সে বলতে পারে এ ছাড়া আমি আর বেশি চাই নে—যাকে পেলে আর ছাড়াছাড়ির কোনও কথাই উঠ্‌বে না! তা হলেই তো মৃত্যুর হাত একেবারে এড়ানো যায়। এমন কোন্ মানুষ এমন কোন্ উপকরণ আছে যাকে নিয়ে বলতে পারি এই আমার চিরজীবনের সম্বল লাভ হয়ে গেল— আর কিছুই দরকার নেই!…

'এই প্রেমকেই যখন পরিপূর্ণরূপে পাবার জন্যে আমাদের অন্তরাত্মার সত্য আকাঙ্ক্ষা আবিষ্কার করি তখন আমরা সমস্ত উপকরণকে অনায়াসেই ঠেলে দিয়ে বলতে পারি "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।"'

এই প্রেমের বাণী কবি দেখাইয়াছেন যে, উপনিষদে নারীর কণ্ঠ দিয়া আমাদের জানানো হইয়াছে। ইহার বিশেষ সার্থকতা আছে। কবি এইজন্য বলিয়াছেন—'উপনিষদে পুরুষের কণ্ঠে আমরা অনেক গভীর উপলব্ধির কথা পেয়েছি, কিন্তু কেবল স্ত্রীর কণ্ঠেই এই একটি গভীর প্রার্থনা লাভ করেছি। আমরা যথার্থ কী চাই অথচ কী নেই তার একাগ্র অনুভূতি প্রেমকাতর রমণীহৃদয় থেকেই অতি সহজে প্রকাশ পেয়েছে।' জগতের গতির মধ্যে এই চিরনারীর রূপ দেখিয়া গেটে নিজেকে ক্লাসিসিজ্‌ম্-এর বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া রোম্যান্টিসিজ্‌ম্-এর উন্মুক্ত বায়ুসেবনের প্রয়াসী করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার প্রভাব যদি তাঁহার উপর আরও বেশি থাকিত তাহা হইলে তিনিও রবীন্দ্রনাথের মত কমলের আদর্শকে, অর্থাৎ সকল দিক হইতে এবং সর্বতোভাবে আত্ম-স্ফুরণকে, গ্রহণ করিতে পারিতেন। রবীন্দ্রনাথের উপর কিন্তু রোম্যান্টিসিজ্‌ম্-এর প্রভাব আরও অনেক বেশি গভীর ছিল। ইহা তাঁহাকে জাগতিক সমস্ত ব্যাপারকে প্রেমের দৃষ্টিতে সৌন্দর্যের দৃষ্টিতে রসের দৃষ্টিতে দেখিবার শক্তি দিয়াছিল। ইহার ফলে তিনি সকল জিনিসের মধ্যে একটা স্বচ্ছন্দ গতিশীলতা দেখিতেন, যাহা তাঁহাকে আর একজন পশ্চিমের মনীষীর চিন্তাধারার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ ও বের্গসঁ

এই মনীষী, বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁ। আমি ইতিপূর্বে ইহাঁর চিন্তাধারার সহিত রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার তুলনামূলক আলোচনা বিশদভাবে করিয়াছি।[৩] এখানে অতি

৩. "বঙ্গবাণী" ১৩৩১ সালের বৈশাখ সংখ্যায় 'বলাকা ও বের্গসঁ' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এই প্রবন্ধের ইংরাজি অনুবাদ *Calcutta Review* ১৯২৬ মে সংখ্যায় "Rabindranath and Bergson" নামে প্রকাশিত হয়।

সংক্ষেপে তাঁহাদের চিন্তাধারার মধ্যে কোথায় সাদৃশ্য এবং কোথায় পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নির্দেশ করিয়া ক্ষান্ত থাকিব।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বলাকা'তে বের্গসঁর ন্যায় গতিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। নানা আকারে কবি গতিকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। প্রথম কবিতাতে তিনি ইহাকে 'নবীন,' 'কাঁচা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন—

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।
আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা॥

আর যে স্থিতিশীল, যে প্রবীণ, সে কাজের বার হইয়া গিয়াছে, সে কেবলই ঝিমায়—

ওই যে প্রবীণ, ওই যে পরম পাকা,
চক্ষুকর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা,
ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ-করা খাঁচায়।

এই নবীনের আগমনে যত কিছু নিয়মের বাঁধাবাঁধি, শৃঙ্খলের কষাকষি, সব আপনি ভাসিয়া যাইবে—

শিকলদেবীর ঐ যে পূজাবেদি
চিরকাল কি রইবে খাড়া!
পাগলামি, তুই আয় রে দুয়ার ভেদি।

এই গতির ভিতরই সত্যকে খুঁজিতে হইবে, নিস্তব্ধতার মধ্যে খুঁজিলে কিছুতেই পাওয়া যাইবে না। বের্গসঁর প্রধান কথাই হইতেছে ইহাই। তাই তিনি তর্কের দ্বারা সত্যকে পাওয়া অসম্ভব বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। এক দিকে তিনি দেখাইয়াছেন সত্য আছে এবং অন্য দিকে আছে কেবল ছবি—

তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটে লিখা?
ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড়,

ওই যারা দিনরাত্রি
আলো-হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি,
তুমি কি তাদেরি মতো সত্য নও ?
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি ?

এই কথাটাই একটু অন্যভাবে কবি এই পুস্তকের 'শা-জাহান' নামক কবিতায় দেখাইয়াছেন। বস্তুর স্তূপের মধ্যে সত্য পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় অন্তরের বেদনার মধ্যে। ভারত-সম্রাট্ শা-জাহান এ কথা জানিতেন এবং সেইজন্য তিনি রাজশক্তি-ধনমানকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অন্তরের বেদনাকে চিরন্তন করিবার মানসে তাজমহল সৃষ্টি করেন—

এ কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।
শুধু তব অন্তরবেদনা
চিরন্তন হয়ে থাক, সম্রাটের ছিল এ সাধনা।

কিন্তু সেই হৃদয়ের বেদনা এই অপরূপ তাজমহলের চেয়েও বড় সত্য। সেইজন্য ইহাকে স্মৃতিমন্দিরও ধরিয়া রাখিতে পারে নাই—

তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারম্বার।

জীবনের প্রকাশের রূপ তাহা হইলে কিরকম? যদি তাজমহলের মত শ্রেষ্ঠ কীর্তিও জীবনকে ধরিয়া রাখিতে না পারে, তাহা হইলে কিরূপে ইহাকে ব্যক্ত করা যাইতে পারে? বের্গসঁর মতে ইহার স্বরূপ হইতেছে অনন্ত প্রবাহ। রবীন্দ্রনাথও বলেন, ইহার প্রকাশ হইতেছে বিরাট নদী—

হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে ;
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু ফেনা উঠে জেগে।

এই প্রবাহ যদি এক মুহূর্তের জন্যও প্রতিহত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বস্তুর স্তূপ জাগিয়া উঠে।

বের্গসঁর সহিত রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য

এতক্ষণ পর্যন্ত আমি বের্গসঁর সহিত রবীন্দ্রনাথের যেখানে মতের ঐক্য আছে, তাহা দেখাইলাম। কবি জীবনের স্রোতকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পুঞ্জীভূত বস্তুর স্তূপের মধ্যে সত্যকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, ইহা তিনি দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু কবি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে কেবল এ কথা বলিলেই তাঁহার বক্তব্য শেষ হয় না, তাঁহার বাণী অসম্পূর্ণ থাকে। কেননা কেবল গতি, যে-গতির কোনও উদ্দেশ্য নাই, যাহা আমাদের কোনও নির্দিষ্ট স্থানে লইয়া যায় না, সে-গতিতে আমাদের প্রাণের কোনও তৃপ্তি হয় না। সেইজন্য এই 'বলাকা' গ্রন্থেই ইহার নবম কবিতাতে কবি গতির মধ্যে আনন্দের রূপ নিরীক্ষণ করিয়াছেন। এইখানেই কবিকে বের্গসঁর সঙ্গত্যাগ করিতে হইয়াছে। বের্গসঁর নিকট গতি কেবল গতি, অফুরন্ত গতি, তাহার কোনও লক্ষ্য নাই। এইখানেই বের্গসঁর সহিত রবীন্দ্রনাথে মতের অনৈক্য। রবীন্দ্রনাথ কেবল গতিতেই তৃপ্ত থাকিতে পারেন নাই, তাই তিনি লিখিয়াছেন—

কে তোমারে দিল প্রাণ,
রে পাষাণ ?
কে তোমারে জোগাইছে এ অমৃতরস
বরষ বরষ।
তাই দেবলোক-পানে নিত্য তুমি রাখিয়াছ ধরি
ধরণীর আনন্দমঞ্জরী।

গতি যে কেবল গতির ভিতরে থাকিতে চাহে না, তাহার লক্ষ্য যে সকল সময়েই অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হওয়া, নিরাকার হইতে সাকার হওয়া, ইহা কবি এই 'বলাকা' গ্রন্থেরই ষোড়শ কবিতাটিতে ব্যক্ত করিয়াছেন—

বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি
উঠে অট্টহাসি ;
ধুলা বালি
দিয়ে করতালি
নিত্য নিত্য
করে নৃত্য
দিকে দিকে দলে দলে ;
আকাশে শিশুর মতো অবিরত কোলাহলে।

কবি নিজে ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন—

'চারি দিকে বিশ্বের বস্তুরাশি যেন হাহা করে হেসে উঠেছে। ধুলোতে বালিতে তাদের করতালি হচ্ছে, তারা উন্মত্তভাবে নৃত্য করছে। বস্তুর সংঘাতে বস্তুর যে লীলা হচ্ছে,

যেন তারই কোলাহল শোনা যাচ্ছে। চারি দিকে রূপের মত্ততা। রূপ বস্তুর আকারে গতি পেয়েছে, তার সংগীত শোনা যাচ্ছে।'

এই কবিতায় কবি আরও দেখাইয়াছেন যে, মানুষের অসংখ্য ভাবনা রূপ পাইবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছে—

মানুষের লক্ষ লক্ষ অলক্ষ্য ভাবনা,
অসংখ্য কামনা,
রূপে মত্ত বস্তুর আহ্বানে উঠে মাতি
তাদের খেলায় হতে সাথি।
স্বপ্ন যত অব্যক্ত আকুল
খুঁজে মরে কূল ;
অস্পষ্টের অতল প্রবাহে পড়ি
চায় এরা প্রাণপণে ধরণীরে ধরিতে আঁকড়ি
কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-সুদৃঢ় মুষ্টিতে,
ক্ষণকাল মাটিতে তিষ্ঠিতে।
চিত্তের কঠিন চেষ্টা বস্তুরূপে
স্তূপে স্তূপে
উঠিতেছে ভরি—
সেই তো নগরী।
এ তো শুধু নহে ঘর,
নহে শুধু ইষ্টক প্রস্তর।

কবি স্বয়ং ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন—

'মানুষের যে অব্যক্ত স্বপ্নের দল, তারা যেন কূল পেলে বেঁচে যায়। তারা অপ্রকাশকে পেরিয়ে বস্তুর ডাঙায় সৃষ্টির সঙ্গে মিলতে চায়। তারা যেন মজ্জমান প্রাণীর মতো অতলের নীচে থেকে ইঁটকাঠের মুষ্টি দিয়ে ধরণী আঁকড়ে ডাঙায় উঠতে চায়।'

'এম্‌নি করে মানুষের চিত্তের চিন্তাগুলি বাইরে কঠিন আকার ধারণ করছে। মানুষের শহরগুলি আর কিছু নয়, তারা মানুষের সেই ভাবনা ও কামনারই ব্যক্ত প্রকাশ। কোনো শহর কেবল কতকগুলি বাড়ির সমষ্টি নয়। মানুষের যে স্পর্শাতীত প্ল্যান, চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা, রূপজগতে সুস্পষ্ট হতে চাচ্ছে, তারাই যেন লোহা-লক্কড়ের ভিতর দিয়ে এই শহরে স্পর্শগোচর হয়েছে।'

অমূর্ত নিরাকার চিত্তের বেদনাগুলি আধারের অন্বেষণে সর্বদা ছুটাছুটি করিতেছে। আধার পাইলেই এগুলি স্থির হয়, শান্তি পায়। বেদনার এই আকারের পিপাসা অনন্ত। কোনোসসীম আধারে তাহার এই পিপাসা মেটে না। অসীমকে না পাইলে তাহার তৃপ্তি নাই।

বের্গসঁ এই আধারকে একেবারে অস্বীকার করিতে চাহেন। তাঁহার মতে এই আধারটা আমাদের জীবনধারণের সুবিধার জন্য আমাদের একটা কল্পনামাত্র। সত্যের হিসাবে তাঁহার মতে ইহার কোনোই মূল্য নাই।

এইখানেই বের্গসঁ ভুল করিয়াছেন। এবং এইজন্যই আমি পূর্বে[৪] লিখিয়াছি: "বের্গসঁ জীবনের মধ্যে কেবল গতি দেখিয়াছেন। তিনি অসীমের সহিত জীবনের কোনো যোগ দেখিতে পান নাই। এইজন্য জীবনটা তাঁহার নিকট নীরস গতি ছাড়া আর কিছুই বলিয়া প্রতিভাত হয় নাই। জীবনের মধ্যে আনন্দের ধারা, রঙের ছটা তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সত্যের তিনি কেবল কঠিন রূপ দেখিয়াছেন। ইহা তাঁহার নিকট beyond good and evil রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এইবার তিনি জীবনের উদ্দেশ্য, গতির লক্ষ্য হারাইয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিকট কেবল গতিতে আমাদের মুক্তি নয়।"

রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ

রবীন্দ্র-দর্শনকে আমরা মানবতাবাদ বলিতে পারি, কিন্তু ইহার সঙ্গে এই কথা বলাও প্রয়োজন যে, ইহা পাশ্চাত্য দর্শনে যাহাকে humanist বলে, তাহা নহে। পাশ্চাত্য দর্শনে যাহাকে humanist বলে এবং যাহার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হইতেছেন ফরাসী দার্শনিক ওগুস্ত কঁত এবং ইংরাজ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল নিজেকে মানবের দর্শন বলিয়া প্রচার করে। কিন্তু ইহার দৃষ্টিকোণ কত সংকীর্ণ। ইহা মানবকে কেবল সামাজিক জীব হিসাবে দেখে, যাহার প্রয়োজনগুলি তাহার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থ-নৈতিক জীবনের ভিতরেই আবদ্ধ আছে। মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের স্থান এই দর্শনে একপ্রকার নাই বলিলেও চলে।

বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ এই মানবদর্শন হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা, মানুষের জীবনের যে দিক্‌টার উপর রবীন্দ্রনাথ সব চেয়ে জোর দিয়াছেন— তাহার আধ্যাত্মিক জীবন— সেটা এই পাশ্চাত্য হিউম্যানিস্ট একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহে। মানুষ কি কেবল সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্যে তৃপ্ত থাকিতে পারে? কখনই নহে। ইহার উর্ধ্বে একটা উচ্চতর জীবনের আশা সে হৃদয়ে পোষণ করে এবং যতক্ষণ না সে ইহা পায় ততক্ষণ তাহার হৃদয় অতৃপ্ত থাকিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের মতে এই অতৃপ্তি মানুষের প্রধান সম্পদ। অভাবের দিক্ থেকে দেখিলে ইহা অতৃপ্তি। কিন্তু আবার ভাবের দিক্ থেকে দেখিলে ইহা অনন্তের সহিত মিলিবার আকুতি, অসীমকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা। এইখানেই আমরা মানবের প্রকৃত সত্তার পরিচয় পাই। এবং ইহাই ঘোষণা করা মানবতাবাদের প্রধান কর্তব্য।

---

৪. বঙ্গবাণী, বৈশাখ ১৩৩১

রবীন্দ্রনাথের মানবতা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানবতা। হিউম্যানিজমকে যদি মানবতা বলা যায়, তাহা হইলে এই দুই মানবতার প্রভেদের কারণ কোথায় নিহিত আছে? ইহাদের প্রভেদ মানবশব্দের সংজ্ঞা লইয়া। ইংরাজি ভাষায় একটা প্রবাদ আছে, 'Your god is my devil', অর্থাৎ তুমি যাহাকে দেবতা বল আমি তাহাকে বলি দানব। এই কথা এখানেও খাটে। কঁত ও মিল মানবের যে-সংজ্ঞা দিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছেন মানবের। ইঁহারা যেটাকে মানবের প্রধান ধর্ম বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন এবং যাহার উপর ইঁহারা বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের হিসাবে সেটা মানবের পক্ষে এমন কিছু বড় জিনিস নহে। আবার যেটাকে ইঁহারা একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং তাঁহাদের দর্শনে কোনো স্থানই দেন নাই, সেই বিষয়টিকেই রবীন্দ্রনাথ মানবের সম্বন্ধে সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, ঈশ্বর। কঁত ও মিলের দর্শনে ঈশ্বরের কোনো স্থান নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও দর্শন হইতে যদি ঈশ্বরকে বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে কি থাকে বলুন তো! তাহাদের সবটাই চলিয়া যায় না কি? যে-কবি প্রতি মুহূর্তে ঈশ্বরের পায়ের ধ্বনি শুনিতে পান এবং যিনি গাহিয়াছেন—

তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি,
সে যে আসে, আসে, আসে।
যুগে যুগে পলে পলে দিনরজনী
সে যে আসে, আসে, আসে।

অথবা যিনি সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া বলিয়াছেন—

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।

তিনি কি কখনও ঈশ্বরকে মানুষের একটা অনাবশ্যক বিষয় বলিয়া মনে করিতে পারেন?

আবার অপর দিকে যে যান্ত্রিক সভ্যতা, হিউম্যানিজমের হিসাবে মানুষের খুব উন্নত অবস্থার লক্ষণ, যাহা কঁতের মতে মানুষের অভিব্যক্তির যে তিনটি স্তর তিনি দেখাইয়াছেন, সেই তিনটি স্তরের মধ্যে সর্বোচ্চ যে স্তর— যাহাকে তিনি 'পজিটিভ' এই আখ্যা দিয়াছেন— সেই স্তরের লক্ষণ, সেই যান্ত্রিক সভ্যতাকে কি মানবতার দিক্ থেকে রবীন্দ্রনাথ খুব উচ্চস্থান দিতে পারিয়াছেন? 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী' নাটক এই প্রশ্নের কি উত্তর দেয়? মানবতার প্রতীক ধনঞ্জয় বৈরাগীর জয় হইল, না যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতীক যন্ত্ররাজ বিভূতির জয় হইল? বিভূতির বাঁধ কি ভাঙিয়া গেল না প্রাণের স্পর্শে? তেমনি 'রক্তকরবী'তে প্রাণহীন বিরাট যন্ত্রের শক্তি কি ক্ষুদ্র নারীর প্রাণের শক্তির কাছে হার মানিল না?

যান্ত্রিক সভ্যতার তীব্র সমালোচনা তিনি করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা হইতে কেহ

যেন না মনে করেন যে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, মধ্যযুগে ফিরিয়া যাইতে বলা। মধ্যযুগের ভক্ত রবীন্দ্রনাথ কোনোকালেই ছিলেন না। 'অচলায়তন' নাটকে ইহার যথেষ্ট পরিচয় তিনি দিয়াছেন। চিরাগত সংস্কার যদি মানুষের মনুষ্যত্বলাভের পথে কণ্টক হয়, তাহা হইলে তাহাকেও ত্যাগ করিতে হইবে। বাস্তবিক, কি প্রাচীন সংস্কার, কি আধুনিক যুগের নূতন নূতন পদ্ধতি, সকলকেই তিনি এক মাপকাঠি দিয়া যাচাই করিয়াছেন, অর্থাৎ মানুষের মনুষ্যত্বলাভের পথে তাহা সহায়, কি তাহা অন্তরায়।

মানবতার চরম কথা রবীন্দ্রনাথ আমাদের শুনাইয়াছেন তাঁহার অপূর্ব গায়ত্রীমন্ত্রের ব্যাখ্যায়। এই মন্ত্রের এরূপ অপরূপ ব্যাখ্যা আর কোথাও দেখি নাই। এই মন্ত্রটিকে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া আর্যসন্তানেরা বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। অথচ ইহার যাহা প্রকৃত অর্থ তাহা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়া, যে অর্থ তাঁহারা করিতেন, তাহাতে কত আশ্চর্য বোধ হইত, কেন বেদের অসংখ্য মন্ত্র হইতে আর্যঋষিগণ এইটাকেই বেদের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রের লুপ্ত তাৎপর্যের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। ইহা তাঁহার একটা প্রধান কীর্তি বলিতে হইবে। মন্ত্রটি ছোট হইলে কি হয়, ইহার ভিতর যে সমগ্র বেদের আর্যধর্মের, আর্যসংস্কৃতির সারমর্ম নিহিত রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ধর্ম' শীর্ষক গ্রন্থে 'ধর্মের সরল আদর্শ' শীর্ষক প্রবন্ধে এই মন্ত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা এখানে উদ্‌ধৃত করিয়া দিতেছি—

'আমরা জানি বা না জানি, ব্রহ্মের সহিত আমাদের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের মধ্যে নিজের চিত্তকে উদ্‌বোধিত করিয়া তোলাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনা।

'ভারতবর্ষে এই উদ্‌বোধনের যে মন্ত্র আছে, তাহাও অত্যন্ত সরল। তাহা এক-নিঃশ্বাসেই উচ্চারিত হয়— তাহা গায়ত্রীমন্ত্র। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ— গায়ত্রীর এই অংশটুকুর নাম ব্যাহৃতি। ব্যাহৃতি শব্দের অর্থ— চারি দিক হইতে আহরণ করিয়া আনা। প্রথমত ভূলোক-ভুবর্লোক-স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হয়— মনে করিতে হয়, আমি বিশ্বভুবনের অধিবাসী—আমি কোনো বিশেষ-প্রদেশবাসী নহি— আমি যে রাজ-অট্টালিকার মধ্যে বাসস্থান পাইয়াছি, লোক-লোকান্তর তাহার এক-একটি কক্ষ। এইরূপে, যিনি যথার্থ আর্য, তিনি অন্তত প্রত্যহ একবার চন্দ্রসূর্যগ্রহতারকার মাঝখানে নিজেকে দণ্ডায়মান করেন, পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া নিখিল জগতের সহিত আপনার চিরসম্বন্ধ একবার উপলব্ধি করিয়া লন— স্বাস্থ্যকামী যেরূপ রুদ্ধগৃহ ছাড়িয়া প্রত্যুষে একবার উন্মুক্ত মাঠের বায়ু সেবন করিয়া আসেন, সেইরূপ আর্য সাধু দিনের মধ্যে একবার নিখিলের মধ্যে, ভূর্ভুবঃ-স্বর্লোকের মধ্যে নিজের চিত্তকে প্রেরণ করেন। তিনি সেই অগণ্যজ্যোতিষ্কখচিত বিশ্বলোকের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কী মন্ত্র উচ্চারণ করেন :

তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।...

এই বিশ্বপ্রসবিতা দেবতার বরণীয় শক্তি ধ্যান করি। এই বিশ্বলোকের মধ্যে

সেই বিশ্বলোকেশ্বরের যে শক্তি প্রত্যক্ষ, তাহাকেই ধ্যান করি। একবার উপলব্ধি করি— বিপুল বিশ্বজগৎ একসঙ্গে এই মুহূর্তে এবং প্রতিমুহূর্তেই তাঁহা হইতে অবিশ্রাম বিকীর্ণ হইতেছে। আমরা যাহাকে দেখিয়া শেষ করিতে পারি না, জানিয়া অন্ত করিতে পারি না, তাহা সমগ্রভাবে নিয়তই তিনি প্রেরণ করিতেছেন। এই বিশ্বপ্রকাশক অসীম শক্তির সহিত আমার অব্যবহিত সম্পর্ক কী সূত্রে? কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব?—

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—

যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহার প্রেরিত সেই ধীসূত্রেই তাঁহাকে ধ্যান করিব। সূর্যের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের দ্বারা জানি? সূর্য নিজে আমাদিগকে যে কিরণ প্রেরণ করিতেছেন, সেই কিরণেরই দ্বারা। সেইরূপ বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন—যে শক্তি থাকাতেই আমি নিজেকে ও বাহিরের সমস্ত প্রত্যক্ষব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি— সেই ধীশক্তি তাঁহারই শক্তি— এবং সেই ধীশক্তি দ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের মধ্যে অন্তরতমরূপে অনুভব করিতে পারি। বাহিরে যেমন ভূর্ভুবঃ-স্বর্লোকের সবিতৃরূপে তাঁহাকে জগৎচরাচরের মধ্যে উপলব্ধি করি, অন্তরের মধ্যেও সেইরূপ আমার ধীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বাহিরে জগৎ এবং আমার অন্তরে ধী, এ দুইই একই শক্তির বিকাশ, ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চিত্তের এবং আমার চিত্তের সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া সংকীর্ণতা হইতে, স্বার্থ হইতে, ভয় হইতে, বিষাদ হইতে মুক্তিলাভ করি। এইরূপে গায়ত্রীমন্ত্রে বাহিরের সহিত অন্তরের, এবং অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগসাধন করে।'

গায়ত্রীমন্ত্রের এই অপরূপ ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, এই মন্ত্রের প্রথম এবং প্রধান কথা ইহা হইতেছে যে মানুষকে সমগ্র বিশ্বের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। সে যে কেবল পৃথিবীর মানুষের নহে, সমগ্র বিশ্বের সহিত সে যে একসূত্রে গ্রথিত ইহা তাহাকে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইবে। ইহাই তাহার মানবতার শ্রেষ্ঠ রূপ। এইখানেই তাহার মানবতার পূর্ণ অভিব্যক্তি। কেবল পৃথিবীর মধ্যেই তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিলে সে চিরকাল দ্বৈপায়নস্বভাব (insular) থাকিয়া যাইবে। এই দ্বৈপায়নভাব (insularity) তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। এবং বিশ্বাত্মবোধে (Cosmic-mindedness) নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তবেই তাহার মানবতা পূর্ণতা লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

আজ এই গায়ত্রীমন্ত্রের বাণীর এক বিশেষ সার্থকতা আছে। কেননা আজ মানুষের মনে একটা নূতন চেতনার উন্মেষ হইয়াছে, যাহাতে সে আজ আর কেবল পৃথিবীর মানুষ হইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছে না। পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া সমগ্র বিশ্বের সহিত মিলিত হইবার তাহার যে আজ একটা ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে, ইহা অত্যন্ত শুভ চিহ্ন। ইহা এক নবযুগের, যাহাকে আমরা বিশ্বযুগ (Cosmic Age) এই আখ্যা দিতে পারি, আবির্ভাব

ঘোষণা করিতেছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে যাহা হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, গ্রহ ও নক্ষত্রলোকেরও আমাদের সহিত মিলিত হইবার একটা আগ্রহ জন্মিয়াছে। এক দিকে আমাদের যেমন আগ্রহ, বিশ্বের সহিত মিলিত হইবার তেমনি লক্ষিত হইতেছে গ্রহ এবং নক্ষত্রলোকেরও আমাদের সহিত মিলিবার আগ্রহ। এই দুই আগ্রহের মণিকাঞ্চনযোগ ঘটিয়াছে। এই সুযোগ মানুষ যেন তাহার নির্বুদ্ধিতার এবং আত্মম্ভরিতায় না হারায়। সে এক দিকে যেন নিজে চেষ্টা করিতে থাকে, বিশ্বের সহিত একসূত্রে গ্রথিত হইবার, তেমনি অন্য দিকে গ্রহ এবং নক্ষত্রলোকের তাহার সহিত মিলিত হইবার চেষ্টাকেও সে যেন সাদরে আহ্বান করিতে থাকে। ইহা যদি সে করিতে পারে, তাহা হইলেই রবীন্দ্রনাথের গায়ত্রীমন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ সার্থক হইবে।

মহাভারত-প্রসঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

অর্থশাস্ত্রমিদং পুণ্যং ধর্মশাস্ত্রমিদং পরম্।
মোক্ষশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা ॥—১।৫৬।২১

মহাভারতকে এইভাবে একাধারে অর্থশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্র বলা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রাচীন কালেও মহাভারত পাঠের প্রচলন ছিল। মহাভারতের বিভিন্ন আখ্যান নিয়ে সংস্কৃতে নাট্য রচনার প্রচেষ্টাও বাংলাদেশে তুর্কি-আক্রমণ-পূর্ব যুগে ছিল তবে মধ্যযুগে (সতেরোর শতকের গোড়ার দিকে কাশীরাম দাসই সব চেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তিনি আদি-সভা-বন-বিরাট এই পর্বচতুষ্টয় রচনা করে স্বর্গত হন বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। অন্যান্য রচয়িতাদের রচনা কাশীরাম দাসের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বর্তমান কালের কাশীদাসী মহাভারতের রূপ নিয়েছে। উইলিয়ম কেরী ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে কাশীরাম দাসের মহাভারত প্রথম ছেপে বার করেন। তিনি নিজে সংস্কৃত-মহাভারতের কয়েক পৃষ্ঠা বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন বলে জানা যায়। ১৭৯৫-এর ৩১শে ডিসেম্বর-এ লিখিত একখানি চিঠিতে পাই—

I have been trying to compose a compendious grammar of the language which I send you together with a few pages of the Mahabharata with a translation, which I wrote out for my own exercise into Bengalee...

এই পৃষ্ঠা সংস্কৃত মহাভারতের কোনো সংগৃহীত পুথির পৃষ্ঠা হতে পারে। ১৭৮৪-তে কলিকাতায় রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর মহাভারতের পুথি সংগ্রহ করার কাজ চলেছিল। এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্কৃত মহাভারতের প্রথম খণ্ড ('edited by the learned Pundits attached to the establishment of the Education Committee') ১৮৩৪-এ প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় খণ্ড সম্পাদনা করেছিলেন পণ্ডিত নিমাই-চাঁদ শিরোমণি ও নন্দগোপাল পণ্ডিত। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন রচিত তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনীতে পাই, তারানাথ তাঁর গুরু নিমাইচাঁদ শিরোমণিকে এই দুরূহ কর্মে সহায়তা করে-ছিলেন (পৃ. ১০)। তৃতীয় খণ্ডের সম্পাদনা করেছিলেন পণ্ডিত নিমাইচাঁদ শিরোমণি, পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালংকার ও পণ্ডিত রামহরি ন্যায় পঞ্চানন। জয়গোপাল তর্কালংকার ছিলেন কোলব্রুক সাহেবের 'পণ্ডিত', বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধ্যাপক এবং সমাচার-দর্পণের সহযোগী সম্পাদক। তিনি কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন শ্রীরামপুর প্রেস থেকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে যে-মহাভারত পাঠের কথা লিখেছেন— সে মহাভারত এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ। এর

পর কালীপ্রসন্ন সিংহের উদ্যোগে ব্যাসকৃত মহাভারতের সম্পূর্ণ অনুবাদকার্য শেষ হতে দীর্ঘকাল লেগেছিল (১৮৬০-৬৬)। "সৎকীর্তি ও জন্মভূমির হিতানুষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া" কালীপ্রসন্ন এই অনুবাদ-যজ্ঞে ব্রতী হন। তিনি আপন বুদ্ধি-বলে লক্ষ্য করেছিলেন :

"মূল মহাভারতের হস্তলিখিত পুস্তকসমুদায়ের পরস্পর এ প্রকার বৈলক্ষণ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, ২।৪ খানি গ্রন্থ একত্র করিলে পরস্পরের, শ্লোক, অধ্যায় ও প্রস্তাবঘটিত অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।..."

এবং সেজন্য কালীপ্রসন্ন আধুনিক কালের textual editingএর পন্থায় মুদ্রিত ও সংগৃহীত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির পাঠ বিচার করে একটি নির্দিষ্ট পাঠ স্থির করেন ও পরে পণ্ডিতবর্গের সহায়তায় সেই পাঠের অনুবাদ করেন। তিনি এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

আমি বহু যত্নে আসিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রিত ও সভাবাজারের রাজবাটীর, মৃত আশুতোষ দেবের ও শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুস্তকালয়স্থিত, তথা আমার প্রপিতামহ দেওয়ান ৺শান্তিরাম সিংহ বাহাদুরের কাশী হইতে সংগৃহীত হস্তলিখিত পুস্তক সমুদায় একত্রিত করিয়া বহুস্থলের বিরুদ্ধ ভাবের ও ব্যাসকূটের সন্দেহ নিরাকরণ পূর্বক অনুবাদ করিয়াছি।

কালীপ্রসন্নের এই কার্যে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। কালীপ্রসন্নের পূর্বে বাংলা গদ্যে মহাভারতের অনুবাদের কার্যে অগ্রসর হয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়। দেশের অতীত ইতিহাস শাস্ত্র ও সাহিত্যের আবিষ্কার, পুনশ্চর্চা ও নবমূল্যায়ন রেনেসাঁস বা নবজাগরণের অন্যতম লক্ষণ। আমাদের দেশের ইতিহাস আবিষ্কার ও চর্চায় উইলিয়ম জোন্‌স, উইলকিনস্, কোলব্রুক, প্রিন্সেপ প্রভৃতির নাম কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণীয়। অন্যদিকে রামমোহন, কৃষ্ণমোহন, রাধাকান্ত, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতির নামও আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ করে নিতে হবে। কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুবাদ সম্পর্কে লিখেছেন—

"আমার অদ্বিতীয় সহায় পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং মহাভারতের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন এবং অনুবাদিত প্রস্তাবের কিয়দংশ কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের অধীনস্থ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে প্রচারিত ও কিয়দ্‌ভাগ পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি মহাভারতের অনুবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছি শুনিয়া তিনি কৃপাপরবশ হইয়া সরল হৃদয়ে মহাভারতানুবাদে ক্ষান্ত হন।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঐ রচনা মহাভারত (উপক্রমণিকাভাগ) নামে ১৮৬০-এর জানুয়ারি মাসে স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। কালীপ্রসন্নের উক্তি থেকে প্রতীয়মান হবে যে তখনকার দিনের কলিকাতার ব্যবসায়ী ধনী ও জমিদারদের গৃহে সংস্কৃত কাব্য, পুরাণ প্রভৃতির পুথি সযত্নে সংগৃহীত হত। সভাবাজারের রাজবাড়ী, আশুতোষ দেবের বাড়ী, পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়ী, এবং তাঁদের নিজেদের বাড়ীর সংগ্রহ তার সাক্ষ্য

দিচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বর্ধমান রাজবাড়ির উল্লেখ করা দরকার। বর্ধমান রাজবাড়ি বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের প্রথম পর্বে বর্ধমানরাজের সহায়তাও পেয়েছিলেন। পণ্ডিত তারকনাথ ও অন্যান্য পণ্ডিতগণের দ্বারা সম্পাদিত ব্যাস-মহাভারতের আদি ও সভাপর্ব- যুক্ত প্রথম খণ্ড বর্ধমানরাজের নির্দেশে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হয়ে ১৮৬২-তে প্রকাশিত হয়। (কালীপ্রসন্ন ঈর্ষাবোধ করে 'হুতোম পেঁচার নকৃশা'য় বর্ধমানী-মহাভারতকে কটাক্ষ করেছেন।) ইংরেজিতে মহাভারত অনুবাদ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে। প্রতাপচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে কিশোরীমোহন গাঙ্গুলি এই কার্য করেছিলেন (১৮৮৩-৯৬)। মন্মথনাথ দত্ত, আরেকখানি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন (১৮৯৫-১৯০৫)। যাই হোক— এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে দেশের সর্বসাধারণ পড়েছে পয়বন্ধে রচিত কাশীদাসী মহাভারত আর উনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে সাম্প্রতিক কাল অবধি শিক্ষিতজনগোষ্ঠী ব্যাস-মহাভারতের মূল পরিচয় লাভ করেছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ-কৃত গদ্যে রচিত মহাভারত থেকে। মহাভারতের বিপুলতা, বৈচিত্র্য, গভীরতা, বিভিন্ন বিষয়ক জ্ঞান ও চিন্তা, রাষ্ট্রনীতি, ধর্মাদর্শ সম্পর্কে প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধ চিন্তার ফসল কাশীদাসী মহাভারত পড়ে জানা যায় না। আমাদের দেশে ভারতীয় চেতনার স্রষ্টা রামমোহন। তিনিই কয়েকখানি উপনিষদের বাংলা ভাষান্তর করে প্রাচীন শাস্ত্রকে শিক্ষিত মানুষের সম্মুখে এনে দেন। পরবর্তীকালে কৃষ্ণমোহন, রাজেন্দ্রলাল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ একই ব্রত উদ্‌যাপন করেছেন। মহাভারত, রামায়ণের মত 'কাব্য' নয়, মহাভারত যুগপৎ কাব্য ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র সকল শাস্ত্রের সমাহার। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর তাঁদের প্রগতিশীল সামাজিক সংস্কারগুলির সমর্থন খুঁজেছিলেন মহাভারতে এবং তাঁরা অনুকূল তথ্যকে উৎকলন করে নিপুণভাবে ব্যবহার করেছেন। কালীপ্রসন্ন 'জন্মভূমির হিতানুষ্ঠান'কে বড় করে দেখেছিলেন— জন্মভূমির অর্থাৎ দেশবাসীর কল্যাণ কর্ম সাধনের স্পৃহা তাঁর মধ্যে নানাভাবে জাগ্রত হয়েছিল এবং তিনি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বহুবার দিয়েছেন। কালীপ্রসন্ন স্বাভাবিকভাবেই বাল্মীকি-রামায়ণেরও অনুরূপ অনুবাদ প্রকাশ করবেন বলে আশা করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রয়ে গেছে। তবে মহাভারতের সঙ্গে ভগবদ্‌গীতা একসূত্রে বাঁধা বলে তিনি পণ্ডিতবর্গের সহায়তায় শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার সম্পূর্ণ মূলানুগত অনুবাদ করেন। কালীপ্রসন্ন ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন:

"ভগবদ্‌গীতা পাঠ করিলে পূর্বপুরুষদিগের বিদ্যাবুদ্ধি স্মরণ করিয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইতে হয়। কত শতাব্দী অতীত হইল ভগবদ্‌গীতা প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু উহার অধিকাংশ মতের সহিত অধুনাতন বিখ্যাত আন্বীক্ষিকী ও ত্রয়ী-বেত্তাদিগের মতের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়।..."

কালীপ্রসন্নের এই ব্যাখ্যা পড়ে আমরা বুঝতে পারি কী ভাবে প্রাচীন শাস্ত্রকে আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা চলছিল।

২

মহাভারত-চর্চায় এর পর পথ অপেক্ষাকৃত সুগম হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এ পন্থার চিরস্মরণীয় ব্যক্তি। তিনি বাংলা গদ্যে ব্যাস-মহাভারতের অনুবাদের জন্য কৃতজ্ঞ চিত্তে কালীপ্রসন্নকে স্মরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের সমালোচনায় লিখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র অন্ধভাবে শাস্ত্রের জয় ঘোষণা না করে স্বাধীন মনুষ্যবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন—কৃষ্ণচরিত্র বিচারে তিনি গোলে হরিবোল দেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে মহাভারতকে বিচার করতে গিয়ে দেখেছেন প্রচলিত ব্যাস-মহাভারতে বিস্তর প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে। তিনি মহাভারতকে 'ইতিহাস'রূপেই গণ্য করেছেন তাঁর বিচারে শ্রীকৃষ্ণ 'ঐতিহাসিক'চরিত্র। মেকলে, কার্লাইল, লা-মার্টিন, থুকিদিদীস প্রভৃতির উদাহরণ দেখিয়ে তিনি মহাভারতকে কবিত্বময় ইতিহাসরূপে গণ্য করেছেন। (রবীন্দ্রনাথ বলেন, ঐতিহাসিক কাব্য)। বঙ্কিমচন্দ্র যে 'কৃষ্ণচরিত্র' গঠন করছিলেন তার মূল বহুলাংশে ছিল ফরাসী মনীষী কোম্‌তের মতাদর্শে। মূলতঃ তাঁর ব্যাখ্যাত বৃত্তিত্রয়ের সামঞ্জস্য শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে আরোপিত হয়েছে বললে অন্যায় হয় না। ভগবদ্‌গীতার জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির যোগ ও কোম্‌তের বিভিন্ন বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন-তত্ত্ব মিলিয়ে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের সৃষ্টি। তিনি যীশুখ্রীষ্ট বা বুদ্ধদেবের চেয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ মানব রূপে গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে 'ভক্তি'র কথা বলেছেন সে-ভক্তি নিষ্কাম কর্মযোগের সঙ্গে যুক্ত, চৈতন্যপন্থার বৈষ্ণব 'ভক্তি' নয়। তিনি মহাভারতের যুগের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন তার কারণ সেখানে আমাদের ইহজীবনকে গ্রহণ করেই 'আদর্শ' কর্মযোগী জীবন অভিব্যক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ (১৮৮৬) প্রকাশের পর তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থের প্রথম ভাগ রচনা করেন। তার পর 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের পরিবর্ধন (১৮৯২) করেন। ধর্মতত্ত্ব (অনুশীলন) (১৮৮৮) গ্রন্থের সঙ্গে 'কৃষ্ণচরিত্র' অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতে বর্ণিত পাণ্ডবকাহিনী ও শ্রীকৃষ্ণজীবন-কথাকে যে-ভাবে যুক্তিগর্ভ বিচার করেছেন তার তুলনা মেলে না। তিনি মহাভারতের বিভিন্ন স্তর নির্ণয়ে, প্রক্ষিপ্ত অংশ নির্বাচনে, অবিশ্বাস্য ঘটনা বর্জনে যে সাহসিক, ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত-বিশ্লেষণে যে-পাণ্ডিত্য ও যুক্তিনিষ্ঠ প্রকাশ ঘটিয়েছেন তার মূল্য অপরিসীম।

বঙ্কিমচন্দ্র রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজ সকল বিষয়ই যুক্তিনিষ্ঠরীতিতে আলোচনা করেছেন। সে-যুগে আমাদের সমাজবিশ্রুত এমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ নেই, যা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র আলোচনায় অগ্রসর হন নি। বঙ্কিমচন্দ্র সমাজ ও রাষ্ট্র চিন্তায় তাঁর যুগে অন্যান্যদের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। তিনি 'মহাভারত'-এর সভাপর্ব থেকে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সূত্রে 'দেবর্ষি নারদ-যুধিষ্ঠির সংবাদ' নিয়ে দীর্ঘ প্রসঙ্গ করেছেন তার কারণ বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতের এই আখ্যানে চিরকালের ও সর্বজাতির আচরণীয় রাজধর্মকে দেখেছিলেন। ব্যক্তি ও সমাজের, রাজা ও প্রজার মঙ্গলকে তাদের পারস্পরিক সামঞ্জস্যকে তথা লোকহিতকে বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্ম' বলে মনে করেছেন। সেজন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণচরিত্র আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—

"তত্ত্বপদিষ্ট লোকহিতাত্মক ধর্ম গ্রহণ করিব। বেন্থামের কথা ইংলণ্ড শুনিল—কৃষ্ণের কথা ভারতবর্ষ শুনিবে না?"

মহাভারতে পূর্বোক্ত অংশে সর্বশ্রেণীর প্রজার মঙ্গলই যে সমাজের মঙ্গল এবং সেই মঙ্গলবিধানই যে প্রকৃত রাজধর্ম সে কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বোঝানো হয়েছে। ঊনবিংশ শতক আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র, পুরাণ ও সাহিত্যের নববিচারের যুগ। বঙ্কিমচন্দ্র কোম্‌তে-বেন্থাম-স্পেনসার-মিল-সীলির রচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং ব্যষ্টি-সমষ্টির কল্যাণবাদকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন মহাভারতের ঐ রচনাটিতে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের একাংশের অবজ্ঞামিশ্রিত ভারত-ইতিহাস আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, জবাবও দিয়েছিলেন। তিনি নারদ-যুধিষ্ঠির সংবাদ আলোচনার প্রারম্ভে লিখেছেন—

'নারদের যে উপদেশ বাক্যের কথার উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে এমত তত্ত্ব অনেক আছে যে রাজনীতি-বিশারদ ইংরেজেরও তাহা গ্রহণ করিয়া তদনুসারে চলিলে তাঁহাদিগের উপকার হয়।'

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে মহাভারত ও গীতা বহু শতাব্দী পরে বরণীয়ার্থ লাভ করেছে এ কথা স্বীকার্য। অপর একটি প্রসঙ্গ ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা নির্ণয়। বঙ্কিমচন্দ্র নবযুগের মননশীল ব্যক্তি, তিনি বর্ণগত ব্রাহ্মণত্বকে স্বীকার করতে চান নি। 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে ব্রাহ্মণ-লক্ষণ প্রসঙ্গে তিনি সদাচারী, জিতেন্দ্রিয় শূদ্রকেও ব্রাহ্মণ এবং অসদাচারী ব্রাহ্মণকে শূদ্রাধম বলে ঘোষণা করেছেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্র সেনকে ব্রাহ্মণ বলে অভিবাদন জানিয়েছেন। বলা বাহুল্য, এ ঘোষণার সমর্থন তিনি পেয়েছেন মহাভারতে এবং কয়েকবার তিনি মহাভারতের নানা স্থান থেকে উক্ত ব্রাহ্মণ-লক্ষণ উদ্‌ধৃত করেছেন। (এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের "ব্রাহ্মণ" প্রবন্ধটিও স্মরণীয়।) বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর যুক্তিসেবিত মন দিয়ে যেমন মহাভারতকে ব্যাখ্যা করেছেন, তেমনি ঊনবিংশ শতকের যুক্তিনিষ্ঠ মানববাদী বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতের ও গীতার নিকট থেকেই তাঁর মনন-সাধনার পাথেয় বহুলভাবে লাভ করেছেন।

নবীনচন্দ্র সেনও ভগবদ্‌গীতার পদ্যানুবাদ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের জীবন অবলম্বনে রৈবতক (১৮৮৬), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩) ও প্রভাস (১৮৯৬) কাব্যত্রয় রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের আদি-মধ্য-অন্ত্য ভাগ উক্ত তিনখানি কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবন' গ্রন্থে কাব্যত্রয় রচনা প্রসঙ্গে তিনি নিজেকে প্রাচীন যুগের নৈমিষারণ্যের ঋষিদের অনুরূপ সাধনার অংশভাক্‌ বলে ঘোষণা করেছেন। 'মহাভারত'-আখ্যানকে অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের তথা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের যে-পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন সে-সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পত্রালাপ সর্বজনবিদিত। রাজ্যভ্রষ্ট অনার্য ও ক্ষমতাচ্যুত ব্রাহ্মণগোষ্ঠী একজোট হয়ে শ্রীকৃষ্ণের কল্পিত ধর্মরাজ্য ধ্বংসে প্রবৃত্ত হয়েছিল এই সিদ্ধান্তে নবীনচন্দ্র উপনীত হয়েছিলেন। কবি শেলির বিশ্বরাষ্ট্র পরিকল্পনার সঙ্গে গীতার 'ধর্মসংস্থাপনার্থায়' মিলিয়ে 'একজাতি এক ধর্ম, শিখাব একত্ব মর্ম, এক ধর্মরাজ্য বিশ্বে করিব

স্থাপন' ঘোষণা শ্রীকৃষ্ণকে দিয়ে নবীনচন্দ্র করিয়েছেন। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের রাষ্ট্রীয় ঐক্যচেতনা, সর্বভারতীয় চেতনা, হিতবাদী মানবচেতনা নবীনচন্দ্রের কল্পিত মহাভারতরাষ্ট্র গঠনের পিছনে ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তথা মহাভারত ব্যাখ্যায় দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সুস্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতের আখ্যানগুলিকে বিচার করে জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগী শ্রীকৃষ্ণকে ব্যাখ্যা করেছেন, যিনি 'অধর্ম' পন্থাকে সর্বতোভাবে বর্জন করেছেন। নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ সর্বভূতহিত ও নিষ্কামকর্মে রত থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত চৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের পঞ্চ ভক্তিরস সাধনার প্রবক্তা। নবীনচন্দ্র আর্য-অনার্যের মিলনব্রত সম্পাদনই শ্রীকৃষ্ণের প্রধান লক্ষ্য রূপে ধরেছিলেন—

অনার্য ব্রাহ্মণ-আর্য গাবে এক কৃষ্ণ নাম—
আর্য ও অনার্য এক প্রেমে ভাসমান,—
প্রতিধ্বনি তুলি সিন্ধু গাবে হরিনাম ॥

নবীনচন্দ্র মহাভারত তথা শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের একটি নব ব্যাখ্যা দানের যে প্রচেষ্টা করেছিলেন তাকে প্রশংসনীয় বলতে হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র উভয়েই গীতা ও মহাভারতের তথা শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের নতুন ব্যাখ্যা দান করেছেন। তাঁদের দুজনের কাছেই শ্রীকৃষ্ণ মূলতঃ পূর্ণ মনুষ্যত্বের আধার যদিচ দুজনের কল্পনায় ও লক্ষ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের এই ব্যাখ্যা উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের ধর্মকে গ্রহণ করে বিস্তার লাভ করেছে।

৩

রবীন্দ্রনাথ ধর্ম ও সমাজচিন্তায় রেনেসাঁস বা নবজাগরণের শক্তিকে বহুলভাবে গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের সমাজে উনবিংশ শতকের শেষের দিকে রেনেসাঁসের পরিবর্তে 'রিভাইভ্যালিজমে'র ঢেউ প্রবল হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। ১২৯১-এ 'প্রচার' ও 'নবজীবন' পত্রিকা দুখানি প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই পত্রিকা দুটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিন্তু তিনি হিন্দুধর্মের বা ধর্মের যে 'আদর্শ' প্রচার ও ব্যাখ্যা করেন তার সঙ্গে তথাকথিত 'নব্য-হিন্দুত্বে'র যোগ নেই। কোম্‌তের 'প্রত্যক্ষবাদ' থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে তাঁর অনুশীলনতত্ত্বের সন্ধান পান এবং পরে বিভিন্ন পাশ্চাত্য মনীষীর মত ও ভগবদ্‌গীতার তত্ত্বকে মিলিয়ে একটি বিশিষ্ট ধর্মাদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন, যার সঙ্গে 'প্রচলিত' আচারসেবিত হিন্দুধর্মের কোনও যোগ নেই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এই জ্ঞান-প্রতিপাদ্য 'আদর্শ'কে তাঁর অনুগামীরা বহন করতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র 'নব্যহিন্দুত্বে'র নেতা শশধর তর্কচূড়ামণিকে আদৌ স্বীকার করেন নি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ও অতীব দুঃখের ঘটনা, সেদিনকার হিন্দু সমাজে তর্কচূড়ামণির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, এবং তাঁর অন্যতম সহায়ক ছিলেন একদা বঙ্কিম-সুহৃদ্ চন্দ্রনাথ বসু।

আচারগত ধর্ম ও প্রথাগত সংস্কারের অদ্ভুত (তথাকথিত বৈজ্ঞানিক !) ব্যাখ্যা-ভাষ্য প্রচার ও তার সমর্থন 'নবজাগরণে'র শক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ও চন্দ্রনাথ বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা ধর্ম ও সমাজচিন্তায় উদার-মত ও পথের বিরোধী ছিলেন। তাঁদের রক্ষণশীল ও প্রগতিবিমুখ মতামতকে তাঁরা 'আর্যামি'র সমর্থন বলে প্রকাশ করতেন। তাঁদের সঙ্গে এলেন কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। তিনি ১২৯০-এ কৃষ্ণানন্দ নাম নিয়ে নূতন ধরণের তন্ত্রসাধনা শুরু করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, কলিযুগে তিনি 'কল্কি অবতার'। (তাঁর পরবর্তী জীবনের কদর্য অধ্যায় সর্বজনবিদিত)। 'আর্যামির আস্ফালন'কে কোনোদিনই রবীন্দ্রনাথ সহ্য করেন নি ('আর্য ও অনার্য' দ্রষ্টব্য)। তিনি প্রিয়নাথ সেনের নিকট এক পত্রে লিখলেন ব্যঙ্গ করে—

ক্ষুদে ক্ষুদে আর্যগুলো ঘাসের মতো গজিয়ে ওঠে
ছুঁচোলো সব জিবের ডগা কাঁটার মতো পায়ে ফোটে॥
তাঁরা বলেন 'আমি কল্কি' গাঁজার কল্কি হবে বুঝি
অবতারে ভরে গেল যত রাজ্যের গলিঘুঁজি॥

এবং এই ১২৯১-এর (১৮৮৫) মাঘ মাসে, (৫ই মাঘ) রবীন্দ্রনাথ সিটি কলেজ গৃহে 'রামমোহন রায়' সম্পর্কে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি বলেন :

'রামমোহন রায় যখন জাগ্রত হইয়া বঙ্গসমাজের চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন তখন বঙ্গসমাজ সেই প্রেতভূমি ছিল।…রামমোহন রায় সমাজকে এই সহস্র নাগপাশবন্ধন হইতে মুক্ত করিতে নির্ভয়ে অগ্রসর হইলেন।…কেবলমাত্র বাহ্য-অনুষ্ঠান ও জীবনহীন তন্ত্রমন্ত্রের মধ্যে জীবন্তে সমাহিত হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার করিলেন। যে-মৃতভারে আচ্ছন্ন হইয়া হিন্দুধর্ম দিন দিন অবসন্ন মুমূর্ষু হইয়া পড়িতেছিল, যে-জড়পাষাণস্তূপে পিষ্ট হইয়া হিন্দুধর্মের হৃদয় হতচেতন হইয়া পড়িতেছিল, সেই মৃতভারে, সেই জড়স্তূপে রামমোহন রায় প্রচণ্ড বলে আঘাত করিলেন…'

রামমোহন রায় শাস্ত্রের আয়ুধ দিয়েই অশাস্ত্রকে আঘাত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে বলেছেন 'ভারতপথিক'। তিনিও প্রচলিত প্রগতিবিমুখ 'নব্যহিন্দুত্ব'ও প্রচলিত সংকীর্ণ লোকাচার ও প্রথাগত ধর্মাশ্রিত জীবনকে ধিক্কার দিয়ে আমাদের সম্মুখে প্রসারিত করে ধরলেন মহাকবি ব্যাসকৃত অমর মহাকাব্য 'মহাভারত' বর্ণিত জীবন। তিনি দেখালেন মহাভারতে যে বিপুল মানব-জীবনবেগ সহস্রধারায় উৎসারিত, উচ্ছ্বসিত হয়েছে, সেই জীবনবেগের কিছুমাত্র উত্তরাধিকারসূত্রে হিন্দুসমাজের আমরা আজ আর বহন করছি না, অথচ দোহাই পাড়ছি সেই প্রাচীন ভারতের, আমাদের রক্ষণশীল মনোবৃত্তির জড় মতগুলির সমর্থনে। এই মানসিক শঠতা ও ক্লৈব্যের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'তে লিখলেন—

"আমরা যখন একটা জাতির মতো জাতি ছিলুম তখন আমাদের যুদ্ধ বাণিজ্য শিল্প, দেশে বিদেশে গতায়াত, বিজাতীয়দের সঙ্গে বিবিধ বিদ্যার আদানপ্রদান, দিগ্বিজয়ী বল

এবং বিচিত্র ঐশ্বর্য ছিল।...আমাদের সেই সর্বাঙ্গসম্পন্ন প্রাচীন সভ্যতা বহুদিন হল পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়েছে, আমাদের বর্তমান সমাজ তারই প্রেতযোনি মাত্র।...এক মহাভারত পড়লেই দেখতে পাওয়া যায় আমাদের তখনকার সভ্যতার মধ্যে জীবনের আবেগ কত বলবান ছিল। তার মধ্যে কত পরিবর্তন, কত সমাজবিপ্লব, কত বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ দেখতে পাওয়া যায়। সে সমাজ কোনো একজন পরম বুদ্ধিমান শিল্পচতুর লোকের স্বহস্তরচিত অতি সুচারু পরিপাটি সমভাববিশিষ্ট কলের সমাজ ছিল না। সে সমাজে এক দিকে লোভ হিংসা ভয় দ্বেষ অসংযত-অহংকার, অন্য দিকে বিনম্র বীরত্ব আত্মবিসর্জন উদার-মহত্ত্ব এবং অপূর্ব সাধুভাব মনুষ্যচরিত্রকে সর্বদা মথিত করে জাগ্রত করে রেখেছিল। সে সমাজে সকল পুরুষ সাধু, সকল স্ত্রী সতী, সকল ব্রাহ্মণ তপঃপরায়ণ ছিলেন না। সে সমাজে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন, দ্রোণ কৃপ পরশুরাম ব্রাহ্মণ ছিলেন, কুন্তী সতী ছিলেন, ক্ষমাপরায়ণ যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় পুরুষ ছিলেন এবং শত্রুরক্তলোলুপা তেজস্বিনী দ্রৌপদী রমণী ছিলেন। তখনকার সমাজ ভালোয়-মন্দয় আলোকে-অন্ধকারে জীবনলক্ষণাক্রান্ত ছিল; মানবসমাজ চিহ্নিত বিভক্ত সংযত সমাহিত কারুকার্যের মত ছিল না। এবং সেই বিপ্লব সংক্ষুব্ধ বিচিত্র মানববৃত্তির সংঘাত-দ্বারা সর্বদা জাগ্রতশক্তিপূর্ণ সমাজের মধ্যে আমাদের প্রাচীন ব্যূঢোরস্ক শালপ্রাংশু সভ্যতা উন্নতমস্তকে বিহার করত।'

কাজেই মহাভারতের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সন্ধান পেয়েছিলেন বলিষ্ঠ জীবনধর্মী সভ্যতার, যে-সভ্যতা 'আধ্যাত্মিক বাবুয়ানা' নিয়ে মত্ত ছিল না। 'জীবন্ত সচেষ্ট তেজস্বী হিন্দুসভ্যতা'র উজ্জ্বল নিদর্শন তিনি দেখেছিলেন 'মহাভারত' গ্রন্থে এবং নানা উপলক্ষে মহাভারতের এই উন্নত সহস্রশীর্ষ জীবনকে তিনি উপস্থাপিত করেছেন। 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য' প্রবন্ধে (১৩০১) তিনি বেগবান প্রাচীন ভারতের যে-বর্ণনা দিয়েছেন সে বর্ণনা যে মহাভারতকে সম্মুখে রেখে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি লিখেছেন—

"আমরা মনে করি, প্রাচীন হিন্দুগণ রক্তমাংসের মনুষ্য ছিলেন না, তাঁহারা কেবল সজীব শাস্ত্রের শ্লোক ছিলেন; তাঁহারা কেবল বিশ্বজগৎকে মায়া মনে করিতেন এবং সমস্ত দিন জপতপ করিতেন। তাঁহারা যে যুদ্ধ করিতেন, রাজ্যরক্ষা করিতেন, শিল্পচর্চা ও কাব্যালোচনা করিতেন, সমুদ্র পার হইয়া বাণিজ্য করিতেন— তাঁহাদের মধ্যে যে ভালো-মন্দের সংঘাত ছিল, বিচার ছিল, বিদ্রোহ ছিল, মতবৈচিত্র্য ছিল, এক কথায় জীবন ছিল, তাহা আমরা জ্ঞানে জানি বটে কিন্তু অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারি না। প্রাচীন ভারবর্ষের কল্পনা করিতে গেলেই নূতন পঞ্জিকার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সংক্রান্তির মূর্তিটি আমাদের মনে উদয় হয়।"

অথচ আমাদের বর্তমান আর্যম্মন্য হিন্দুসমাজ যে মহাভারতের সেই উদার বীর্যবান সমাজ থেকে কতদূর অধঃপতিত হয়েছে তারই দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি হ্যামারগ্রেন-প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। রামমোহন রায়ের বিশ্বমুখীন মত-আদর্শ সম্পর্কে সশ্রদ্ধমনা হয়ে সুইডেনবাসী হ্যামারগ্রেন বাংলাদেশে এসে অকালে পরলোকগত হন। এই প্রসঙ্গে জানা দরকার যে

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হ্যামারগ্রেনকে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি এই আশা প্রকাশ করেছিলেন যে তাঁর মৃতদেহ যেন অগ্নিতে দাহ করা হয়। মৃতদেহ নিমতলায় দাহ হবার পর রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ 'ম্লেচ্ছ'দাহে হিন্দুশ্মশানের অপবিত্রতার প্রশ্ন তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য' (১৩০১) প্রবন্ধে এই মূঢ় 'ধর্মনিষ্ঠা'র তীব্র নিন্দা করে বলেছিলেন—

'জানি না কী দুর্দৈবক্রমে সম্প্রতি এমন দুঃসময় পড়িয়াছে যে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও হিন্দুধর্মকে নিষ্ঠুর সংকীর্ণ এবং একান্ত পরবিদ্বেষী বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না।'

রবীন্দ্রনাথের মতে এই সর্বনাশা 'সংকীর্ণ' পথ সর্বথা পরিত্যাজ্য। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিয়েও রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য-সভ্যতার শক্তি তথা সত্যকে নির্মোহদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন। ঐ সভ্যতার 'চিরন্তন অংশ' গ্রহণে যে আমাদের কল্যাণ বই অমঙ্গল নেই এ কথা তিনি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের "সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতীকার" প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে রচিত 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধ (১৩১৪) থেকে একটি অংশ উৎকলন করা যেতে পারে—

'এ কথা যিনি বলেন, ভারতবর্ষীয় আদর্শে লোককে কেবলই তপস্বী করে, কেবলই ব্রাহ্মণ করিয়া তুলে, তিনি ভুল বলেন এবং গর্বচ্ছলে মহান্ আদর্শকে নিন্দা করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ যখন মহান্ ছিল, তখন সে বিচিত্ররূপে বিচিত্রভাবেই মহান্ ছিল। তখন সে বীর্যে ঐশ্বর্যে জ্ঞানে এবং ধর্মে মহান্ ছিল তখন সে কেবলই মালাজপ করিত না।'

বলা বাহুল্য উৎকলিত অংশটির অনুরূপ বক্তব্য আমরা পূর্বে দেখেছি।

ভারতীয় 'বিশিষ্টতা' 'স্বাধর্ম্য' 'স্বাতন্ত্র্য' প্রভৃতির ঘোষণা যে শেষ পর্যন্ত মহাভারত-বর্ণিত আর্যজীবনের প্রকৃত সত্যের বিরোধী হয়ে ওঠে এ কথাই রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চেয়েছিলেন। 'ব্যাধি ও প্রতিকার' রচনার পরে ১৩১৮ সালে রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধ রচনা করেন। স্বজাতির 'বিশিষ্টতা' ও স্বাদেশিকতা নিয়ে গৌরবকারী অথচ সংকীর্ণমনা শিক্ষিত হিন্দু সমাজের একাংশের চিন্তা ও আচরণের দৈন্য রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেয়েছিলেন। যাঁরা লোকপরম্পরাগত আচারকে শাস্ত্রনির্দেশ বলে মেনে নিতে দ্বিধা করেন নি, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক প্রথাকেই সমর্থন করেছেন, বুদ্ধি বা বিচারকে নয়, সেই সমাজের অবিবেকী জড় ধারণাকে তীব্রভাবে আঘাত করবার প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন— তাই তিনি মহাভারতের দৃষ্টান্তকে পুনরায় তুলে ধরলেন সজীব মনুষ্যত্বের নিদর্শন হিসাবে—

'একদিন এই হিন্দু সভ্যতা সজীব ছিল, তখন সে সমুদ্র পার হইয়াছে, উপনিবেশ বাঁধিয়াছে, দিগ্‌বিজয় করিয়াছে, দিয়াছে এবং নিয়াছে; তখন তাহার শিল্প ছিল, বাণিজ্য ছিল, তাহার কর্মপ্রবাহ ব্যাপক ও বেগবান ছিল; তখন তাহার ইতিহাসে নব নব মতের

অভ্যুত্থান, সমাজ-বিপ্লব ও ধর্মবিপ্লবের স্থান ছিল; তখন তাহার স্ত্রীসমাজেও বীরত্ব, বিদ্যা ও তপস্যা ছিল; তখন তাহার আচার ব্যবহার যে চিরকালের মতো লোহার ছাঁচে ঢালাই করা ছিল না মহাভারত পড়িলে পাতায় পাতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই বৃহৎ বিচিত্র জীবনের-বেগে-চঞ্চল, জাগ্রত চিত্তবৃত্তির তাড়নায় নব নব অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হিন্দুসমাজ— যে সমাজ ভুলের ভিতর দিয়া সত্যে চলিয়াছিল···সেই সমাজকে আজ আমরা হিন্দুসমাজ বলিয়া স্বীকার করিতেই চাই না;— যাহা চলিতেছে না তাহাকে আমরা হিন্দুসমাজ বলি···'

'যাহা চলিতেছে না' অর্থাৎ প্রাচীন ভারতের জঙ্গম সভ্যতাকে বর্জন করে আমরা যে 'স্থাবর' রূপকে গ্রহণ করছিলাম, তার বিরোধিতা করে সমকালীন নাটক 'অচলায়তন' প্রকাশিত হয়। ঐ নাটকের 'স্থবিরপত্তন', 'মন্থরগুপ্ত', 'স্থবিরক' নামগুলি জড়ত্বের দ্যোতক। বেগবান জগৎপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, উঁচু প্রাচীর তুলে 'অচলায়তন' প্রতিষ্ঠা, চণ্ডককে কালঝণ্টি দেবীর কাছে বলিদান, একজটা দেবীর দিকের জানালা খোলার অপরাধে সুভদ্রের 'মহাতামস' প্রায়শ্চিত্ত সবই 'স্থবির' সভ্যতার বিশেষ বিশেষ রূপক মাত্র। রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই সর্বপ্রকার স্থবিরত্বের বিরোধী, তাই অচলায়তনের দেয়াল গুরু-চালিত শোণপাংশুদের অস্ত্রাঘাতে বিচূর্ণ হয়। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র'কে তিনি আশীর্বাদ জানান, অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন মনের ও চিন্তার তারুণ্যকে। ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে (১৩২১) তিনি এই যৌবনের শক্তিকে ডাক দিতে গিয়ে পুনরায় মহাভারতের প্রাণস্পর্ধী জঙ্গম জীবনকেই তুলে ধরলেন—

'আজ ক্ষুদ্র ভারতের প্রাণ একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া স্থির হইয়া গেছে, তাহার মধ্যে সাহস নাই, সৃষ্টির কোনো উদ্যম নাই এইজন্যই মহাভারতের সনাতন প্রাণের সঙ্গে তাহার যোগই নাই। যে-যুগ দর্শন চিন্তা করিয়াছিল, যে-যুগ শিল্পসৃষ্টি করিয়াছিল, যে-যুগ রাজ্যবিস্তার করিয়াছিল তাহার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন। অথচ আমরা তারিখের হিসাব করিয়া দেখিতেছি জগতে আমাদের মতো সনাতন আর কিছুই নাই। কিন্তু তারিখ তো কেবল অঙ্কের হিসাব, তাহা তো প্রাণের হিসাব নয়।'

ঠিক এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধ সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি দ্রৌপদী ও কর্ণ চরিত্রের আদিম বলিষ্ঠতার উল্লেখ করেছেন—

মহাভারতকার কবি যে একটি বীরসমাজ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একটি সুমহৎ সামঞ্জস্য আছে কিন্তু ক্ষুদ্র সুসংগতি নাই। খুব সম্ভব, আধুনিক খ্যাত-অখ্যাত অনেক আর্য বাঙালি লেখকই সরলা বিমলা দামিনী যামিনী নাম দিয়া এমন সকল সতীচরিত্রের সৃষ্টি করিতে পারেন, কিন্তু তথাপি, মহাভারতের দ্রৌপদী তাহার সমস্ত অপূর্ণতা অসংকোচে বক্ষে বহন করিয়া এই সমস্ত নব্যবল্মীক রচিত ক্ষুদ্র নীতিস্তূপগুলির বহু ঊর্ধ্বে উদার আদিম অপর্যাপ্ত প্রবল মাহাত্ম্যে নিত্যকাল বিরাজ করিতে থাকিবেন। কর্ণ চরিত্র সম্পর্কেও অনুরূপ উক্তি রবীন্দ্রনাথ করেছেন।

বিচিত্রবীর্য সমাজের যে-পরিচয় রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ-মহাভারতে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, তার মধ্যে তিনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের একটি সংঘাত ও সমন্বয়মূলক ইতিবৃত্তের সন্ধান পান। আর্য ও আর্যেতর গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় প্রচেষ্টা, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের ক্ষমতাগত ও আদর্শগত দ্বন্দ্ব, যজ্ঞবিধি ও জ্ঞান-ভক্তির দ্বন্দ্ব প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজ ও সভ্যতা যে একটি নূতন পরিণতির পথে যাত্রা করেছিল তার বিশ্লেষণ-ধর্মী আলোচনা রবীন্দ্রনাথ করেন 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে (১৩১৮)। এই প্রবন্ধটি পঠিত ও প্রকাশিত হবার পর তাঁর অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পর বৎসরের শ্রাবণ মাসে 'প্রবাসী পত্রিকা'য় (১৩১৯) রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে সমর্থন করে একটি 'আলোচনা' প্রকাশ করেন। কবির প্রবন্ধটি যদুনাথ সরকার মহাশয় 'মডার্ন রিভিউ পত্রিকা'য় ১৯১৩ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 'My Interpretation of Indian History' নামে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯২৩ সালে 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি' পত্রিকায় 'A Vision of India's History' নামে যে প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন, সেটি 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধটির অবিকল অনুবাদ নয়। অনেক নতুন তথ্য ও মন্তব্য কবি এই প্রবন্ধে যোগ করেন। এই প্রবন্ধে মহাভারত-বর্ণিত বহু চরিত্র ও ঘটনাকে কবি অচিন্ত্য-পূর্ব রীতিতে ব্যাখ্যা করেছেন এবং মহাভারত সংকলনের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দান করেছেন।

আর্য ও আর্যেতর গোষ্ঠীর সংঘাতের রূপক বলে তিনি গ্রহণ করেছেন মহাভারতের রাজা জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ কাহিনীকে। নাগবংশ ধ্বংসের মধ্যে সে-যুগের গোষ্ঠীবৈরিতাই রূপায়িত হয়েছে। অন্যদিকে রামায়ণের জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র ক্ষত্রিয়ত্রয়ী আর্য ও আর্যেতর জনগোষ্ঠীর অন্তঃসংঘাত ঘুচিয়ে একটি সমন্বয়ের সূত্রে উভয় গোষ্ঠীকে বদ্ধ করবার প্রচেষ্টা করেছিলেন এবং সেজন্যই রামচন্দ্র 'অবতার' রূপে পরবর্তীকালে পূজিত হয়েছেন বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। এবং এই পর্যায়ে আছেন শ্রীকৃষ্ণও। (এখানে নবীনচন্দ্রের সঙ্গে মতসাদৃশ্য লক্ষণীয়) তিনিও ক্ষত্রিয়, এবং বেদ ও ব্রাহ্মণ্য মতবিরোধী। রবীন্দ্রনাথের মতে ভৃগু যে বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করেছিলেন তার মধ্যে রয়ে গেছে সেকালের যজ্ঞাদিধর্ম ও তার বিরুদ্ধশক্তির দ্বন্দ্ব। মহাভারতকে অবলম্বন করে তিনি প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় গোষ্ঠীর 'আদর্শ'গত দ্বন্দ্বের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। গীতা মহাভারতেরই অংশরূপে স্বীকৃত হয়ে আসছে এবং ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয় অর্জুনকে যে-উপদেশ দিয়েছেন সেগুলিই এখানে সমাহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ গীতার কয়েকটি শ্লোক তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে ব্যবহার করেছেন :

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥ ২॥৪২

অথবা—

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥ ২॥৫৩

তাঁর মতে "বেদ" ও "শ্রুতি" সম্পর্কে ভগবদ্গীতার এই মন্তব্য বৈদিক কর্মবিধির প্রতিপক্ষ। এবং স্মরণীয় তথ্য ভগবদ্গীতার প্রবক্তা ব্রাহ্মণ নন, ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ। তিনি আর একটি নতুন কথা বলেছেন যে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ মূলত দুটি ধর্মপন্থার অর্থাৎ কৃষ্ণপন্থা ও কৃষ্ণবৈরীপন্থার যুদ্ধ, রাজ্যলাভে কুরুপাণ্ডবের সংঘর্ষ নয়। তাঁর মতে মহাভারতের পরবর্তী কালের সংস্করণে প্রচলিত রূপান্তর ঘটানো হয়েছে।

In this latter version of the epic the fact is suppressed that it was an unorthodox religious movement, acknowledging Krishna to be its prophet, that gave rise to the most desperate fight in the ancient ages in India. The very fact that Krishna was the charioteer of Arjuna is proof enough that it was a war of rival creeds; and for that very reason the battleground of Kurukshetra has ever remained a Sacred spot of pilgrimage.—*A Vision of India's History pp. II.*

রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের আদি রূপ ও পরবর্তী কালের রূপান্তর সম্পর্কে যে-মন্তব্য করেছেন ঐতিহাসিকেরা তাকে স্বীকার করবেন বলে মনে হয় না— কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ধর্ম ও সমাজের ভিত্তিতে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার গুরুত্ব অস্বীকার্য নয়। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর বিরোধীদলের কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যে সমাবেশ ঘটেছিল তার মধ্য দিয়েও রবীন্দ্রনাথ এই দ্বন্দ্বের নির্দেশ পেয়েছেন। তাঁর মতে কৃষ্ণবিরোধী পক্ষে ছিলেন দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ বীরেরা এবং ক্ষত্রিয়বিরোধী পরশুরামের শিষ্য ছিলেন দ্রোণ।

৪

মহাভারতের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের প্রতি এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। মহাভারত মহাকাব্য সংকলনের পিছনে এক গুরুতর সামাজিক তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেছেন। আমরা জানি মহাভারতের আদি নাম ছিল 'জয়' তাকে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে 'ইতিহাস' এবং 'জয়' নামযুক্ত এই 'ইতিহাস' যুদ্ধজয়েচ্ছু সকল ব্যক্তির শ্রোতব্য— এ কথা ঐতিহাসিকেরা জানিয়েছেন। 'ততো জয়মুদীরয়েৎ' বাক্যাংশটি নমস্ক্রিয়ায় আমরা পেয়েছি কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির সর্বত্র— "নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ"॥
শ্লোকটি পাওয়া যায় না। এই শ্লোকটি বৈষ্ণব-প্রাধান্যকালে সংযোজিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। (এইজন্য মহাভারতের 'পুনা-সংস্করণে ঐ শ্লোকটি সন্নিবেশিত হয় নি।)

রবীন্দ্রনাথ মহাভারত রচনার পিছনে দেখেছেন ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রবল সামাজিক

উপপ্লব এবং ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে বাঁধবার প্রচেষ্টা। তাঁর মতে বুদ্ধদেব ও মহাবীর এই দুই ক্ষত্রিয় বেদবিরোধী নেতা "মুক্তির বার্তাই ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছিলেন। এইবার অতি দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয় গুরুর প্রভাব ব্রাহ্মণের শক্তিকে একেবারে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল।" কিন্তু বৌদ্ধ জৈন ধর্মের বন্যাকে রবীন্দ্রনাথ সমাজ-সংগঠনের দিক থেকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করতে পারেন নি, কেননা তাঁর মতে—

'এতদিন ভারতবর্ষে আর্য-অনার্যের যে মিলন ঘটিতেছিল তাহার মধ্যে পদে পদে একটা সংযম ছিল— মাঝে মাঝে বাঁধ বাঁধিয়া প্রলয়স্রোতকে ঠেকাইয়া রাখা হইতেছিল।'

কিন্তু যখন বৌদ্ধপ্রভাবের বন্যা সরে গেল তখন দেখা গেল সমাজের সংযমও ভেঙে গেছে। শক হুন প্রভৃতিরা বন্যার জলের মতো সমাজের মর্মস্থলে প্রবেশ করে অদ্ভুত উচ্ছৃংখলতার সৃষ্টি করেছে। তখন—'সমাজের অন্তরস্থিত আর্যপ্রকৃতি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিল।'

এই শক্তিপ্রয়োগের প্রকৃষ্ট ফল মহাভারত। 'সামাজিক প্রলয়ঝড়ে আপনার ছিন্নভিন্ন বিক্ষিপ্ত সূত্রগুলিকে খুঁজিয়া লইয়া জোড়া দিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল।···তখনকার যিনি ব্যাস, নূতন রচনা তাঁহার কাজ নহে, পুরাতন সংগ্রহেই তিনি নিযুক্ত।···সেই চেষ্টার বশে ব্যাস বেদ-সংগ্রহ করিলেন।' বেদ-সংগ্রহ ও আর্যসমাজের জনশ্রুতি-সংগ্রহ উভয় কার্যই ব্যাসের দ্বারা আরব্ধ ও সমাপ্ত হয়েছিল বলে ঘোষিত হয়েছে। উভয় সংগ্রহের লক্ষ্য এক। শিথিলগ্রন্থি সমাজকে একটি বিরাট পরিধির মধ্যে অর্থাৎ ইতিহাসের মধ্যে ধারণই মহাভারতের মূলে।

'পরাশর-সত্যবতী'র পুত্র দেহের কৃষ্ণবর্ণ ও দ্বীপে জন্ম হেতু কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বেদ সংকলন করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয় বেদব্যাস। 'ব্যাস' শব্দের অর্থ সংকলয়িতা। মহাভারত তিনিই সকংলন করেন। 'সপ্ত চিরজীবী'র অন্যতম হলেন ব্যাস। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'আর্যসমাজের যতকিছু জনশ্রুতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকে তিনি এক করিলেন। শুধু জনশ্রুতিকে নহে, আর্যসমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস, তর্কবিতর্ক ও চারিত্রনীতিকেও তিনি এই সঙ্গে এক করিয়া একটি জাতির সমগ্রতার এক বিরাট মূর্তি এক জায়গায় খাড়া করিলেন। ইহার নাম দিলেন মহাভারত। এই নামের মধ্যেই তখনকার আর্যজাতির একটি ঐক্য উপলব্ধির চেষ্টা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছে। আধুনিক পাশ্চাত্য সংজ্ঞা অনুসারে মহাভারত ইতিহাস হইতে না পারে কিন্তু ইহা যথার্থই আর্যদের ইতিহাস। ইহা কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিবৃত্তান্ত।'—ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা

কিন্তু মহাভারত রবীন্দ্রনাথের কাছে শুধুমাত্র 'একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিবৃত্ত' রূপেই বরণীয় নয়। তিনিও বঙ্কিমচন্দ্রের বা নবীনচন্দ্রের মতো ভগবদ্‌গীতাকে মহাভারতের

সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছেন। তিনিও ভারতবর্ষের ইতিহাসের মর্মগত সত্যকে গীতার মধ্যে উপলব্ধি করেছেন—

'এই মহাভারতে কেবল যে নির্বিচারে জনশ্রুতি সংকলন করা হইয়াছে তাহাও নহে। আতস কাঁচের এক পিঠে যেমন ব্যাপ্ত সূর্যালোক এবং আর-এক পিঠে যেমন তাহারই সংহত দীপ্তিরশ্মি মহাভারতেও তেমন এক দিকে ব্যাপক জনশ্রুতিরাশি আর-এক দিকে তাহারই সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি— সেই জ্যোতিটিই ভগবদ্গীতা। জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির যে সমন্বয়যোগ তাহাই সমস্ত ভারত ইতিহাসের চরমতত্ত্ব।… মানুষের সকল চেষ্টাই কোনখানে আসিয়া অবিরোধে মিলিতে পারে মহাভারত সকল পথের চৌমাথায় সেই চরম লক্ষ্যের আলোকটি জ্বালাইয়া ধরিয়াছে। তাহাই গীতা॥…'

এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি মনে পড়ে—

'এ শান্তিনিকেতন। আমার কুটীরে বিনা-তৈলে একটি দীপ জ্বলিতেছে, ভগবদ্গীতা।… উহার অটল জ্যোতি সেকাল হইতে একাল পর্যন্ত সমান রহিয়াছে, ক্ষণকালের জন্যও ক্ষুব্ধ বা ম্লান হয় নাই।'

৫

গীতার একটি শ্লোকাংশকে রবীন্দ্রনাথ তার ধর্মনীতির ক্ষেত্রে উচ্চস্থান দিয়েছেন। এখানে পরিষ্কাররূপে জানা দরকার যে তরুণ বয়সেই রবীন্দ্রনাথ 'মানবধর্ম' সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণায় আসতে পেরেছিলেন। 'বালক' পত্রিকায় (১২৯২) যখন 'রাজর্ষি' প্রকাশিত হয় তখন 'বিল্বন' চরিত্রে সকল লোকাচার ও প্রথার ঊর্ধ্বে বলিষ্ঠ মানবধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। গোবিন্দমাণিক্য এলেন রাজধর্মের প্রতিনিধিরূপে। সেই মানবধর্মের পরিপোষক বা অনুমোদক শ্লোক রবীন্দ্রনাথ যে-শাস্ত্রে যখন পেয়েছেন তাকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা সকলেই জানি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং' শ্লোকের যে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন, বিশেষত 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা' অংশের যে-ব্যাখ্যা করেছেন রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা তার চেয়ে অনেক ব্যাপক ও মহৎ। তেমনি ভাবে 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং' শ্লোকটির ব্যাখ্যায় মহর্ষির ও রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যার পার্থক্য স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা অনেক বলিষ্ঠ।[৫]

---

৫ এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন মহর্ষি 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থখানির প্রথম খণ্ডকে 'শ্রুতিশাস্ত্র' এবং দ্বিতীয় খণ্ডকে 'স্মৃতিশাস্ত্র' রূপে সংকলন করেন। দ্বিতীয় খণ্ড অনুশাসনের জন্য মহাভারত, গীতা, মনুস্মৃতি থেকে শ্লোক সংগ্রহ চলতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ মহাভারত, গীতা ও মনুস্মৃতির যে-শ্লোকগুলি ব্যবহার করেছেন সেগুলি 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডভুক্ত।

রবীন্দ্রনাথ 'ধর্মের অধিকার' (১৩১৮), 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' (১৩২৪) 'শক্তিপূজা' (১৩২৬) ও 'সত্যের আহ্বান' (১৩২৮) প্রবন্ধগুলিতে উক্ত শ্লোকাংশ—

'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'—প্রয়োগ করেছেন।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় 'সাংখ্যযোগ' অংশে শ্লোকটি আছে—

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ২ ॥ ৪০ ॥

এর পূর্ব শ্লোকে জ্ঞানযোগের উপসংহার করে তার সাধন কর্মযোগ সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, —হে পার্থ তুমি শ্রবণ কর যে বুদ্ধিতে যুক্ত হলে তুমি কর্মরূপ বন্ধন ত্যাগ করতে পারবে। এবং সেই সূত্রে বলেছেন, এই নিষ্কাম কর্মযোগ আরম্ভ করলে বিফল হয় না। এতে বিঘ্ন হয় না। এই ধর্মের অল্পমাত্রও মহাভয় থেকে রক্ষা করে ॥

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য'কে গ্রহণ করেছেন তখন সে ধর্ম সত্যধর্ম। তার সঙ্গে কর্মযোগের 'সংস্কার' নেই। 'ধর্মের অধিকার' (১৩১৮) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ গীতার এই শ্লোকটিকে প্রথম ব্যবহার করেন বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে ধর্ম চিরদিনই 'সত্যধর্ম' সর্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের ধর্ম। তিনি লিখেছেন—

'বীরের ধর্ম বীরত্ব, রাজার ধর্ম রাজত্ব—মানুষের ধর্ম ধর্মই—তাহাকে আর কোনো নাম দিবার দরকার করে না।'—ধর্মের অর্থ

'ধর্ম মানুষের পূর্ণ শক্তির অকুণ্ঠিত বাণী, তাহার মধ্যে কোনো দ্বিধা নাই।'—ধর্মের অধিকার

গীতার ঐ শ্লোকাংশটির মূল অর্থ হয়তো কিয়দংশে হারিয়ে গেল কিন্তু মানবসত্যের পূর্ণ অর্থে জ্বলে উঠল। 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' 'শক্তিপূজা' ও 'সত্যের আহ্বান' তিনটি প্রবন্ধই সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। রাজনৈতিক স্বার্থে 'ধর্ম' বিসর্জন এমন-কি দেশপ্রেমের দিক থেকে 'প্রয়োজন' হলেও রবীন্দ্রনাথ তাকে 'অ-ধর্ম' বলেই জেনেছেন। এবং অধর্ম যে ব্যক্তি বা জাতির মনুষ্যত্বকে তুলতে পারে না, নামাতেই শুধু পারে এ প্রত্যয়ে রবীন্দ্রনাথ সর্বদ্বিধামুক্ত। 'শিবাজী ও মারাঠাজাতি' (১৩১৫) নামক ভূমিকা-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন শিবাজী 'ধর্ম'কে আশ্রয় করেছিলেন বলেই একদা মারাঠা জাতি বড়ো হতে পেরেছিল কিন্তু ধর্মসাধনার স্থলে রাষ্ট্রিক স্বার্থ-সাধনা যেই বড়ো হয়ে উঠল তখনই মারাঠা জাতির পতন ঘটল। ঠিক এ জন্যই তিনি মনুসংহিতার ধর্মনীতিজ্ঞাপক শ্লোকটি বার বার উচ্চারণ করেছেন :

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥

মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে পাই—

অধার্মিকো নরো যো হি যস্য চাপ্যনৃতং ধনম্।
হিংসারতশ্চ যো নিত্যং নেহাসৌ সুখমেধতে ॥ ১৭০ ॥

ন সীদন্নপি ধর্মেণ মনোঽধর্মে নিবেশয়েৎ।
অধার্মিকাণাং পাপানামাশু পশ্যন্বিপর্যয়ম্ ॥ ১৭১ ॥
নাধর্মশ্চরিতো লোকে সদ্যঃ ফলতি গৌরিব।
শনৈরাবর্তমানস্তু কর্তুর্মূলানি কৃন্ততি ॥ ১৭২ ॥
যদি নাত্মনি পুত্রেষু ন চেৎপুত্রেষু নপ্তৃষু।
ন ত্বেব তু কৃতোঽধর্মঃ কর্তুর্ভবতি নিষ্ফলঃ ॥ ১৭৩ ॥
অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥ ১৭৪ ॥

"অধর্মেণৈধতে তাবৎ" শ্লোকটি রবীন্দ্রনাথ বোধকরি 'বিরোধমূলক আদর্শ' (১৩০৮) নামক রাজনৈতিক প্রবন্ধে প্রথম ব্যবহার করেন। মনে রাখতে হবে এ-যুগ এক দিকে য়ুরোপীয় বণিকতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির এশিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার যুগ এবং এ-সময়ই কবি লেখেন: 'শতাব্দীর সূর্য আজি রক্ত মেঘ মাঝে অস্ত গেল' 'স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে' প্রভৃতি কবিতা। তিনি উগ্র জাতীয়তাবাদ বা উগ্র দেশপ্রেম কখনও সমর্থন করেন নি কেননা এরা শেষ পর্যন্ত 'অধর্ম' পালক। সেজন্য তিনি লিখেছেন—

'আমরা যদি বাঁধি বোলে না ভুলি, যদি "প্যাট্রিয়ট"কেই সর্বোচ্চ বলিয়া না মনে করি, যদি সত্যকে ন্যায়কে ধর্মকে ন্যাশনালত্বের অপেক্ষাও বড়ো বলিয়া জানি, তবে আমাদের ভাবিবার বিষয় বিস্তর আছে।...সম্প্রতি উত্তরোত্তর ব্যাপ্যমান মিলিটারিত্বের রক্তিমায় য়ুরোপের গণ্ডস্থল যে টকটকে হইয়া উঠিতেছে, সে কি স্বাস্থ্যের লক্ষণ? তাহার ন্যাশনালত্বের ব্যাধি, অতিমেদস্ফীতির ন্যায় তাহার হৃদয়কে, তাহার মর্মস্থানকে, তাহার ধর্মনীতিকে আক্রমণ করিতেছে, ইহা কি আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাইতেছি না?'

এবং পশ্চিমী এই নেশনতন্ত্বের উপরে 'সকল দেশের সকল কালের চিরন্তন সত্য' এই ধর্মবাণীকে রবীন্দ্রনাথ স্থান দিয়েছেন। স্বদেশীয় অথবা আন্তর্জাতিক রাজনীতির উভয় ক্ষেত্রেই তিনি যেন এই শ্লোকটিকে ধ্রুবতারকার মতো বহন করেছেন এবং সেজন্যই দেখা যায় তিনি 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' (১৩১৭) 'ছোটো ও বড়ো' (১৩১৭) 'সভ্যতার সংকট' (১৩৪১) প্রবন্ধগুলিতে 'ন্যাশনাল' বা রাষ্ট্রিক প্রয়োজনের বা স্বার্থের ঊর্ধ্বে নিত্য ধর্মবাণীকে তুলে ধরে শক্তিলোলুপ অধর্মাচারী পন্থার আশু অবসানের ভবিষ্যদ্‌বাণী উচ্চারণ করে গেছেন। শুধু রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে নয় আমাদের ধর্মসাধনার ক্ষেত্রেও এই শ্লোকটির মহিমা তিনি ঘোষণা করেছেন 'ধর্মের সরল আদর্শ' (১৯০২), 'প্রার্থনা' (১৯০৪) 'দুঃখ' (১৯০৭) প্রভৃতি প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে। আর একটি শ্লোকাংশ 'ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ' রবীন্দ্রনাথের ধর্মাদর্শে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। এ শ্লোকটি মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ে পাই—

ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্‌ধর্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্মো হতোঽবধীৎ ॥ ৮ ॥ ১৫ ॥

ধর্মের এই আদর্শ পূর্বালোচিত শ্লোক দুটির সমার্থক। রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের আখ্যান-অবলম্বনে যে-কাব্যনাট্যগুলি রচনা করেছেন তার মধ্যে 'নরকসংবাদ' (১৮৯৭) 'গান্ধারীর আবেদন' (১৮৯৭) 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' (১৮৯৭) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মনুসংহিতার বা মানবধর্মশাস্ত্রের এই বক্তব্যকে রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের কাহিনীগুলিতে বিশেষভাবে প্রয়োগ করেছেন। 'নরকসংবাদ' রচনাটির মধ্যে সোমক-ঋত্বিক সংবাদে রবীন্দ্রনাথ মহাভারত থেকে কিছুদূরে সরে গেছেন। মহাভারতের কাহিনী হল, শতভার্যার স্বামী রাজা সোমক বৃদ্ধ বয়সে 'জন্তু' নামে এক পুত্র লাভ করেন। শতমাতা সেবিত সেই পুত্র একদিন পিপীলিকাদংশনে ক্রন্দন করলে মাতৃগণের সম্মিলিত রোদনে রাজা রাজকার্য ফেলে অন্তঃপুরে গেলেন। পুত্রকে শান্ত করে ফিরে এসে ঋত্বিককে বললেন একমাত্র পুত্র বড়োই উদ্‌বেগের বিষয়, এমন কর্ম করা কি সম্ভব যার ফলে শতপুত্র লাভ করতে পারি? ঋত্বিক বললেন যদি আপনি পুত্র 'জন্তু' দ্বারা অগ্নিতে হোম করতে পারেন তা হলে তার ধূম আঘ্রাণ করে মাতৃগণ পুত্রবতী হবেন, 'জন্তু'-ও পুনর্জাত হবে তার বামপার্শ্বে একটি স্বর্ণচিহ্ন থাকবে। 'জন্তু'কে আনয়নকালে দয়ার্দ্রচিত্ত মাতৃগণ তাকে আকর্ষণ করতে লাগলেন কিন্তু ঋত্বিক বামহস্ত ধারণ করে তাকে টেনে নিলেন এবং 'জন্তু' দ্বারা হোম করলেন। তার গন্ধ আঘ্রাণ করে জননীরা শোকার্ত হয়ে ভূপতিত হলেও তাঁরা গর্ভবতী হলেন। 'জন্তু'সহ শতপুত্রের জন্ম হল। রাজা মৃত্যুর পর স্বর্গযাত্রাকালে পথে নরকে ঋত্বিককে দেখে ধর্মরাজকে বললেন, কর্মের দিক দিয়ে বিচার করলে আমরা সমান পাপী— অতএব পুণ্য ও পাপের ফল আমাদের সমান হোক—

নরকে বা ধর্মরাজ! কর্মণাঽস্য সমো হ্যহম্।
পুণ্যাপুণ্যফলং দেব! সমমস্ত্বাবয়োরিদম্॥ বনপর্ব ॥ ১০৫ অধ্যায়॥

কাজেই দেখা যাচ্ছে মহাভারতের এই কাহিনীতে ঋত্বিকের কর্মের দায়িত্ব ও গুরুত্ব অনেক লঘু। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'নরকসংবাদে' ঋত্বিক প্রদর্শিত হয়েছে ধর্মভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ রূপে, যে মানবধর্মকে লঙ্ঘন করেছে। মহাভারতের কাহিনীতে ঋত্বিকের 'উঠিল জ্বলিয়া ব্রাহ্মণের অভিমান' প্রসঙ্গ নেই। এবং সোমকের 'নরধর্ম রাজধর্ম পিতৃধর্ম হায় অনলে করেছি ভস্ম' অনুতাপও মূল কাহিনীতে অশ্রুত। রবীন্দ্রনাথ সোমক চরিত্রেও পিতৃ-ধর্মলঙ্ঘন দেখেছেন।

'গান্ধারীর আবেদন' রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তাকে মহত্তর রূপে প্রকাশ করেছে। মহাভারতে সভাপর্বে মাতা গান্ধারী 'কুলপাংসন' দুর্যোধনকে ত্যাগ করবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের 'পর জোর দিয়েছেন, বলেছেন—

তথা তে ন কৃতং রাজন্ পুত্রস্নেহান্মহামতে।
তস্য প্রাপ্তং ফলং বিদ্ধি কুলান্তকরণায় হ॥ (৭২॥৯)

অর্থাৎ পুত্রস্নেহবশতঃ দুর্যোধনকে ত্যাগ করেন নি, এখন তার ফলে বংশনাশ উপস্থিত হয়েছে। অতএব তাকে ত্যাগ করুন।

উদ্যোগপর্বেও গান্ধারী দুর্যোধনকে ডেকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনায় সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এলে। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করে মূর্খ, দুরাত্মা, দুঃসহায় দুর্যোধনের হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করবার জন্য পুনঃ পুনঃ তিরস্কার করেছেন। পরে দুর্যোধনকে ডেকে বলেছেন, যুদ্ধে কল্যাণ নেই, ধর্ম বা অর্থ নেই, সুখ নেই, সর্বদা জয়ও হয় না। তুমি তেরো বৎসর পাণ্ডবদের প্রচুর অপকার করেছ, তোমার কামনা ও ক্রোধের জন্য তা বর্ধিত হয়েছে, এখন তার উপশম কর। তুমি অরাতি-নিপাতন পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হলে পরমসুখে পৃথিবী ভোগ করবে। বলাবাহুল্য দুর্যোধন মাতৃবচনে কর্ণপাত করেন নি।

ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী সংবাদে রবীন্দ্রনাথ যখন গান্ধারী বচনে ব্যক্ত করেন—

ধর্ম নহে সম্পদের হেতু,
মহারাজ, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু ;
ধর্মেই ধর্মের শেষ।

তখন তাঁর চিত্তোৎসারিত বিশিষ্ট ধর্মবাণী ধ্বনিত হতে দেখি—যে ধর্ম-প্রত্যয় মনু-গীতা-মহাভারতের ঋষিবাক্য অধ্যয়নে মহত্তর হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কর্ণকুন্তীসংবাদে মূল মহাভারতকাহিনী অনেকাংশে গৌণ হয়ে কর্ণের বীরধর্ম ও কুন্তীর মাতৃহৃদয়বেদনা বড়ো হয়ে উঠেছে। মূল কাহিনীতে কুন্তী কর্ণের কাছে অর্জুন ভিন্ন অপর চারপুত্রকে তিনি সংহারের চেষ্টা করবেন না এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এখানে শুধু কর্ণ-চরিত্রের ট্রাজেডি বা কুন্তী-হৃদয়ের বেদনাকে অনবদ্যরূপে উপস্থিত করেছেন তাই নয়— মানবধর্ম, বীরধর্মের আদর্শ কর্ণ-চরিত্রে প্রস্ফুটিত করে মহাভারত-বর্ণিত আখ্যানকেই গৌরবান্বিত করেছেন।

৬

১৩০০ সালের ১৩ই শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথ 'পুরস্কার' কবিতাটি রচনা করেন। কবি-নায়ক রাজসভায় কাব্যপাঠের সূচনায় বাণীবন্দনার পর রামায়ণ-মহাভারতকে স্মরণ করেছেন। মহাভারত-বর্ণনা সূত্রে তিনি কুরুপাণ্ডবের সংগ্রাম, কুরুক্ষেত্রের রক্তাক্ত অধ্যায়, স্বজনহীন, বান্ধবহীন পাণ্ডবগণের সিংহাসন লাভ ও মহাপ্রস্থান কাহিনী বর্ণনার পর মহাভারতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করেছেন—

তবু কোথা হতে আসিছে সে স্বর—
যেন সে অমর সমরসাগর
গ্রহণ করেছে নব কলেবর
একটি বিরাট গানে ;
বিজয়ের শেষে সে মহাপ্রয়াণ,
সকল আশার বিষাদ মহান্,

উদার শান্তি করিতেছে দান
চিরমানবের প্রাণে ॥

এই কবিতা রচনার আট বৎসর পরে 'নৈবেদ্য' কাব্যের প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধটিতে ঐ 'উদার শান্তি' বক্তব্যকে আরও গভীরভাবে ব্যাখ্যা করেন। রচনাটির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তিনি দেখিয়েছেন ভারতবর্ষের চিরন্তন জীবন-সাধনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটি মহাভারত-কাব্যের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে। তিনি বলেছেন—

'মহাভারতে যে একটা বিপুল কর্মের আন্দোলন দেখা যায়, তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ বৈরাগ্য স্থির অনিমেষভাবে রহিয়াছে। মহাভারতে কর্মেই কর্মের চরম প্রাপ্তি নহে। তাহার সমস্ত শৌর্যবীর্য, রাগদ্বেষ, হিংসা-প্রতিহিংসা, প্রয়াস ও সিদ্ধির মাঝখানে শ্মশান হইতে মহাপ্রস্থানের ভৈরবসংগীত বাজিয়া উঠিতেছে।' 'গান্ধারীর আবেদনে' গান্ধারীর উক্তিতে মহাভারতের অন্তর্লোকের এই মহান্ করুণ ফলশ্রুতি রবীন্দ্রনাথ আ-পূর্ব ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত করেছেন—

তার পরে নমো নম
সুনিশ্চিত পরিণাম, নির্বাক নির্মম
দারুণ করুণ শান্তি; নমো নমো নম
কল্যাণ কঠোর কান্ত, ক্ষমা স্নিগ্ধতম।
নমো নমো বিদ্বেষের ভীষণা নির্বৃতি—
শ্মশানের ভস্মমাখা পরমা নিষ্কৃতি।

রবীন্দ্র-তন্ত্র

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

তন্ত্র কথাটির একাধিক তাৎপর্যের একটি হল— নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। মানুষের মনে এই সিদ্ধান্ত আসে দুটি উপায়ে— ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে অথবা মনীষীদের আলোচিত উপদেশ থেকে। দ্বিতীয় উপায়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ক্ষণভঙ্গুর, বিপরীত অভিজ্ঞতার একটু নাড়া পেলেই ভেঙে পড়ে। তার চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ় ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ সিদ্ধান্তগুলি। আর সেই সিদ্ধান্ত সত্যরূপ লাভ করে শাস্ত্র-বাণীর সমর্থন পেয়ে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের অধিকাংশ তত্ত্বালোচনা যদিও এসেছে অন্তরের উপলব্ধি থেকে, তবুও সেখানে শাস্ত্রের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। এমন-কি, যে রস-সাহিত্যের আলোচনায় পূর্বসূরীদের বাঁধা বচন এড়িয়ে চলাই ছিল তাঁর স্বাভাবিক রীতি, সেখানেও দেখি আপন উপলব্ধ সত্যের সমর্থনে, প্রয়োজন হলে, কীট্‌স্ থেকে যাজ্ঞবল্ক্যের দোহাই দিতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নি। আবার, অন্য দিকে কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তের সঙ্গে সাহিত্য ও আর্টের অভিজ্ঞতাকে মেলানো সম্ভব না হলে মত-পরিবর্তনেও কবি দ্বিধাবোধ করেন নি। এই ভাবে বারে বারেই ভিতর ও বাহিরের অভিজ্ঞতাকে একযোগে মিলিয়ে দেখাই ছিল কবির জীবনব্যাপী সাধনা।

অবশ্য তাঁর কোনো কোনো রচনায় শাস্ত্রীয় সত্যের প্রতি অস্বীকৃতির সংশয়বাক্য বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেখা যায়। এমনি একটা রচনা হল পত্রপুটের পনেরো সংখ্যক কবিতা। মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পূর্বে লিখিত এই কবিতাটিতে কবি একবার সমগ্র জীবনটাকে বিশ্লেষণ করে আত্মপরিচয় উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। তার প্রাসঙ্গিক অংশটুকু এই—

শুনেছি যাঁর নাম মুখে মুখে,
পড়েছি যাঁর কথা নানা ভাষায় নানা শাস্ত্রে,
কল্পনা করেছি তাঁকেই বুঝি মানি।
তিনিই আমার বরণীয় প্রমাণ করব ব'লে
পূজার প্রয়াস করেছি নিরন্তর।
আজ দেখেছি প্রমাণ হয় নি আমার জীবনে।[১]

এত কথা বলার পরেও কবি শেষ পর্যন্ত যেখানে এসে পৌঁছলেন সেখানে কিন্তু তাঁর উপলব্ধি গিয়ে মিলল শাস্ত্রীয় উপলব্ধির সঙ্গে—

হে মহান পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে
তামসের পরপার হতে

---

১. এই সঙ্গে তুলনীয় শেষ সপ্তকের ৪১ সংখ্যক কবিতা

আসলে মানব-রস-পিপাসু কবি 'ভেদচিহ্নের তিলক-পরা' সমাজে মানুষের অপমানে নিজেকেও সেই মান-হারাদের দলভুক্ত ক'রে নিতে চেয়েছিলেন। বাংলার বাউল এবং উত্তর-ভারতের সন্ত্‌কবিদের প্রতি তাঁর প্রাণের টান ছিল এই কারণেই। এই সমস্ত অবহেলিত মানুষের সাধনাকে ভারতের আন্তরিক সাধনার ধারা ব'লে স্বীকার ক'রে কবি মন্তব্য করেছেন— "এই সাধনা অনেকটা পরিমাণে অশাস্ত্রীয়, এবং সমাজ-শাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। যাঁদের চিত্তক্ষেত্রে এই প্রস্রবণের প্রকাশ, তাঁরা প্রায় সকলেই সামান্য শ্রেণীর লোক। তাঁরা যা পেয়েছেন ও প্রকাশ করেছেন তা ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।"[২]

কবির ভাষায় বলা যায়, তাঁরা ছিলেন ব্রাত্য ও মন্ত্রহীন। কিন্তু তাই বলে তাঁরা যে-সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, ভারতীয় সাধনার পূর্বতন যুগে তা একান্তই অপরিচিত ছিল না। মধ্যযুগীয় সন্ত্‌কবিরা শাস্ত্রজ্ঞানে বঞ্চিত হয়েও তাঁদের দেবতাকে খুঁজে পেয়েছেন 'সকল বেড়ার বাইরে সহজ ভক্তির আলোকে।' অর্থাৎ শাস্ত্র-নির্দিষ্ট পথে না গিয়েও শাস্ত্রীয় সিদ্ধি তাঁরা লাভ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কি সেই মন্ত্রহীন ব্রাত্যদের দলভুক্ত? কেমন করে বলি? যিনি মনে করেন "মানবীয় সত্যের শাশ্বত ভিত্তি সন্ধান করতে গেলেই উপনিষদের বাণীকে আশ্রয় করা ছাড়া আমাদের পক্ষে আর কোনো উপায় নেই,"[৩] তিনি আর যাই হোন মন্ত্র-বর্জিত অন্ত্যজ নন। বঙ্গ-ভারতীর তন্ত্রী'পরে তিনি যে একটি অপূর্ব তন্ত্র পরিয়ে গেলেন, তার পশ্চাতে ছিল প্রকৃতি ও মানুষের সাহচর্য আর ছিল উপনিষদের মন্ত্র।

কিন্তু কেবল এইটুকু মাত্র বললে প্রকৃত কথাটা অনুচ্চারিত থেকে যায়। কারণ, যে মন নিয়ে কবি জগৎটাকে দেখেছিলেন, সে মন যে কোনো বিশেষ মন্ত্রের সৃষ্টি, কোনো বিশেষ ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কোনো সাময়িক ইতিহাসের জালে আবদ্ধ, এ কথা তিনি কোনো মতেই মেনে নিতে চান নি। এ সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত হয়েছে 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা' নামক প্রবন্ধে। প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য এই যে, রবীন্দ্রনাথ যেখানে কবি, সেখানে তিনি স্রষ্টিকর্তা, তিনি একক, তিনি মুক্ত। "সৃষ্টিকর্তা যে, তাকে সৃষ্টির উপকরণ কিছু বা ইতিহাস জোগায়; কিছু-বা তার সামাজিক পরিবেষ্টন জোগায়, কিন্তু এই উপকরণ তাকে তৈরি করে না। এই উপকরণগুলি ব্যবহারের দ্বারা সে আপনাকে স্রষ্টা-রূপে প্রকাশ করে।...উপনিষদের কাছ থেকে আমি যে বাণী গ্রহণ করেছি সে আমিই করেছি, তার মধ্যে আমারই কর্তৃত্ব।"[৪]

এইভাবে নানা তর্কের সাহায্যে কবির অন্তরাত্মাকে কর্তৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে

২. ক্ষিতিমোহন সেন-কৃত "ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা" (১৯৩০) গ্রন্থের রবীন্দ্রনাথ-লিখিত ভূমিকা

৩. রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, গ্রন্থপরিচয় পৃ. ৫৪৮

৪. সাহিত্যের স্বরূপ

আর সবকিছুকে নেপথ্যে রাখা হয়েছে। সেই কবি-কর্তার স্বরূপটি বোঝার জন্য উল্লিখিত প্রবন্ধ থেকে তিনটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক—

১. শীতের রাত্রি— ভোরবেলা, পাণ্ডুবর্ণ আলোক অন্ধকার ভেদ ক'রে দেখা দিতে শুরু করেছে।…গায়ে একখানা মাত্র জামা দিয়ে গরম লেপের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতুম। কিন্তু এমন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। অন্যান্য সকলের মতো আমি আরামে অন্তত বেলা ছটা পর্যন্ত গুটিসুটি মেরে থাকতে পারতুম। কিন্তু আমার উপায় ছিল না।…নারকেল গাছের কম্পমান পাতায় আলো পড়বে, শিশির-বিন্দু ঝলমল করে উঠবে, পাছে আমার এই দৈনিক দেখার ব্যাঘাত হয় এইজন্য আমার ছিল এমন তাড়া।…এর পিছনে কোনো ইতিহাসের কোনো ছাঁচ নেই।…কবি যে সে এইখানেই।[৪]

২. স্কুল থেকে এসেছি সাড়ে চারটের সময়। এসেই দেখেছি আমাদের বাড়ির তেতলার ঊর্ধ্বে ঘননীল মেঘপুঞ্জ, সে যে কী আশ্চর্য দেখা। সে একদিনের কথা আমার আজও মনে আছে, কিন্তু সেদিনকার ইতিহাসে আমি ছাড়া কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই মেঘ সেই চক্ষে দেখে নি এবং পুলকিত হয়ে যায় নি। এইখানে দেখা দিয়েছিল একলা রবীন্দ্রনাথ।

৩. একদিন স্কুল থেকে এসে আমাদের পশ্চিমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক অতি আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছিলুম। ধোপার বাড়ি থেকে গাধা এসে চরে খাচ্ছে ঘাস…আর একটি গাভী সস্নেহে তার গা চেটে দিচ্ছে। এই যে প্রাণের দিকে প্রাণের টান আমার চোখে পড়েছিল আজ পর্যন্ত সে অবিস্মরণীয় হয়ে রইল। কিন্তু এ কথা আমি নিশ্চিত জানি, সেদিনকার সমস্ত ইতিহাসের মধ্যে এক রবীন্দ্রনাথ এই দৃশ্য মুগ্ধ চোখে দেখেছিল। সেদিনকার ইতিহাস আর কোনো লোককে ওই দেখার গভীর তাৎপর্য এমন করে বলে দেয় নি। আপন সৃষ্টিক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একা, কোনো ইতিহাস তাকে সাধারণের সঙ্গে বাঁধে নি। ইতিহাস যেখানে সাধারণ, সেখানে ব্রিটিশ সব্‌জেক্‌ট্ ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিল না।

রবীন্দ্র-তন্ত্রের ভূমিকারূপে কবির উল্লিখিত আত্মবিশ্লেষণ পর্যাপ্ত বলে মনে করি। এই বিশ্লেষণের আলোকে কবির কাব্য থেকে সেই বিশিষ্ট তন্ত্রটি বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে নিষ্ঠার সঙ্গে কালানুক্রমিক রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহ অনুধাবনের চেষ্টা করা বৃথা। প্রথমতঃ, আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, কবির রচনার মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা সাময়িক। নানা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্নকালীন সাধনায় যে মালাখানি তৈরি হয়ে উঠেছে, তার স্বতন্ত্র মূল্য থাকলেও তার সবটাই সেই বিশিষ্ট তন্ত্রে গ্রহণীয় নয়। দ্বিতীয়তঃ, সৃষ্টিকর্তা রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যজীবনের গোড়ার দিকে স্বরূপতঃ বড় একটা

৪. শেষ সপ্তকের ৪৬ সংখ্যক কবিতা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়

দেখা দেন নি। তখনকার যে আয়োজন তার বেশির ভাগই মূল-শিকড়ের বিস্তার। ফুল ফুটেছে অনেক পরে। নিজের চিন্তা ভাবনা ও রচনা বার বার সংশোধন ক'রে কবি প্রৌঢ় বয়সে রচনার প্রৌঢ়তায় উপনীত হন। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে বিধাতা যেমন মানুষ সৃষ্টি করতে পেরেছেন, কবির সৃষ্টিক্ষেত্রেও সেই একই লীলা।

সেই লীলার ধারা অনুসরণ ক'রে অগ্রসর হলে দেখা যায়, মৃত্যুর পূর্ব বৎসরে জন্মদিন উপলক্ষে রচিত একটি ক্ষুদ্র কবিতার মধ্যে কবি যেন মন্ত্রের আকারে তাঁর জীবনতন্ত্রটিকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। স্বতন্ত্র করে স্তবক ভাগ না করা হলেও স্পষ্টই দেখা যায় কবিতাটির পাঁচটি অংশ এবং প্রতিটি অংশে পাঁচটি পঙ্‌ক্তি। পঁচিশ পঙ্‌ক্তি-বিশিষ্ট এই কবিতাটির আরও একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রতি অংশের শেষ অর্থাৎ পঞ্চম পঙ্‌ক্তিটি একই বাক্যের পুনরাবৃত্তি—'এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।' কবিতাটির বিষয়ও পাঁচটি— আনন্দ, প্রেম, জীবন, মৃত্যু ও বিশ্ব। বিষয় পাঁচটি হলেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একটি ব্যাপার সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়— সে হল মৃত্যুর উপস্থিতি। প্রথম অংশে 'মৃত্যু' শব্দটি প্রত্যক্ষ। দ্বিতীয় অংশে তাকে বলা হয়েছে 'দস্যু', একেও প্রত্যক্ষ বলা যায়। তৃতীয় অংশে আছে 'অস্তিত্বের কলঙ্ক'— খুব পরোক্ষ নয়। চতুর্থ অংশের বিষয় তো একান্তভাবেই মৃত্যু। কিন্তু সর্বত্রই মৃত্যুর negation, পঞ্চম বা শেষ অংশে অস্তিত্বের জয়গান।

এক হিসাবে রবীন্দ্র-কাব্য মানেই অস্তিত্বের জয়গান, জীবনের জয়ধ্বনি। এবং একটু ব্যাপক অর্থে একেই বলা যায় রবীন্দ্র-তন্ত্র। মর্ত্যপ্রীতি, বিশ্বানুভূতি, আনন্দগীতি— রবীন্দ্র-কাব্যের যতই শ্রেণীবিভাগ করি-না কেন, সকলকার গোড়ার কথাটা হল পরম জীবনের উপলব্ধি। আর সেই উপলব্ধি তিনি অর্জন করেছেন কোনো কর্মসাধনার মধ্য দিয়ে নয়, ধ্যানের মধ্য দিয়ে। বিশ্বপ্রকৃতির প্রাঙ্গণে কবি যে বাহ্যতঃ অলস দিন যাপনের সুযোগ পেয়েছিলেন, সেগুলিই তাঁর কবি-জীবনের পরম সঞ্চয়।[৫] বিশ্বের নানা রূপ-রঙ-ধ্বনিকে তিনি প্রাণভরে দেখেছিলেন ও শুনেছিলেন এবং সেই সঙ্গে অনুভব করেছিলেন বেঁচে থাকার আনন্দ— অনেকগুলি সুন্দর কবিতায় এই একই প্রসঙ্গ বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে। মাত্র চারটি দৃষ্টান্ত—

১. ঐ যে ছাতিম গাছের মতোই আছি
সহজ প্রাণের আবেগ, নিয়ে মাটির কাছাকাছি ;···

---

৫ অলস সময়ধারা বেয়ে
মন চলে শূন্য-পানে চেয়ে।
—আরোগ্য, ১০ সংখ্যক

বিশ্ব আমাকে পেয়েছে,
আমার মধ্যে পেয়েছে আপনাকে,
অলস কবির এই সার্থকতা ॥
—পত্রপুট, ৭ সংখ্যক

আজ আমি যে বেঁচেছিলেম সবার মাঝে মিলে সবার প্রাণে
সেই বারতা রইল আমার গানে ॥

—আছি, পরিশেষ

২. তারা জানিয়ে দেবে আশ্চর্য কথাটি—
একদিন আমি দেখেছিলেম এই সব-কিছু।

—দেখা, পুনশ্চ

৩. চারদিক থেকে অস্তিত্বের এই ধারা
নানা শাখায় বইছে দিনে রাত্রে।···
আজ আমি অলস মনে
আকণ্ঠ ডুব দেব এই ধারার গভীরে;
এর কলধ্বনি বাজবে আমার বুকের কাছে
আমার রক্তের মৃদু তালের ছন্দে।

—শেষ সপ্তক, ৪ সংখ্যক

৪. যার দিকে তাকাই
চক্ষু তাকে আঁকড়িয়ে থাকে
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো।
আমার নগ্নচিত্ত আজ মগ্ন হয়েছে
সমস্তের মাঝে।···
যার রূপ হয়েছে অবলুপ্ত,···
দেখা দিল সে অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে।[৬]

—শেষ সপ্তক, ২৩ সংখ্যক

অস্তিত্বের এই আশ্চর্য অনুভব মুহূর্তে মুহূর্তে আসে না, আসে দুর্লভ মুহূর্তে—কবি যাকে বলেছেন 'উজ্জ্বল সুন্দর ক্ষণখণ্ড' (ছিন্নপত্র, ৫৩-সংখ্যক পত্র), কখনো বা বলেছেন 'সুসম্পূর্ণ সময়ের ছোটো একটু টুকরো' (পত্রপুট, ১ সংখ্যক), আবার কখনো বলেছেন 'রস-নিমগ্ন মুহূর্ত' (পত্রপুট, ৭ সংখ্যক)। এই মুহূর্তের কথা একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে শেষ সপ্তকের ৩৬ সংখ্যক কবিতায়। কুয়োতলার কাছে সামান্য আমের গাছ সারা বছর থাকে আত্মবিস্মৃত। বনের সাধারণ গাছপালার সঙ্গে ওর কোনো পার্থক্যই থাকে না। এমন সময়ে মাঘের শেষে হঠাৎ একদিন মাটির নীচে শিহর লাগে আমের শিকড়ে, এবং তার শাখায় শাখায় দেখা দেয় আম্রমুকুলের মঞ্জরী। কবির জীবনেও মাঝে মাঝে এমনি ভাবে আবির্ভূত হয় উজ্জ্বল সুন্দর ক্ষণখণ্ড। তখনকার কথা কবির ভাষায় শোনা যাক—

তখন যে-আমি ধূলি-ধূসর
সামান্য দিনগুলির মধ্যে মিলিয়ে ছিল

৬. এই সঙ্গে তুলনীয় প্রান্তিকের ১৫ সংখ্যক কবিতা

সে দেখা দেয় এক নিমেষের অসামান্য আলোকে।
সে-সব দুর্মূল্য নিমেষ···
জাগিয়েছে আমার মর্মে
বিশ্বমর্মের নিত্যকালের সেই বাণী
'আমি আছি'।

এই রকম একটি অতি দুর্মূল্য নিমেষের কথা 'শ্যামলী'র একটি কবিতায় চরম রস-রূপ লাভ করেছে বলে আমরা মনে করি। কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এই—

আমাকে শুনতে দাও,
আমি কান পেতে আছি।
পড়ে আসছে বেলা ;
পাখিরা গেয়ে নিচ্ছে দিনের শেষে···
ওদের ইতিহাসের আর কোনো সাড়া নেই,
কেবল এইটুকু কথা—
আছি, আমরা আছি, বেঁচে আছি,
বেঁচে আছি এই আশ্চর্য মুহূর্তে।

—প্রাণের রস

কবি তাঁর চেতনার মধ্য দিয়ে কখনো ছেঁকে নিচ্ছেন বিশ্ব-প্রাণের স্পর্শ, কখনো-বা ডুব দিচ্ছেন চার দিক থেকে নানা শাখায় প্রবহমাণ অস্তিত্বের ধারায়, কখনো পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মত দৃষ্টি তাঁর নিবদ্ধ সামান্য বস্তুর উপরে, আবার কখনো-বা তাঁর নগ্নচিত্ত মগ্ন হচ্ছে পরিবেষ্টনের মধ্যে। বিকেলবেলায় মেয়েদের ঘট ভরে জল নিয়ে যাওয়ার মত কবি কখনো-বা মনটাকে ডুবিয়ে দিয়ে ভরে নিচ্ছেন পাখিদের কলকাকলি।

কিন্তু এর সমস্তটাই সীমাবদ্ধ জগতের কথা—পরিসর বড়োই ক্ষুদ্র। বস্তু থেকে মন বস্তুর অতীতে যায় না ব'লে যখন আক্ষেপ করি, তখন মনে পড়ে কবির সেই স্মরণীয় উক্তি যে, তাঁর কাব্যজীবনের একটি মাত্র পালা— সীমার মাঝে অসীমের পালা। তত্ত্বটি জীবন-স্মৃতিতে আলোচিত হওয়ার ফলে আজ অতি পুরোনো হয়ে পড়েছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সত্য কখনো পুরোনো হয় না, সে চির-নবীন। কবির শেষদিককার কাব্য থেকে কয়েকটি বচন আহরণ করছি—

১. এই ধরণীর সকল সীমায় সীমাহারার গোপন আনাগোনা
সেই আমারে করেছে আনমনা।

—বালক, পরিশেষ

২. যা-কিছু সমুখে আছে,
চক্ষের পরে যাহা বক্ষের কাছে

সেই তো অন্তহীন
প্রতিপল প্রতিদিন।

—শূন্যঘর, পরিশেষ

৩. বিশ্বভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্যের সঙ্গে আমার যোগ হয়েছে
মনোবৃক্ষের এই ছড়িয়ে-পড়া
রসলোলুপ পাতাগুলির সংবেদনে।
এরা ধরেছে সূক্ষ্মকে, বস্তুর অতীতকে ;
এরা তাল দিয়েছে সেই গানের ছন্দে
যার সুর যায় না শোনা।

—পত্রপুট, ১৩ সংখ্যক

৪. জীবনেরে যাহা জেনেছি, অনেক তাই,
সীমা থাকে থাক্, তবু তার সীমা নাই।

—পত্রোত্তর, সেঁজুতি

৫. এ মর্ত্যের লীলাক্ষেত্রে সুখে দুঃখে অমৃতের স্বাদ
পেয়েছি তো ক্ষণে ক্ষণে,
বারে বারে অসীমেরে দেখেছি সীমার অন্তরালে।

—জন্মদিনে, ১৩ সংখ্যক

কবির এই সীমা-অসীম তত্ত্বটির সঙ্গে যে প্রশ্নটি অনিবার্যরূপে এসে দেখা দেয়, তা হল মৃত্যুর। যতদিন মৃত্যুভয় রয়েছে ততদিন অসীমের চেতনা কখনই সত্য, সম্পূর্ণ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে না। আর মৃত্যুভয়ই যে মানুষের মুখ্য ভয় সে কথা কবিকেও স্বীকার করতে হয়েছে 'সেঁজুতি'র ভাগীরথী কবিতায়—

মানুষের মুখ্যভয় মৃত্যুভয়,
কেমনে করিবে তারে জয়
নাহি জানে ;

মৃত্যুর বিপরীত প্রাণ। জাহ্নবী সেই প্রাণের ছবি। ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা-আনয়ন বৃত্তান্তটি মৃত্যুভয়কে দূর করবার জন্যই কল্পিত। যে মানুষ মৃত্যুর শাসনাধীন, সগরের ষাট হাজার সন্তান বুঝি সেই বিপুল মনুষ্যকুলের প্রতিনিধি। আর তাই মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের জটা থেকে ভাগীরথীর সঞ্জীবনী ধারার নিরন্তর প্রস্রবণ।

এখানে একটা সংগত প্রশ্নের মীমাংসা করে নেওয়া প্রয়োজন। রবীন্দ্র-সাহিত্যে মৃত্যু সম্পর্কে যত উক্তি রয়েছে তার সবগুলিকে সমসূত্রে বাঁধা চলে না। কখনো দেখি মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম, কখনো-বা মৃত্যু পরমবাঞ্ছিত। রবীন্দ্রকাব্যে মৃত্যু মুক্তি দুঃখ বৈরাগ্য প্রভৃতি কতগুলি অতি পরিচিত শব্দের ব্যবহার হয়েছে দুই বিপরীত অর্থে। যেমন ধরা যাক মুক্তি। পরিশেষের 'পান্থ' কবিতাটি আরম্ভ হয়েছে—'শুধায়ো না মোরে তুমি

মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই।' স্পষ্টতই এ মুক্তিতে কবির কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু কবিতাটির শেষ স্তবকেই আবার বলা হয়েছে—

হে মহাপথিক,···
তীর্থ তব পদে পদে ;
চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে।

এ মুক্তি কবির পরমকাঙ্ক্ষিত। প্রথম মুক্তি বন্ধন-ছেদন। দ্বিতীয় মুক্তি আসক্তিবিহীন বন্ধন।

মৃত্যুরও তেমনি দুই অর্থ—১. অনন্ত বিলয় ২. প্রবল আঘাত। "মানুষের মধ্যে যে দুটো 'আমি' আছে, তার একজন লোভে ক্ষোভে শোকে দুঃখে আনন্দে বিষাদে সর্বদাই দোদুল্যমান, আর একজন বড়ো 'আমি'। সে এ সমস্তের অতীত, সে স্থির, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ।"[৭] কিন্তু এই দুই 'আমি' বাস করে একসঙ্গে। কেবল তাই নয়, ছোট 'আমি'র চাপে বড় 'আমি' থাকে কোণঠাসা হয়ে। তার চেয়েও মারাত্মক ব্যাপার এই যে, এই দুই 'আমি' স্বরূপতঃ স্বতন্ত্র হলেও ছোট 'আমি'র ধর্মকেই বড় 'আমি' তার নিজস্ব ধর্ম বলে ভুল ক'রে অশেষ দুর্গতি ডেকে আনে। জরা-ব্যাধি-মৃত্যু— সব ঐ ছোট 'আমি'র। বড় 'আমি' যে, সে তো মুক্ত স্বচ্ছ স্বতন্ত্র। এই দুয়ের টানাটানি সম্পর্কে বলা হয়েছে—

ওর জরা দিয়ে আচ্ছন্ন করে আমাকে
যে-আমি জরাহীন।···
তাই ওকে যখন মরণে ধরে
ভয় লাগে আমার
যে-আমি মৃত্যুহীন।

—শেষ সপ্তক, ২২ সংখ্যক

সেই জরাহীন মৃত্যুহীন 'আমি'ই ক্ষুদ্রের সংস্পর্শে নীচতার ক্লেদপঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে রুদ্রের কাছে প্রার্থনা জানায়—

মন মোর কেঁদে আজ উঠে জাগি'
প্রবল মৃত্যুর লাগি।

—কলুষিত, বীথিকা

অথবা বলে ওঠে—

মৃত্যুর মুল্যেই করি ক্রয়
এ জীবনে দুর্মুল্য যা, অমর্ত্য যা, যা-কিছু অক্ষয়।

—বিরোধ, বীথিকা

'মৃত্যু' যদি এখানে 'অনন্ত বিলয়' হয়, তবে ক্রয়ের প্রসঙ্গ নিরর্থক হয়ে পড়ে।

---

৭. মংপুতে রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৪ সংস্করণ) পৃ. ২৪৭

দুই 'আমি'র দুই মৃত্যু। কিন্তু এমন স্বতন্ত্র করে দেখা মানুষের পক্ষে বড় একটা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কবির পক্ষেও না। তখনই কবি-চিত্তে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সংশয়-দুর্বলতা এবং একটা অনিশ্চিত মনোভাবের পরিচয় পাই। তখনই কবিকে বলতে শোনা যায়— 'কী আছে জানি না দিন-অবসানে মৃত্যুর অবশেষে'[৮] ; তখনই কবির করুণ জিজ্ঞাসা— দেহের মধ্যে যে চৈতন্য-ধারা প্রবাহিত, সে কি দেহের স্তব্ধতার সঙ্গে সঙ্গে গতিহারা হয়ে যায়? জন্মদিন ও মৃত্যুদিন এই দুই সীমানার মধ্যে যাকে দেখতে পাই সে কে? চলতে চলতে মৃত্যুর শাসনে যে মধ্যপথে থেমে যায় কে সে? নানাভাবে যে বিশ্বজনের কাছে আত্মপরিচয় তুলে ধরতে চায় শিল্পে সাহিত্যে সংগীতে—

হঠাৎ কি তাহার বিলয়,
কোথাও কি নাই তার শেষ সার্থকতা।

—অপূর্ণ, পরিশেষ

এই করুণ জিজ্ঞাসাটিকে কবি একাধিক কবিতায়[৯] বীজের চিত্রকল্প দিয়ে পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন এইভাবে—মাটির তলায় সুপ্ত থাকে যে বীজ, রৌদ্র-বর্ষার পরিচর্যায় সে চায় মাটির বাইরে অঙ্কুরিত হয়ে উঠতে। সে-ই তার স্বপ্ন, সে-ই তার মুক্তি। কিন্তু স্বপ্নেই কি তার শেষ? কোনোদিনই কি মুক্তি সত্য হয়ে উঠবে না? মৃত্যু নিশ্চিত, জীবনও তো মিথ্যা নয়। তবে? জীবন-মরণের মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও একটা সামঞ্জস্য আছে। 'এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল'।[১০] কবির এই সমস্ত উক্তির মধ্যে দৃঢ় প্রতীতির কোনো লক্ষণ নেই, আছে একটা দ্বিধাগ্রস্ত সংশয়পূর্ণ মনোভাব।

সেই দ্বিধা-সংশয় কেটে যায়, যখন ছোট 'আমি'র সমস্ত পিছুটান থেকে মুক্ত কবি-চিত্তে 'পরম-আমি'র সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তখন কবির কণ্ঠে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ভঙ্গী—

যে মন্ত্রখানি পেয়েছি ওদের সুরে
তাহার অর্থ মৃত্যুর সীমা ছাড়ায়ে গিয়েছে দূরে।

—যাবার মুখে, সেঁজুতি

চমকে বিনাশ মাঝে অস্তিত্বের হাসি
আনন্দের বেগে।
মরণের বীণা-তারে উঠে জেগে
জীবনের গান ;

—ধাবমান, পরিশেষ

৮. পত্রোত্তর, সেঁজুতি

৯. পরিশেষ কাব্যের অপূর্ণ, ও শেষ সপ্তকের ৩৫ সংখ্যক কবিতা দ্রষ্টব্য

১০. বলাকা, ১৯ সংখ্যক

এই অনিত্যের মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে
অনুভব করি আমার হৃৎস্পন্দনে
অসীমের স্তব্ধতা ॥[১১]

—শেষ সপ্তক, ৩৪ সংখ্যক

আমি পেয়েছি ক্ষণে ক্ষণে অমৃতভরা
মুহূর্তগুলিকে,
তার সীমা কে বিচার করবে?

—শেষ সপ্তক, ২১ সংখ্যক

ইতিপূর্বে সীমা-অসীমের প্রসঙ্গে আমরা পাঁচটি কবিতার উল্লেখ করেছি। উপরে আরও চারটির উল্লেখ করা হল। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য এই যে, শেষোক্তগুলির মধ্যে জীবনের দুর্মূল্য নিমেষগুলি মৃত্যুর আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু কেবল দুর্মূল্য নিমেষ নয়, উজ্জ্বল সুন্দর ক্ষণখণ্ড নয়, সুসম্পূর্ণ সময়ের ছোটো ছোটো টুকরো নয়, সমগ্র জীবন যেখানে কবি-কল্পনায় মৃত্যুর-আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, যেখানে সৃষ্টির অনন্ত রহস্য চারিদিকে উচ্ছলিত হয়ে জীবন-মৃত্যুকে একাকার ক'রে দিয়েছে, সেইখানেই কবি যথার্থ মরণবিজয়ী। সেইখানেই তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত, তাঁর জীবন-তন্ত্র।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে চাই 'পূরবী'র একটি কবিতা। একদিন কবি দেখলেন, মাঠের পথের পাশে ঘাসের উপর পড়ে আছে এক পশুর কঙ্কাল। একদিন এই ঘাস তাকে শক্তি জুগিয়েছিল, দিয়েছিল বিশ্রামের স্থান। কিন্তু আজ সেখানে পড়ে আছে তার পাণ্ডু অস্থিরাশি। সেই দিকে তাকিয়ে কবির মনে হল পশুর ঐ পাণ্ডু অস্থিরাশির মধ্য দিয়ে মৃত্যু যেন তাঁকে বলছে—'পশুতে কবিতে কোনো প্রভেদ নেই। পশুর যে পরিণাম, কবিরও পরিণাম তা-ই।' উদ্দীপ্ত কবি তখন বলে উঠলেন—

মৃত্যু, করি না বিশ্বাস
তব শূন্যতার উপহাস।
মোর নহে শুধুমাত্র প্রাণ
সর্ব বিত্ত রিক্ত করি' যার হয় যাত্রা অবসান;
যাহা ফুরাইলে দিন
শূন্য অস্থি দিয়ে শোধে আহার-নিদ্রার শেষ ঋণ।

—কঙ্কাল, পূরবী

তা হলে মৃত্যু হয় কার? মৃত্যু হয় মাংসপিণ্ডের, রক্ত-মাংসে গঠিত সেই প্রাণীটার—যে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর, যে দীন ও লোলুপ। কিন্তু কবির পরিচয় বৃহত্তর—

১১, এই প্রসঙ্গে তুলনীয় প্রান্তিকের ১৬ সংখ্যক কবিতা

যে আমার সত্য পরিচয়
মাংসে তা'র পরিমাপ নয়

—কঙ্কাল, পূরবী

কবির এক অংশ জরা-অধীন, আর এক অংশ জরা-বিহীন ; এক অংশ মৃত্যু-যুক্ত, আর এক অংশ মৃত্যু-মুক্ত ; এক অংশ অন্ধকার, আর এক অংশ 'নিত্যকালের আলো'। জরা-বিহীন মৃত্যু-মুক্ত সেই নিত্যকালের আলো-কে চেনা চাই। পত্রপুট, প্রান্তিক, রোগশয্যায়, আরোগ্য ও জন্মদিনে— এই কাব্যগ্রন্থগুলিতে আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— কবি হলেন সূর্য-স্বরূপ। কবি-সত্তা ও সূর্যের মধ্যে যে ঐক্য, সেই ঐক্যরূপ দর্শনের জন্য বার বার প্রার্থনা জানিয়েছেন—

হে পূষন,···
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতমরূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।

—প্রান্তিক, ৯ সংখ্যক

তোমার অন্তরতম পরম জ্যোতির মধ্যে দেখি
আপনার আত্মার স্বরূপ।

—জন্মদিনে, ১৩ সংখ্যক

আলোকের অন্তরে যে আনন্দের পরশন পাই
জানি আমি তার সাথে আমার আত্মার ভেদ নাই।

—আরোগ্য, ৩২ সংখ্যক

প্রভাত আলোর সাথে
দেখি তার অভিন্ন স্বরূপ।

—রোগশয্যায়, ৩৬ সংখ্যক

হে সবিতা,
সরিয়ে দাও আমার এই দেহ, এই আচ্ছাদন···
তারো অলক্ষ্য অন্তরে আছে তোমার কল্যাণতম রূপ,
তাই প্রকাশিত হোক আমার নিরাবিল দৃষ্টিতে।

—পত্রপুট, ১০ সংখ্যক

শেষ স্তবকের শেষ পঙ্‌ক্তিটিতে বলেছেন—কবির অন্তরস্থিত সূর্যের কল্যাণতম রূপ প্রকাশিত হোক তাঁর নিরাবিল দৃষ্টির সম্মুখে। বস্তুতঃ রবীন্দ্র-তন্ত্রের এইটেই হচ্ছে আসল কথা— নিরাবিল দৃষ্টি, মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি। 'নবজাতকে'র 'জয়ধ্বনি' কবিতায় ঐ যে বলেছেন, হিমালয়কে বুঝতে হলে দেখতে হবে সমগ্র দৃষ্টিতে। পর্বতগাত্রে কত অসংখ্য গুহাগহ্বর ভাঙাচোরা। ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে সেগুলি তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, অসুন্দর। কিন্তু সমগ্রভাবে হিমালয় মহান্ ও বিশাল, যে মহত্ত্ব ও বিশালতার তুলনা নেই। মানব-জীবন সম্পর্কেও তেমনি। সমস্ত

খণ্ড নিয়ে এক সঙ্গে অখণ্ড রূপের দিকে তাকালে বিস্ময়ে, আনন্দে, বিশ্বাসে ও শ্রদ্ধায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে আসে। রবীন্দ্র-কাব্যের এই হল সত্য দৃষ্টি, নিরাবিল দৃষ্টি।

১৯৪০ সালে রোগশয্যায় শুয়ে কবি বার বার বলেছেন এই সত্য দৃষ্টির কথা। প্রকৃত পক্ষে সত্য তো চিরন্তন আসনে প্রতিষ্ঠিত; মানুষের সাধনা হল সেই সত্যদর্শনের সাধনা। একমাত্র সাধক-কবির পক্ষেই বলা সম্ভব—

এই ঘন-আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদিজ্যোতি,
শাশ্বত প্রকাশপারাবার।

—রোগশয্যায়, ২০ সংখ্যক

তার্কিক তর্ক করতে পারেন এ নিয়ে, কিন্তু কবি সেই তর্কের জটিলতায় প্রবেশ করতে অনিচ্ছুক—

আমি কবি তর্ক নাহি জানি,
এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে।

—রোগশয্যায়, ২১ সংখ্যক

অন্তহীন দেশকালে পরিব্যাপ্ত সত্যের মহিমা
যে দেখে অখণ্ডরূপে
এ জগতে জন্ম তার হয়েছে সার্থক।

—রোগশয্যায়, ২৫ সংখ্যক

কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা নয় তা নির্ভর করে দ্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গীর উপর। এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ন্ত্রিত হয় ব্যক্তিগত সুখদুঃখের দ্বারা। কবি বলতে চান, বিশ্বজনীন সত্য রয়েছে ব্যক্তিগত সুখদুঃখের অনেক ঊর্ধ্বে। আর মানুষের সৌভাগ্য এই যে, ব্যক্তি-জীবনের অবস্থা ও অবস্থান্তর দিয়ে সেই বিশ্বজনীন সত্যের ব্যত্যয় ঘটে না—

রুগ্ন যদি রোগেরে চরম সত্য বলে,
তাহা নিয়ে স্পর্ধা করা লজ্জা বলে জানি—
তার চেয়ে বিনা বাক্যে আত্মহত্যা ভালো।

—রোগশয্যায়, ২৪ সংখ্যক

'রুগ্ন যদি রোগেরে চরম সত্য বলে'...—তা হলে চরম সত্যটা কি? আর সেই সত্য সন্ধানের সাধনাই বা কিরূপ? চরম সত্য এই জগৎ, এই জীবন, এই জীবনের ভালোবাসা। চরম সত্য এই পৃথিবী। রবীন্দ্রনাথ তাই পার্থিব কবি, যাঁর দৃষ্টিতে 'মধুময় পৃথিবীর ধূলি'। কিন্তু কেমন সেই দৃষ্টি? শান্ত নিরাসক্ত। এইখানে তিনি অপার্থিব। বসুন্ধরার মৃৎ-পাত্রে যে অমৃত সঞ্চিত রয়েছে, বুভুক্ষুর লালসায় তাকে পাওয়া যায় না—'নহে তাহা দীন ভিক্ষু লালায়িত লোলুপের লাগি।' সেই অমৃতে অধিকার রয়েছে তার, ধর্ম যার ত্যাগ ও

বৈরাগ্য। এখানেও সেই বড় আমি ও ছোট আমির কথা। কবির শেষ জীবনের সাধনা ছিল অমর অজেয় আত্মার সাধনা। "সেই বড়ো সত্তার মধ্যে দৃঢ়ভাবে সত্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে মানুষের আর কোনো ভয় থাকে না। যখনই কোনো কারণে চঞ্চল হই তখনি বুঝতে পারি আমার সাধনা সম্পূর্ণ হয় নি। তাই আমি ভোরবেলার সূর্যালোকে বসে প্রত্যহ চেষ্টা করি সেই ছোটো আমিটার থেকে দূরে যেতে।[১২] নিজের কাছ থেকে নিজের যে মুক্তি সেই দুর্লভ মুক্তির জন্য চেষ্টা করি। সে চেষ্টা প্রত্যহ করতে হয়, তা না হলে আবিল হয়ে ওঠে দিন। আর তো সময় নেই, যাবার আগে সেই বড়ো আমিকেই জীবনে প্রধান করে তুলতে হবে। সেইটেই আমার সাধনা।"[১৩]

অর্থাৎ পরম-আমির সাধনা, যে আমির সত্যে সত্য এই বিশ্ব। এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে রবীন্দ্র-তন্ত্র-প্রকাশক যে বিশেষ কবিতাটির উল্লেখ করেছি, সেই কবিতা ও উল্লিখিত গদ্যাংশের রচনাকাল একই অর্থাৎ ১৯৪০ সালের মে মাস। 'শেষ লেখা'য় কেবল সংখ্যা-চিহ্নিত হয়ে রইলেও 'প্রবাসী'তে প্রকাশকালে কবিতাটির নাম ছিল "অনন্ত আমি"। সার্থক নাম। ওই একটি নামেই কবি রবীন্দ্রনাথের পরিচয়, ওই নামের মধ্যেই লুকিয়ে আছে রবীন্দ্র-তন্ত্রের রহস্য।—

বিশ্বেরে যে জেনেছিল আছে ব'লে
সেই তার আমি
অস্তিত্বের সাক্ষী সেই,
পরম-আমির সত্যে সত্য তার
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।

—শেষ লেখা, ২ সংখ্যক

বঙ্গবাসী কলেজ

১২. তুলনীয় শেষ সপ্তকের ২২ সংখ্যক কবিতা
১৩. মংপুতে রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৪) পৃ. ২৪৭

সংগীতচিন্তায় প্রাচীন ভারত ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নূতন সৃষ্টি সর্বতোভাবে সার্থক হয় তখন যখন তার সঙ্গে পুরাতন সৃষ্টির মৌলিকতার সূক্ষ্ম যোগসূত্র বিদ্যমান থাকে। রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভারতীয় সংগীতের আধুনিক যুগে। এই আধুনিক যুগ মধ্যযুগের প্রভাবে বিশেষভাবে প্রভাবিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী সংগীতরচনার ধারায় যেভাবে ক্রমশ ভারতীয় সংগীতের প্রাচীন ও মৌলিক সূত্রগুলি পুনরায় উপস্থাপিত করেছিলেন তা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। এই উপস্থাপনা তিনি জ্ঞাতসারে করেছিলেন অথবা তাঁর প্রতিভার গুণে আপনা থেকে হয়েছিল তা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার বিষয়। বক্ষ্যমাণ আলোচনায় আমরা তাঁর গানের সুরগঠনে যেসব সাক্ষ্যপ্রমাণাদি বর্তমান তা দিয়েই বিচার-বিশ্লেষণ করব।

সর্বদেশের সর্বকালের সংগীতে তিনটি বিষয় অবিচ্ছেদ্যভাবে বর্তমান থাকে— সুর, ছন্দ ও লয়। গীত ও বাদ্যে সুর প্রধান, ছন্দ ও লয় তার অনুগামী। গানের ক্ষেত্রে সুরগঠন ও ছন্দপ্রয়োগের বৈশিষ্ট্যে এবং ভাষার ভিন্নতায় এক-একটি গীতরীতির উদ্ভব হয়। বর্তমান প্রবন্ধে গানের কথায় সুরপ্রয়োগের আলোচনাই প্রাধান্য পাবে।

যে-কোনো সংগীতরচয়িতার রচনায় তৎকালীন পারিপার্শ্বিক সাংগীতিক আবহাওয়া অল্পবিস্তর প্রভাব বিস্তার করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

"বাংলাদেশে আধুনিক যুগের যখন সবে আরম্ভকাল তখন আমি জন্মেছি। পুরাতন যুগের আলো তখন ম্লান হয়ে আসছে কিন্তু একেবারে বিলীন হয় নি।··· দেখেছি তখনকার বিশিষ্ট পরিবারে সংগীতবিদ্যার অধিকার বৈদগ্ধ্যের প্রমাণ বলে গণ্য হত।··· সৌভাগ্যক্রমে তখনো আমাদের সংগীত-রাজ্যে বক্‌স্ হারমোনিয়মের মহামারী কলুষিত করে নি হাওয়াকে। তম্বুরার তারে নিজের হাতে সুর বেঁধে সেটাকে কাঁধে হেলিয়ে আলাপের ভূমিকা দিয়ে যখন বড়ো বড়ো গীতরচয়িতার ধ্রুপদ গানে গায়ক নিস্তব্ধ সভা মুখরিত করতেন। সেই ছবির সুগম্ভীর রূপ আজও আমার মনে উজ্জ্বল আছে।"

ভারতবর্ষের সংগীতের ক্ষেত্রে ধ্রুবপদ শ্রেণীর গানের স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে। সুর-সৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে সামগান ছন্দোগান প্রবন্ধগান ও ধ্রুবপদের উদ্ভাবনা ও প্রচলনের ইতিহাসে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারাবাহিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তার মধ্যে শেষোক্ত ও প্রচলিত ধ্রুবপদের প্রতি যে রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন পূর্বোল্লিখিত উক্তিতে তার ইঙ্গিত আছে। রবীন্দ্রসংগীতেও রচনার শ্রেষ্ঠত্বে ও সংখ্যার বিপুলতায় ধ্রুবপদ-অঙ্গের গানের স্থান বিশেষভাবে চিহ্নিত। যেমন—

কানাড়া। চৌতাল

জগতে তুমি রাজা, অসীম প্রতাপ—

হৃদয়ে তুমি হৃদয়নাথ হৃদয়হরণরূপ ॥…

এ গানটিতে ধ্রুবপদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছাড়াও বাণী ও সুরের মিলিত এমন একটি মেজাজ আছে যেটিই হল রবীন্দ্রসংগীতের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সুর, ছন্দ, লয়, বাণী, গানের কলিসংখ্যা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে এবং 'বিপুল গভীরতা', 'আত্মদমন' ও 'সুসংগতি'র মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করার বিচারে ধ্রুবপদ-অঙ্গের গান ছাড়া অন্যান্য রবীন্দ্রসংগীতেও ধ্রুবপদের প্রভাব আছেই। কিন্তু বর্তমান আলোচনায় তা প্রধান কথা নয়। প্রধান কথা হল এই যে, রবীন্দ্রসংগীতে সুরপ্রয়োগের ধারায় কিভাবে প্রাচীন ভারতের সংগীতচিন্তার সঙ্গে সাযুজ্য ঘটেছে। সে-আলোচনার পূর্বে ভারতীয় সংগীতের প্রাচীন ও মৌলিক স্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে উল্লেখ করা আবশ্যক।

মানুষ তার কণ্ঠে সংগীতের উপযোগী সাংগীতিক ধ্বনি যখন আবিষ্কার করল, তখন থেকে সংগীতকলায় সেই ধ্বনিকে ব্যবহার করতে উদ্যোগী হল। কিন্তু সুর-সৃষ্টির সূচনায় ধ্বনিস্থানের সংখ্যার অল্পতার জন্য সংগীতে বৈচিত্র্য তেমন ছিল না। ষড়্‌জ ঋষভ ও গান্ধার (বর্তমান কোমল গান্ধার তুলনীয়) এই তিনটি স্বরেই সুর সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমশ বৈচিত্র্যের দিকে আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসার ফলে ষড়্‌জ ঋষভ ও গান্ধার স্বরত্রয়ের সঙ্গে আনুপাতিক আর এক প্রস্ত ষড়্‌জ ঋষভ ও গান্ধার নিয়ে এবং শেষোক্ত স্বরত্রয়কে পঞ্চম ধৈবত ও নিষাদ (বর্তমান কোমল নিষাদ তুলনীয়) নামে নামাঙ্কিত করে ও তার মধ্যবর্তী স্থানে মধ্যমকে প্রতিষ্ঠিত করে মোট সাতটি স্বর দ্বারা সপ্তক গঠিত হল।

ভারতীয় সংগীতের যাবতীয় সুর-গঠনের মূলে এই সপ্তক, অর্থাৎ ষড়্‌জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত ও নিষাদ স্বরাবলী। প্রাচীন ষড়্‌জ গ্রামে আরো দুটি স্বর চিহ্নিত ছিল— অন্তর গান্ধার ও কাকলী নিষাদ। এই নয়টি সংগীতের স্বর, অ ই উ ঋ ৯ এ ঐ ও ঔ এই নয়টি সাহিত্যের স্বরের সহিত গভীরভাবে সম্বন্ধযুক্ত ছিল। দুই প্রস্ত স্বরাবলীর প্রত্যেকটি এক-একটি বিশেষ ভাবের দ্যোতক। উভয়বিধ স্বরের এই ভাব-তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই সুর-সৃষ্টি ও গানে সুর-প্রয়োগ করা হত। কিন্তু এক সপ্তকে উক্ত নয়টি স্বর বা ধ্বনি-স্থানই শেষ কথা নয়। সপ্তকে প্রমাণিত ধ্বনি-স্থান মোট বাইশটি, এক-একটি শ্রুতি নামে পরিচিত। স্বরশাস্ত্রের এই তত্ত্ব ও তথ্য দু হাজার বছর পূর্বে রচিত মহর্ষি ভরত-কৃত নাট্যশাস্ত্রের উপর আধারিত এবং আজও অভ্রান্তরূপে স্বীকৃত। এই স্বরতত্ত্বের মৌলিকত্বকে রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করতেন। এ প্রসঙ্গে শ্রুতি সম্বন্ধে তাঁর উক্তি স্মরণযোগ্য :

"এই শ্রুতি আমাদের গানের সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্র। এরই যোগে এক সুর কেবল যে আর-এক সুরের পাশাপাশি থাকে তা নয়, তাদের মধ্যে নাড়ির সম্বন্ধ ঘটে। এই নাড়ির সম্বন্ধ ছিন্ন করলে রাগরাগিণী যদি বা টেঁকে তাদের ছাঁদটা বদল হয়ে যায়।"

আমাদের প্রাচীন সংগীতাচার্যগণ আর-একটি অতি প্রয়োজনীয় অনুশাসন দিয়েছেন। সেটি হল স্বরের 'গুণধর্ম' অর্থাৎ একই স্বর উচ্চারণের মৃদুতা বা প্রবলতার জন্য, বিলম্বিত বা দ্রুত উচ্চারণের জন্য, আন্দোলন বা গমকের বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন ভিন্ন রস-সৃষ্টির সহায়ক হয়। তা ছাড়া অন্য কথা আছে। নাট্যশাস্ত্রকার এক দিকে যেমন বলেছেন :

বাদ্যপ্রয়োগবিহিতান্ স্বরাংশ্চৈব নিবোধত ॥
হাস্যশৃঙ্গারয়োঃ কার্যৌ স্বঁরো মধ্যমপঞ্চমৌ।
ষড়্জর্ষভৌ চ কর্তব্যৌ বীররৌদ্রাদ্ভুতেষ্বথ ॥
গান্ধারশ্চ নিষাদশ্চ কর্তব্যৌ করুণে রসে।
ধৈবতশ্চ প্রয়োক্তব্যো বিভৎসে সভায়নকে ॥

হাস্য ও শৃঙ্গার রসে মধ্যম পঞ্চম, বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত রসে ষড়্জ ঋষভ, করুণ রসে গান্ধার নিষাদ এবং বীভৎস ও ভয়ানক রসে ধৈবত প্রযুজ্য। আবার একই বিকৃত স্বরের ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতির আশ্রয় লাভ করে বিভিন্ন রসের অভিব্যক্তি-বিষয়েও অনুশাসন আছে। যেমন, যদি কোমল ঋষভের প্রয়োগ দ্বারা করুণ রসের অভিব্যক্তি আবশ্যক হয় তা হলে কোমল ঋষভ আন্দোলনরহিত ও এক শ্রুতি নিম্নগামী হওয়া বিধেয়। আর যদি কোমল ঋষভের প্রয়োগ দ্বারা বীররসের অভিব্যক্তি উদ্দেশ্য হয় তা হলে কোমল ঋষভকে তার স্বাভাবিক স্থানে রেখে শুদ্ধ গান্ধার থেকে পুনঃ পুনঃ আন্দোলিত করা বিধেয়। এ প্রসঙ্গে যোগিয়া ও ভৈরব রাগের কথা মনে আসে। যোগিয়া রাগে অতিকোমল ঋষভ ও ভৈরব রাগে পুনঃ পুনঃ আন্দোলিত স্বাভাবিক কোমল ঋষভ প্রয়োগ করা হয়।

গভীরভাবে চর্চা ও অনুশীলন করলে বিশেষ বিশেষ রবীন্দ্রসংগীতে বিশেষ বিশেষ শ্রুতি-প্রয়োগ ও তার সার্থকতা উপলব্ধি করা যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ স্বরের ভাব নিয়ে সুর-গঠনে প্রাচীন ভারতের সংগীতচিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তার সাযুজ্য ঘটেছে। রাগসংগীতের ক্ষেত্রে রাগরাগিণীর উৎপত্তি, রাগ-নিয়ম, সংগীত-পদ্ধতি ও গীতরীতির ভিন্নতা, ঠাট-পদ্ধতি, গানের শ্রেণীভেদ, অলংকরণের বৈচিত্র্য ইত্যাদি বহু-পরবর্তীকালের উদ্ভাবনা। সংগীতের ধারা প্রবহমান না হলে তার কলাশক্তি খর্ব হয়। প্রবহমান ভারতীয় সংগীতের ধারা কখনও পুষ্ট হয়েছে, কখনও ক্ষীণ হয়েছে। তার মধ্যে মধ্যযুগে ভারতীয় সংগীতের সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য যেমন হয়েছিল, তেমনি তাতে আতিশয্য ও বিভ্রান্তিও অনুপ্রবেশ করেছে। তার জের আজও চলছে। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের সংগীতচিন্তার মৌলিকত্বকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ কথা বিশেষভাবে ভেবে দেখবার প্রয়োজন আছে।

ললিতকলার ক্ষেত্রে যাঁরা প্রতিভাবান ও সার্থক স্রষ্টা তাঁদের নিজের সৃষ্টির প্রতি বিশেষ মমত্ববোধ থাকে। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর গান সম্বন্ধে বিশেষ আশা পোষণ করতেন তাঁর উক্তিতেই তা জানা যায় :

"যুগ বদলায় কাল বদলায়, তার সঙ্গে সবকিছুই বদলায়। তবে সব চেয়ে স্থায়ী হবে

আমার গান, এটা জোর করে বলতে পারি। বিশেষ করে বাঙালীর শোকে দুঃখে, সুখে আনন্দে আমার গান না গেয়ে তাদের উপায় নেই। যুগে যুগে এই গান তাদের গাইতে হবেই।"

এরূপ আশাপোষণের গভীর তাৎপর্য আছে। রবীন্দ্রসংগীতে কথা ও সুরের মিলন, সংখ্যার বিপুলতা, ভাবের বৈচিত্র্য ইত্যাদি তো আছেই। বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনার বিষয় তা নয়। আলোচ্য বিষয় হল এই যে রবীন্দ্রনাথের সুর-প্রয়োগের ধারায় কি ভাবে স্বরের ভাব নিয়ে সুর-গঠনের কার্যকরতা সার্থক হয়েছে।

স্বরের ভাব নিয়ে সুর-গঠনের বিচারে রবীন্দ্রসংগীত তিন প্রকারে সার্থক হয়েছে— ১. প্রচলিত একক রাগের প্রয়োগে, ২. প্রচলিত রাগের মিশ্রিত-রূপ প্রয়োগে, ৩. প্রচলিত রাগে আগন্তুক স্বরের প্রয়োগে। এই তিনের মধ্যে শেষোক্তটি বক্ষ্যমাণ আলোচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।

এ স্থলে রাগ সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা আবশ্যক। রাগ শব্দের সঙ্গে রঞ্জনের গুণ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। পূর্বোক্ত স্বরাবলীর ভাব নিয়ে এক-একটি রাগের ধ্যানরূপ পরিকল্পিত হয়েছে ও তদনুযায়ী এক-একটি রাগ রূপায়িত হয়েছে। এই মূল-কথাটি জানা না থাকলে শিল্পীর পক্ষে রাগ-রূপায়ণ সর্বাঙ্গসুন্দর করা যেমন সম্ভবপর হয় না, সুরকারের পক্ষেও তেমনি গানে রাগ-রূপ সার্থকভাবে প্রয়োগ করাও দুরূহ হয়ে পড়ে। অন্য দিকে রাগের মৌলিক তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত না হলে চিত্রকরের পক্ষেও ছবিতে ঠিক-ঠিক রাগ-রূপ পরিস্ফুট করার আশা সুদূরপরাহত হয়। এ কথা মনে রেখে পরবর্তী আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক।

প্রচলিত একক রাগের প্রয়োগ

'পান্থ এখনো কেন অলসিত অঙ্গ' যোগিয়া রাগে ও সুরফাঁকতালে রচিত একটি ধ্রুবপদ অঙ্গের রবীন্দ্রসংগীত। সূর্যোদয়ের পূর্বে গেয় যোগিয়া করুণ রসের রাগ। এই রাগে আন্দোলনরহিত অতিকোমল ঋষভ ও কোমল ধৈবত প্রয়োগে বিশেষ কুশলতা আবশ্যক। ভক্তিভাবের দ্যোতক বলে যোগিয়া রাগে তানকর্তব তেমন হয় না। এজন্য যোগিয়া রাগের ভজন যতটা সুখশ্রাব্য হয়, খেয়াল ততটা হয় না। সংক্ষিপ্ত রাগ-রূপ :

সা ঋা -া -া সা, সা ঋা মা -া -া মা গঋা -া -া মা গঋা সা,
মা পা দা -া -া র্সা, র্সা -া নদা -া -া পা, পা দণা দপা মা,
মা গঋা -া -া মা গঋা সা।

উক্ত রাগে রচিত উল্লিখিত ধ্রুবপদ অঙ্গের রবীন্দ্রসংগীতটির কথা ও সুর নিবিষ্ট মনোযোগ সহকারে শুনে বিচার-বিশ্লেষণ করলে উপলব্ধি হয়, রবীন্দ্রনাথ যোগিয়া রাগের মূল-রসটি কত গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন ও তাঁর গানে অভিব্যক্ত করেছিলেন।

প্রচলিত রাগের মিশ্রিত-রূপ প্রয়োগ

রাগসংগীতের ক্ষেত্রে মিশ্ররাগ দুই প্রকার— ছায়ালগ (সালঙ্ক) ও সংকীর্ণ। ছায়ালগ রাগ দুই রাগের মিশ্রণে গঠিত, সংকীর্ণ রাগ দুইয়ের অধিক রাগের মিশ্রণে উদ্ভূত। রবীন্দ্র-সংগীতে এই দুই প্রকার রাগেরই প্রয়োগ হয়েছে। তার বিস্তারিত আলোচনা এ স্থলে সম্ভব নয়। একটি মাত্র ছায়ালগ রাগের গানের দৃষ্টান্ত দিই :

কত যে তুমি মনোহর মনই তাহা জানে

এ গানে টোড়ী ও ভৈরবী রাগের মিশ্রিত রূপ প্রয়োগ করা হয়েছে। 'কত যে তুমি মনোহর' অংশের সূচনায় ণ ও র থাকলেও উক্ত অংশের সুর টোড়ী রাগের পরিবেশ সৃষ্টি করে। কিন্তু 'মনই তাহা জানে' অংশের 'মনই' শব্দটিতে শুদ্ধ মধ্যমের প্রয়োগ চমৎকারভাবে ভৈরবী রাগের আবহাওয়া এনে দেয়। এ স্থলে শুদ্ধ মধ্যমের প্রয়োগ সার্থকও। কেননা শুদ্ধ মধ্যম শান্ত রস ও গম্ভীর ভাবের দ্যোতক। 'কত যে তুমি মনোহর' চরণাংশ দ্বারা মনোহারিত্বের পরিমাণ বোঝা যাচ্ছে, পরবর্তী চরণাংশ 'মনই তাহা জানে' দ্বারা মন যে তা জানবার বা গ্রহণ করবার উপযোগী এ ভাব পরিস্ফুট হচ্ছে। 'মন'এর যথার্থ ভাব প্রকাশ করবার জন্য শুদ্ধ মধ্যমের প্রয়োগ যুক্তিসংগত মনে হয়। কারণ শুদ্ধ মধ্যম গম্ভীর ভাবের সঙ্গে ব্যাপ্তির ভাবও প্রকাশ করে। লক্ষ্য করবার বিষয় উক্ত গানটি প্রকৃতি পর্যায়ের 'সাধারণ' বিভাগের অন্তর্গত ; কোনো ঋতু-বিশেষের বর্ণনা এতে নেই। এরূপ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গানটির পরবর্তী অংশও বিশ্লেষণীয়।

ছায়ালগ ও সংকীর্ণ রাগ ছাড়াও রবীন্দ্রসংগীতে কতকগুলি নূতন ও অভিনব মিশ্রিত রাগের প্রয়োগ হয়েছে। তার বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে এখানে একটিমাত্র গানের উল্লেখ করছি। গানটি হল :

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।

বিভাস রাগের রূপ দিয়ে এ গানটির সুরের সূচনা, তার পর অন্যান্য রাগের ছায়া এসেছে ; তার মধ্যে সঞ্চারীর

তরঙ্গ মিলায়ে যায়, তরঙ্গ উঠে,
কুসুম ঝরিয়া পড়ে, কুসুম ফুটে।

দ্বিতীয় চরণের শেষার্ধে 'কুসুম ফুটে' অংশে ললিত রাগের প্রয়োগ হয়েছে। ললিত রাগের স্বরবিন্যাস সংক্ষেপে এরূপ :

ন্‌া ঋা গা -া -া হ্মা মা -া -া গা, হ্মা দা র্সা, র্সা না ঋ্‌র্া
না দা -া -া, হ্মা দা হ্মা মা -া -া গা, হ্মা গা ঋা সা।

আলোচ্য গানটির সঞ্চারীর দ্বিতীয় চরণের ভাব কি? প্রথমার্ধে হল 'কুসুম ঝরে পড়া'র বেদনা, শেষার্ধে হল 'কুসুম ফুটে' ওঠার আনন্দ। ললিত রাগ পরিবেশনের সময় রাত্রি চতুর্থ প্রহরের শেষাংশ। এই সময়ের বিশেষত্ব হল— রাত্রির অন্ধকার তরল হয়ে আসছে,

পূর্বদিগন্তে নবারুণ-আলোকের আভাস দেখা দিচ্ছে, শান্ত পরিবেশে একটি নতুন দিনের আনন্দ সমাগত। এই রাগে শুদ্ধ মধ্যম স্বরের উপর বিশ্রান্তিও ওই একই দিকে ইঙ্গিত করে। কেননা, পূর্বে বলা হয়েছে, শুদ্ধ মধ্যম শান্ত রসের দ্যোতক। এ-সব কারণে 'কুসুম ফুটে' চরণাংশে ললিত রাগের প্রয়োগ সার্থক ও যুক্তিযুক্ত মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ যে রাগের মৌলিক ভাবটি গ্রহণ করে কথার ভাব প্রকাশের জন্য রাগের আসল রূপকে সার্থকতার সহিত প্রয়োগ করতেন, এটি তার অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রচলিত রাগে আগন্তুক স্বরের প্রয়োগ

গানের সুরে আগন্তুক স্বরের সার্থক প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কৃতিত্বের তুলনা খুব কমই মেলে। রাগসংগীতের ক্ষেত্রে কোনো রাগের নিয়ম অনুযায়ী সে-রাগের স্বর-নকশায় যে-স্বরটির প্রয়োগ হবার কথা নয়, সে-স্বরটি বিশেষ কোনো কারণে ও শর্তাধীনে সে-রাগে প্রযুক্ত হলে আগন্তুক স্বরপদবাচ্য হয়। অবশ্য রবীন্দ্রসংগীতে আগন্তুক স্বরের প্রয়োগ হয়েছে ভিন্ন উদ্দেশ্যে। একটি দৃষ্টান্ত দিই :

এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে মুকুলগুলি ঝরে

গানটির সঞ্চারী ছাড়া অন্যান্য কলির সুর ইমন বলতে বাধা নেই। কিন্তু সঞ্চারী অর্থাৎ

বউ কথা কও তন্দ্রাহারা বিফল ব্যথায় ডাক দিয়ে হয় সারা
আজি বিভোর রাতে।

কলির 'বিফল' শব্দটিতে আন্দোলনবর্জিত অতিকোমল ঋষভের ব্যবহার হয়েছে। পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে কোমল ঋষভ দ্বারা করুণ রস প্রকাশ করতে হলে আন্দোলনরহিত ও বিশেষ শ্রুতি-আশ্রয়ী করা আবশ্যক। তদনুসারে 'বিফল' ব্যথার যথাযথ ভাব প্রকাশের জন্য অতিকোমল ঋষভের প্রয়োগ তাৎপর্যপূর্ণ ও যুক্তিসংগত মনে হয়। 'বিভোর' শব্দটিতে শুদ্ধ মধ্যমের প্রয়োগও ভাবপ্রকাশের জন্যেই। যদিও গানটির সুরের কাঠামো ইমন রাগে, যথাযথ ভাবকে রূপ দেবার জন্যে আগন্তুক স্বর হিসাবে কোমল ঋষভ ও শুদ্ধ মধ্যমের প্রয়োগে রাগের রঞ্জকত্ব খর্ব হয় নি বলেই আমাদের বিশ্বাস। রবীন্দ্রসংগীতে এ রকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই। ভাব-অভিব্যক্তির এই কেন্দ্রেই প্রাচীন ভারতের সংগীতচিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তার মিল। তিনি যেমন বলেছেন :

"আমার মনে যে সুর জমে ছিল সে সুর যখন প্রকাশিত হতে চাইলে তখন কথার সঙ্গে গলাগলি করে দেখা দিল। ছেলেবেলা থেকে গানের প্রতি আমার নিবিড় ভালোবাসা যখন আপনাকে ব্যক্ত করতে গেল তখন অবিমিশ্র সংগীতের রূপ সে রচনা করলে না, সংগীতকে কাব্যের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে; কোন্‌টা বড়ো কোন্‌টা ছোটো বোঝা গেল না।"

রবীন্দ্রনাথের এ উক্তিকে লঘুভাবে নিলে খুব ভুল করা হবে। কারণ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এই উক্তি। কবির কথাতেই বলি :

"সংগীত যেখানে আপন স্বাতন্ত্র্যে বিরাজ করে সেখানে তার নিয়ম-সংযমের যে শুচিতা প্রকাশ পায়, বাণীর সহযোগে গানরূপে তার সেই শুচিতা তেমন করে বাঁচিয়ে চলা যায় না বটে, কিন্তু পরম্পরাগত সংগীতরীতিকে আয়ত্ত করলে তবেই নিয়মের ব্যত্যয়সাধনে যথার্থ অধিকার জন্মে।"

ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগের সংগীতাচার্যগণ ভাবের প্রতিই অধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। রবীন্দ্রনাথ যে 'পরম্পরাগত সংগীতরীতিকে' যথার্থ উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁর বিপুল সংগীত-রচনায় তার মৌলিকত্বকে সুনিপুণভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন পূর্ববর্তী সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তার আভাস দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ভারতবর্ষে মধ্যযুগে নানা অবস্থা-বিপর্যয়ে সংগীতকলাকার ও সংগীতশাস্ত্রবিদ্গণের মধ্যে বহু ক্ষেত্রে ভেদ সৃষ্টি হয়, যার ফলে বিভিন্ন মতান্তরের উদ্ভব হয় এবং ক্রমশঃ আমাদের সংগীতে নানা আতিশয্য ও বিভ্রান্তি এসে পড়ে। আধুনিক যুগে জন্মগ্রহণ করেও রবীন্দ্রনাথ সহজাত কবিধর্ম ও সংগীত-প্রতিভার গুণে মধ্যযুগের সংগীতের আতিশয্য ও বিভ্রান্তিকে বর্জন করে তাঁর সংগীত-রচনায় প্রাচীন ভারতীয় সংগীতের মৌলিক সূত্রগুলি পুনর্বার উপস্থাপিত করেছেন। নূতন যুগের ভূমিতে অধিষ্ঠান করে প্রাচীন যুগের সঙ্গে যোগসূত্র-স্থাপনের এই সার্থকতা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। বলা আবশ্যক, এ প্রসঙ্গটি বহুশাখান্বিত ও অতি বিস্তারিত। আলোচিত অংশটি সংক্ষেপে আভাস দেওয়ার সামান্য চেষ্টা মাত্র।

রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম পর্যায়

ব্রাহ্মমুহূর্তের সন্ধিক্ষণে

শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

গীতাঞ্জলি প'ড়ে এজরা পাউণ্ডের মনে পড়েছিল দান্তের 'পারাদিসো'র কথা। এই তুলনাসূত্রটিকে ক্লিষ্ট না ক'রেও বাড়িয়ে নেওয়া চলে। এমন কথা অসংকোচে বলা চলে রবীন্দ্রনাথকেও দান্তের মতো পর্যায় থেকে পর্যায় পার হয়েই পরিণতির দিকে যেতে হয়েছিল। Karl Vossler-এর বিশ্লেষণে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে, দান্তের উদ্ভাসিত ঈশ্বরীস্তোত্রের পূর্বপটে আছে মানবস্বভাবের অনালোকিত, অমীমাংসিত স্তর। বিশেষ **canzoniere**-এর একগুচ্ছ কবিতায় সেই রক্তমাংসের দেহমানস এত স্পষ্ট এতই উচ্চারিত যে তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন অন্তর্দ্বন্দ্বটি চিনে নেওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয় না। অথচ কে না জানে এ শুধুই একটি স্তর, যাকে ছাপিয়ে দান্তের মিলনান্ত মন্ত্রভাষণ, পারাদিসোর সৌরশিখর। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এভাবে স্তর-নিরূপণ যে একান্ত অসম্ভব এমন কথা মেনে না নিলেও এ কথা বলব তিনি সে সুযোগ আমাদের একরকম দেন নি। তাঁর রচনার প্রথমতম পর্যায়টিকে তিনি কেন সূর্যের মুখ দেখতে দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন, তার কারণ দেখাতে গিয়ে তিনি বলেছেন তাঁর সেই পর্বের রচনায় ভূ-সংস্থান জেগে ওঠে নি। এখানে, একটু তলিয়ে দেখলেই চোখে পড়ে রবীন্দ্রনাথ কবিতাকে প্রায় প্রথম থেকেই ভাষার সমস্যা হিসেবে নিতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। এবং সেই ভাষাকে মানুষের পবিত্রতম সাংস্কৃতিক পরিচয়, তার আদান-প্রদানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠতম সম্পদ ব'লে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন। ফলত, তারুণ্যের প্রথম বাঁকে ঘুরেই তিনি ভাষার সেই ভূমিকা সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন হয়ে উঠলেন। আজ যাকে আমরা অচলিত সংগ্রহ বলে অভিহিত করছি, তার সঙ্গে তাই তাঁর পরবর্তী রচনাবলীর আপাত-দুস্তর ব্যবধান। অচলিত সংগ্রহ বা তৎসংক্রান্ত কবিতাবলী অসমান, স্বভাবের কাছাকাছি, unsophisticated। এর অব্যবহিত পরেই আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে দেখতে পাই মননে ও কথনে সুসমঞ্জস, আদর্শের আভায় দীপ্যমান, **sophisticated** রূপে। গীতাঞ্জলির অনেক আগেই, চিত্রায়— এমন-কি তারও আগে, সম্ভবত প্রভাতসংগীতেই পরিচিত-অপরিচিত-নির্বিশেষে তাঁর আত্মসচেতন শব্দব্যবহার, সৌজন্যসুন্দর আলাপচর্চার বরেণ্য মূর্তিটি দেখা গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর সেই আতিথেয়তা নিরুত্তাপ নয়, আদর্শবাদ স্বভাব-বিবিক্ত নয়। অচলিত সংগ্রহের অনাদৃত ধূসর পাণ্ডুলিপি থেকে মানসীর এক পর্যায়ের রক্তিম কবিতাগুচ্ছ পর্যন্ত তাঁর কবিতায় ঐহিক সত্তার তীব্র উত্তাপ কখনো অবাধে কখনো অতর্কিতে প্রকাশমান।

সেই মুহূর্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে নিশ্চয় আত্মনির্মিতির, দোলাচলের। তরুণ রবীন্দ্রনাথের মনে সেই মুহূর্তের অভিঘাত যে-প্রবণতা সূচিত করেছিল, তাকে কি সাহিত্যসমালোচনার পরিভাষা অনুসারে neo-romantic বলব? যতদূর মনে পড়ে, ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পূর্বে এ বিষয়ে কেউ চিন্তান্বিত হন নি। রোমান্টিক কাব্য-আন্দোলনের অনুসূক্ষ্ম স্তর-বিবর্তন বর্ণনা-প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ 'রোমান্টিক' ও 'নিয়ো-রোমান্টিক' শব্দ দুটিকে স্বতন্ত্র করে দেখতে চেয়েছিলেন। শেষোক্ত শব্দটির তাৎপর্য নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি একটি যুগসন্ধির কথা স্পষ্টভাষায় বলেছিলেন—

It is needless to state we reserve the term neo-romantic for the epoch, or stage, which is the subject of this paper, giving it wider and comprehensive meaning, in according to the terms neo-classical and neo-oriental.

—*New Essays in Criticism*

নূতন প্রাচীর যে দুজন কবি এই মুহূর্তে সতীর্থ, সক্রিয় ও নব্য-রোমান্টিকতার লক্ষণে চঞ্চল, তাঁরা অক্ষয়কুমার বড়াল ও রবীন্দ্রনাথ। এক দিকে ভারতবর্ষীয় মনোভঙ্গি অর্জনে উন্মুখ অপর দিকে সদ্য-সমাগত পশ্চিমী কবিতার থেকে অর্জিত অবাধ্য হৃদয়ের ভাষা এঁদের তখন নিরন্তর দোটানায় উচাটন করেছে। তাই

উন্মত্ত কবির মত
গড়ে ভাঙে অবিরত
লয়ে এক অন্ধ শক্তি কল্পনা ভীষণ—

অক্ষয়কুমারের এই অকপট ক্রন্দনের উত্তেজনা মানসী-পর্বের রবীন্দ্রনাথেও—

মনে হয় সৃষ্টি বুঝি বাঁধা নাই নিয়মনিগড়ে
আনাগোনা মেলামেশা সবই অন্ধ দৈবের ঘটনা।

যদিও একই কবিতার অন্তিম স্তবকে কবিপ্রদত্ত সান্ত্বনা

সত্য আছে স্তব্ধ ছবি
যেমন উষার রবি
নিম্নে তারি ভাঙে গড়ে মিথ্যা যত কুহক-কল্পনা।

তবু সন্দেহ থাকে না রবীন্দ্রনাথ তখনও দ্বিধাবিদ্ধ, প্রশ্ন-জর্জরিত। যে যন্ত্রবিশ্বের সঙ্গে হৃদয়ের সংঘর্ষে অক্ষয়কুমার জীবনকে বলেছেন 'অদৃষ্টের ছলা', রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'জড়ময় সৃজন' তার সঙ্গে রফানিষ্পত্তির চেষ্টায় তাঁদের কবিতা দীর্ঘদিন সংক্ষুব্ধ, প্রস্তুতিময়।

সেই সময়ে রচিত 'কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন' নামক একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কবিতার নূতন ভূমিকা সম্পর্কে যে-অভিমত জানিয়েছেন তাতে কবির সচেতন সংকল্প ধরা পড়েছে—

'জ্ঞানের অনুশীলন যতই হইতেছে, অজ্ঞানের অন্ধকার ততই বাড়িতেছে, ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন?...অন্ধকারের মানচিত্র ক্রমেই বাড়িতেছে, বড় বড় বৈজ্ঞানিক কলম্বস্-সমূহ নূতন নূতন অন্ধকারের মহাদেশ বাহির করিতেছেন। নিশাচরী কবিতার পক্ষে এমন সুখের সময় আর কি হইতে পারে! সে রহস্যপ্রিয়, কিন্তু এত রহস্য কি আর কোন কালে ছিল!...পাঠকেরা যদি ভাবিয়া দেখেন, যে, এখনকার কোন কবি যথার্থ সত্য মনে করিয়া যেরূপ করিয়া উষা বা সন্ধ্যার একটা গড়ন বাঁধিয়া দেন, সকল লোকেই যদি তাহাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া শিরোধার্য করিয়া লয়, তাহা হইলে কবিতার রাজ্য কি সংকীর্ণ হইয়া আসে!...যতই জ্ঞান বাড়িতেছে ততই কবিতার রাজ্য বাড়িতেছে। কবিতা যতই বাড়িতেছে কবিতার ততই শ্রমবিভাগের আবশ্যক হইতেছে, ততই খণ্ডকাব্য গীতিকাব্যের সৃষ্টি হইতেছে।'

অর্থাৎ, সত্য যে আপেক্ষিক, সেই কথা এখানে বলা হল। এবং এ কথাও প্রকারান্তরে অভিব্যক্ত হল যে কবি কোনো সার্বজনিক সত্যের উদ্গাতা নন, তিনিও রহস্যময় অন্ধকারের মন্ময় ভাষ্যকার এবং লিরিক অথবা লিরিকধর্মী কবিতা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির অনুভূতির আধার। 'কবি-কাহিনী'তে এই-সব কথাই কবিতায় অনূদিত করছে—

নিশাই কবিতা আর দিবাই বিজ্ঞান।
দিবসের আলোকে সকলি অনাবৃত,
সকলি রয়েছে খোলা চোখের সমুখে—
ফুলের প্রত্যেক কাঁটা পাইবে দেখিতে।
দিবালোকে চাও যদি বনভূমি পানে,
কাঁটা খোঁচা কর্দমাক্ত বীভৎস জঙ্গল
তোমার চোখের পরে হবে প্রকাশিত;
দিবালোকে মনে হয় সমস্ত জগৎ
নিয়মের যন্ত্রচক্রে ঘুরিছে ঘর্ঘরি।
কিন্তু কবি নিশাদেবী কি মোহন-মন্ত্র
পড়ি দেয় সমুদয় জগতের পরে
সকলি দেখায় যেন রহস্যে পূরিত।

রাত্রির এই স্তব পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ক্ষমাহীন বস্তুসত্যকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা থেকে এর জন্ম। তাই প্রায় পরমুহূর্তেই প্রকৃতির প্রতি কবির প্রগাঢ় অনাস্থা—

মানুষের মন চায় মানুষেরি মন;
গম্ভীর সে নিশীথিনী, সুন্দর সে উষাকাল,
বিষণ্ণ সে সায়াহ্নের ম্লান মুখচ্ছবি,
বিস্তৃত সে অম্বুনিধি, সমুচ্চ সে গিরিবর,

আঁধার সে পর্বতের গহ্বর বিশাল ;
তটিনীর কলধ্বনি, নির্ঝরের ঝর ঝর,
আরণ্য বিহঙ্গদের স্বাধীন সঙ্গীত,
পারে না পূরিতে তারা, বিশাল মনুষ্যহৃদি—
মানুষের মন চায় মানুষেরি মন।

আজকের পাঠক ঐ 'মানুষেরি' শব্দটিকে 'মানুষী' শব্দের সঙ্গে একাকার করে ফেলতে পারেন—জীবনানন্দের অনুষঙ্গে—

তবুও কাউকে আমি পারি নি বোঝাতে
সেই ইচ্ছা সঙ্ঘ নয় শক্তি নয়, কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়,
আরো আলো : মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।

—সুরঞ্জনা

এবং জীবনানন্দের মতোই রবীন্দ্রনাথের কৈশোরপর্যায়ের কবিতা প্রেম ও অপ্রেমের দ্বন্দ্বে জীবন্ত, প্রেম ও মৃত্যুর তত্ত্বলেশশূন্য সংস্পর্শে সংরক্ত। এই প্রেম যে ইন্দ্রিয়স্পর্শী তার অভিজ্ঞান 'রাক্ষসী স্বপ্নের তরে, ঘুমালেও শান্তি নাই / পৃথিবী দেখিত কবি শ্মশানের মত' এই রকম উচ্চারণে প্রকট। ফলত, মৃত্যুও যে ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে রোমাঞ্চকর, আকাঙ্ক্ষা-সুন্দর তারও দৃষ্টান্ত আদৌ বিরল নয়—

মানবকঙ্কাল শুয়ে ভস্মের শয্যায়
কানের কাছেতে গিয়ে বায়ু কত কথা ফুসলায় !
তটিনী কহিছে কানে উঠ ! উঠ ! উঠ নিদ্রা হতে
ঠেলিয়া শরীর তার ফিরে ফিরে তরঙ্গ আঘাতে !

অধোরেখ অংশের স্বরক্ষেপ ছাড়াও পাঠকের মনে পড়বে জীবনানন্দকে, মনে পড়বে জীবনানন্দের 'শব' নামক কবিতাটি কোনো রমণীর মৃতদেহ ঘিরে মোহাবিষ্ট নিসর্গচিত্রণ।

প্রসঙ্গত, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর নাম অনিবার্য। অক্ষয়চন্দ্রের 'উদাসিনী' মিলনান্ত একটি আখ্যায়িকা হলেও আধুনিক মানসের নানা উপাদানে আপূর্যমান। আজকের পাঠকের কাছে এই আখ্যায়িকার তিন-চতুর্থাংশ কাব্যাংশে পাংশু বলে গণ্য হবে। কিন্তু এর আপাতমেদুর প্রচ্ছদ সরিয়ে ভিতরে তাকালেই চোখে পড়বে কবির অস্থির একটি অন্তর্জ্বালা। কবি এমন কয়েকটি সমস্যা উত্থাপন করেছেন যা নিছক রোমান্টিক নয়, নিয়ো-রোমান্টিক। বলা যায়, ব্যক্তিচরিত্রের আত্মসন্ধানই অক্ষয়চন্দ্রের কবিতার অন্যতম বিষয়। রোমান্টিক কবির লক্ষ্য অবাধ আত্মপ্রকাশ, ভাবাবেগের স্বতঃস্ফূর্ত মূর্তন। পক্ষান্তরে, নিয়ো-রোমান্টিক কবির উৎসাহ আত্মসন্বিৎসায়, ভাবনা-মননে। সেই অর্থে অক্ষয়চন্দ্রের কাব্য নিয়ো-রোমান্টিক। এই কাব্যের প্রেমিক প্রতিশ্রুত তৃপ্তির মুহূর্তে পলাতক, প্রেমিকা পাপবোধে জর্জরিত। সেই প্রেমিকের বিস্ময়কর অন্তর্ধানের মুখে

ভয়ঙ্কর বেশ ধরি কল্পনা শত্রুতা করি
বিভীষিকা করে প্রদর্শন।

এবং অন্বেষণের মুহূর্তে প্রেমিকার মনে হয়—

মহিষ গণ্ডার কত চেয়ে চেয়ে থাকে,
পাপিনী বলিয়ে বুঝি ছুঁলে না আমাকে।
তন্ন তন্ন করি দেবি! দেখি চারি ধার—
সহসা সাহস ভঙ্গ, আতঙ্কে শিহরে অঙ্গ
শুনিলাম শৃগালের অশিব নিনাদ,
গৃধিনীর ঘোর রবে আকুলিত বনে সবে
ভাবিলাম কি জানি কি ঘটেছে প্রমাদ।...
ঘুরিছে মেদিনী যেন চক্রের মতন,
ভয়ের বিভ্রম ভরে, ভয়ঙ্কর কলেবরে
বহুরূপী বিভীষিকা করি নিরীক্ষণ।

এই বহুরূপী বিভীষিকা অবশ্য অচিরেই অক্ষয়চন্দ্রের পৌরোহিত্যে একটি ধর্মীয় শুভৈকসুন্দর পরিণতি লাভ করেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কৈশোর রচনাপর্যায়ে অশুভ ও অসুন্দরকে একটি ব্যাপক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। জীবন নামক প্রকাণ্ড অনিশ্চয়তাকে বুঝবার জন্য বিপজ্জনক নিরীক্ষার ঝুঁকি নিয়ে তাঁর বয়ঃসন্ধির নায়কেরা প্রায়শই, কখনো-কখনো ছেলেমানুষির ছাপ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে—

রুসিয়ার হিমক্ষেত্রে আফ্রিকার মরুভূমে
আর একবার আমি করি গে ভ্রমণ।

—কবি-কাহিনী

এবং পরিব্রাজকের এই দুর্মর পিপাসা যেমন পুরুষচরিত্রকে চিহ্নিত করেছে, তেমনি নারীচরিত্রকেও। বিশেষত নারীর পাপবোধ ও আত্মবিশ্লেষণে তাঁর এই পর্বের চরিত্র-চিত্রণকে রক্তাভ করে তুলেছে—

সেই মূর্তি নীরদের! সে মূর্তি মোহন
রাখিলে বুকের মধ্যে পাপ কেন হবে?
তবুও সে পাপ—আহা নীরদ যখন
বলেছে, নিশ্চয় তারে পাপ বলি তবে!

—বনফুল

সচেতন পাঠক নিশ্চয় লক্ষ করেছেন, নারীর এই পাপবোধ রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তিতায় ক্রমশ পুরুষের পাপবোধ ও আত্মবিশ্লেষণে রূপান্তরিত ও শক্তিশালী হয়েছে। মানসীর নারীর উক্তি, পুরুষের উক্তি, নিষ্ফল কামনা, সুরদাসের প্রার্থনা প্রভৃতি কবিতা পড়লেই এই

কথাটি নির্ধারিতরূপে প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ মানসীতে এসেই পুরুষের কাছে নারী অনুধাবনের, অনুধ্যানের, উপাসনার বিষয় হয়ে উঠেছে; ইতিপূর্বে যে তারা সমস্তরে দাঁড়িয়েছিল, অস্তিত্বের মুহূর্তলাঞ্ছিত বাস্তবতায় একযোগে আক্রান্ত হয়েছিল, সেই স্বেদাক্ত সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার স্তর থেকে এবার তিনি নারীকে বিশ্রাম দিলেন। একথা তাঁর কয়েকটি ছোটগল্প ও উপন্যাস সম্পর্কে খাটে না, কিন্তু কবিতা সম্পর্কে তীব্ররূপে প্রযোজ্য। মানসীর অনন্ত প্রেম কবিতায় নারীকে ঈশ্বরীর ভূমিকায় নিরীক্ষণের প্রথম প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে। চিত্রায় নারী ও ঈশ্বরী একাকার, এবং সেই যুগ্মসত্তাকে জীবন-দেবতা বা বিশ্বদেবতা যে নামেই অভিহিত করি না কেন, তা বিয়াত্রিচের মতোই কবির কাছে সত্য উর্ধ্বাকর্ষী, পরীক্ষোত্তীর্ণ পূর্ণতার প্রতিমা। সেই নারীশ্বরী কবিকে ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে শুদ্ধশীল সুন্দরের ধারণায় চালিত করে নিয়ে যাচ্ছেন। দান্তের মতোই জীবনব্যাপী সেই অভিসার, সেই দিব্য ভাবসম্মেলনের প্রতিশ্রুতি। নারীর হাত থেকে পূর্ণতার ছাড়পত্র অর্জনের পৌরুষব্যঞ্জক সংগ্রামে দান্তে ও রবীন্দ্রনাথের জীবন বেগবন্ত সাংকেতিক নাটকের উদাহরণ।

পূর্ণতা অর্জনের এই সংগ্রাম যখন মানচিত্রের মতো ক্রমপ্রসারী নব নব দিগন্তের সম্ভাবনায় প্রতিশ্রুতিময় হয়ে ওঠে নি, সেই সময়ের রচনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অস্বস্তি ছিল স্বাভাবিক কারণেই অত্যন্ত বেশি। সেই পর্বের রচনায় অস্পষ্টতা শুধু অনিবার্য নয়, বরণীয় ছিল। 'ভুল' (১৮৮৭) নামক কাব্যগ্রন্থের সূচনায় অক্ষয়কুমার গ্যেটের বচন ইংরেজি তর্জমা থেকে উদ্ধৃত করে পাঠককে জানিয়েছিলেন, 'All good lyrics must be reasonable as a whole, and yet in details a little unreasonable।' অক্ষয়কুমার তাঁর প্রতিটি গ্রন্থ পরিমার্জনা করেছেন, প্রকরণের প্রয়োজনে ভাবনার বশ্যতা ঘটিয়েছেন। লিরিকের প্রধান শর্ত যে শৃঙ্খলাশূন্য জীবনের পাশাপাশি মিতায়তন রূপকল্পের সাধনা, সেই কথা স্পষ্ট করে প্রদীপ (১৮৮৪) কাব্যের অন্তর্গত 'গীতি-কবিতায়' গাঢ় স্বরে আমাদের জানিয়ে বলেছেন: 'নিটোল শিশির-কণা, বন্ধুরা মেদিনী'। রবীন্দ্রনাথও ইতিমধ্যে সন্ধ্যাসংগীত লিখেছেন, লিরিকের ঋজু হ্রস্ব ও ঘনীভূত এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। কিন্তু তার আগে তাঁর অনচ্ছ 'ফর্ম'-শূন্যতা, রাগিণীর ধ্রুবপদে উপনীত হওয়ার আগে অস্থির আলাপ। তখন তাঁর মনে হয়েছে—

> অসংলগ্ন কথাগুলি, মরমের ভাব আরো
> গোলমাল করি দিল প্রকাশ না করি।
>
> —কবি-কাহিনী

অথবা

> সেই অর্থহীন কথা, হৃদয়ের ভাব যত
> প্রকাশ করিতে পারে এমন কিছু না।
>
> —কবি-কাহিনী

কাহিনীকবিতা রচনার আগ্রহ যখন অবসিত হয়ে এল, সেই সন্ধ্যাসংগীতে এই অস্থিরতা ছোটো-ছোটো কয়েকটি উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গবলয়ে ধরা দিয়েছে। স্তবকনির্মাণে অযত্ন থেকে শুরু ক'রে প্রবহবিক্ষোভে স্বৈরবৃত্ততার এই অভিব্যক্তি প্রকট। সন্ধ্যা, হলাহল, পরাজয়-সংগীত, তারকার আত্মহত্যা প্রভৃতি কবিতায় শিল্পরূপ শুধু অনুপস্থিত নয়, অবাঞ্ছিত। প্রভাতসংগীতে বরং ঐ অপর্যাপ্ত আশাবাদের মধ্যেও কাব্যানুশাসনের আভাস দেখা দিয়েছে। প্রভাতসংগীতের প্রথম কবিতা আহ্বানসংগীতের আরম্ভেই আত্মধিকার মাত্রাবৃত্তের প্রসাদে সুরে বেজে উঠেছে—

মড়কের কণা, নিজ হাতে তুই
রচিলি নিজের কারা,
আপনার জালে জড়ায়ে পড়িলি
আপনি হইলি হারা।

এ যেন পরবর্তীকালে তাঁর রচিত 'আপনারে দিয়ে রচিলি রে কি এ আপনারি আবরণ' গানটির পূর্বাঙ্কুর। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটির অজস্র পাঠ থেকেও এ সিদ্ধান্ত ন্যায্য, প্রভাতসংগীতে কবি চৈতন্যের অনিঃশেষ অপাবরণে উৎসুক। বিবেক যেন হৃদয়কে অন্তর্নিরুদ্ধ গুহা থেকে মুক্ত করে দিয়েছে, কিন্তু সাবধান পাঠকের চোখে এই সত্য এড়াবে না যে সেই মুক্তি নিঃশর্ত নয়। সেই শর্ত শোচনা নয় পরিতাপ নয়, শুভ বিবেকের সাহচর্যে হৃদয়ের গ্লানিক্ষালন, রৌদ্রস্নান। কিন্তু 'শৈশব যৌবন যখন সবে মিলেছে' সেই ছবি ও গানে যেন কখনো-কখনো শেষবারের মতো হৃৎপিণ্ডের উৎকণ্ঠা ঘোষণা করার দুর্মর আগ্রহ। যেমন আর্তস্বর কবিতায়—

নিশীথ সমুদ্র মাঝে জলজন্তুসম রাজে
নিশাচর যেন রে অগণ্য।

অথবা

এ অনন্ত অন্ধকারে কে রে সে, খুঁজিছে কারে
তন্ন তন্ন আকাশ গহ্বর।

কিম্বা প্রত্ন-মাত্রাবৃত্তে ট'লে-যাওয়া অথচ আশ্চর্য অভিঘাতসম্পন্ন কবিতা রাহুর প্রেমে—

কাছেতে দাঁড়ায়ে প্রেতের মতন,
শুধু দুটি প্রাণী করিব যাপন
অনন্ত সে বিভাবরী।

কিন্তু এর অনতিপরেই রবীন্দ্রনাথের চিরবাঞ্ছিত উত্তরণ, মানসীতে।—

তোমাতে হেরিব আমার দেবতা
হেরিব আমার হরি—
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব
অনন্ত বিভাবরী।

—সুরদাসের প্রার্থনা

লক্ষ করা দুরূহ নয়, শেষোক্ত উদাহরণে নারী পুরুষের নিয়ন্ত্রী হয়ে উঠেছে, দৈনন্দিন ঘনিষ্ঠতা থেকে কমনীয় অথচ পরিশীলনী ব্যবধানে স'রে গিয়ে।

কড়ি ও কোমল মানসীর অব্যবহিত পূর্বলেখ। এই কাব্যের sensuousness যতই উচ্চারিত হোক তা তাঁর পূর্ববর্তী কবিতাপ্রবাহের ঐন্দ্রিয়িক অসন্তোষের তুলনায় অনেক শান্ত, সুস্মিত, এমন-কি রোমান্টিক লালিত্যে স্নিগ্ধ। কড়ি ও কোমলে নিজেকে কবি কিছুমাত্র নির্যাতন না করে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তা কখনো গীতিবন্ধে, কখনো সনেটবন্ধে। এ দুটিই ব্যক্তিগত, অথচ ব্যক্তিগত নয়। আগের তুলনায় এ যেন দেহসংক্রান্ত নৈর্ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার অন্তরঙ্গ ভাষ্য। এখন থেকে তাঁকে আর নিজেকে প্রকাশ ক'রেও 'ব্যক্তিগত' ব'লে অভিযুক্ত হতে হবে না—

চলো গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে,
সুখদুঃখ লয়ে সবে গাঁথিছে আলয়—
হাসি-কান্না ভাগ করি ধরি হাতে হাতে
সংসার-সংশয়রাত্রি রহিব নির্ভয়।

—মরীচিকা

কড়ি ও কোমলকেই রবীন্দ্রনাথ তাই তাঁর নিজস্ব প্রথম ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। অনিকেত বিষয়ী এখানে কোথাও নিজেকে আরোপ করে নি, বিষয়ের আশ্রয় লাভ করেছে। 'এই আমার প্রথম কবিতার বই যার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বহির্দৃষ্টিপ্রবণতা দেখা দিয়েছে', কবির এই উক্তি শ্লথকথন নয়, নিজের কবিতা বিষয়ে একটি সূত্র গেয়ে যাওয়ার উপলব্ধিতে আলোকিত। বিষয়ী এবং বিষয় রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতায় একাসনে বসেছে কড়ি ও কোমল থেকেই, এবং সেই কারণেই এই কাব্যকে তিনি কবিতা হিসেবে প্রথম অনুমোদন জ্ঞাপন করেছেন।

এ কথার অর্থ এই নয় যে মানসীতে বা মানসীর পরে তিনি যা যা লিখেছেন সবই বিষয়ের সঙ্গে হৃদয়ের অন্যোন্য সামঞ্জস্যে, মগ্ন আত্মস্থতায় প্রতিষ্ঠিত। শুধু বলব, অস্মিতার সেই স্বরাঘাত কোথাও নেই যা বিষয়ের থেকে বিশ্লিষ্ট বা বিবিক্ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। গীতাঞ্জলি পর্যন্ত, এমন-কি বলাকা পলাতকা পর্যন্ত এই বিষয়নিষ্ঠ হৃদয়ধর্ম প্রসারিত। এখানে আরেকটি সূত্রও লক্ষ করতে হবে। যে মুহূর্ত থেকে তিনি অবাধে তাঁর খসড়া আমাদের দেখতে দিলেন, তিনি যেন আমাদের ব'লেই দিলেন যে আমাদের চোখের উপর তিনি নিজেকে অতিক্রম ক'রে যাবেন বারবার; একবার তিনি সিন্ধুতরঙ্গে নামবেন পরক্ষণে তীরে ফিরে আসার জন্য, একবার সারারাত্রি হাহাকার করবেন অকস্মাৎ প্রাতঃস্বপনের জন্য। রোমান্টিক যন্ত্রণার্তি এতটুকু এড়িয়ে না গিয়েও তাকে মনঃপূত পরিণামের দিকে নিয়ে যাওয়া। এজন্য তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থের পরিপূরক, পরিণাম অব্যবহিত পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ। সন্ধ্যাসংগীত-প্রভাতসংগীত, কড়ি ও কোমল - মানসী, সোনার তরী - চিত্রা, খেয়া-গীতাঞ্জলি, শেষসপ্তক-বীথিকা, প্রান্তিক-সেঁজুতি, রোগশয্যায়-আরোগ্য

—কত উদাহরণ যোগ করব? এ ভাবে মিলিয়ে পড়লে রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাবের সামগ্রিক সূত্রটি আমাদের কাছে মূর্ত হয়ে ওঠে।

সোনার তরীর শেষ কবিতা নিরুদ্দেশ যাত্রার সঙ্গে চিত্রার অন্তিম কবিতা সিন্ধুপারে যুক্ত করে দেখলেই একটি আত্মসচেতন কবি-ব্যক্তিত্বের উপস্থিত চোখে পড়ে। দুটি কবিতার পটভূমি খুব কাছাকাছি। দুটিরই বিন্যাস ষাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তে, তফাৎ শুধু চলনে। যে নারীটি তাঁকে সমুদ্রযাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন তিনিই সিন্ধুপারে নিয়ে এলেন তাঁকে। একই নারী দুজনে, ইঙ্গিতভাষায় কথা বলেন, মন্ত্রচালিত কবিকে নিষ্ঠুর-ভাবে নিয়ে চলে যান এক রহস্যময় বিবাহসভায়, দুরূহতর পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে হেসে ওঠেন। ঐ বিবাহ তাঁকে তো কোথায় বিশ্রাম করতে দিল না, নিরন্তর আত্ম-উত্তরণের যজ্ঞকর্মে জাগিয়ে রাখল। একটি অপরিণাম মুছে পরিণামে, সেই পরিণাম মুছে ফেলে অপর পরিণামে ধাবিত হবার নামই রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য নিজে কখনও সেই কৃতিত্ব দাবি করেন নি, ঊর্ধ্বতন এক সত্তার কাছে হস্তান্তরিত করে এগিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু আমরা তো জানি সেই ঊর্ধ্বতন সত্তা— নারীই হোক আর জীবনদেবতাই হোক— নিজের সঙ্গে তাঁর নিজের সংগ্রাম থেকে উদ্ভূত। যে-রাত্রি তিনি নিজের হাতে সৃষ্টি করেছিলেন তাকে প্রভাতে পরিণত করেছেন তিনি নিজেই। কিন্তু সেই সকালের প্রাক্-মুহূর্তের অস্থির প্রত্যূষক্ষণটিকে ভুলে গেলে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করা হবে।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

শ্যামদেশ প্রথম দর্শনের পরে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে স্মরণ করিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন—

ভগবান বুদ্ধ সেথা সমাসীন
চিরদিন—
মৌন যাঁর শান্তি অন্তহারা,
বাণী যাঁর সকরুণ সান্ত্বনার ধারা।

এ কবিতা লেখা ১৯২৭ সালে। ঐ বৎসরেই বোরোবুদুরের পাষাণস্তূপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটি কথাই কেবল ঘুরিয়া ফিরিয়া কবির মনকে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে প্রণতি-আগ্রহে দোলা দিতেছিল, 'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।—

পাষাণের মৌনতটে যে বাণী রয়েছে চিরস্থির—
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র 'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।

ঐ একটি কবিতার মধ্যে ঐ একটি কথা 'বুদ্ধের শরণ লইলাম' যে-ভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া একটি ধ্রুবপদের মত দেখা দিয়াছে তাহাতেই বোঝা যায়, কথাটি যেন রবীন্দ্রনাথের সমগ্র দেহমনের একটি ব্যাকুল প্রণতি হইয়াই কাঁহারও চরণে অর্পিত হইতে চাহিতেছে। কাঁহার চরণে? বুদ্ধের চরণে। সে বুদ্ধ কে? রবীন্দ্রনাথের ধ্যানমননে এই বুদ্ধের একটি বিশেষ রূপ আছে। মানুষের মধ্যে যাহা কিছু শ্রেয়, যাহা কিছু মহিমান্বিত তাহার সবই একদিন মানুষের পরম বিস্ময়াবহরূপে বিষয়ীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল একটি মানবীয় আবির্ভাবের মধ্যে— সেই মানবীয় পরম আবির্ভাবের মধ্যেই নিহিত বুদ্ধদেবের সত্য।

বুদ্ধদেবের প্রতি কবিহৃদয়ের এই যে শ্রদ্ধা-প্রণতি তাহা কবির শেষ জীবনের দিকে বিশেষ বিশেষ বৌদ্ধধর্মের দেশে বিশেষ বিশেষ বুদ্ধস্মারকচিহ্নের সম্মুখে দাঁড়াইয়াই জাগিয়া উঠিয়াছিল এমন নহে। অনেক পূর্বের লেখা কবির 'কথা ও কাহিনী'; তাহার মধ্যে বুদ্ধের প্রসঙ্গ কোনো একটি গল্পাকারে আসিয়াছে; সে সব গল্পের ব্যঞ্জনা করুণাঘন বুদ্ধের স্নিগ্ধ মহিমা-খ্যাপনই। শ্রীমতী নামে যে দাসীটি 'আমি বুদ্ধের দাসী' বলিয়া তাহার জীবনের দীপ লইয়া এক 'শারদ স্বচ্ছ নিশীথে প্রাসাদ-কাননে নীরবে নিভৃতে স্তূপপদমূলে' শেষ-আরতির শিখা জ্বালিয়া দিয়াছিল, সে আমাদিগকেও নীরবে নিভৃতে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া কেবলই ভাবায়— নিখিল মানবের জন্য কি অকথিত মহিমা জাগিয়া উঠিয়াছিল বুদ্ধের

আনন্দময় মূর্তিতে, কি অমোঘ আকর্ষণে তাহা ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল সর্বস্তরের মানুষের মন, যে আকর্ষণ রাজদণ্ডের শাণিত তরবারিকে অবলীলায় তুচ্ছ করিয়া শ্রীমতীনামক একটি দাসীকে একাকী নিশীথে স্তূপপদমূলে আরতির শিখা জ্বালাইয়া দিতে প্রেরণা দিয়াছিল। 'নটীর পূজা'য় বুদ্ধের চরণে জীবনারতির এই জীবনপণ ব্যাকুলতারই সংগীতনৃত্যময় বিস্তার। ঐ শ্রীমতী নামে দাসীর আরতি আর 'নটীর পূজা'র মধ্যে কবি একদিন আপনার প্রশান্ত ধ্যানের ভিতরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন বুদ্ধদেবের প্রতি প্রণতি-জ্ঞাপনের জন্য নিখিল মানব-চিত্তের ঠিক সেই আর্তি, যে আর্তি তিনি একবার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বুদ্ধগয়ায় বসিয়া।

"দেখলুম, দূর জাপান থেকে সমুদ্র পার হয়ে একজন দরিদ্র মৎস্যজীবী এসেছে কোনো দুষ্কৃতির অনুশোচনা করতে। সায়াহ্ন উত্তীর্ণ হল নির্জন নিঃশব্দ মধ্যরাত্রিতে, সে একাগ্রমনে করজোড়ে আবৃত্তি করতে লাগল: আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম। কত শত শতাব্দী হয়ে গেছে, একদা শাক্যরাজপুত্র গভীর রাত্রে মানুষের দুঃখ দূর করবার সাধনায় রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে বেরিয়েছিলেন; আর সেদিনকার সেই মধ্যরাত্রে জাপান থেকে এল তীর্থযাত্রী গভীর দুঃখে তাঁরই শরণ কামনা করে। সেদিন তিনি ঐ পাপপরিতপ্তের কাছে পৃথিবীর সকল প্রত্যক্ষ বস্তুর চেয়ে প্রত্যক্ষতম, অন্তরতম; তাঁর জন্মদিন ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে ঐ মুক্তিকামীর জীবনের মধ্যে। সেদিন সে আপন মনুষ্যত্বের গভীরতম আকাঙ্ক্ষার দীপ্তশিখায় সম্মুখে দেখতে পেয়েছে তাঁকে যিনি নরোত্তম।"[১] অভিসার কবিতায় সন্ন্যাসী উপগুপ্তের যে

> নবীন গৌরকান্তি,
> সৌম্য সহাস তরুণ বয়ান
> করুণাকিরণে বিকচ নয়ান,
> শুভ্র ললাটে ইন্দু-সমান
> ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি।—

বুঝিয়া লইতে কিছুই কষ্ট হয় না যে, ইহা নক্ষত্রের উপরে সূর্যের প্রতিভাসের মতন বৌদ্ধ ভিক্ষুর উপরে বুদ্ধদেবেরই ভুবনপাবন কান্তির বিচ্ছুরণ। সব মানুষকে মানুষের অধিকার দিয়া চণ্ডালকন্যার মধ্যেও প্রেমে দুর্লভ মহিমার উদ্বোধন করিয়া দিয়াছেন 'চণ্ডালিকা' নাটিকার যে বৌদ্ধভিক্ষুটি, তিনি সেই অমিতাভ বুদ্ধেরই একটি স্নিগ্ধ রশ্মিকণা যিনি অতন্দ্রভাবে 'অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে মৈত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত' করিয়া তুলিতে বলিয়াছেন। 'কথা ও কাহিনী'র মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে বুদ্ধের যে বর্ণনা রহিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলেও দেখিতে পাই, কবিমনে বুদ্ধদেবের প্রতি শুধু একটা শ্রদ্ধা নয়, একটা গভীর মমতা সঞ্চিত রহিয়াছে। নিজের চিত্তে সঞ্চিত সেই মমতা দিয়াই কবি গড়িয়া তুলিয়াছেন বুদ্ধদেবের সেই মূর্তি, যে মূর্তি—

---

১ বুদ্ধদেব, পৃ. ২

বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে,
নিরঞ্জন আনন্দ-মুরতি।
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে, স্ফুরিছে অধর পরে—
করুণার সুধাহাস্য-জ্যোতি!

অথবা—

নির্বাক সে-সভাঘরে ব্যথিত নগরী পরে
বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
সন্ধ্যাতারাসম রহে ফুটি।

রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে ভগবান্ বলিয়া সম্বোধন করিতে এবং গ্রহণ করিতে আগ্রহান্বিত ছিলেন মুখ্যভাবে এইজন্য যে বুদ্ধদেব ছিলেন নরোত্তম। নরোত্তমত্বেই যে বুদ্ধদেবের ভগবত্তা এ দিকে কবির ঝোঁক প্রথম হইতেই, কারণ এ ঝোঁক তাঁহার সহজাত। বুদ্ধদেবের মধ্যে যে নরোত্তমত্বের প্রকাশ তাহা একটা ঐতিহাসিক আকস্মিকতা নয়; এ প্রকাশ দীর্ঘকালের বিবর্তনের ধারায়। পূর্বেই আভাস দিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের নিকটে বুদ্ধদেব একটি বিশেষ কালের রক্তমাংসের ঐতিহাসিক মানুষ মাত্র নহেন, তিনি একটি মানবীয় পরম সত্যের বিষয়ীকৃত রূপ। বহুদিনের বিবর্তনধারার ভিতর দিয়াই শাক্যসিংহ বুদ্ধের ভিতরে যে এই মানবীয় পরম সত্য বিষয়ীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল এ কথার ইঙ্গিত লাভ করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ জাতকের গল্পগুলির ভিতর হইতে। জাতক গল্পগুলির ভিতরে দেখিতে পাই, শাক্যসিংহরূপে জন্মগ্রহণের পূর্বে মনুষ্যসমাজের বিভিন্ন স্তরে তিনি বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, বণিক হইয়াছেন, আবার কৃষিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কৃষিকর্মের দ্বারাও জীবিকানির্বাহ করিয়াছেন। শুধু কি মনুষ্যযোনিতে জন্মজন্মান্তর? বুদ্ধ পশু পাখি সরীসৃপ—এই-সব তির্যক্ যোনিতেও অসংখ্যবার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। জীবনের নিম্নতর স্তরগুলিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি কি করিয়াছেন? তিনি নানা প্রতিবন্ধকতার ভিতর দিয়া কোনো-না-কোনো একটি শীলের অনুশীলন করিয়াছেন। শীল কাহাকে বলে? শীল হইল চারিত্রিক গুণ। গুণ কাহাকে বলিব? গুণ কথাটিকে আমাদিগকে মনুষ্যজীবনের পটভূমিকাতে বুঝিতে হইবে; কারণ গুণের ধারণার পশ্চাতে থাকে কোনো একটি পরম মূল্যবোধ বা শ্রেয়োবোধ; সেই পরম মূল্যবোধ বা শ্রেয়োবোধ শুধু মনুষ্যচেতনাতেই সম্ভব হইতে পারে। আমাদের এই মনুষ্যচেতনার মধ্যে যে পরম মূল্যবোধ বা শ্রেয়োবোধ যে আচরণ বা কর্ম এই শ্রেয়োবোধের এবং শ্রেয়োলাভের অনুকূল তাহাই হইল গুণ; যে প্রবৃত্তি ও কর্ম আমাদিগকে চরম শ্রেয়ের দিকে আগাইয়া দেয় তাহাই হইল শীল। বিচিত্র জীবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া বুদ্ধ সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরে বসিয়াই এই শীলের অনুশীলন করিয়াছেন, অর্থাৎ সর্বপ্রাণীর জীবনযাত্রার ভিতর দিয়া পরম শ্রেয়ের সত্যকে বিকশিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"জাতককাহিনীর মধ্যে খুব একটা মস্ত কথা আছে ; তাতে বলেছে, যুগ-যুগ ধ'রে বুদ্ধ সর্বসাধারণের মধ্য দিয়েই ক্রমশ প্রকাশিত। প্রাণীজগতে নিত্যকাল ভালো-মন্দ'র যে দ্বন্দ্ব চলেছে সেই দ্বন্দ্বের প্রবাহ ধ'রেই ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বুদ্ধের মধ্যে অভিব্যক্ত। অতি সামান্য জন্তুর ভিতরেও অতি সামান্য রূপেই এই ভালোর শক্তি মন্দ'র ভিতর দিয়ে নিজেকে ফুটিয়ে তুলছে ; তার চরম বিকাশ হচ্ছে অপরিমেয় মৈত্রীর শক্তিতে আত্মত্যাগ। জীবে জীবে লোকে লোকে সেই অসীম মৈত্রী অল্প অল্প করে নানা দিক থেকে আপন গ্রন্থি মোচন করছে, সেই দিকেই মোক্ষের গতি।"[১]

দেখা যাইতেছে, আত্মকেন্দ্রিকতার শত বন্ধন হইতে প্রাণিসমূহের যে মোক্ষের দিকে বা মুক্তির দিকে গতি সেই গতিই হইল বুদ্ধত্বের দিকে গতি। এই বুদ্ধত্ব কোনো একটি পূর্ব হইতেই হওয়া জিনিস নয়—প্রাণিসমূহের অনন্তকালে বিচিত্র জীবনপ্রবাহের ভিতর দিয়া এই বুদ্ধত্ব নিরন্তর হইয়া উঠিতেছে। কপিলাবস্তুতে আড়াই হাজার বৎসরাধিক কালের পূর্বে জাত একটি বিষয়ত্যাগী রাজপুত্রের শান্ত-সমাহিত মূর্তির মধ্যে মানুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছে নিখিলজীবনে নিত্যজায়মান সেই বুদ্ধত্বের একটি পরম প্রকাশ। প্রাণিজীবনের বহু ভালো-মন্দের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভিতর দিয়া মুক্তির বার্তা লইয়া আবর্তিত হইতে হইয়াছে এই বুদ্ধত্বকে ; বহুদিনের সেই আবর্তনের ইতিহাসই কৌতূহলোদ্দীপক ভাবে লিখিত হইয়াছে বৌদ্ধজাতক গল্পগুলির ভিতর দিয়া। এই বৌদ্ধজাতক গল্পগুলির উদ্ভবের মূল প্রেরণা কোথায় রবীন্দ্রনাথ শৈশবের একটি স্মৃতির দৃষ্টান্তে তাহার চমৎকার আভাস দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"মনে আছে, ছেলেবেলায় দেখেছিলুম, দড়িতে বাঁধা ধোপার বাড়ির গাধার কাছে এসে একটি গাভী স্নিগ্ধ চক্ষে তার গা চেটে দিচ্ছে ; দেখে আমার বড় বিস্ময় লেগেছিল। বুদ্ধই যে তাঁর কোনো-এক জন্মে সেই গাভী হতে পারেন, এ কথা বলতে জাতককথা-লেখকের একটুও বাধত না। কেননা, গাভীর এই স্নেহেরই শেষ গিয়ে পৌঁছেছে মুক্তির মধ্যে।"[২]

এইখানেই জাতক-গল্পগুলির উদ্ভবের ইঙ্গিত। রবীন্দ্রনাথ সামনে দেখিতে পাইলেন একটি ঘটনা— যেটা চমৎকার একটি গল্প— একটি স্নেহশীলা গাভী স্নিগ্ধ চক্ষে একটি ধোপার গাধার গা চাটিয়া দিতেছে ; আর রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে ছিল সমগ্র প্রাণিজগতের ভিতর দিয়া করুণাঘন বুদ্ধত্বের বিকাশের আদর্শ ; রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে তখনই জাগিয়া উঠিল যে একটি প্রেরণা সেই প্রেরণাটিই আসলে সকল জাতক-গল্পের প্রেরণা। যাঁহারা জাতকের গল্পকার তাঁহারা হয়তো বা অনেকগুলি গল্পের ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, অনেকগুলি হয়তো বা তাঁহারাও গল্প হিসাবেই পাইয়াছেন। তাঁহাদের মনে ছিল এই বিশ্বাস, যিনি মানব-মুক্তির জন্য কল্যাণঘন আনন্দঘন করুণাঘন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে একদিন পরিপূর্ণ

১ বুদ্ধদেব, পৃ. ৬২

২ ঐ, পৃ ৬২-৬৩

বুদ্ধরূপে বিকশিত হইলেন, তিনি তৎপূর্বে অসংখ্য জন্মজন্মান্তর ধরিয়া বোধিসত্ত্বরূপে সাধনা করিয়াছেন। বোধিসত্ত্ব-রূপই হইল প্রাণি-পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া কোনো-না-কোনো একটি শীলের বা মহৎ প্রবৃত্তির অনুশীলনের সাধকরূপ। আমরা পরে দেখিব, এই মহৎ প্রবৃত্তিসমূহের ভিতরে মহত্তম হইল বিশ্বমৈত্রী, বিশ্বকরুণা। বোধিসত্ত্ব যে-কোনো পশুরূপে পাখিরূপে বা মানুষরূপে যে শীলেরই অনুশীলন করুন-না কেন তাহার ভিতর প্রত্যক্ষে হোক বা পরোক্ষে হোক সর্বপ্রাণীর কল্যাণচিন্তার এবং কল্যাণকর্মের একটি আকুতি প্রকাশ পাইয়াছে। এই বিশ্বাসে এবং বোধে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া জাতককারগণ কেহ যেদিন দেখিলেন বা শুনিলেন যে প্রবল পরাক্রান্ত পশুরাজ সিংহ মাংস খাইতে গিয়া গলায় হাড় বিঁধাইয়া অসহায়ভাবে কষ্ট পাইতেছিল এবং তাহার সেই কষ্ট দূর করিবার জন্য গাছের নগণ্য একটি কাঠঠোকরা পাখি নিজের প্রাণ হারাইবার বিপদকে তুচ্ছ করিয়া আগাইয়া আসিয়াছে, এবং সকল বিপদের সম্ভাবনা জানা সত্ত্বেও সিংহের মুখের 'হাঁ'-এর মধ্যে নিজের ঠোঁট ঢুকাইয়া দিয়া হাড় তুলিয়া ফেলিয়া সিংহের সকল যন্ত্রণার লাঘব করিয়া দিয়াছে— তখন তিনি ভিতরে ভিতরে এই কথা বলিবারই প্রেরণা অনুভব করিলেন যে বুদ্ধই তাঁহার পূর্ব পূর্ব জন্মের কোনো একদিন বোধিসত্ত্বরূপে এই বনের কাঠঠোকরার ভিতর দিয়া এই কল্যাণচিন্তা ও কল্যাণকর্মের সাধক ছিলেন। কোনো গল্পকার লক্ষ্য করিয়াছেন, মহালোহিত নামে গৃহস্থঘরের একটি বলদ চুল্ললোহিত নামে তাহার সাথী অপর বলদটিকে নিজে খাটিয়া-পিটিয়া যাহা আহার্য লাভ করা যায় তাহাতেই সন্তোষ লাভ করিতে উপদেশ দিতেছে— অপরকে দেখিয়া আরও পাইবার লোভ করিতে বারণ করিতেছে, তখন জাতককারগণ অতি সহজেই বলিতে পারিয়াছেন, বুদ্ধদেবই একজন্মে গৃহস্থের ঐ মহালোহিত নামক বলদ ছিলেন; প্রাণি-স্তরের সেই বলদ-পর্যায়ে বসিয়াও চলিয়াছে তাঁহার এই স্বল্প-সন্তুষ্টির সাধনা। আবার জামগাছবাসী বানর এবং তাহার তলবাসী নদীর কুমীরকে লইয়া যে মজার গল্প তাহার মধ্য দিয়াও বানরের যেটুকু বুদ্ধির প্রকাশ ঘটিল সেইটুকু বুদ্ধিরূপে সেই বানরের মধ্যেও গল্পকারগণ বুদ্ধদেবের কোনো বোধিসত্ত্বরূপের ঈষৎ বিকাশই লক্ষ্য করিলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বুদ্ধদেব যে একদিন আকস্মিকভাবেই বুদ্ধরূপে জন্মগ্রহণ করেন নাই— তাঁহার পরিপূর্ণ আবির্ভাবের পূর্বে ছিল তাঁহার জন্ম-জন্মান্তরের নিরন্তর সাধনা এই বিশ্বাস-সংস্কার জাতকগল্পকারগণের মধ্যেই জাগ্রৎ ছিল। বুদ্ধত্বলাভের এই নিরন্তর সাধনার আদর্শ রবীন্দ্রনাথের কবিমনে আরও ব্যাপক এবং গভীর দ্যোতনার সৃষ্টি করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মনে এক দিকে এই বিশ্বাস ছিল যে বুদ্ধদেবের বোধির মধ্যে মৈত্রীভাবনার যে দিকটি রহিয়াছে উহাই হইল মানবতার মুক্তির দিক। অপর দিকে তাঁহার বিশ্বাস ছিল, মানবতার এই যে একটি পরিপূর্ণতার আদর্শ— ইহা কোনোদিনই একটি স্থিতিশীল আদর্শ নয়— একটি নিরন্তর জায়মান আদর্শ— তাই একটি গতিশীল আদর্শ। রবীন্দ্রনাথের কবি-অনুভূতির গভীরে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইব, মানবতার এই

পরিপূর্ণতার বিবর্তনপরিধি শুধু মানবজীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, প্রাণবিবর্তনের নিখিল স্রোতের মধ্যেই এই বিবর্তন নিজেকে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে। জড়ের সকল বাধা-বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া যেদিন দেখা দিল প্রাণ ও তাহার প্রবাহ সেইদিনই প্রাণ তাহার গতি-নির্দেশের ইঙ্গিত রাখিল মুক্তির দিকে। মুক্তির পথ হইল বিকাশের পথ; প্রাণের বিকাশ দেখা দিল চেতনায়। এই চেতনার ভিতর দিয়া তখন আবার চলিল মুক্তির সাধনা। চেতনার মুক্তি হইল চেতনাকে 'অপরিমিত চেতনায়' দৃঢ়ভাবে অতন্দ্রভাবে ধারণ করা। এই অনন্ত চেতনা কোনও নেতিমূলক অবস্থা নয়; অনন্ত শুধু অন্তের অভাবত্বেরই সূচনা করে না; অনন্ত হইল পরিপূর্ণতার ভিতরেই সর্ববিধ সান্তরহিতত্ব। এই অনন্তচেতনাকেই বৌদ্ধগণ বলিয়াছেন অপরিমিত মানস। প্রথমে চাই এই অপরিমিত মানসের জাগরণ; সেই অপরিমিতমানসে যে পরিপূর্ণতার কথা বলিলাম— তাহাই হইল মানুষের প্রেম। সেই প্রেমই প্রাণযাত্রার পরম মুক্তি। রবীন্দ্রনাথ এই প্রেমকেই মিলাইয়া লইয়াছেন বুদ্ধদেবের করুণা ও মৈত্রীভাবনার সঙ্গে। এই করুণা ও মৈত্রীভাবনার দ্বারা বুদ্ধদেবের মধ্যে অপরিমিত মানসের পরিপূর্ণ রূপ। রবীন্দ্রনাথের চিন্তধারার সহিত একান্ত সংগতি রাখিয়া বলিতে হইলে বলিতে হয়, যাহার যাহার ভিতর দিয়া মানুষের মহত্ত্বার প্রকাশ সেই সকল উপাদানের সমাবেশেই বুদ্ধদেব একদিন আমাদের ভিতরে মূর্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু মানুষের ভিতরকার অনন্ত মহত্ত্বার প্রকাশযাত্রা যে ইতিহাসের কোনো কালে কোনো ব্যক্তিবিশেষের আবির্ভাবের মধ্যে আসিয়া থামিয়া গিয়াছে তাহা বলা যায় না— এ যাত্রা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নিত্যকাল চলিতে থাকিবে।

জাতকের গল্প অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তার কথা ছাড়িয়া দিতেছি। একজন ঐতিহাসিক মানবরূপে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে যে ভাবে দেখিয়াছিলেন তাহাতেও লক্ষ্য করিতে পারি, বুদ্ধদেবকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার চিত্তে যে একটা গভীর শ্রদ্ধা তাহার কারণ, রবীন্দ্রনাথ মনে করিতেন যে বুদ্ধদেব তাঁহার জীবন ও বাণী দ্বারা সত্যসত্যই আমাদের মধ্যে একটা মুক্তির বাণী লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের এই মুক্তি শূন্যতাকে অবলম্বন করিয়া কোনো নেতিমূলক নিঃসীম আত্মবিলোপের মুক্তি, রবীন্দ্রনাথ এ কথা কখনোই স্বীকার করেন নাই। এই মুক্তির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে বুঝিয়াছেন চিত্তের জাগরণের কথা— জাগরণ হইল মানুষের অন্য সর্বভাবের মুক্তির কেন্দ্রস্থলে। এ কথা আজ আমাদের কাহারও অজানা নাই যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমাদের জাতীয় জীবনে ব্যাপকভাবে যে মুক্তি-আন্দোলনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহার সহিত নিজেকে অনেকটা যুক্ত করিয়া তাহার পরে একটু দূরে সরিয়া গেলেন। কেন তিনি নিজেকে দূরে সরাইয়া লইয়াছিলেন তাহার কথা নানা প্রসঙ্গে তিনি নিজেই পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। জাতীয় জীবনের মুক্তির কথা মনে করিতে তিনি জাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তির কথাই মনে করিয়াছেন, কেবলমাত্র কোনো রাজশক্তির বন্ধন হইতে মুক্তি নয়। কবি মনে করিতেন, জাতীয়

জীবনের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি কখনোই সম্ভব হয় না, যদি-না জাতির চিত্তজাগরণের ভিতর দিয়া জাতির চিত্ত-মুক্তি সম্ভব হইয়া না ওঠে। রবীন্দ্রনাথ এই কথা মনে করিতেন যে বুদ্ধদেব আসিয়া আমাদিগকে একদিন মুখ্যভাবে ধর্মের ক্ষেত্রেই আহ্বান জানাইয়াছিলেন; কিন্তু সেই আহ্বানের মধ্যে আশ্চর্যভাবে আমাদের চিত্ত-জাগরণের একটা ব্যাপক আহ্বান ছিল; ফলে সমস্ত জাতির মধ্যে সত্যসত্যই একটা ব্যাপক জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। কবির মতে এইজন্যই বৌদ্ধ যুগ আমাদের জাতির পক্ষে পার্থিব সমৃদ্ধিরও একটি স্বর্ণযুগ। একস্থানে রবীন্দ্রনাথ কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"বৌদ্ধধর্ম বিষয়াসক্তির ধর্ম নহে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্তী যুগে সেই বৌদ্ধসভ্যতার প্রভাবে এ দেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যশক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনো কালে হয় নাই।

"তাহার কারণ এই, মানুষের আত্মা যখন জড়ত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখনই আনন্দে তাহার সকল শক্তিই পূর্ণ বিকাশের দিকে উদ্যম লাভ করে।"[১]

একদিন গান্ধীজী-প্রচারিত স্বরাজের আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধায় গ্রহণ করিতে না পারিয়া প্রত্যক্ষে ভারতের মুক্তির আদর্শ লইয়া বিতর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেদিনও তিনি জাতীয় মুক্তির আদর্শ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের যে সর্বতোভাবে মুক্তির আহ্বান তাহারই উল্লেখ করিয়াছিলেন। গান্ধীজীর মুক্তি-আহ্বানের সংকীর্ণতার উল্লেখ করিয়া কবি তখন বলিয়াছিলেন—

"তখন বড়ো আনন্দে এই কথা আমার মনে হয়েছিল যে, এইবার এই উদ্‌বোধনের দরবারে আমাদের সকলেরই ডাক পড়বে, ভারতবাসীর চিত্তে শক্তির যে বিচিত্র রূপ প্রচ্ছন্ন আছে সমস্তই প্রকাশিত হবে। কারণ, আমি একেই আমার দেশের মুক্তি বলি—প্রকাশই হচ্ছে মুক্তি। ভারতবর্ষে একদিন বুদ্ধদেব সর্বভূতের প্রতি মৈত্রীমন্ত্র নিজের সত্যসাধনার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন; তার ফল হয়েছিল এই যে, সেই সত্যের প্রেরণায় ভারতের মনুষ্যত্ব শিল্পকলায় বিজ্ঞানে ঐশ্বর্যে পরিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রশাসনের দিক থেকে সেদিনও ভারত বারে বারে এক হবার ক্ষণিক প্রয়াসের পর বারে বারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু তার চিত্ত সুপ্তি থেকে, অপ্রকাশ থেকে মুক্তিলাভ করেছিল। এই মুক্তির জোর এত যে, সে আপনাকে দেশের কোনো ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ করে রাখতে পারে নি, সমুদ্রমরুপারেও যে-দূরদেশকে সে স্পর্শ করেছে তারই চিত্তের ঐশ্বর্যকে উদ্‌ঘাটন করেছে।[২]

ইতিহাসের দিকে তাকাইলে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিকে গভীরার্থক বলিয়া মনে হয়। এই বৌদ্ধধর্মকে অবলম্বন করিয়াই ভারতবর্ষের উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে ব্যাপক প্রসার।

১ বুদ্ধদেব, পৃ. ৫৬

২ সত্যের আহ্বান, কালান্তর

এই প্রসারের পশ্চাতে কোনো বিজয়ের মনোবৃত্তি ছিল না, ধর্মবিজয়ের মনোবৃত্তিও নয়। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যে বাণীটির উপরে বিশেষভাবে জোর দেখা গেল তাহা কোনো জাতি-বিশেষের জন্য লব্ধ বাণী নয়, তাহা নিখিল মানবের জন্য লব্ধ বাণী; এইজন্য এই বাণীকে দেশে বিদেশে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য ভারতবর্ষ যেন নিজের ভিতর হইতেই একটা দায় অনুভব করিতেছিল। আবার বিদেশ হইতে যাঁহারা এ দেশে আসিয়া পরিব্রাজকরূপে পৌঁছিতেছিলেন তাঁহারাও দেখিতে পাইলেন, বুদ্ধের বাণীর মধ্যে সত্যের যে আহ্বান সে আহ্বান তাঁহাদের সকলের জন্যই, তাঁহারা তাই সেই আহ্বানে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন, সেই বাণীকে মাথায় বহন করিয়া তাঁহারা নিজের নিজের দেশে রওনা হইয়া গেলেন।

বুদ্ধদেবের বাণীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই একটি প্রকাণ্ড বলিষ্ঠতা লক্ষ্য করিলেন যে এখানে মানুষের সহজাতদুর্বলতা-জনিত যে-সকল বিশ্বাস ও সংস্কার তাহাদের কাছে কোনো আবেদন নাই; মনুষ্যলোকের অতিরিক্ত দেবলোক বা স্বর্গলোকের প্রতি প্রলোভন নাই; আছে বাস্তবদৃষ্টি, আছে যুক্তিনিষ্ঠা, আছে ইহলোকের নিখিল মানবকে অবলম্বন করিয়া অপরিসীম মঙ্গলকামনা। কবি বলিয়াছেন—

"ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড়ো করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগযজ্ঞের অবলম্বন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছিলেন, দেবতাকে মানুষের লক্ষ হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। দয়া এবং কল্যাণ তিনি স্বর্গ হইতে প্রার্থনা করেন নাই, মানুষের অন্তর হইতে তাহা তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন।

"এমনি করিয়া শ্রদ্ধার দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, মানুষের অন্তরের জ্ঞান শক্তি ও উদ্যমকে তিনি মহীয়ান করিয়া তুলিলেন। মানুষ যে দীন দৈবাধীন হীন পদার্থ নহে, তাহা তিনি ঘোষণা করিলেন।"[১]

এই যে মানুষকে তাহার আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হইয়া সেই শক্তিতে জাগ্রৎ হইবার আহ্বান— রবীন্দ্রনাথ মনে করিয়াছেন, ইহাই হইল যথার্থ মুক্তির আহ্বান। এই জাতীয় মুক্তির আহ্বানই সে যুগে ভারতবর্ষকে শুধু ধর্মে দর্শনে নহে— শিল্পে বাণিজ্যে, ঐশ্বর্যে সম্পদে, সাহিত্যে চিত্রে ভাস্কর্যে নূতন প্রেরণা দিয়াছিল, দেশ সর্ব দিক হইতেই জাগিয়া উঠিয়া আত্মবিস্তারের আত্মবিকাশের চেষ্টা করিয়াছিল।

বুদ্ধদেবের অহিংসার আদর্শও রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল। অহিংসা প্রেমেরই ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ। বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্য দেখা যায়, ব্যাবহারিক সব ক্ষেত্রে কবি অহিংসা-প্রয়োগের নীতিকে স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই; মহাত্মা গান্ধীর অহিংসানীতির সমর্থক হইয়াও সর্বত্র অহিংসার প্রয়োগবিষয়ে গান্ধীজীর সহিত কবির যথেষ্ট মতবিরোধও লক্ষ্য করিতে পারি। বিশেষ করিয়া সমষ্টিগতভাবে অহিংসানীতিকে

---

১ বুদ্ধদেব, পৃ. ৪৮

একটি অস্ত্ররূপে প্রয়োগের বিষয়ে তিনি সংশয়ী ছিলেন— এবং এইজন্য তিনি বিরোধীও ছিলেন। কিন্তু সাধারণভাবে দেখিতে পাই, বুদ্ধদেবের 'অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে', এই উপদেশটি রবীন্দ্রনাথের চিত্তে একটি গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া বহুভাবে এই বাণীটি কবির নিজের বাণীর মধ্যে দেখা দিয়াছে। অক্রোধের দ্বারা যে ক্রোধকে জয় করিতে হইবে, সাধুতা দ্বারা যে অসাধুকে জয় করিতে হইবে এ কথাটি রবীন্দ্রনাথের কবি-মনকে এমন গভীরভাবে আলোড়িত করিয়াছিল কেন? পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি, বুদ্ধদেবের বাস্তববোধ এবং যুক্তিনিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের অসীম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল; অক্রোধের দ্বারা সর্বক্ষেত্রে ক্রোধকে জয় করিতে হইবে, সাধুতা দ্বারা অসাধুতার জয় করিতে হইবে, এই-সব কথার মধ্যে কোথায়ই বা রহিয়াছে বাস্তববোধ, আর কোথায়ই বা রহিয়াছে যুক্তিনিষ্ঠা?

রবীন্দ্রনাথ এই সত্যকে কেমন করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বুঝিতে হইলে আগে সত্যটিকেই একটু ভালো করিয়া বুঝিয়া লইতে হয়। যাঁহারা অক্রোধের দ্বারাই ক্রোধকে এবং সাধুতা দ্বারাই অসাধুতাকে জয় করিতে বলিয়াছেন, তাঁহারা কি বিশ্বাসে এই কথা বলিয়াছেন? বলিয়াছেন এই বিশ্বাসে যে, ক্রোধ মানুষের সত্যকার স্বরূপের পরিচয় নয়; ওটা বিশেষ হেতুপ্রত্যয়কে অবলম্বন করিয়া একটা আগন্তুক এবং সঞ্চরমান বৃত্তিমাত্র; মানুষের স্বরূপ বা আসল প্রকৃতির পরিচয় ঐ অক্রোধের পিছনে যে শান্ত সমাহিত অসীম সহানুভূতিপূর্ণ চিত্ত তাহার ভিতর দিয়াই। অসাধুতা মনুষ্যচরিত্রে ক্ষণিক উপচার মাত্র, সাধুতাই মানুষের স্বাভাবিক চরিত্র। যেটা আসল, শেষ পর্যন্ত তাহারই জয় হইবে; যেটা নকল সেটাকে আপাততঃ যত প্রবল করিয়াই দেখা যাক-না কেন, শেষ পর্যন্ত তাহার অপ্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী।

মানুষ স্বভাবতঃ ভালো, পাপ তাহার চরিত্রে ব্যাবহারিক কারণে আরোপিত কতকগুলি আগন্তুক ময়লা— রবীন্দ্রনাথের মনের গভীরে মানুষ সম্বন্ধে এই-জাতীয় একটি বিশ্বাস অতি সহজাতভাবে বাসা বাঁধিয়াছিল। এই সহজাত-প্রবণতার জন্যই মানবেতিহাসের সংকটময় সকল বীভৎসতা এবং কদর্যতার সম্মুখে দাঁড়াইয়াও কবি দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে পারিয়াছেন, 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।' এই সহজাত-প্রবণতাই রবীন্দ্রনাথকে বুদ্ধদেবের অহিংসার আদর্শকে গ্রহণ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। অহিংসার বাণী যাঁহারাই বলিয়াছেন তাঁহাদের সকল বাণী বিশ্লেষণ করিলেই আমরা গোড়াতে এই সত্যে গিয়া পৌঁছাইব যে তাহার স্বাভাবিক আসল সত্তায় মানুষ নিষ্কলুষ, এবং মানব-ইতিহাসের সকল জটিল-কুটিল আবর্তনের ভিতর দিয়া এখন পর্যন্তও এই সত্যই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে করিতেছে ও করিবে যে, মানুষের এই নিষ্কলুষ সত্তারই শেষ পর্যন্ত মহিমান্বিত প্রতিষ্ঠা।

২

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন যে, সমগ্র জীবনে তিনি যাহা-কিছু লিখিয়াছেন এবং করিয়াছেন তাহার ভিতর দিয়া তাঁহার যে মুখ্য পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইল তাঁহার কবি-পরিচয়। কবি-পরিচয়ের গূঢ় তাৎপর্য হইল স্রষ্ট্যাত্মকতা, সর্ব ক্ষেত্রেই কবি কিছু-না-কিছু সৃষ্টি করেন। বুদ্ধদেব এবং বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ যেখানে যত আলোচনা করিয়াছেন তাহার ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক, ধর্মতত্ত্ববিদ্ বা দার্শনিক নহেন, ইহার ভিতর দিয়াও তিনি কবি; তিনি বুদ্ধদেবকে এবং বৌদ্ধধর্মকে নিজের জ্ঞাতে এবং অজ্ঞাতে নিজের মতো করিয়া গড়িয়া লইয়াছেন। ইহার ফল ভালো এবং মন্দ দুই-ই হইয়াছে। ভালোর দিকে, এই গভীর কবিদৃষ্টির ফলে নিজের অনেক গূঢ়ানুভূতির সহিত রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের অনেক গূঢ়ানুভূতির মিল খুঁজিয়া পাইয়াছেন; ইহা রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধদেবের প্রতি প্রণতিময় শ্রদ্ধাকে আন্তরিক এবং প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার্ঘ্য ও উক্তির ভিতর দিয়া বুদ্ধদেব তাঁহার মহাকরুণার ধর্ম লইয়া আমাদের বিংশ শতকের নরনারীর মনে নূতন মহিমায় ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু দোষের দিকে আবার দেখিতে পাই, অনেকখানি নিজের মনের মতন করিয়া গড়িতে গিয়া স্থানে স্থানে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে এবং বৌদ্ধধর্মকে মূল বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম হইতে একটু দূরে সরাইয়া লইয়াছেন।

জানি, এখানে প্রথমেই অতি যৌক্তিক ভাবেই একটা প্রশ্ন উঠিবে যে, মূল বুদ্ধদেব এবং মূল বৌদ্ধধর্ম বলিতে আমরা কি বুঝি, বুদ্ধদেব এবং বৌদ্ধধর্মের মূল আমরা কোথায় খুঁজিয়া পাইলাম। আমরা মোটামুটিভাবে জানি, বুদ্ধদেবের তিরোধানের পরে বুদ্ধদেবের প্রিয় এবং প্রধান শিষ্যগণের নিকট হইতে বুদ্ধদেবের বাণী সংগৃহীত হইয়াছে, সেই সংগৃহীত বাণীই তিন ভাগে বিন্যস্ত হইয়া ত্রিপিটকের সৃষ্টি করিয়াছে। ত্রিপিটক আমরা পালি-ভাষাতে পাইতেছি। বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় তাঁহার উপদেশ দিয়াছেন, সকল দেশের সকল শিষ্যের নিকট একই ভাষায় উপদেশ দিয়াছেন কি না তাহা আমরা নিশ্চিত জানি না। বুদ্ধদেব এবং বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আমরা এখন অনেক বই সংস্কৃত ভাষাতেও পাইতেছি। পূর্বে অবশ্য একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে পালি বৌদ্ধধর্মই 'আদি এবং অকৃত্রিম' বৌদ্ধধর্ম; সংস্কৃতের বৌদ্ধধর্ম মুখ্যতঃ মহাযানিগণ কর্তৃক রচিত এবং পরবর্তী কালে ঈষৎ ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবে প্রভাবিত হইয়া লিখিত। কিন্তু এখন পণ্ডিতগণ তথ্য ও যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে আমাদের এই-জাতীয় ধারণারও কোনো ভিত্তি নাই; সংস্কৃতে লিখিত বৌদ্ধশাস্ত্রও বেশ প্রাচীন শাস্ত্র, এবং মহাযানের প্রধান প্রধান মতগুলি তথাকথিত হীনযানের মতের পাশাপাশিই প্রচলিত ছিল।

যেমন করিয়াই হোক, পালিতেই হোক আর সংস্কৃতেই হোক, অথবা তিব্বতী বা চীনা অনুবাদের ভিতর দিয়াই হোক, বুদ্ধবচনগুলি নাহয় পাইলাম; কিন্তু সেগুলির তাৎপর্য সম্বন্ধে ঐকমত্য কোথায়? প্রাচীনকাল হইতেই তো বুদ্ধভক্ত পণ্ডিতগণ নিজেদের নিজেদের

ধাতুপ্রকৃতি অনুসারে এই বচনগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ভাবেই তো হীনযান-মহাযানের প্রকাণ্ড ভেদরেখা দেখা দিল, সেই হীনযানের এবং মহাযানের মধ্যেও বিভিন্ন মত-উপমত লইয়া কত দল-উপদল গড়িয়া উঠিল। শুধু তাহাই নয়— একই মহাযান আবার দেশভেদে কালভেদে কত রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে; জাপানের মহাযান বৌদ্ধধর্ম এবং তিব্বতের মহাযান ধর্ম যে বেশ খানিকটা পৃথক্ তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। এই মহাযান বৌদ্ধধর্মকে অবলম্বন করিয়াই বাংলাদেশে বৌদ্ধ সহজিয়াগণের দোহা ও চর্যাগীতি গড়িয়া উঠিয়াছে; এই চর্যাগীতির মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্রীয় মহাযান বৌদ্ধধর্মের পার্থক্যও ধর্মমত ও ধর্মচর্যা উভয় দিক হইতে বেশ স্পষ্টভাবেই লক্ষণীয়। অতএব অতি স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন দেখা দিবে, এত মতবিরোধ, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ভিতরে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের আসল রূপ কোথায় পাইব; যাঁহার হৃদয়ে যে রূপ ধরা পড়িবে তাঁহার কাছে সেই রূপই আসল বলিয়া গৃহীত হইবে।

বৌদ্ধধর্ম, এমন-কি বুদ্ধদেবকে লইয়া যে স্তূপীকৃত বিতর্ক রহিয়াছে এ কথা অস্বীকার করিতে পারি না; তথাপি বলিতে ইচ্ছা হয়, বিভিন্ন প্রকারের বৌদ্ধ মতের সহিত আমাদের যেটুকু সামান্য পরিচয় রহিয়াছে তাহার ভিতর হইতে বৌদ্ধধর্মের মূলরূপ সম্বন্ধে একটা ধারণা আমরা করিয়া লইতে পারি।

ধর্মের ক্ষেত্রে অতি প্রাচীন কাল হইতেই দেখিতে পাই, ভারতীয় মনে এক দিকে অত্যন্ত একটা সহজ স্থিতিস্থাপকতাগুণ আছে, অন্য দিকে একটা আশ্চর্য শোষণশক্তি আছে— আর চিত্তের এই সহজ স্থিতিস্থাপকতাগুণ এবং শোষণশক্তির পরিচালকরূপে রহিয়াছে একটি 'এক' এবং অন্বয়ের বোধ। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন সমাজস্তর হইতে প্রাপ্ত ধর্মমত ও দিনচর্যার উপাদানগুলি যতই বিরোধিতা লইয়া আমাদের নিকটে দেখা দিক আমরা সেগুলিকে আমাদের অন্বয়বোধের মধ্যে সমন্বিত করিয়া লইয়াছি। উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে আমাদের পরিশীলিত ভারতীয় চিত্ত লইয়া আমরা যখনই বুদ্ধদেবকে ও বৌদ্ধধর্মকে গ্রহণ করিতে গিয়াছি তখনই আমাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে একটি প্রবণতা দেখা দিয়াছে, যেমন করিয়া হোক বৌদ্ধধর্মকে আমাদের ধর্মমতের সহিত সমন্বিত করিয়া লইতে; ঠিক হিন্দুধর্মের সহিত এক করিয়া লইতে যেখানে ইতস্ততঃ করিয়াছি সেখানে বলিয়াছি, বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় ধর্মেরই একটা রকমফের। বস্তুতঃ ভারতীয় ধর্মসমূহের মধ্যে যে সদাচার ও সংযমের কথা আমরা দেখিতে পাই, চিত্তস্থির করিবার উপরে যে অসাধারণ প্রাধান্যের আরোপ দেখিতে পাই, যে অহিংসা ও বিশ্বমৈত্রীর কথা দেখিতে পাই, বৌদ্ধধর্মের মধ্যেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই। বৌদ্ধযোগশাস্ত্রের অনেক পরিভাষার সহিত হিন্দুযোগশাস্ত্রের পরিভাষার লক্ষণীয় যোগ রহিয়াছে, ভারতীয় মননের একই উৎসমূল হইতে এগুলি গৃহীত।

ইহার কোনো কথাকে অস্বীকার না করিয়াই বলিতে পারি, অনেক কিছু মিল সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের (হিন্দুধর্ম বলিতে এখানে আমি ঔপনিষদ হিন্দুধর্মের কথাই

বলিতেছি) কতকগুলি মৌলিক পার্থক্যকে অস্বীকার করিতে পারি না। বুদ্ধের প্রাথমিক ধর্মদৃষ্টিই একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টি, ইহা জগতের ধর্ম-ইতিহাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমার বিশ্বাস, সেই মৌলিক পার্থক্যটুকু বিস্মৃত হইয়া বৌদ্ধধর্মকে যখন আমরা বুঝিতে যাই তখন ধর্মহিসাবে বৌদ্ধধর্মের যে একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে তাহা আমরা হারাইয়া ফেলি। আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উদার ব্যাপক মনের সহজাত সমন্বয়-প্রবণতার মধ্যে বৌদ্ধধর্মের এই বিশিষ্টতাকে বহু প্রসঙ্গে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। এই-জাতীয় প্রবণতা শুধু রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই দেখিতে পাই না ; ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থপাদ হইতে বাঙালী মনীষার মধ্যেই এই প্রবণতা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ঔপনিষদ ব্রহ্মবাদের উপরে হিন্দুধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিবার প্রবল আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্মও যে আসলে এই ব্রহ্মবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত তাহা প্রমাণ করিবার অত্যন্ত আগ্রহ দেখা দিল। এ বিষয়ে যাঁহারা আগ্রহশীল তাঁহাদের অনেকের মধ্যেই এই-জাতীয় একটা মত প্রবল হইয়া উঠিল যে বুদ্ধদেব যে অনাত্মাবাদী শূন্যতাবাদী, নেতিমার্গপন্থী এ-জাতীয় একটা মতের অপপ্রচারের জন্য মুখ্যতঃ দায়ী ইয়োরোপীয় পণ্ডিতবর্গ— যাঁহারা বুদ্ধদেবের উপদেশসমূহের ঠিক ঠিক সারমর্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া তাঁহার মতের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করিয়া আমাদের চিত্তে কতকগুলি অমূলক সংশয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। মোটামুটিভাবে ইঁহাদের সিদ্ধান্ত হইল যে বুদ্ধের যাহা শূন্যবাদ তাহাই হইল বেদান্তের বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদ, বুদ্ধের যাহা হইল নির্বাণ তাহা বেদান্তের নির্বিকল্প সমাধিরই সামিল। বুদ্ধ সব কথা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, কিন্তু তিনি আভাসে ইঙ্গিতে যে-সকল কথা বলিয়াছেন তাহাকে ব্যাখ্যা করিয়া লইলে ঐ এক কথাতেই গিয়া পৌঁছানো যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে আলোচনা করেন প্রথমে সম্ভবতঃ সাধু অঘোরনাথ তাঁহার 'শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব' বইখানিতে (প্রথম প্রকাশ ১৮০৫ শকাব্দ, অর্থাৎ ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দ)। সাধু অঘোরনাথ নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া বুদ্ধদেবের জীবন ও ধর্মতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন। নির্বাণতত্ত্ব পর্যালোচনা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, সর্বপ্রকারের বিকারশীল প্রপঞ্চ হইতে মুক্ত হইয়া নিত্য শান্তস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থানই হইল নির্বাণ লাভ। এই নিত্য শান্ত শুদ্ধসত্ত্বই হইল ব্রহ্ম-স্বরূপ। বুদ্ধজীবনী 'ললিতবিস্তর' হইতে নির্বাণপ্রাপ্ত বুদ্ধের একটি দীর্ঘ বর্ণনা উদ্‌ধৃত করিয়া এবং তাহার বঙ্গানুবাদ দিয়া লেখক বলিতেছেন—

"বুদ্ধদেবের এই উক্তিই নির্বাণের পরম তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দিতেছে। তিনি যে সগুণ নির্গুণের অতীত এবং নির্বিকার পুরুষে একাকার হইয়া পরম সমাধি ও সম্বোধি লাভ করিয়া শান্ত ও নিষ্কলঙ্ক হইয়াছিলেন, তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইল।"[১]

সাধু অঘোরনাথ নির্বাণতত্ত্বের আলোচনায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন—

১ চতুর্থ সং, পৃ. ১৫২

"তিনি (বুদ্ধদেব) আত্মা, পরলোক বা অপর কোনো ঈশ্বরপদবাচ্য সত্তা মানিতেন না। ললিতবিস্তরেই শাক্যমুনির জীবন, সাধনপ্রণালী ও মত পরিষ্কাররূপে বিবৃত হইয়াছে; তদনুসারে বিচার করিতে হইলে ইহাই সপ্রমাণ হয় যে তিনি প্রচলিত বিশ্বাসের অতীত হইয়া নূতনভাবে এই তিনটিই বিশ্বাস করিতেন।"[১]

সাধু অঘোরনাথ প্রসিদ্ধ বুদ্ধচরিত 'ললিতবিস্তর' গ্রন্থখানিকে অবলম্বন করিয়াই বুদ্ধদেবের জীবন ও সাধনাকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু বেশ বোঝা যায়, এই কাজের পিছনে তাঁহার যে প্রেরণা সেই প্রেরণার মধ্যেই একটি উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন ছিল। তখনকার দিনে এই কথাটিই শিক্ষিত বাঙালীগণকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইতেছিল যে ব্রাহ্মধর্ম কোনো নূতন ধর্ম নহে, হিন্দুধর্মকে তাহার সকল আগন্তুক কলুষ হইতে মুক্ত করিয়া বিশুদ্ধ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেই ব্রাহ্মধর্মকে পাওয়া যাইবে; সঙ্গে সঙ্গে এই কথা প্রচারেরও চেষ্টা দেখা দিয়াছিল যে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম হইতে একটি পৃথক্ ধর্ম নহে; বিশুদ্ধ ঔপনিষদ হিন্দুধর্মের সহিত চরম সিদ্ধান্তে এবং যথার্থ সাধনচর্যায় বৌদ্ধধর্মের কোনো মৌলিক তফাত ছিল না। সাধু অঘোরনাথের 'শাক্যমুনি-চরিত ও নির্বাণতত্ত্ব' গ্রন্থের মধ্যে এই উদ্দেশ্যটি স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার বিভিন্ন ভাষণে প্রসঙ্গক্রমে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ করিয়াছেন। আমেরিকায় প্রদত্ত তাঁহার একটি ভাষণে বলিয়াছেন যে, পাশ্চাত্যগণ বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মকে দুইটি পৃথক্ ধর্ম বলিয়া ভুল করেন; বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মেরই একটি সম্প্রদায়-বিশেষ। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, ভারতের অন্য ধর্মমতগুলির মতো বৌদ্ধধর্মও চরমে বেদান্তের উপরই গ্রথিত। তাঁহার মতে বেদান্তের মধ্যে অজ্ঞেয়বাদেরও (Agnosticism) স্থান রহিয়াছে; বুদ্ধদেব দার্শনিকতত্ত্ব বিষয়ে ছিলেন এই-জাতীয় একজন অজ্ঞেয়বাদী, তাঁহার ঝোঁক ছিল ব্যাবহারিক আচরণের দিকে।

বিংশ শতকের প্রথম দিক হইতে আর-একজন মনীষী প্রবাসী পত্রিকায় বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন, তিনি হইলেন মহেশচন্দ্র ঘোষ। বৌদ্ধশাস্ত্রের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল, সেই শাস্ত্র অবলম্বন করিয়াই তিনি তাঁহার প্রবন্ধসমূহে আলোচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ইঁহার বুদ্ধচর্চার সহিত পরিচিত ছিলেন, তাঁহার নিজের লেখায় তিনি মহেশচন্দ্র ঘোষের মতামতের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন। মহেশচন্দ্র ঘোষও পালিশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া বুদ্ধদেবের জীবন ও সাধনার পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই; আলোচনার শেষে তিনিও কিছু কিছু মন্তব্য করিয়াছেন, সে-সব মন্তব্যের দুই-একটি এখানে উদ্‌ধৃত করিলেই মোটামুটিভাবে এ-বিষয়ে তাঁহার মনোভাব স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। 'সম্যক্ সমাধি ও ব্রহ্মবিহারে'র কথা আলোচনা করিয়া তিনি বলিতেছেন—

১ পৃ. ১৪৭

"গোতমের আত্মবাদ ও অনাত্মবাদ আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, তিনি যাহা বিশ্বাস করিতেন তাহা (আমাদের ভাষায়) আত্মবাদই।"[১]

নির্বাণতত্ত্বের আলোচনা করিয়া উপসংহারে তিনি বলিতেছেন, "এই সমুদায় আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, নির্বাণ ও ব্রহ্ম এতদুভয়ের মধ্যে অতি আশ্চর্য সাদৃশ্য। এ সাদৃশ্য যে কেবল অপর বিষয়ে তাহা নহে; মৌলিক তত্ত্বেও সাদৃশ্য এবং একত্ব। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই নির্বাণ ও ব্রহ্ম একই।"

মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় 'বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা' সম্বন্ধে বই লিখিয়াছেন, সংক্ষেপে তাঁহার মতও হইল এই—

"এক কথায় শূন্য উপনিষদের 'নেতি নেতি' ব্রহ্ম।"…

"সার কথা এই, সবিশেষ দৃষ্টিতে দেখিলে যিনি পূর্ণ (plenum)—পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্,—নির্বিশেষ দৃষ্টিতে তিনি শূন্য, মহাশূন্য (vacuum)। সেইজন্য শ্রীশঙ্করাচার্যের নামে প্রচলিত 'সর্ব-বেদান্ত-সংগ্রহে' উক্ত হইয়াছে— যৎ শূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং চ যৎ। অতএব বেদান্তের নিগদিত যিনি ব্রহ্ম, বুদ্ধদেবের পরিভাষায় তিনিই শূন্য। শূন্য শব্দের দ্বারা ব্রহ্মই যখন বুদ্ধদেবের লক্ষ্য, তখন তাঁহার সম্বন্ধে 'নাস্তিক' শব্দের প্রয়োগ একেবারেই অযুক্ত।"[২]

বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত আলোচনা করিতে গিয়া যে আমরা ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে বাঙালী মনীষা বুদ্ধদেব এবং বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কি-দৃষ্টিতে আলোচনা করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম ইহা নিরর্থক নহে। আমরা লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিলাম যে হিন্দু ভারতীয় মনের, অথবা হিন্দু বলিতে যদি কাহারও কোনো আপত্তি থাকে তবে বলিব, ঔপনিষদ ভারতীয় মনের বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মকে গ্রহণ করিবার মধ্যে একটি বিশেষ প্রবণতা ছিল, তাহা হইল এই যে, নানাভাবে ব্যাখ্যা-বিচারের দ্বারা এই জিনিসটিই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা যে পরমতত্ত্বে ঔপনিষদ ধর্মের মধ্যে ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে মৌলিক কোনো তফাত নাই; পার্থক্য ধর্মমতের বিস্তৃতির মধ্যে এবং সাধনপন্থায় বিশেষ বিশেষ তত্ত্বের উপরে ঝোঁক দিবার মধ্যে। বুদ্ধদেব তাঁহার উপদেশে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনো কথা বলিতে চান নাই; কিন্তু যে শূন্যতার কথা বলিয়াছেন, যে ব্রহ্মবিহারের কথা বলিয়াছেন, যে নির্বাণের কথা বলিয়াছেন তাহাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে বুদ্ধদেব শূন্যতা দ্বারা পরব্রহ্মের পূর্ণতার কথাই বলিয়াছেন, নির্বাণের দ্বারা কায়বাক্‌চিত্তের অতীত আনন্দময় ব্রহ্মানুভূতির কথাই বলিয়াছেন। বুদ্ধদেব এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব থাকিতে চাহিলেও আমরা তাঁহাকে কিছুতেই নীরব থাকিতে দিই নাই; আমরা বলিয়াছি যে নীরবতাই সর্বাপেক্ষা গূঢ়ার্থব্যঞ্জক বাণী— সেই বাণীকেই ব্যাখ্যা করিয়া

১ বুদ্ধপ্রসঙ্গ, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, পৃ. ৩৭

২ বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা, পৃ. ১৩৬-৩৭

পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে কতকগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের আলোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথও এই প্রবণতারই পরিচয় দিয়াছেন। বুদ্ধ-উপদিষ্ট ব্রহ্মবিহারের কথা বলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"যারা বলে ধর্মনীতিই বৌদ্ধধর্মের চরম তারা ঠিক কথা বলে না। মঙ্গল একটা উপায় মাত্র। তবে নির্বাণই চরম? তা হতে পারে, কিন্তু সেই নির্বাণটি কী? সে কি শূন্যতা?"

রবীন্দ্রনাথ বলিবেন, সর্বশূন্যতার মধ্যে নির্বাপণ লাভ করা আসল নির্বাণ নয়।

"বৌদ্ধধর্মে সে পথের ঠিক উল্টা পথ দেখি যে। তাতে কেবল তো মঙ্গল দেখছি নে, মঙ্গলের চেয়েও বড়ো জিনিস দেখছি যে।"

রবীন্দ্রনাথের মতে এই সব-চেয়ে বড় জিনিস হইল প্রেম, এবং সে প্রেমের স্বরূপ হইল, 'প্রেম হচ্ছে স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা; সে কিছুই নেওয়ার অপেক্ষা করে না, সে যে কেবলই দেওয়া।" এই প্রেমই তো হইল ব্রহ্মের স্বরূপ।

এইখান হইতে ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের ব্রহ্মবিহারকে অনেক দূর টানিয়া লইয়াছেন। বুদ্ধদেব-উপদিষ্ট ব্রহ্মবিহারের প্রথম কথাই হইল অপরিসীম মৈত্রী-ভাবনা, রবীন্দ্রনাথের মতে তাহার অর্থ হইল অপরিসীম প্রেমে নিজের বিশুদ্ধ চিত্তকে স্থাপন করা। সে প্রেম কিরকম প্রেম তাহা বুঝাইতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বহু প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের একটি বাণী পরম শ্রদ্ধায় বার বার উদ্‌ধৃত করিয়াছেন; তাহা হইল এই—

মাতা যথা নিযং পুত্তং
আয়ুসা একপুত্তমনুরক্‌খে
এবম্পি সব্বভূতেসু
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।
মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ
অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।
তিট্‌ঠং চরং নিসিন্নো বা
সয়ানো বা যাবতস্‌স বিগতমিদ্ধো
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্যং
ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু।

মাতা যেমন একমাত্র নিজপুত্রকে নিজের আয়ু দ্বারা রক্ষা করেন, এইরূপ সর্বভূতে অপরিমাণ মানস ভাবনা করিবে। উর্ধ্বে অধে চতুর্দিকে সর্বলোকে শোকে বাধাহীন বৈরতাহীন প্রতিদ্বন্দ্বিহীন মৈত্রী এবং অপরিমাণ মানস ভাবনা করিবে বা রক্ষা করিবে। স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া, চলিতে চলিতে, বসিয়া বা শুইয়া যে-পর্যন্ত নিদ্রা না আসে সেই পর্যন্ত এই-জাতীয় স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিবে; ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলা হয়।

বুদ্ধদেবের এই বাণীর ব্যাখ্যা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে মৈত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোলাকে ব্রহ্মবিহার বলে। সে প্রীতি সামান্য প্রীতি নয়— মা তাঁর একটিমাত্র পুত্রকে যেরকম ভালোবাসেন সেইরকম ভালোবাসা।"

"ব্রহ্মের অপরিমিত মানস যে বিশ্বের সর্বত্রই রয়েছে, এক পুত্রের প্রতি মাতার যে প্রেম সেই প্রেম যে তাঁর সর্বত্র। তাঁরই সেই মানসের সঙ্গে মানস, প্রেমের সঙ্গে প্রেম না মেশালে সে তো ব্রহ্মবিহার হল না।…"

"অপরিমিত মানসে অপরিমিত মৈত্রীকে সর্বত্র প্রসারিত করে দিলে ব্রহ্মের বিহারক্ষেত্রে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন হয়।"[১]

নিজের ধর্ম-এষণা এবং চিত্তপ্রবণতা লইয়া রবীন্দ্রনাথ এখানে ব্রহ্মবিহারকে যেখানে টানিয়া লইলেন আমাদের বিচারে তাহা বুদ্ধের ব্রহ্মবিহার হইতে অনেক দূরে। বুদ্ধদেব যে এ-প্রসঙ্গে 'ব্রহ্ম' শব্দটির ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণই 'বৃহৎ-বাচি'। মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষাকে অবলম্বন করিয়া চিত্তকে বৃহতের মধ্যে বিহার করানো। আমরা তখনই বলিয়া উঠিব, তবেই তো হইল— সেই তো একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া আমাদের 'ব্রাহ্মী স্থিতি'র কথা। কিন্তু 'ব্রহ্মবিহার' ও 'ব্রাহ্মী স্থিতি' মূলতঃ এক ভাবনা হইতে প্রসূত নয়।

রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবিহার এবং ব্রহ্মের সহিত মিলনকে যে-ভাবে এক করিয়া মিলাইয়া দিয়াছেন এবং যে-ভাবে বলিয়াছেন যে প্রেমের দ্বারা গঠিত যে অপরিসীম মানস তাহা ব্যক্তি-আত্মাকে সকল বন্ধন অতিক্রম করিয়া পরম-আত্মার সহিত মিলনে মুক্ত করিয়া দেয়, এই-সব ঠিক কিনা তাহা আলোচনা করিবার পূর্বে বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্মকে এইভাবে বুঝিতে যাইবার বা গ্রহণ করিতে যাইবার বিরুদ্ধে প্রথমেই একটা মৌলিক আপত্তি তুলিতে চাই। রবীন্দ্রনাথ যাহা করিয়াছেন এবং অন্যান্য বাঙালী মনীষিগণ অধিকাংশে যাহা করিয়াছেন তাহা হইল বুদ্ধদেব অতি স্পষ্টভাবে যাহা করিতে বারণ করিয়াছেন তাহাই করা। বুদ্ধদেবকে তাঁহার শিষ্যগণ যখনই অতিপ্রাকৃত দার্শনিকতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন তখনই তিনি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি কথা বলিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন যে তিনি যাহা অব্যক্ত রাখিয়াছেন তাহাকে তাঁহারা যেন ব্যক্ত করিবার চেষ্টা না করে, তিনি যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন শিষ্যগণ যেন শুধু তাহারই অনুসরণ করে। বুদ্ধের এই উক্তিটি তৎপ্রচারিত ধর্মসম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে করি। বাঙালী মনীষিগণ যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার কথা পূর্বে অন্যান্যের সঙ্গে উল্লেখ করি নাই এইজন্য যে তাঁহাকে আমার অন্যান্য অপেক্ষা ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হইয়াছে। তিনি বৌদ্ধধর্ম যে আসল হিন্দুধর্ম হইতে কিছুই পৃথক্ নয় ইহা প্রমাণ করিবার জন্যই বৌদ্ধধর্মের

১ বুদ্ধদেব, পৃ. ২১-২২

আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। বুদ্ধদেব যাহা অপ্রকাশিত রাখিয়াছেন তাহা অপ্রকাশিত রাখিয়া তিনি যাহা প্রকাশিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহার যথাসম্ভব পরিচয় দিবার জন্যই সত্যেন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের নিজের বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদের দিকেই ঝোঁক ছিল এবং আলোচনার মাঝে মাঝে তিনি বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের তুলনা করিতে গিয়া এ-কথা বলিয়াছেন যে বৌদ্ধধর্ম মানুষের কতকগুলি অতি সাধারণ এবং স্বাভাবিক জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করিতে পারে নাই; কিন্তু বৌদ্ধমতের উপরে ব্রাহ্মণ্যমতকে তিনি কোনো স্থানেই আরোপ করিতে যান নাই। নির্বাণের আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি শেষ পর্যন্ত চরম অবস্থাতেও মানুষের একটা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষার দিকে সানন্দ প্রবণতা প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি নির্বাণকে ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যাইবার সামিল বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

ধর্মকে গ্রহণ করিবার যে ব্রাহ্মণ্যব্যবস্থা তাহা অপেক্ষা বুদ্ধদেবের পন্থার মূলেই সম্পূর্ণ একটা পার্থক্য ছিল। যে পার্থক্যটি চমৎকার প্রকাশিত হইয়াছে পালি মজ্ঝিম-নিকায়ের ভিতরকার চুল-মালুঙ্ক্যপুত্তসুত্তের ভিতরে। মালুঙ্ক্যপুত্র বুদ্ধের একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন। মালুঙ্ক্যপুত্রের একদিন মনে হইয়াছিল, তিনি এতদিন বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, কই পরমার্থতত্ত্ব বিষয়ে তিনি তো তাঁহাকে কোনো উপদেশ দান করেন নাই। তবে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া লাভ হইল কি? বিষণ্ণ মালুঙ্ক্যপুত্রকে বুদ্ধদেব যে উপদেশ দান করিয়া-ছিলেন তাহা মজ্ঝিম-নিকায় হইতে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অতি সুন্দর এবং সংক্ষিপ্তভাবে তাঁহার গ্রন্থে সংকলন করিয়াছেন; সেখান হইতেই সূত্রটি সংক্ষিপ্তাকারে উদ্‌ধৃত করিতেছি—

"তখন বুদ্ধদেব কহিলেন—

"হে মালুঙ্ক্যপুত্র— আমি কি কখনো তোমাকে বলিয়াছি—"এসো, আমার শিষ্য হও— আমি তোমাকে বলিয়া দিব, জগৎ সৃষ্ট কি অনাদি, দেহ ও আত্মা পরস্পর ভিন্ন কি অভিন্ন— বুদ্ধ মরণোত্তর নব-জীবনধারণ করিবেন কি না?— এই সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া উপদেশ দিব, আমি কি এমন কোনো বচন দিয়াছি?

"—না, গুরুদেব, তা দেন নাই।

"—এই সকল তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশে কি তুমি আমাকে গুরু বলিয়া মানিয়াছ?

"—না, তাহা নহে।

"বুদ্ধদেব কহিলেন—

"এক ব্যক্তি বিষাক্ত বাণে আহত হইয়াছিল। তাহার আত্মীয় বন্ধুগণ একজন সুনিপুণ চিকিৎসক ডাকিয়া আনিল। যদি সেই আহত ব্যক্তি বলিত, আগে আমাকে বল কার বাণে আমি আহত হইয়াছি, যে বাণ মারিয়াছে সে লোকটা কে? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কি শূদ্র? তাহার নাম কি? নিবাস কোথায়? সে বাণই বা কি রকমের বাণ? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে কি কোনো লাভ আছে? ফলে এই দাঁড়াইত যে, কথা শেষ হইতে না হইতেই সেই বাণাহত ক্ষতব্যক্তি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে দেখিতে পাইতে।

—হে মালুঙ্ক্যপুত্র, তুমি আহত হইয়া আমার নিকট চিকিৎসার জন্য আসিয়াছ। তোমার আরোগ্যের উপযোগী যে ঔষধ তাহা আমি বলিয়া দিয়াছি। আমি যাহা প্রকাশ করি নাই, তাহা অপ্রকাশিত থাকুক— যাহা ব্যক্ত করিয়াছি তাহা প্রকাশিত হউক।"

ব্যক্ত এবং অব্যক্ত অর্থে মূলে ব্যাকৃত এবং অব্যাকৃত শব্দ দুইটি ব্যবহৃত হইয়াছে। অব্যাকৃত শব্দটির টীকায় বলা হইয়াছে, শুধু অকথনীয় নহে, যাহা অনর্থকর হিসাবেও বর্জনীয়। বুদ্ধদেব যাহাকে অব্যক্ত রাখিয়াছেন তাহা অনর্থকর হিসাবে বর্জনীয় বলিয়াই অব্যক্ত রাখিয়াছেন।

আমরা বৌদ্ধধর্মকে সামান্য যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে মনে হয়, এই মালুঙ্ক্যপুত্ত-সুত্তই হইল বৌদ্ধধর্মে প্রবেশের চাবিকাঠি। মালুঙ্ক্যপুত্রের সহিত বুদ্ধদেবের যে-জাতীয় আলোচনা হইয়াছিল এ-জাতীয় আলোচনা পালি-সাহিত্যের মধ্যে আমরা আরও অনেক দেখিতে পাই। 'দাঘ-নিকায়ে'র[১] 'পোট্ঠপাদ-সুত্রে'র মধ্যে তৎকালীন প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক পোট্ঠপাদের সহিত গৌতমবুদ্ধের এই-জাতীয় একটি তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনার বর্ণনা পাই। ভগবান্ বুদ্ধ তখন শ্রাবস্তীর জেতবন-বিহারে বাস করিতেছিলেন, আর পোট্ঠপাদ তিনশত শিষ্যসহ বাস করিতেছিলেন শ্রাবস্তীপুরীরই মল্লিকারামে। বুদ্ধ ভিক্ষায় বাহির হইয়া মল্লিকারামে গিয়া পৌঁছিলেন। পোট্ঠপাদ তখন শিষ্যগণের সহিত উত্তেজিত ভাবে বহুবিধ তর্কবিতর্কে রত ছিলেন; গৌতমবুদ্ধ উপস্থিত হইলে পোট্ঠপাদ তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'এই লোক কি শাশ্বত?' বুদ্ধদেব উত্তর দিয়াছিলেন, 'হে পোট্ঠপাদ, এ বিষয়ে আমি কোনো মত ব্যক্ত করি না।' পোট্ঠপাদ ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, 'তবে এই লোক কি অশাশ্বত? এই লোকের কি অন্ত আছে? এই লোক কি অনন্ত? জীব ও দেহ কি এক? জীব ও দেহ কি বিভিন্ন? সত্যদর্শী তথাগত মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করেন কি? তিনি আর জন্মগ্রহণ করেন না এইরূপ কি? করেন এবং করেন না এই উভয় প্রকার কি? অথবা এই উভয়ের কোনোটাই না এমন কি?' উত্তরে বুদ্ধদেব বলিলেন, 'হে পোট্ঠপাদ, এই-সব মত সত্য এবং অন্য সব মত মিথ্যা এইরূপ কোনো মতই আমি ব্যক্ত করি না।' পোট্ঠপাদ বলিলেন, 'আপনি এ-সকল মতবাদ বিষয়ে কোনো মতই ব্যক্ত করেন না কেন?' বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, 'হে পোট্ঠপাদ, এ-সকল মতবাদ অর্থযুক্ত নয়, ধর্ম-সংহিত নয়, ব্রহ্মচর্যের জন্য নয়, বিরাগের জন্য নয়, নিরোধের জন্য নয়, উপশমের জন্য নয়, অভিজ্ঞার জন্য নয়, সম্বোধির জন্য নয়, নির্বাণের জন্য নয়; সেইজন্য আমি এ বিষয় সকল অব্যাকৃত রাখিয়াছি।' পোট্ঠপাদ বলিলেন, 'হে ভগবন্, আপনি তাহা হইলে কি ব্যক্ত করেন?' উত্তরে বুদ্ধদেব বলিলেন, 'আমি দুঃখ কি, দুঃখের কারণ কি, দুঃখের নিরোধ কি, দুঃখ-নিরোধের উপায় কি তাহাই ব্যক্ত করি। ইহাই অর্থযুক্ত, ইহাই ধর্ম-সংহিত, ইহাই ব্রহ্মচর্যের জন্য, ইহা বিরাগের জন্য, নিরোধের জন্য, উপশমের জন্য, জ্ঞানপ্রদ, সম্বোধির জন্য, অভিজ্ঞার জন্য, নির্বাণের জন্য।'

১ দীঘ-নিকায়, সীলক্খন্ধবগ্গ

পালি-সাহিত্যে বুদ্ধদেবের নির্বাণের সন্ধানে প্রব্রজ্যা গ্রহণের যে বর্ণনাটি রহিয়াছে তাহাতে স্পষ্টই দেখিতে পাই, তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, জাত প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ের মধ্যেই একটি অনির্বাণ অগ্নিজ্বালা রহিয়াছে, তাহাই প্রতিটি মানুষকে দগ্ধ করিতেছে; তখন একটি চিন্তাই তাঁহার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া বসিল, "কস্মিং নু খো নিব্বুতে হদয়ং নিব্বুতং নাম হোতি"—কি নিবিয়া গেলে হৃদয়ের এই আগুন নিবিয়া যায়। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন, দুশ্চর-তপস্যা করিলেন, ধ্যান-সমাধির দ্বারা লাভ করিলেন বোধি—জানিতে পারিলেন, এই দুঃখাগ্নি কি, ইহার কারণ কি, ইহার নিরোধ কি, ইহা নিরোধ করিবার উপায় কি। তিনি এই দুঃখনিরোধের উপায়-স্বরূপ আবিষ্কার করিলেন অষ্টাঙ্গিক মার্গ; সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, এই-ই পথ; সকলে এসো, আচরণ করিয়া দেখ হৃদয়ের অগ্নি নির্বাপিত হয় কি না,—'এহি' এবং 'পস্‌স' এসো এবং দেখ। বুদ্ধের আহ্বান হইল এই 'এসো এবং দেখ'র আহ্বান। পরমার্থতত্ত্ব লইয়া জল্পনা-কল্পনা নয়, বড় বড় পারমার্থিক সিদ্ধান্তের খণ্ডন-মণ্ডন নয়—ব্যাবহারিক জীবনে আচরণের পথ। ব্রহ্মবিহারে জীবের ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন হয় কি না এ প্রশ্ন বুদ্ধদেবকে করা হইলে তিনি বলিতেন, ইহার উত্তর দিতে আমি আসি নাই। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রথমে স্থির করিতে হইবে, 'জীব' বলিয়া পদার্থটি কি, ব্রহ্ম বলিয়া পদার্থটি কি—জীব এবং ব্রহ্ম এই উভয়ের ভিতরে সম্পর্কটিই বা কি। এই প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে কোনো ধর্ম বা কোনো দর্শন হইতেই কোনো স্থির সিদ্ধান্ত লাভ করা যায় নাই, অনন্তকাল ধরিয়া বিবাদই চলিতেছে। আমরা হিন্দুগণ কথায় কথায় যে ব্রহ্মের মধ্যে লীন হইবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিতেছি সেই ব্রহ্ম এবং তল্লীনতা খ্রীস্টধর্মাবলম্বী পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোকের নিকটে কোথাও স্পষ্টতঃ বিধর্মিতা বলিয়া ধিকৃকৃত, কোথাও উদ্‌ভট কল্পনা বলিয়া পরিহসিত। বুদ্ধদেব সেইজন্য আগে-ভাগেই বলিয়া রাখিলেন, তিনি যে ধর্মের কথা বলিয়াছেন সে ধর্মের ক্ষেত্রে এ-সব প্রশ্ন অবান্তর। নির্বাণ-শব্দের অর্থ মানুষের হৃদয়ের সকল অগ্নি নিবিয়া যাওয়া; মানুষের হৃদয়ের সকল বিষক্ষত, সকল অগ্নিজ্বালা দূর করিবার পথ বলিয়া দেওয়াই হইল তাঁহার আসল কাজ; অন্যটা তাঁহার কাজ নয় বলিয়াই তিনি অপ্রকাশিত রাখিয়াছেন, সেই অপ্রকাশিতকে যেমন করিয়া হোক প্রকাশিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা বুদ্ধদেব বা তৎপ্রচারিত ধর্মকে ভালো করিয়া বুঝিয়া লইবার চেষ্টা নয়।

আমরা আমাদের আলোচনার প্রারম্ভেই বলিয়া আসিয়াছি, বৌদ্ধধর্মের মধ্যে পরবর্তী কালে অনেক দার্শনিক মত গড়িয়া উঠিয়াছে। এই-সকল দার্শনিক-মত অনুধাবন করিলেও আমরা দেখিতে পাইব, তাঁহারাও মোটামুটিভাবে এই জিনিসটি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে পরমার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনোরূপ সিদ্ধান্তগ্রহণ করাই সম্ভব নয়। আমরা বলিয়াছিলাম, কিছু কিছু মতান্তর সত্ত্বেও বিভিন্ন শাখার বৌদ্ধধর্মের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে ঐকমত্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। পরমার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা না করিয়া বুদ্ধপ্রদর্শিত মার্গকেই অনুসরণ করা যে শ্রেয়—ঐকমত্যের বিষয়গুলির মধ্যে ইহাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ঐকমত্যের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল প্রতীত্যসমুৎপাদবাদের গ্রহণ। ব্যাখ্যার কিছু কিছু পার্থক্য সত্ত্বেও বৌদ্ধগণ কেহই প্রতীত্যসমুৎপাদে অনাস্থা প্রকাশ করেন নাই। বুদ্ধদেব সর্বপ্রথমে যে বোধি লাভ করিলেন সেই বোধির মূল কথাই হইল প্রতীত্যসমুৎপাদ। এক কথায় বলিতে গেলে জগৎ সম্বন্ধে আত্মা সম্বন্ধে পরমাত্মা সম্বন্ধে বুদ্ধের যাহা মনোভাব মূলে তাহা এই এক প্রতীত্যসমুৎপাদের ভিতর দিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতীত্য-সমুৎপাদ স্বীকার করিলে ক্ষণিকবাদ স্বীকার করিতেই হইবে। ক্ষণিকবাদ স্বীকার করিলে কোনো শাশ্বতবাদকে কোনোরূপেই স্বীকার করা যায় না। শাশ্বতবাদ স্বীকার না করিলে জীবের মধ্যে আত্মা এবং সর্বভূত জুড়িয়া পরমাত্মারূপ ব্রহ্মকে স্বীকার করিবার কোনও প্রশ্নই আসে না। সুতরাং বুদ্ধদেব তাঁহার মৌনত্বের ভিতর দিয়া অথবা তাঁহার শূন্যতাবাদের ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষে না হোক পরোক্ষে 'অবাঙ্‌মনসগোচরম্' নির্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্মেরই ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন এ সব কথার কোনও তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে বলিয়াছেন—

"বুদ্ধদেব যখন বেদনাপূর্ণচিত্তে ধ্যানদ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলেন যে, মানুষের বন্ধন বিকার বিনাশ কেন, দুঃখ জরা মৃত্যু কেন, তখন তিনি কোন্ উত্তর পেয়ে আনন্দিত হয়ে উঠেছিলেন? তখন তিনি এই উত্তরই পেয়েছিলেন যে, মানুষ আত্মাকে উপলব্ধি করলেই, আত্মাকে প্রকাশ করলেই, মুক্তিলাভ করবে।"[১] নানা আবরণে আত্মার প্রকাশে বাধা ঘটিতেছে; "সেই আবরণগুলি মোচন হলেই আত্মা আপনার বিশুদ্ধ স্বরূপটি লাভ করবে।" বুদ্ধদেবের মত বলিয়া রবীন্দ্রনাথের এই-সকল উক্তিকে শিথিল ভ্রান্তিমূলক বলিয়া মনে করি। রবীন্দ্রনাথের এখানে অবশ্য বক্তব্যটি এই যে, প্রেমই হইল আমাদের আত্মার স্বরূপ। "এই প্রেমকে বিস্তারের দ্বারাই আত্মা আপন স্বরূপকে পায়। সূর্য যেমন আলোককে বিকীর্ণ করার দ্বারাই আপনার স্বভাবকে পায়।"[২] রবীন্দ্রনাথ বার বার করিয়া এই কথা বলিয়াছেন যে, মানুষের যে স্বরূপ তাহাকে বুদ্ধদেব শূন্যতাও বলেন নাই, নৈষ্কর্ম্যও বলেন নাই— তাহাকে বলিয়াছেন প্রেম; মৈত্রী-করুণার দ্বারাই এই প্রেম নিখিলের প্রতি বিস্তৃত হয়। এই প্রেমের যত বিস্তার ঘটে আত্মারও তত প্রকাশ ঘটে; আত্মার প্রকাশেই আত্মার মুক্তি; এই মুক্তির কথাই বলিয়া গিয়াছেন বুদ্ধদেব।

"মানুষের মধ্যে গভীর হয়ে আছে সোঽহংতত্ত্ব। সে-কথা বুদ্ধদেব নিজের মধ্য থেকেই জেনেছেন, তাই বলেছেন, অপরিমাণ প্রেমেই আপনার অন্তরের অপরিমেয় সত্যকে মানুষ প্রকাশ করে।"[৩] বুদ্ধদেব যে শূন্যতার কথা, বৈরাগ্যের কথা, বাসনাত্যাগের কথা

১ বুদ্ধদেব, পৃ. ৫১-৫২।

২ ঐ।

৩ ঐ পৃ. ৬৩।

বলিয়াছেন তাহা সবই হইল ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য। কৃষক যেমন ফসল ফলাইবার জন্য ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া প্রথমে সব আগাছা দূর করিয়া লয়, মানুষকেও তেমনই সংযম বৈরাগ্য বিষয়-বাসনা-ত্যাগের দ্বারা চিত্তে অনন্ত প্রেম জাগ্রত করিয়া লইতে হয়। প্রেমের জাগরণেই হইল আত্মার জাগরণ, আত্মার জাগরণেই মুক্তি।

মুক্তি সম্বন্ধে এই যে উক্তি ইহা বুদ্ধদেবের উক্তি নয়, ইহা পুরাপুরি রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি। মানুষ হিসাবে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের নিকটে নরোত্তম; আর রবীন্দ্রনাথের মতে পূর্বোল্লিখিত মুক্তি ইহল মানুষের আদর্শমুক্তি; মানুষের সেই আদর্শমুক্তিকে কবি নরোত্তম বুদ্ধদেবের স্মরণে আমাদের নিকটে উপস্থিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, বিশ্বপ্রবাহের পিছনে একটি মঙ্গলময় আত্ম-সচেতন সত্য রহিয়াছেন; তিনি এক অনন্ত প্রকাশকামী পুরুষ। প্রকাশের ভিতর দিয়াই সেই পরম পুরুষের পরম মুক্তি; সৃষ্টিপ্রবাহ তাঁহার আত্ম-সর্জন—অনন্ত আত্মত্যাগের দ্বারা অনন্তদেশে কালে নিরন্তর আত্মপ্রকাশ। এই আত্মত্যাগেই তাঁহার প্রেম—সেই প্রেমেই বিশ্বপ্রবাহ হইয়া উঠিয়াছে পরমপুরুষের লীলা। বিশ্বপ্রবাহের মধ্যে এই যে পরমপুরুষের আত্ম-প্রকাশের লীলা তাহা চরম প্রকাশ লাভ করিয়াছে মানুষের মধ্যে। মানুষের মধ্যে জড়ের সর্বপ্রকারের বাধা অতিক্রম করিয়া প্রথম জাগিয়াছিল প্রাণ, সেই প্রাণের প্রবাহ ঘনীভূত হইয়া জাগাইল মন; মানুষের মনের চেতনা সর্বাপেক্ষা ঘনীভূত হইয়া এবং সর্বাপেক্ষা রহস্যময় হইয়া দেখা দিল মানুষের প্রেমে। জড়ের বন্ধন অতিক্রম করিয়া সে আত্ম-প্রকাশ মুক্তি লাভ করিয়াছে প্রাণে—প্রাণের মুক্তি চেতনায়—চেতনার মুক্তি অপরিসীম প্রেমে। আসলে প্রত্যেকটি মানুষ হইল এক পরম পুরুষ মহাদেবের (মহান্ দেবের) এক একটি বিশিষ্ট ধ্যানকণা। যিনি পরমপুরুষ পরমাত্মা তিনি হইলেন পরম প্রেম; তাঁহারই ধ্যানকণা-স্বরূপ মানুষের মধ্যেও সঞ্চারিত সেই পরম প্রেমেরই কণা। জীবজগতে সেই প্রেম মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছে আত্মকেন্দ্রিকতার বেড়াজাল অতিক্রমের তীব্র আবেগ নিজের সকল শুভবুদ্ধিকে বিস্তারিত করিয়া দিতে নিখিল মানবের দিকে। পরম কল্যাণ-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া নিখিল মানবের জন্য নিজের চেতনাকে উর্ধ্বে অধে চতুর্দিকে সঞ্চারিত করিয়া দেওয়াই মানুষের পরম ধর্ম, ইহাই যথার্থ মানুষের ধর্ম।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই-জাতীয় ধ্যান-ধারণা স্ফুট-অস্ফুটরূপে দেখা দিয়াছিল তাঁহার প্রথম জীবন হইতে একটা সহজাত প্রবণতারূপে। জীবনের ক্রমপরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তৎকালে প্রচলিত পৃথিবীজোড়া মানবতাবাদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের এই ধ্যান-ধারণা একটা নিগূঢ় জীবনবোধে পরিণতি লাভ করিল। তিনি নিজের গভীর কবি-অনুভূতির ভিতর দিয়াই মানুষের প্রেমের উপরে প্রতিষ্ঠিত একটি 'মানুষের ধর্ম' আবিষ্কার করিলেন। এই 'মানুষের ধর্মে'র আদর্শ তাঁহাকে দিনে দিনে এমন ভাবে অধিকৃত করিল যে তিনি উপনিষদের সকল ভালো ভালো কথার মধ্যে তাঁহার নিজের চিত্তে বিধৃত এই মানুষের ধর্মের সমর্থনই খুঁজিয়া পাইতে লাগিলেন, উপনিষদকেও তাই সেই ভাবেই আমাদের নিকটে উপস্থিত

করিতে লাগিলেন। আবার সেই একই অন্তরাবেগে বুদ্ধদেবের বাণীর মধ্যেও তিনি নিজের চিত্তধৃত 'মানুষের ধর্ম'কেই বার বার করিয়া পাঠ করিয়াছেন। ঐ যেখানে বুদ্ধদেব জোর দিয়াছেন মৈত্রী-ভাবনার উপরে—ঐ যেখানে তিনি বলিয়াছেন মহাকরুণার কথা রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধবাণীর মধ্যে সেই কথাটুকুকেই বার বার করিয়া সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া শুনিলেন, ঐ যেখানে বুদ্ধদেব বলিলেন সর্বজীবের জন্য তেমন করিয়া অপরিমাণ মানস ধারণ করিবার কথা যেমন ধারণ করেন মাতা তাঁহার অপরিমাণ মানসকে তাঁহার একমাত্র সন্তানের প্রতি সেইখানেই রবীন্দ্রনাথ লাভ করিলেন বুদ্ধদেবের চরম বাণী। নিজের মনের বাণীর সঙ্গে এই-জাতীয় চমৎকার সমর্থন লাভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধবাণীর আশেপাশের দিকে আর তাকাইলেনই না; দু-একটা বেসুরা কথা কানে পৌঁছিলেও, বলিয়া উঠিয়াছেন, ঐ কথাই যে ঠিক কথা—অন্য কথা যে ঠিক কথা নয়, এ কথা কে নিশ্চিত করিয়া বলিবে!

কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, মৈত্রী ও করুণাকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ধর্মের চরম কথা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন বুদ্ধবাণীতে মৈত্রী ও করুণাকে সেইরূপ চরম কথা বলা হয় নাই। মহাযান বৌদ্ধধর্মের মধ্যে অবশ্য করুণা বা মহাকরুণার উপরে প্রাধান্য দিয়াই সমস্ত ধর্মমত ও সাধনা গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে; কিন্তু পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে মৈত্রী ও করুণা নির্বাণ-সাধনার অঙ্গস্বরূপ; মৈত্রী ও করুণা চিত্তকে নির্বাণের উন্মুখ করিয়া দেয়; ইহারা চিত্তের চরমাবস্থার সহায়ভূত,—সেইজন্যই ইহাদের সম্যক্ অনুশীলনের কথা বলা হইয়াছে। এই মৈত্রী-করুণাকে অবলম্বন করিয়া যে অপরিমাণ মানসের কথা রবীন্দ্রনাথ সেইখানেই থামিয়া গিয়া ইহাকেই বুদ্ধের চরম বাণী বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ব্রহ্মবিহারের মধ্যে যে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষাকে লইয়া চারিটি ভাবনার কথা বলা হইয়াছে ইহার উল্লেখ পাতঞ্জল যোগদর্শনের মধ্যেও দেখিতে পাই। উপেক্ষা অর্থ ঔদাসীন্য; ইহা অনেকখানি নঙর্থক দৃষ্টি বলিয়া ইহাকে আর ভাবনা বলা হয় নাই, মৈত্রী করুণা ও মুদিতা—এই তিনটিকে অবলম্বন করিয়া তিনটি ভাবের কথা বলা হইয়াছে। সুখী জীব সম্বন্ধে মৈত্রীভাবনা দ্বারা মৈত্রীবল লাভ হয়, দুঃখী জীব সম্বন্ধে করুণাভাবনা করিয়া করুণাবল লাভ হয়, পুণ্যশীল সম্বন্ধে মুদিতাভাবনা দ্বারা মুদিতাবল লাভ হয়। এই-সকল ভাবনা দ্বারা সমাধি লাভ হয় বলিয়া এই সকল ভাবকে সংযম বলা হইয়া থাকে। এইভাবে দেখিতে পাইতেছি, হিন্দু যোগশাস্ত্রেও মৈত্রী-করুণা প্রভৃতিকে বিভিন্ন স্তরে সমাধি-সাধনার সহায়ক রূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ আমরা দেখি, রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের মৈত্রী-করুণার প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ইহাকে মানুষের পরম কাম্য 'প্রেম' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদের মতে প্রচলিত প্রেমধারণার সহিত বুদ্ধ-বর্ণিত মৈত্রী-করুণাকে সর্বাংশে এক এবং অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিবার মধ্যে কিঞ্চিৎ গোলযোগ রহিয়াছে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে আমাদের প্রচলিত প্রেমধারণা মূলে একটি শাশ্বতবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষীয় দ্বৈতবাদিগণ যেখানে প্রেমের কথা বলেন, সেখানে প্রেম ভগবৎ-স্বরূপ; ভগবৎ-স্বরূপ হইতেই তাহা জীবে

সঞ্চারিত হয়।। রবীন্দ্রনাথ যখন অদ্বৈতবাদ-ঘেঁষা কথা বলিয়াছেন তখনও তাঁহার মনের মধ্যে এই ভাবটি ছিল যে বিশুদ্ধ প্রেম হইল ব্রহ্মের বিশুদ্ধস্বরূপ; আমরা যাহাকে মানবপ্রেম বলি তাহা হইল আমাদের ভিতরকার ব্রহ্ম-স্বরূপতারই মানব-সম্বন্ধে প্রকাশ। বুদ্ধদেবের মৈত্রী-করুণার আলোচনা-প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ প্রেম সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"কিন্তু, প্রেম যে সকল প্রয়োজনের বাড়া। কারণ, প্রেম হচ্ছে স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা; সে কিছুই নেওয়ার অপেক্ষা করে না, সে যে কেবলই দেওয়া।

"যে দেওয়ার মধ্যে কোনো নেওয়ার সম্বন্ধ নেই সেইটেই হচ্ছে শেষের কথা, সেইটেই ব্রহ্মের স্বরূপ—তিনি নেন না।"[১]

রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রত্যাশাবর্জিত ভাবে নিজের স্বভাব হইতে শুধু দেওয়ার আবেগ লইয়া যে প্রেমের কথা বলিলেন, ইহাই খ্রীস্টানগণ-প্রচারিত পিতৃস্বরূপ ভগবানের love agape, ইহাই যীশুখ্রীস্টের ভিতর দিয়া মানবের নিকটে আসিয়া পৌঁছায়।

উপরে বর্ণিত এই-সকল প্রেমের সহিত বুদ্ধবর্ণিত মৈত্রী-করুণা সর্বাংশে এক নয়। পূর্বেই বলিয়াছি, বৌদ্ধশাস্ত্রে মৈত্রীভাবনা নির্বাণ-সমাধির উপায়রূপে গৃহীত হইয়াছে। চিত্তকে দিকে দিকে বিস্তৃত করিয়া দেওয়াই হইল মৈত্রী-ভাবনার মুখ্য উদ্দেশ্য। মৈত্রী-ভাবনার দ্বারা চিত্ত এই-জাতীয় নিঃসীম বিস্তার লাভ করিলে করুণারও উদ্রেক হয়; করুণা চিত্তকে নিখিল জীবের সহিত সমবেদনাভাগী করিয়া তোলে। এই মৈত্রী-করুণা মানুষের মধ্যে জাগ্রত হইবে কি ভাবে? কোনও শাশ্বত চরম সত্যের স্বরূপ ভাবে নয়; ইহা জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে নিখিল প্রাণীর সম্বন্ধে মানবচিত্তের অনুশীলন দ্বারা। মূল প্রেরণা আসিবে 'অত্তানং উপমং কত্বা'—ইহার ভিতর দিয়া। নিজেকে উপমা করিয়া করিয়া মৈত্রী ও করুণাকে জাগ্রত করিতে হইবে। এই আচরণ আমার নিকটে প্রীতিদায়ক কি অপ্রীতিদায়ক এই বিচারের দ্বারা পরের প্রতি আমাদের আচরণীয় স্থির করিতে হইবে। নিরন্তর অনুশীলনের দ্বারা এমন অবস্থা আসিবে যে নিজের প্রতিকূল কোনো কিছু আর অন্যের প্রতি আচরণ করা যায় না। এই মানসিক অনুশীলন দ্বারা মৈত্রী-করুণাকে জাগ্রত করিতে হয়—ইহা কোনো শাশ্বত স্বরূপ হইতে আমাদের স্বরূপে সঞ্চারিত হয় না। মৈত্রী-করুণা অনুশীলনজাত চৈতসিক (psychological) বস্তু, ইহা কোনো অধ্যাত্মস্বরূপজাত (ontological) বস্তু নহে।

বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে-সকল মতামতের কথা উপরে উল্লেখ করিলাম তাঁহার 'বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ' লেখাটির ভিতর দিয়া সেই সকল মতামতই তিনি আবার পণ্ডিতগণের মতামত তুলিয়া সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পণ্ডিতগণের মতামত অপেক্ষাও যে জিনিসটির উপরে তিনি এখানে বিশেষভাবে জোর দিতে চাহিয়াছেন তাহা হইল এই, "ধর্মকে চিনিতে গেলে তাহাকে জীবনের মধ্যে দেখিতে হয়।" এইজন্য কবি চীনে-জাপানে

১ বুদ্ধদেব, পৃ. ১৬-১৭।

বৌদ্ধধর্মকে যে-ভাবে দেখিয়া আসিয়াছেন বা সেখানকার বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে যে-সব লেখা পড়িয়াছেন তাহা অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধধর্মের সত্য নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ-স্থানেও তিনি প্রধান প্রধান যে-সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহার সমালোচনা আমরা পূর্বেই করিয়া আসিয়াছি। তিনি নূতন করিয়া এখানে যে-কথাটির উপরে জোর দিতে চাহিয়াছেন সেই সম্বন্ধেই মন্তব্য প্রকাশ করিতে চাই। শাস্ত্রের উপরে নির্ভর না করিয়া দেশে দেশে ধর্ম কি ভাবে আচরিত হইতেছে তাহার উপরে নির্ভর করিয়া সেই ধর্ম সম্বন্ধে কথা বলাতে অনেকখানি বিপদ আছে। ইউরোপীয় দর্শকগণ ভারতবর্ষ ভ্রমণে আসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমাদের অনেক ধর্মাচরণ দেখিয়া যান এবং অনেক সময়ে তাহা অবলম্বনে আমাদের দেশের ধর্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন; তাহার অধিকাংশ স্থলেই আমরা দেখিতে পাই আমাদের ধর্মশাস্ত্রের এবং দর্শনশাস্ত্রের সহিত যোগ না থাকার ফলে আমাদের ধর্মের মর্মবাণী ইহার মধ্যে প্রকাশ লাভ করে না। বিংশ শতাব্দীতে চীন-জাপানে বৌদ্ধধর্মের আচরণ দেখিয়া বৌদ্ধধর্মের মর্মবাণী আবিষ্কারের চেষ্টার মধ্যেও ঐরূপ ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে করি।

যে কথা দিয়া আরম্ভ করিয়াছি সেই কথা দিয়াই শেষ করিতে চাই। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি কবি; যিনি কবি তিনি যাহা কিছু পান সবই 'মনের মাধুরী' মিশাইয়া অনেকখানি নিজের মত করিয়া সৃষ্টি করিয়া লন। বুদ্ধদেবকেও নানা প্রসঙ্গে তিনি সেই ভাবে অল্প-বিস্তর নিজের মতন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সৃষ্টির ভিতরে বহু স্থানেই বুদ্ধদেবকে তিনি অপূর্ব মহিমায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন; তথাপি সেখানে সৃষ্টি রহিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধদেব সম্বন্ধে এবং বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে সকল কথা এই দৃষ্টিতেই গ্রহণ করিতে হইবে, সেই কথাটির দিকেই নানা ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিলাম। এ প্রসঙ্গে আমাদের আরও স্মরণ রাখিতে হইবে, রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধচর্চা মুখ্যতঃ কোনো তত্ত্বালোচনা নহে; যে-সব দিনগুলি বুদ্ধদেবকে অবলম্বন করিয়া স্মরণীয় সেই সব দিবসে রবীন্দ্রনাথ অন্তরঙ্গগণকে লইয়া বিনম্রচিত্তে 'মানুষের মধ্যে যিনি মহত্তম' তাঁহাকেই স্মরণ করিয়াছেন, সকল বুদ্ধচর্চাই সেই স্মরণের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র-বক্তৃতা

রবীন্দ্রনাথকৃত ইংরাজি শব্দের বঙ্গানুবাদ

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

১৩৩৬ সালের চতুর্থ সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়[১] রবীন্দ্রনাথ কতকগুলো ইংরাজি শব্দের বাংলা অনুবাদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন সময়ে তাঁর নানা লেখার মধ্যে অনেক ইংরাজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন।[২] এই সমস্ত শব্দের স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। সেই আলোচনার পথ প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে নানা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত ও প্রস্তাবিত ইংরাজি শব্দের বঙ্গানুবাদের এই তালিকা সংকলিত হয়েছে। এই তালিকাকে পূর্ণাঙ্গ করবার চেষ্টার ত্রুটি করি নি। অনবধানতার জন্য কোনো শব্দ বাদ গিয়ে থাকলে পাঠকেরা সেদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন এই অনুরোধ জানাচ্ছি। এই প্রতিশব্দ-তালিকা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ও বাংলা শব্দতত্ত্বে কবির পূর্বপ্রকাশিত শব্দতালিকার অনুবৃত্তিস্বরূপ গণ্য হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের মৌল সৃষ্টির তুলনায় আক্ষরিক অনুবাদের পরিমাণ অভাবনীয় রকমের কম। এইটেই তাঁর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। কেননা প্রতিভার অন্যতম প্রধান লক্ষণ অসাধারণ স্বীকরণশক্তি। এই শক্তিতেই সকল কিছু রবীন্দ্রনাথের মনে জারিত হয়ে প্রকাশ পেত। সেই প্রকাশ একান্ত তাঁরই। তাতে তাঁর স্বকীয়তার ছাপ স্পষ্ট। T. S. Eliotএর Journey of the Magi-র অনুবাদটি লক্ষ্য করলেই এ কথার তাৎপর্য বোঝা যাবে। একমাত্র 'জলযন্ত্র' (watermill) ছাড়া আর কোনো শব্দ অনুবাদ বলে ধরা যায় না। কিন্তু এই একটি শব্দের ক্ষেত্রে অন্য উপায় ছিল না। অনেক সময় এই রকম অনিবার্য কারণেই তাঁকে অনেক ইংরাজি শব্দের সরাসরি আক্ষরিক অনুবাদ করতে হয়েছিল। মূল ইংরাজি বাগ্‌ভঙ্গির আভাস দেওয়ার জন্য বা রসসৃষ্টির উদ্দেশ্যেও কখনো কখনো আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন। এই শেষোক্ত ধরণের অনুবাদ তালিকাভুক্ত হয় নি।

যে-সব শব্দ স্পষ্টতই ইংরাজির অনুবাদ বলে মনে হয় আর যেগুলোর পাশে ইংরাজি শব্দ দেওয়া আছে প্রধানত সেগুলোই তালিকায় ধরা হয়েছে। কিন্তু অনুবাদটির পাশাপাশি

---

১. পুনঃপ্রকাশিত, বাংলা শব্দতত্ত্ব (১৩৪২); বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা— এই সংখ্যায় ঐ তালিকা ছাড়াও শ্রীবুদ্ধদেব বসু ও শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত -সংকলিত অপর দুটি তালিকা আছে। শ্রীসুপ্রকাশ রায়ের পরিভাষাকোষেও কিছু শব্দ রবীন্দ্রনাথ-কৃত বলে উল্লেখ আছে। বাংলা শব্দতত্ত্ব গ্রন্থের পরিশেষে 'পরিভাষাসংগ্রহ' নামে আরও একটি তালিকা আছে।

২. এইরকম কয়েকটি শব্দের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য শ্রীপুলিনবিহারী সেন মহাশয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ইংরাজি দেওয়া থাকলেও বৈচিত্র্যহীন বা বর্তমানে সুপ্রচলিত শব্দগুলো ধরি নি।[৩] এই সব অতি সাধারণ কোনো কোনো শব্দের ক্ষেত্রে ইংরাজি শব্দ দেওয়ার একটি কারণ— যেকালে শব্দগুলো রবীন্দ্রনাথ প্রথম ব্যবহার করেছিলেন, তখন হয়তো সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি দেওয়ার দরকার ছিল। কোনো কোনোটি আবার তাঁর মনঃপূতও নয়।

একই কারণে কোনো ইংরাজি শব্দের রবীন্দ্রনাথ-ব্যবহৃত একাধিক প্রতিশব্দের মধ্যে সুপ্রচলিত প্রতিশব্দটি বাদ দিয়ে অপ্রচলিত বা স্বল্পপ্রচলিতটি গ্রহণ করেছি। যেমন— coffin অর্থে রবীন্দ্রনাথ শবাধার ও কাষ্ঠাধার দুইই ব্যবহার করেছেন। শবাধার প্রচলিত বলে বর্জিত। কাষ্ঠাধার অপ্রচলিত বা স্বল্পপ্রচলিত, তাই গৃহীত হয়েছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাবিত শব্দগুলোর মধ্যে কয়েকটি তিনি অপরিবর্তিত বা ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে ও অর্থে তাঁর লেখার মধ্যে ব্যবহার করেছেন। অতিকৃত (বাঁ. ২৪।১৭৩।২৭; কা. ২৪।৪৬৪।২৪); অতিদিষ্ট (রা. চি. ২০।৩৪৫।২০); অনপেক্ষিত (প. ২।৬২৪।২৩; সা. ৮।৫০৮।১৯; গ. ১৯।২৭৯।৩০; গ. ২২।২৪০।২৫; চি. দ্বি. ৫৬।১১); অনুদেশ (প. ২।৫৯০।১৩); অন্তরায়ণ (কা. ২৪।২৮৯।২৩); অন্তরায়িত (শি. ১৭৭।২০); অপদীক্ষা (মা. ধ. ২০।৩৯৮।৯); অভয়পত্রী (শি. ২০০।৮), আকল্প (পু. ১৬।১১২।২৩); আগামিক (বি. ১৭।৭।১৪); আঙ্গিক (যা. ১৯।৪৫০।২৮; রা. চি. ২০।৩০৬।২৭; ছ. ২১।৩৫৩।২২-২৩; শি. ২১৩।৪-৫); আত্মকীয়তা (প. প. প্রা. ১০২।৭); পরিবর্তিত রূপে আত্মতা (সা. প. ২৩।৪২৫।৪-৫; ৪২৬।৪, ৪); পত্রিকায় essence-এর প্রতিশব্দ হিসাবে উল্লিখিত, কিন্তু লেখায় character-এর প্রতিশব্দ রূপে দেখা যায়), উচ্চণ্ড (পু. ১৬।১২৫।১৯); উচ্ছ্রিত (অ. অ-২।৫৬২।৮; নৌ. ৫।২৮৩।৪; সা. ৮।৪৩২।৫; বী. ১৯।১৫।২৫; পা. ২২।৪৭১।১৫); উচ্ছ্রিয়া (ব. ১২।২২।১); উত্তত (মা. ধ. ২০।৩৭৭।২); উদ্‌ঘোষ (রা. চি. ২০।২৮৬।৬); (ব্যবহারে উদ্‌ঘোষণ পাই), উন্মুখর (প. ১৫।১৬২।১০; ১৯৪।৪), (উন্মুখরতা, সা. প. ২৩।৪৪৯।৫); উপনিপাত (ছ. ২১।৪২০।১৯); ঊর্মিল (পু. ১৬।১৬।৫); ঐচ্ছিক (চি. প. ৭৪।৪; শি.

৩. Aristocrat = অভিজাত, প. ১০।৫৭৮।২১; Bride = বধূ, মু. প. ১।৫৬৩।১৮; Ceremony = অনুষ্ঠান, স. ১২।৫৮৪।১৬; Crusade = ধর্মযুদ্ধ, সা. ৮।৪৪৭।১৩; Dialect = উপভাষা, লো. ৬।৬০৯।২১; Exploitation = শোষণনীতি, স. ৩।১; Intensity = প্রগাঢ়তা, আ. ৯।৪৪১।১৮; সা. প. ২৩।৫০১।৪; Success = সিদ্ধি, যা. ১৯।৪০৭।১০; ৪৪২।২২; Suggestiveness = ব্যঞ্জনা, প. ১৮।৫২০।১৩; Technique = আঙ্গিক, যা. ১৯।৪৫০।২৮; রা. চি. ২০।৩৬০।২৭; ছ. ২১।৩৫৩।২২-২৩; শি. ২৮৭।২০; The Home of Rest = বিশ্রান্তিনিকেতন, রা. চি. ২০।৩২৬।২৮-২৯; ৩২৭।৪; Vivisection = জীবচ্ছেদ, ম. ১১।৪৯১।১৮।

কান, সোনা, চুন, পান শব্দগুলোকে মূর্ধন্য ণয়ের অধিকার নিরোধ করা এত দুঃসাধ্য হয়েছে। ছাপাখানায় অক্ষরযোজকেরা সংশোধন মানে না। অথচ প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, কানের এক সোনাকে যদি মূর্ধন্য ণ লাগল তবে অন্য সোনায় কেন দন্ত্য ন লাগে। শ্রবণ শব্দের ণ ফলা লোপ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার মূর্ধন্য ণ সংস্কৃত ব্যাকরণমতেই দন্ত্য ন হয়েছে। অথচ স্বর্ণ শব্দ যখন রেফ বর্জন করে সোনা হল তখন মূর্ধন্য ণয়ের বিধান কোন্ মতে হয়? হাল আমলের নতুন সংস্কৃত লোকেরা সোনাকে শোধন করে দিয়েছেন তাঁদের সুকল্পিত ব্যাকরণবিধির দ্বারা— প্রথম দখল প্রমাণ ছাড়া সূত্রের অন্য প্রমাণ অগ্রাহ্য হয়ে গেল। শ্রবণ শব্দের অপভ্রংশ শোনা শব্দ যখন বাংলা ভাষায় ভালোমতেই চালু হয়েছিল তখন বিদ্যাসাগর প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতেরা বিধানকর্তা ছিলেন— সেদিনকার বানানে কান সোনা প্রভৃতিরও মূর্ধন্যত্ব প্রাপ্তি হয় নি।

কিছুকাল পূর্বে যখন ভারতে শাসনকর্তারা ইন্টার্ন্ সুরু করলেন তখন খবরের কাগজে তাড়াতাড়ি একটা শব্দ সৃষ্টি হয়ে গেল, অন্তরীন। শব্দসাদৃশ্য ছাড়া এর মধ্যে আর কোনো যুক্তি নেই। Internment কে কি বলা যায় অন্তরায়ণ? কিন্তু ওটা কী হতে পারে তাও কেউ ভাবলেন না। অর্থাৎ অন্তরায়ণ অন্তরায়িত, বহিরায়ণ বহিরায়িত ব্যবহার করলে আপত্তির কারণ থাকে না সকল দিকে সুবিধাও ঘটে।

নূতন সংঘটিত শব্দের মধ্যে কদর্যতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে "বাধ্যতামূলক শিক্ষা।" প্রথমত শিক্ষার মূলের দিকে বাধ্যতা নয়, ওটা শিক্ষার পিঠের দিকে। বিদ্যালয় বা বিদ্যালাভই হচ্ছে শিক্ষার মূলে— তার প্রণালীতেই কম্পালসন্। অথচ "অবশ্যশিক্ষা" শব্দটা বলবামাত্র বোঝা যায় জিনিষটা কি। "দেশে অবশ্যশিক্ষার প্রবর্তন করা উচিত" কানেও শোনায় ভালো, মানেও পৌঁছায় সহজে। কম্পালসারি এডুকেশনের বাংলা যদি হয় বাধ্যতামূলক শিক্ষা— কম্পালসারি সাবজেক্ট কি হবে বাধ্যতামূলক পাঠ্যবিষয়? তার চেয়ে অবশ্যপাঠ্য বিষয় কি সহজ ও সহজে বোঝায় না? ঐচ্ছিক (optional) শব্দটা সংস্কৃতে পেয়েছি তবে প্রতিবাদী আবশ্যিক শব্দ ব্যবহার চলে কিনা পণ্ডিতেরা বিবেচনা করবেন। ইংরেজিতে যেসব শব্দ অত্যন্ত সহজ ও নিত্য প্রচলিত, দরকারের সময় বাংলায় তার প্রতিশব্দ সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন তাড়াতাড়ি যা হয় একটা বানিয়ে দিতে হয়। যেমন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে পঠিত 'শব্দচয়ন' প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি

রবীন্দ্র-সংগ্রহ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

সময় বেমানান হয়ে দাঁড়ায়, অনেক সময় ব্যবহার করেই স্থগিত থাকে। অথচ সংস্কৃত ভাষায় হয় তো তার অবিকল বা অনুরূপ ভাবের শব্দ দুর্লভ নয়। একদিন "রিপোর্ট" কথাটার বাংলা করবার প্রয়োজন হয়েছিল। সেটাকে বানাবার চেষ্টা করা গেল, কোনোটাই মনে লাগল না। হঠাৎ মনে পড়ল সংস্কৃতে আছে "প্রতিবেদন" — আর ভাবনা রইল না। প্রতিবেদন, প্রতিবেদিত, প্রতিবেদক — [illegible] যেমন করেই ব্যবহার করা যাক না মনে কোথাও বাধে না।

[illegible] জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি, ওভারপপুলেশন বিষয়টা আজকাল খবরের কাগজের একটা নিত্য আলোচ্য — কোমর বেঁধে তর্ক একটা বাংলা শব্দ বানাতে গেলে হাঁপিয়ে উঠতে হয় — সংস্কৃত শব্দকোষে তৈরি পাওয়া যায়, অতিপ্রজন। বিদ্যালয়ের ছাত্রসম্বন্ধে [illegible] রেসিডেন্ট, নন্‌রেসিডেন্ট বিভাগ করা দরকার, বাংলায় নাম দেব কি? সংস্কৃত ভাষায় সন্ধান করলে পাওয়া যায় আবাসিক, অনাবাসিক। সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারে আমি কিছু দিন সন্ধানের কাজ করেছিলেম। যা সংগ্রহ করতে পেরেছি তা শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমারের প্রবর্তনায় প্রকাশ করবার জন্য তাঁর হাতে অর্পণ করলুম। অন্তত এর অনেকগুলি শব্দ বাংলা লেখকদের কাজে লাগবে বলে আমার বিশ্বাস।

অকর্মনিযুক্ত unemployed.
অসংলগ্ন incongruous, incoherent.
অভিহত charmed.
অতিরঞ্জিত, অতিকৃত exaggerated
অতিষিদ্ধ overruled.
অধিকর্মী superintendent.
অধিবক্তা advocate.
অধিকারিবর্গ Governing body.
অপৌরুষ impersonal
অনীহা apathy.

অনুজ্ঞা permission
অনুজ্ঞাত allowed ~~permitted~~.
অনুদত্ত remitted.
অনুবন্ধ reference to something prior.
অনুপার্শ্ব lateral
অনুযাত্র retinue
অনুলাপ repetition
অনুষঙ্গ association
অনুগত intimate
অন্তঃপাতিত inserted.

২১৫।২৯), কালাতিক্রমণ (সঞ্চয়িতা, ভূমিকা ১।২৫) ; কালান্তর (সা. ৮।৩৪৫।৮ ; ৪১০। ১৯ ; ৪১৭।২৮ ; ৪৯১।৪ ; আ. ৯।৫০৭।১৩ ; শা. ১৩।৫৩১।১৮ ; শে. ১৮।৯১।২৬ ; ছ. ২১। ২৯৭।১৪) ; তরঙ্গরেখা (চি. ষ. ১১৮।৩ ; ১১৯।৮, ৮, ৯, ১০) ; নঙর্থক (রা. চি. ২০।৩৪১। ১১ ; মা. ধ. ২০।৩৮৮।৩০ ; কা. ২৪।৪৫৭।২১ ; বু. ১২।৫ ; ম. গা. ১৩।৬) ; নিষ্কাসিত (ব. হা. ১।৪২৩।১১ , প. ২।৫৪২।১৫) , প্রাগ্রসর (সা. প ২৩।৫১৭।২১) ; প্রোল্লোল (বি. ১৭।৩৬।১৯) ; সংরাগ (গ্র. ১৩।৫৪৩।২৯ ; ছ. ২১।৩৫২।২৭) ; স্বপ্ত (বি. ১৭।২৩।২২)। রবীন্দ্রনাথের এই তালিকাভুক্ত অতিপ্রজন, অনাবাসিক, অনীহা, আবাসিক, দুর্মর, মৌল, সংলাপ এখন চলে গেছে। তালিকায় মৌল aboriginalএর প্রতিশব্দ হিসাবে ধৃত। বর্তমানে originalএর প্রতিশব্দ রূপে চলছে। Original অর্থে রবীন্দ্রনাথ অনন্যতন্ত্র, স্বকীয়তন্ত্র ব্যবহার করেছেন।

এই তালিকাভুক্ত সকল শব্দই রবীন্দ্রনাথকৃত নাও হতে পারে। অবশ্য অধিকাংশ নিশ্চয়ই তাঁর নিজের সৃষ্ট ; কিছু শব্দ হয়তো তিনিই চল করেছেন ; কিছু পুরনো— প্রচলিত ও অপ্রচলিত— শব্দের তিনিই হয়তো নতুন অর্থে প্রয়োগকর্তা। কিন্তু তিনি কোন্ শব্দের স্রষ্টা, কোন্ শব্দের প্রচলনকর্তা বা কোন্ পুরনো শব্দের নতুন অর্থে প্রয়োগকর্তা, তা নিঃসংশয়ে বলার উপায় নেই। কেননা প্রচলিত বাংলা অভিধান থেকে এ বিষয়ে বিশেষ কোনো সহায়তা পাওয়া যায় না। বাংলা শব্দের প্রথম প্রয়োগকাল নির্ধারণ দুঃসাধ্য।

নিম্নের তালিকায় শব্দের পরে বইয়ের সংক্ষিপ্ত নাম, রবীন্দ্র-রচনাবলীর খণ্ড, পৃষ্ঠা ও পঙ্‌ক্তি -সংখ্যা আছে। যেমন—'abduction = অপহরণ, শ. ১২।৫৫২।২০'— এর তাৎপর্য abduction ও অপহরণ কথা দুটি পাশাপাশি শব্দতত্ত্ব বইয়ে রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ডের ৫৫২ পৃষ্ঠার ২০তম পঙ্‌ক্তিতে আছে। রচনাবলীবহির্ভূত বইয়ের ক্ষেত্রে কেবল পৃষ্ঠা ও পঙ্‌ক্তি -সংখ্যা আছে।

বাংলা শব্দের পরে প্রশ্নবোধক চিহ্ন কবির সংশয়সূচক। ইংরাজি শব্দের পরে এই চিহ্ন বর্তমান সংকলকের সংশয়নির্দেশক। পাশাপাশি ইংরেজি বাংলা দুই-ই থাকলে তা বোঝানোর জন্য = চিহ্ন ব্যবহার করেছি।

আকরসূচী

বইয়ের সংক্ষিপ্ত নামের অব্যবহিত পরের সংখ্যা রবীন্দ্র-রচনাবলীর খণ্ডজ্ঞাপক। অচলিত সংগ্রহের ক্ষেত্রে অ-১ ও অ-২ আছে। রচনাবলীবহির্ভূত গ্রন্থের প্রকাশকাল বন্ধনীমধ্যে নির্দিষ্ট হয়েছে।

অ. অ-২ = অনুবাদচর্চা,
আ. অ-২ = আদর্শ প্রশ্ন
আ. = আত্মপরিচয় (১৩৫২)
আ. রূ. বি. = আশ্রমের রূপ ও বিকাশ (১৩৫৮)
আ. ৩ = আত্মশক্তি
আ. ৯ = আধুনিক সাহিত্য
ই. = ইতিহাস (১৩৬২)

ই. অ-২ = ইংরেজি সোপান
ই. অ-২ = ইংরেজি সহজ শিক্ষা
ক. ৭ = কল্পনা
ক. ই. ক. ১৮ = কর্তার ইচ্ছায় কর্ম
ক. কো. ২ = কড়ি ও কোমল
কা. ৭ = কাহিনী
কা. ২৪ = কালান্তর
খা. ২১ = খাপছাড়া
খৃ. = খৃষ্ট (১৩৬৬)
গ. ১৯-২৪ = গল্পগুচ্ছ
গ. ২৬ = গল্পসল্প
গো. ৬ = গোরা
গ্র. ১-২৬ = গ্রন্থপরিচয়
ঘ. ৮ = ঘরেবাইরে
চ. ৭ = চতুরঙ্গ
চা. ৪ = চারিত্র পূজা
চা. ১৩ = চার অধ্যায়
চি. = চিত্রবিচিত্র (১৩৬৬)
চি. ২ = চিঠিপত্র (রচনাবলী-২ ভুক্ত)
চি. দ্বি. = চিঠিপত্র ২য় (১৩৪৯)
চি. তৃ. = চিঠিপত্র ৩য় (১৩৪৯)
চি. চ. = চিঠিপত্র ৪র্থ (১৩৫০)
চি. প. = চিঠিপত্র ৫ম (১৩৫২)
চি. ষ. = চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ (১৯৫৭)
চি. ১৬ = চিরকুমার সভা
চো. বা. ৩ = চোখের বালি
ছ. ২১ = ছন্দ
ছ গা. ১ = ছবি ও গান
ছি. = ছিন্নপত্র (১৩৬২)
জ. ২৫ = জন্মদিনে
জা. ১৯ = জাপান-যাত্রী
জী. ১৭ = জীবনস্মৃতি
ত. ২১ = তপতী
তা. দে. ২৩ = তাসের দেশ
তি. ২৫ = তিন সঙ্গী
দু. ১১ = দুই বোন
ধ. ১৩ = ধর্ম
ন. ২৪ = নবজাতক
নৌ. ৫ = নৌকাডুবি
প ২ = পঞ্চভূত
প. ১০ = পরিশিষ্ট
প. ১৩ = পলাতকা
প. ১৮ = পরিচয়
প. প. প্রা. = পথে ও পথের প্রান্তে (১৩৬৩)
প. স. ২৬ = পথের সঞ্চয়
পা. ২২ = পারস্যে
পু. ১৬ = পুনশ্চ
প্র. ২৩ = প্রহাসিনী
প্র. নি. ৪ = প্রজাপতির নির্বন্ধ
প্র. প্র. ১ = প্রকৃতির প্রতিশোধ
প্রা. ৫ = প্রাচীন সাহিত্য
ব. ১২ = বলাকা
ব. হা. ১ = বউঠাকুরানীর হাট
বাঁ. ২৪ = বাঁশরী
বা. ২৬ = বাংলাভাষা পরিচয়
বা. অ-১ = বাল্মীকিপ্রতিভা
বি. = বিশ্বভারতী (১৩৫৮)
বি. ৪ = বিদায়-অভিশাপ
বি. ৫ = বিচিত্র প্রবন্ধ
বি. ১৭ = বিচিত্রিতা
বি. ২৫ = বিশ্বপরিচয়
বি. অ-১ = বিবিধ প্রসঙ্গ
বী. ১৯ = বীথিকা
বু. = বুদ্ধদেব (১৩৬৭)
ব্য. ৭ = ব্যঙ্গকৌতুক
ব্র. অ-১ = ব্রহ্মমন্ত্র

ভা. ৪ = ভারতবর্ষ
ভা. প. = ভানুসিংহের পত্রাবলী (১৩৫২)
ভা. রা. রা. = ভারতপথিক রামমোহন রায় (১৩৬৬)
ম. ১৫ = মহুয়া
ম. অ-২ = মন্ত্রি অভিষেক
ম. গা. = মহাত্মা গান্ধী (১৩৬৭)
মা. ২ = মানসী
মা. ধ. ২০ = মানুষের ধর্ম
মু. ১৪ = মুক্তধারা
যা. ১৯ = যাত্রী
য়ু. ডা. ১ = য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি
য়ু. প. ১ = য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র
যো. ৯ = যোগাযোগ
র. ১৫ = রক্তকরবী
রা. ১০ = রাজা প্রজা
রা. চি. ২০ = রাশিয়ার চিঠি
লি. ২৬ = লিপিকা
লো. ৬ = লোকসাহিত্য
শ. ১২ = শব্দতত্ত্ব
শা. ১৩-১৬ = শান্তিনিকেতন
শি. = শিক্ষা (১৩৫৮)
শি. ১২ = শিক্ষা
শে. ১৮ = শেষবর্ষণ
শে. ১৯ = শেষরক্ষা
শে. ক. ১০ = শেষের কবিতা
শো. ১৭ = শোধ-বোধ
শ্যা. ২০ = শ্যামলী
স. = সমবায়নীতি (১৩৬৭)
স. ১০ = সমূহ
স. ১২ = সমাজ
স. ১৮ = সঞ্চয়
স. অ-২ = সমালোচনা
স. স. ২৬ = সভ্যতার সংকট
সা. ৮ = সাহিত্য
সা. ২৪ = সানাই
সা. প. ২৩ = সাহিত্যের পথে
সা. স্ব. = সাহিত্যের স্বরূপ (১৩৫৬)
সেঁ. ২২ = সেঁজুতি
স্ফু. = স্ফুলিঙ্গ (১৩৫২)
স্ব. ১১ = স্বদেশ

তালিকা নির্মাণে ব্যবহৃত বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রকাশকাল—

১ম, ১৩৬০ ; ২য়, ১৩৬৩ ; ৩য়, ১৯৫৭ ; ৪র্থ, ১৩৫২ ; ৫ম, ১৩৬২ ; ৬ষ্ঠ, ১৩৬৩ ; ৭ম, ১৩৬০ ; ৮ম, ১৩৬০ ; ৯ম, ১৩৫৩ ; ১০ম, ১৩৬৫ ; ১১শ, ১৩৫৮ ; ১২শ, ১৩৫৮ ; ১৩শ, ১৩৫৯ ; ১৪শ, ১৩৬০ ; ১৫শ, ১৩৬০ ; ১৬শ, ১৩৬০ ; ১৭শ, ১৩৬১ ; ১৮শ, ১৩৬১ ; ১৯শ, ১৩৬৩ ; ২০শ, ১৩৬১ ; ২১শ, ১৯৫৭ ; ২২শ, ১৯৫৭ ; ২৩শ, ১৯৫৮ ; ২৪শ, ১৩৫৪ ; ২৫শ, ১৩৫৫ ; ২৬শ, ১৩৫৫ ।

অচলিত সংগ্রহ ১ম খণ্ড, ১৩৪৮ ; ২য় খণ্ড, ১৩৪৭ ।

এগুলি সকল ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথমপ্রকাশকাল নয়— সংকলয়িতা যে সংস্করণ ব্যবহার করেছেন তাই উল্লিখিত হয়েছে ।

শব্দসূচী

---

১ ইতিবাচক, অ-২।২৮৬। ইংরেজি সোপান ও ইংরেজি সহজ শিক্ষা বইয়ে ব্যবহৃত। তু নেতিবাচক।

Airbird
নভশ্চরপক্ষী, অ, অ-২।৫৬১।২০
Airforce
বায়ুনাবিক সৈন্য, মা. ধ. ২০।৪০১।৪
Ambiguity of sense
অর্থদ্বৈধ, আ. ৩।৫১৫।৮
Ambiguity of thought
ভাবদ্বৈধ, আ. ৩।৫১৫।৮
Ambitious
দুরাকাঙ্ক্ষী, রা.চি. ২০।৩৬৫।২২
Amiable
=প্রিয়চারী, প. ১০।৫৬৯।১৬ ; =৫৭০।৬
Amputation
ছেদন, গো. ৬।১৮২।৩০ ; ১৮৩।,১,২
Anachronism
=কালবিরোধ-দোষ, সা. ৮।৪৫০।১৫-১৬
Anarchy
নৈরাজ্য, যা. ১৯।৩৯৭।২৯
Anatomist
শারীরতত্ত্ববিদ্, ছ. ২১।৩৩৯।১৪
Anatomy
১. শরীরতত্ত্ব, শ. ১২।৫৬৫।৯ ;
গ. ১৬।৩২৩।১৭ ; গ. ১৮।৩১৮।৯ ; শে. র. ১৯।১৩৭।১১ ; সা.প, ২৩।৪০১।৫
২. শরীরতত্ত্ব, ভা. ৪।৩৯৯।২৩ ; ৪১২।১৬
৩. শরীর বিজ্ঞান, সা.প. ২৩।৪০৫।৮ ; বা. ২৬।৪৫৬।৭
৪. শারীরতত্ত্ব, ছ. ১১।৪৩৮।২৬
বা.ভা.প. ২৬।৪৫৬।১৩
৫. শারীর বিদ্যা, শি. ২৩০।৪
Animate
জীববাচক, বা. ২৬।৪৩৭।৫, ২৬ ; ৪৪০।৯

Anonymous letter
অনামা চিঠি, গো. ৬।৪০৬।২০
Anthem
গাথা, আ. ৩।৫১৮।২৪
Apatheia (apathy)
=বৈরাগ্য, স. ১২।৪৮০।২৭
Apparatus
যন্ত্রতন্ত্র, আ. ৩।৫৯৯।২ ;
ভা. ৪।৩৭১।২৪ ; ৪১০।২৮ ;
নৌ. ৫।১৮৩।২৫ ;
ধ. ১৩।৩৭১।২ ;
জী. ১৭।২৮৫।১৩
Appetizing
ক্ষুধাকর, শে.ক. ১০।৩৫৪।৩০
Application
দরখাস্ত পত্রিকা, প. ১০।৬২০।১১
Apron
আঁচলা, য়ু.প. ১।৫৭৬।৫
Archaeologist
১. প্রত্নতাত্ত্বিক, গ. ২৩।২২১।১২
২. পুরাতত্ত্ববিৎ, লো. ৬।৫৮৫।১৭ ;
স. ১২।৪৭২।২১ ; ৪৭৪।২৯ ; সা. প. ২৩।৪৪৪।২৯ ; কা. ২৪।২৫৬।২৪
৩. পুরাতাত্ত্বিক, যা. ১৯।৪৩৯।৮
৪. পুরাবশেষবিৎ, পা. ২২।৪৬৩।১০
৫ প্রাত্ত্বিক, প্রহা. ২৩।৫।১৬
Artist
১. রূপদক্ষ[১], যা. ১৯।৪৩৭।১৬ ;
=সা.প. ২৩।৩৮০।১০, ১১ ; ৩৮৫।১৭, ৩০
২. রূপশিল্পী, বা. ২৬।৪৫৬।১৩

---

১. শব্দটি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উদ্ভাবিত না হলেও তাঁর স্বীকৃত।

Asian

ঐশিয়, আ. ৩।৬০২।৯, ১২, ১৫

Assimilation

১. আত্মীকরণ, সা.প. ২৩।৪৯৫।৮, ২০

২. স্বাঙ্গীকরণ, শি. ।৩০৯

৩. স্বীকরণ, সা.প. ২৩।৪১৭।১৫, ১৬

Association

=ভাবানুষঙ্গ, সা.প. ২৩।৪৫৪।৪-৫

Asteroids

=গ্রহিকা, বি. ২৫।৩৯৮।৩-৪, ৬, ১৪

Astronomer

১. জ্যোতির্বিজ্ঞানবিৎ, পা. ২২।৪৮৮।৯

২. জ্যোতির্বিজ্ঞানী, ১ভূ ॥৵৫ ; বি. ২৫।৩৫৮।২৮

Atmosphere

১. বাতাস, প্রা. ৫।৫৩১।৪

২. বায়ব মণ্ডল, আ. অ-২।৬৯৩।৭

Attorney

=আইনসচিব, চি. প. ১৯৪।১১

Autobiographical

আত্মজৈবনিক, ছ. ২১।৪২২।১৪

Autocracy

একেশ্বর রাজত্ব, কা. ২৪।২৬০।২

Autograph

স্বাক্ষরখাতা, সা. প. ২৩।৪৯১।২৩

Automobile

স্বতশ্চালিত, চা. ৪।৫০৩।৬

Autonomous

=স্বতন্ত্রশাসিত, রা.চি. ২০।৩১৯।৮

Axiom

স্বতঃস্বীকার্য, শি. ৩৩৮।৮-৯

Awe

=সভয়সম্ভ্রম, শা. ১৪।৪৭১।১৬

Awkwardness

=অসৌষ্ঠব, ছিন্নপত্রাবলী, ২৪৫।১৬

Ball dance

১. ঘূর্ণ নৃত্য, য়ু.ডা. ১।৫৯৫।১৫ ;

২. ঘূর্ণি নাচ, শে.ক. ১০।৩৫৩।২০ ;

৩. ঘূর্ণি নৃত্য, আ. ৩।৫৬৪।১২

৪. জুড়িনৃত্য, বি. ২৫।৩৬৭।৫ ; (তুঃ য়ু. প. ১।৫৪৬।৮)

Band

মণিবন্ধ, তি.স. ২৫।২২৯।৭

Baptism

=অপ্‌সু দীক্ষা, মা.ধ. ২০।৩৯৮।৯

Baptist

অভিষেকদাতা, খৃ. ১২।১৫

Basin

জলাধার, য়ু. প. ১।৫৬৯।১৭

Bathroom

স্নানশালা, গ. ২০।২৩২।১৩

Batic

বর্তিক, যা. ১৯।৫০৪।৩০ ; ৫০৫।৩০

Bigamy

=দ্বৈধব্য, স্ব. ১১।৪৯৩।২৮

Biological necessity

জৈবিক প্রয়োজন, মা. ধ. ২০।৩৭৮।১৪

Biologist

জীববিজ্ঞানী, বা. ২৬।৩৭৬।১৮

Biology

১. জন্তুতত্ত্ব, আ. ৩।৫৫০।২৮

২. জীববিজ্ঞান, রা. চি. ২০।৩০২।১১ ; পা. ২২।৫০১।১৪

Bird of passage

পান্থপাখি, ম. ১৫।১৬।৯

Black hole tragedy
কালা গর্তের নৃশংসতা, রা. চি. ২০।৩৪২।২৭

Black nigger
অসিত চর্ম, রা.চি. ২০।৩০১।১৪

Blank Verse
=নেড়া ছন্দ, প.প.প্রা. ৯৬।৮

Blind lane
আঁধাগলি, স. ৫৩।১৮-১৯

Boat (Steamer)
লৌহতরী, বি. ৫।৪৮৬।১৪ ; ৪৮৮।১০

Bold Simile
সাহসিক উপমা, ব্র. অ-২।২০২।২

Bonfire
অগ্নিসৎকার, প্রা. ৫।৫৩৩।১৬

Botanist
উদ্ভিদ্‌বেত্তা, ধ. ১৩।৩৩৭।১০

Bourgeoise
=পরশ্রমজীবী, রা. চি. ২০।২৯৯।১ ;
=৩০৬।১৩

Bowl
গোলা ছোঁড়া, গো. ৬।২০৬।৬

Bright
১. উজ্জ্বল, য়ু.প. ১।৫৬৫।১০

Brilliant
=দেদীপ্যমান, তি.স. ২৫।২৬৯।২ ;

Bull's eye lantern
১. একচক্ষু লণ্ঠন, গ. ২৩।৩০২।২৪-২৫
২. গবাক্ষ লণ্ঠন, শি. ২৯৪।৬
৩. বৃষচক্ষু লণ্ঠন, রা.চি. ২০।৩৩৫।১৩-১৪

Bully
=তেরিয়া, য়ু.ডা. ১।৬১৩।৪

Bureaucracy
আপিসি শাসন, রা.প্র. ১০।৪৪০।১০

Burlesque
=কৌতুকনাট্য, জী. ১৭।৩৩৫।২০

Buzzing
গুঞ্জৎ, অ. অ-২।৫৭৯।১৬

Calendar
দিনপঞ্জী, শ্যা. ২০।৮৫।২৬

Caloric food
তাপজনক খাদ্য, অ. অ-২।৫৪৭।২৪

Camp follower (Hanger-on)
আনুযায়িক, শ. ১২।৩৭৭।১৭

Canvas
১. আঁকন পট, বি. ১৭।৪।৩
২. পট, শে. ১৮।১৫।৩

Caption
শিরোনামা, চো. বা. ৩।৩০০।২০

Carbolic acied
অঙ্গারাম্ল, বি. ২৫।৪০৫।২৪

Carbolic gas
আঙ্গারিক গ্যাস, আ. অ-২।৬৯৩।৩ ;
বি. ২৫।৩৯৫।১৬, ১৯, ২৭ ; ৩৯৬।৫, ৯,
১১ ; ৪০৩।২২

Carbon
=আঙ্গারিক বস্তু, আ. অ-২।৬৯৩।৩
বি. ২৫।৩৭৩।১৪-১৫

Carbon-di-oxide
অঙ্গার-বাষ্প, যা. ১৯।৪০২।১০

Castle of indolence
=কুঁড়েমির কেল্লা, য়ু.ডা. ১।৫৯৩।১৪-১৫

Cemetry
সমাধিভূমি, বি. ৫।৪৪৭।২৪

Centrifugal

=কেন্দ্রাতিগ, বি. ৫।৪৪৬।২২
সা. ৮।৩৮৮।২৫ ; স. ১০।৪৯৯।৯।৫ ; স. ১২।২৩৭।২৫ ; ধ. ১৩।৪২৩।২৬ ; ৪৫০ ১৬ ; শা. ১৪।৩০৩।২৫ ; ৪০৫।১৩ ; শা. ১৬।৩৫৮।১১

Centripetal

কেন্দ্রানুগ, সা. ৮।৩৮৮।২৬ ; স. ১০। ৪৯৯।৫ ; স. ১২।২৩৭।২৫,২৬ ; ধ ১৩। ৪২৩।২৬ ; ৪৫৯।১৬ ; শা. ১৪।৩০৩।২৫ ; ৪০৫।১৪ ; শা. ১৬।৩৫৮।১১

Character

১. =আত্মঘোষণা, সা. প. ২৩।৪২৬। ১১-১২
২. =আত্মতা; ৪২৫।৪-৫,১৮; ৪২৬।৪,৪,[১]
৩. চারিত্র, ভা. ৪।৪১৭।১৪,২৮ ; ৪২৩।২০
৪. =চরিত্ররূপ, যা. ১৯। ৪৩২।২১ ;
৫. =নৈতিক চরিত্র ; যা. ১৯।৪৩২।২০
৬. =স্বভাব, যা ১৯।৪৩২।২০

Characteristics

ভাব, প. ১৮।৫১৫।১৫

Charade

=হেঁয়ালিনাট্য, হা. ৮। মুখবন্ধ

Charter

আশ্বাসপত্র, প. ১০।৬১৭।২৫

Chemist

রসায়নী ; বি. ২৫।৩৫৯।৩ ; ৩৬৯।২৭ ; ৩৭০।১১

Chivalry

=বীরধর্ম, রা.চি. ২০।৩৩৫।২২

Circular

=পরোয়ানা, insulting circular— অপমানজনক পরওয়ানা, প্র. ১২।৬২৫।১০

Citizen, libertine[২]

=নাগর, মা. ধ. ২০।৩৮৭।৬

Civil War

ঘরাও যুদ্ধকাণ্ড, রা. ১০।৪৮০।৯-১০

Civil

অসৈনিক, অ. অ-২।৫৬৩।২২

Clan system

১. =গোত্র-বন্ধন, স. ১২।৪৪১।৭-৮
২. =জ্ঞাতি বন্ধন, স. ১২।৪৪১।৭-৮

Classic

=চিরাগত রীতি, সা.প. ২৩।৫২৫।৯-১০

Close acquaintance

নিকট পরিচয়, রা.চি. ২০।২৮৩।১৯

Close contact

১. নিকট সংস্পর্শ, ম. অ-২।১৭২।২১ ; সা. প. ২৩।৪১৭।১১
২. নিকট সংস্রব, গো. ৬।২৭০।১২ ; শি. ২৭০।১০ ; ২৯৪।৮

Coachman

সারথি, য়ু. প. ১।৫৩৮।৩০ ; ৫৩৯।১ ; জী. ১৭।৩৫০।২৮

Coal age

আঙ্গারিক যুগ. চিত্রা ৪। স্ব ৵৬

Co-education[৩]

দ্বয়ী শিক্ষা

---

১. (অন্যত্র আত্মতা=essence) বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৪শ বর্ষ পৃ. ৩১৩

২. অনভিপ্রেত

৩. "রবীন্দ্র জানাইয়াছেন—co-education-এর যথার্থ বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দ্বয়ী শিক্ষা।"—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বাঙ্গালা-ভাষার অভিধান।

Coffin
কাষ্ঠাধার, অ. অ-২।৫৭।১২

Collective
ঐকত্রিক, রা.চি. ২০।২৯১, ১৮, ২৪, ২৯ ; ২৯২।৪, ৭, ৮, ১০, ১১, ২৫ ; ২৯৩।২৮,২৯

Collectivisation
একত্রীকরণ, রা.চি. ২০।২৮৪।৩০ ; ২৯১।১ ; ২৯৪।১২

Collectivism
ঐকত্রিকতা, রা.চি. ২০।২৯১।৬,১৫, ২৭ ; ২৯২।৯, ১৪

Colonist
উপনিবেশী, আ. ৩।৬০২।৩ ;

Colour scheme
=বর্ণকল্পনা, রা.চি. ২০।৩০৬।২৫

Column
১. বীথিকা (সংবাদ-), সা. প. ২৩।৪৪৯।২
২. স্তম্ভ, স্ব. ১১।৪৭২।৭ ; তা. দে. ২৩। ১৭৬।২১ ; ১৭৬।২৩ ; ১৭৭ ; ১৮৯

Combustible
জ্বলনধর্মী, বি. ৫।৪৬৪।১১

Combustiblity
আগ্নেয়তা, শে. ক. ১০।২৭৪।১৫

Commandment
অনুশাসন, মু.প. ১।৫৬৩।৪ ; প. ২।৫৮৯।২৯

Common
=সরকারি জায়গা, মু. প. ১।৫৭৭।২

Communism
সাম্যনীতি, আ. ৩।৬০১।১২, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭

Comparative
তুলনাগত, আ. ৩।৫৮৬।২৩

Comparative literature
=বিশ্বসাহিত্য, সা. ৮।৩৭২ ; =৩৮৫।৮-৯, ২৭ ; ৩৮৭।৯, ১৫, .৯ ; ৩৯৫।১২-১৩

Compartment
=মহল, রা.চি. ২০।৩২২।৩

Complex
বহুলাঙ্গিক, স. ৩।১৪, ২৫

Composition
=সংস্থান, রা.চি. ২০।৩০৬।২৫

Compulsion
অবশ্য বাধ্যতা, ভা. ৪।৪৩৩।২

Compulsory
১. বি=অবশ্যকৃত্য, চি. প. ৭৩।২৩
২. বিণ. আবশ্যিক, পা. ২২।৪৩৮।৮ ; চি. প.=৭৪।৪ ; শি. ২৯১।১৮,১৯

Compulsory education
অবশ্যশিক্ষা, শি. ৩১৩।২৩

Congress
জনসভা, প. ১০।৫৮৫।২৬

Congressman
জনসভাপতি, প. ১০।৫৮৫।২৬ ; ৫৮৬।৭

Consequence
পরিণামফল, অ. অ-২।৫৩৪।২২

Conservative
১. রক্ষণপটু, আ. ৩।৬২৪।১১
২. স্থিতিশীল, মু. প. ১।৫৭৪।২০

Constitution[1]
১. গঠনপত্রিকা, শি. ১২।২৯৫।১৬

Contagiousness
স্পর্শক্রামকতা, প. ১০।৫৭৯।১৩

---

১. অন্যত্র কনস্টিট্যুশন=নিয়মের কাঠামো, বি. ১৪৪।১৫

Contradictory
১. প্রতিমুখ, অ. অ-২।৬০২।৪
২. অন্যোন্যবিরোধী, স. অ-২।৮০।৯

Controller
নিয়ামক, রা.চি. ২০।২৭৫।২২

Co-operative Store
কো-অপারেটিভ স্টোর = বিক্রয়ভাণ্ডার, আ. ৩।৬১৭।২০

Copyist
নকলকর্তা, চি. প. ১২২।১১

Corona
= কিরীটিকা, বি. ২৫।৩৬৯।১৭, ১৮

Corporation
১. পুরসভা, পা. ২২।৪৭৭।১০
২. পৌর পরিষৎ, শা. ১৪।২৯৯।৭

Cosmos
মহাকাশ, গো. ৬।৩০০।৩ ; শি. ২৩০।১৫

Cosmic Ray
১. আকস্মিক রশ্মি, বি. ২৫।৩৭৩।২১ ;
২. = মহাজাগতিক রশ্মি, বি. ২৫।৩৭৩।২১

Cosmogeny
পরিণামবাদ, শা. ১৩।৫৩১।২১

Cosmopolitan
১ সার্বভৌমিক, সা. ৮।৪৭১।২
২. সার্বভৌমিক, ম. অ-২।১৭০।৭ : চা. ৪।৫২৩।১৩, ৫২৭।১৭, ১৮, ২৭

Cosmopolitanism
বিশ্বজাগতিকতা, শা. ১৪।৪৭৯।৯

Cosmos
মহালোক, নৌ. ৫।২০৯।১০

Countrywide
১. দেশপ্লাবী, ভা. ৪।৪৬৯।২১ ;
২. দেশব্যাপ্ত, গো. ৬।৫৫১।১১

Couplet
দ্বিপদী, শ্যা. ২০।৮৮।৯ ; মা.ধ. ২০। ৩৭৬।২০ ; সা.প. ২৩।৪৯৬।১০

Courtship marriage
(love marriage) পূর্বরাগমূলক বিবাহ, স. অ-২।১৪৮।৬, ২৬

Cradle
দোলাবিছানা, অ. অ-২।৫৭৬।১৯

Creation
= রূপ, প্র. ৯।৫৪৫।২৬

Creche
= শিশুরক্ষণী, রা.চি. ২০।৩২৬।৪-৫

Credulity
১. বিশ্বাসমুগ্ধতা, স. ১৮।৩৮১।২৯
২. মুগ্ধতা, স. ৩৮১।২৯

Credulous
বিশ্বাসপ্রবণ, গ. ১৫।৪৩৭।১১

Crossing
চতুষ্পথ, অ. অ-২।৫৪২।১৬

Crowned
মুকুটিত, আ. ৩।৫৫৮।২ ; খৃ. ৭০।৬ ; ৭১।১৪ ; চি.প. ১৩১।২০

Cult of nationalism
স্বজাতিপূজা, জা. ১৯।৩৩২।১১

Culture[1]
১. চিৎপ্রকর্ষ, শি. ২৭১।১৪ ; ২৭৯।১৩

---

[1] এর অন্যতম সুপরিচিত অনুবাদ 'কৃষ্টি'র রবীন্দ্রনাথ সমর্থক ছিলেন না। দ্রষ্টব্য, মা. ধ. ২০।৩৭৮।২ ; ছ. ২১।৩৭১।১০-১২ ; তা. দে. ২৩।১৭৬।১৬, ১৭, ১৯, ২০ ; সা.প. ২৩।৪৪৪। ১৫-১৬ ; বা. ২৬।৪৫৬।১২, ১২ ; বাংলা শব্দ-তত্ত্ব (২য় সং), ১৭৮।২ ; ১৭৯।৬, ১৬ ; ১৮০।৯ ১৮১।৫

Culture

২. চিত্তোৎকর্ষ, পা. ২২।৪৪৮।১৮ ; বা. ২৬।৩৯০।২৪ ; বি. ১৪৮।১৩ ; শি. ২৯৭।২

৩. বৈদগ্ধ্য, রা. চি. ২০।২৭৭।১১

৪. সংস্কৃতি, সা. প. ২৩।৪৪৪।১৬ ; শি. ২২৪-২৫৮ দ্র°

Cultured

উৎকর্ষবান্, অ. অ-২।৫৫৬।১৬, ১৭

Curve

১. তরঙ্গচিত্র, চি.ষ. ১১৯।২১ ;

২. =তরঙ্গরেখা, চি. ষ. ১১৮।৩, ১১৯।৯, ১০

Customs House

মাস্থলখানা, আ. ৩।৫১৮।২৭

Dark heat

=কালো আগুন, বাঁ. ২৪।১৯।১০

Dazzling

চোখ-ধাঁধক, য়ু. প. ১।৫৭৭।১১-১২

Deafening

১. কর্ণবধিরকর, অ. অ-২।৫৭৯।৩

২. বধিরকর, রা. ১০।৪৬২।১০

Decoration

সজ্জীকরণ, জা. ১৯।৩০৯।২৪

Degenerating

অবজননকর, অ. অ-২।৫৯০।২১

Depression (?)

অধঃসরণ, অ. অ-২।৫৫৬।৩

Deserving

আনুকূল্যযোগ্য, অ. অ-১।৫৪২।১

Despot

স্বৈরশাসক, অ. অ-২।৫৪৬।৩

Destination

গম্যস্থান, য়ু.ডা. ১।৬০৩।৬ ; নৌ. ৫।২৬৫। ২৩ ; প্রা. ৫।৫১১।১৪ ; ৫৪৩।২৫ ; গো. ৬।৪৮৪।১৩

Destructive

বৈনাশিক, সা. স্ব. ২৩।২৪

Diarchy

১. দ্বৈধ, গো. ৬।৩২৩।৯

২. দ্বৈরাজ, যা. ১৯।৩৯৭।২৯

৩. দ্বৈরাজ্য, শে. ক. ১০।৩৩৩।২৩ ; দ্র. ১১।৪১৭।২ ; =গ. ২৪।২০৭।১৭ ; চি. প. ৬১।২২

Dictator

১. একনায়ক, রা.চি. ২০।৩২৮।৪

২. নায়ক, রা. চি. ২০।৩৪১।৭ ; ৩৪২।৩

Dictatorship

১. একনায়কতা, রা.চি. ২০।৩৪০।২২

২. একনায়কত্ব, রা.চি. ২০।৩৪১।১৫, ২২

৩. =নায়কতন্ত্র, রা.চি. ২০।৩৪০।১৮

Didactive

ঔপদেশিক, ছি. ১৫।১৫

Die down

১. মরিয়া আসা, ছ.গা. ১।১৪৫।৮

২. মরে আসা ; প.প. প্রা. ভূ।২১

Die in harness

১. লাগাম জোতা অবস্থাতেই মরা, ধ. ১৩।৪২১।৮ ;

২. লাগাম-পরা অবস্থায় মরা, ভা. ৪। ৩৬৭।৫

৩. লাগাম-বাঁধা মরিবার, সা. প. ২৩।৩৭৪।৪, ৭, ১৬-১৬, ১৯

Dignity of labour

=শারীর শ্রমের সম্মান, প. প. প্রা. ৯৮। ১৬-১৭

Dining Room
ভোজনশালা, য়ু. ডা. ১।৫৯৪।৬ ; ৬৪০।৪
Discipline
সংযম, স. ১২।৪৬৪।২৪
Disyllabic
দ্বৈমাত্রিক, ছ. ২১।৩১৪।২৫ ; ৪১৫।৬ ; বা. ২৬।৪০৩।২৬
Dogma
=শাস্ত্রমত, কা. ২৪।২৭৪।২, ৬
Don't look a gift horse into the mouth
দানের ঘোড়ার দাঁত পরীক্ষা করিয়া লওয়াটা শোভা পায় না, শি. ১২।৫১৬।৩১
Door-handle
দ্বারকর্ণ, য়ু. ডা. ১।৫৮৮।২৯
Down train
ভাঁটির ট্রেন, ন. ২৪।৩৭।৮
Dramatic action
নাট্যঘটনা, র. ১৫।৩৪৪।১৬
Drop scene
চরম তিরস্করিণী, সা.প. ২৩।৪৮৭।৫
Duality (Duplicity)
দ্বৈধ, কা. ২৪।৩৩৮।১৩, ১৭
Duet
দ্বন্দ্ব, চি.প. ২২৮।১
Eater of chaste food—
নির্মলখাদ্যভোজী, অ. অ-২।৫৩৪।১১
Economics
১. অর্থতন্ত্র, রা.চি. ২০।৩৪৩।২৮
২. অর্থব্যবহার শাস্ত্র, ই. ১৪৫।১
৩. অর্থশাস্ত্রিক-তত্ত্ব, কা. ২৪।৩৩৫।২৩
Economist
১. অর্থতাত্ত্বিক, রা. চি. ২০।৩৪৫।১৯
২. অর্থশাস্ত্রবিৎ, কা. ২৪।৩৩২।২৭
Edentate
=দন্তহীন, শ. ১২।৫৫৩।২৩
Educate
=বহির্নয়ন, শ. ১২।৫৫৩।২২
Educationist
শিক্ষাতত্ত্ববিৎ, কা. ২৪।৩৩২।২৮
Egoistic
আত্মকেন্দ্রিত, প্র. প্র. ১।স্১।২৪-২৫
Electricity
=বৈদ্যুত, বি. ২৫।৩৬২।২৩
Electron
বৈদ্যুতওয়ালা কণাবস্তু, বি. ২৫।৩৬৭।৫
Elementary
রূঢ়িক, ছ. ২১।৪২৯।২২
Elixir of life
=চিরজীবনরস, স্ব. ১১।৪৭০।২৬
Embodied
১. অঙ্গবদ্ধ, ই. ৫৭।১
২. আকারবদ্ধ, আ. অ-২।৪১।৫ ; ম. অ-২।১৯২।২ ; ২০১।৭ ; ব্র. অ-২।২১৫।২৯ ; লো. ৬।৫৯৪।১২ ; আ. ৯।৪০৫।১৬ ; ৫১৯।৮ ; ৫২৩।১০ ; ৫৩০।৮
Energy
=প্রৈতি, শা. ১৪।৪২৫।৬ ; ৪৫৮।২১
(দ্র° Impulse)
Engaged
বাগ্‌দত্তা, য়ু.প. ১।৫৪৬।১৭
Enlightened
১. আলোকিত, শি, ২৯২।১২
২. জ্ঞানালোকিত, বি, অ-১।৩৪৮।২১

Ethics

১. =চারিত্র, শ. ১২।৫৮০।২২

২. নীতি, রা. ১০।৪৭৬।২০ ;

শ. ১২।৫৮০।১০ ;

৩. নীতিতত্ত্ব, ক. ই.ক. ১৮।৫৬০।২৭

Ethnologist

১. নৃতত্ত্ববিৎ, রা.চি. ২০।৩১৭।১৭

২. মানবতত্ত্ববিৎ, স. ১২।৪৭৪।৬

Ethnology

=নৃতত্ত্ব, আ. ৩।৫৮৭।১১ ; রা. চি. ২০।৩১৭।১৭,১৭ ; ছ. ২১।৩৬৮।১৬

Eugenics

=সৌজাত্যবিদ্যা, গ. ২৩।৩২১।২১-২২

Evening dress

১. সান্ধ্য পরিচ্ছদ, য়ু.প. ১।৫৪৫।৬

২. সান্ধ্যবেশ, প. ২।৬৩৩।২৮

Evolution

ক্রমাভিব্যক্তি, স. ১২।৪৮১।২৪ ; শা. ১৪।৩৩৬।২০

Exaggerated

অতিকৃত, বাঁ. ২৪।১৭৩।২৭ : কা. ২৪। ৪৬৪।২৪

Exaggeration

১. অতিকরণ, কা. ২৪।৪৩৮।২২

২. অতিকৃতি, মা. ধ. ২০।৫৮৮।২৮ ; ৪২৫।১২ ; সা. প. ২৩।৫২৫।১৬ ; সা. স্ব. ১৯।১৬

৩. অত্যুক্তিপরায়ণতা, ভা. ৪।৪৫১।৪

Expert

ওস্তাদ, সা. স্ব. ৫।৭

External

বহির্বিষয়ী, ব.হা. ১।স্থ। ১।১

(বিপ. internal দ্র°)

External student

বহিরঙ্গ ছাত্র, শি. ২৫৪।১০

Extremist

=চরমপন্থী, স. ১০।৫০২।২৬, ২৮ : ৫০৫।৮, ১৪, ২১

Fact

=তথ্য, আ. ৯।৪৫৪।১ ;

=তথ্যমাত্র, সা. প. ২৩।৪৩৬। ১৬-১৭, ২৫, ২৬ ; ৪৬২।৩

Factual

তথ্যমূলক, আ. ৯।৪৪৯।৩০

Fairfaced

চারুমুখী, অ. অ-২।৫১৬।৭

Faith

=ভক্তি, চা. ৪।৫২২।১৬-২০

Fancy ball

=ছদ্মবেশী নাচ, য়ু. প. ১।৫৪৪।৯

Far reaching

দূরগামিনী, ভা. ৪।৪১৮।৫

Feeling

=ভাব, প. ১৮।৫১৫।১৪

Female friend

১. স্ত্রীবন্ধু য়ু. ডা. ১।৬২২।১৯ ;

২. বন্ধুনী, শে.ক. ১০।২৭১।৩

Fever of life

জীবনের জ্বর, চিত্রা. ৪।৪৬।৯

Fidelity

সাধ্বীতা, অ. অ-২।৫১৬।১২

Fire breathing

১. অগ্নিশ্বসিত, স্ব. ১১।৪৭৪।১ ;

২. অনলনিশ্বাসী, আ. ২২।৫০।১২

৩. অনলশ্বসনা, মা. ২।১৫১।৭ ;

Fire place

অগ্নিকুণ্ড, য়ু. প. ১।৫৮০।১৬-১৭ ; সা. প. ২৩।৩৯৭।২৫

Five Year plan
পঞ্চবার্ষিক সংকল্প, রা.চি. ২০।৩০১।৮ ; ৩০৩।২৬ ; ৩০৪।১০

Force of gravitation (Gravitational pull)
১. =ভারাকর্ষণ
স. অ ২।১৩৩।২১ ; ১৫৬।২০ ; প. ২।৬২০। ২৬ ; সা. ৮।৩৯৪।১৮, ছ. ২১।৩৫২।৭ ; সা. প. ২৩।৫১৮।১০ ; বি. ২৫।৩৮২।১৫ ; ৩৮৪।২৬ ; বা. ২৬।৩৮৩।৬ ; প. স. ২৬। ৫১৯।২৮ ; চি. প. ২৪৪।১৬; ভা.প. ৪১।৬ ১১৬।১৪
২. মহাকর্ষ, তি. স. ২৫।২৪৬।৫ ; বি. ২৫।৩৮১।২৪, ২৬, ২৭, ৩০ ; ৩৮২।৩, ৫, ১০, ১৫ ; বা. ২৬।৩৯০।২০

Forced labour
অগত্যাপ্রেরিত খাটুনি, ভা. ৪।৪১১। ২৪-২৫

Forefront
পুরঃসীমা, অ. অ-২।৫৫২।২

Foremost duty
সর্বোচ্চ কর্তব্য, স. ১২।৪৮১।২০

Fossil
১. জীবশিলা, শ. ১২।৫৮০।৮
২. শিলাবিকার, শ. ১২।৫৮০।১

Fossilzed
১. শিলাবিকৃত, শ. ১২।৫৮০।২
২. শিলীভূত, শ. ১২।৫৮০।২

Foster son
কৃতকপুত্র, প্রা. ৫।৫১৮।২৬; ৫২৮।২৮, ২৮

Frederic the great
মহাফ্রেডারিক, সা. প. ২৩।৪৭৩।৪

Freedom
=স্বাতন্ত্র্য (?), স. অ-২।১৩৩।২২

Freedom worshipper
স্বাধীনতাপূজক, রা. ১০।৪২৯।২১

Galvanometer
তড়িৎমাপক সূচি. চি. প.।১১৯।৫

Gardener
স্ত্রী উদ্যানপালিকা, য়ু. প. ১।৫৩৯।২০

Gaseous
১. গ্যাসদেহী, আ. অ-২।৬৯২।১০
২. বাষ্পদেহী, বি. ২৫।৪০৯।৯
৩. বাষ্পময়, স. অ-২।৭৮।১০

Generalization
ব্যাপ্তিসাধনপ্রণালী, শ. ১২।৫৫৪।৯

Generation
প্রজাতি, অ. অ-২।৬০২।৩

Gesture
=ব্যঞ্জনা, চা. ১৩।৩১১।১৫

Girls' school
স্ত্রীবিদ্যালয়, গো. ৬।১৯৯।২

Global
ভৌমণ্ডলিক, শি. ২৭২।২

Golden Treasury
স্বর্ণভাণ্ডার, প্র. বি. ৪।২৮১।৯

Gospel of beauty
সৌন্দর্যের ধর্মশাস্ত্র, সা. ৮।৩৯০।৫-৬

Government
রাজা, স. অ-২।১৪৬।৯

Granary
শস্যস্থলী অ. অ-২।৫৬৩।৪

Gravitation
=ভারাবর্তন ;
বি. ২৫।৩৮২।১৫ ; ৩৮৪।২৬

Greatest good of the largest number
প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধন, চ. ৭।৪৩৫।৩-৪, ৮

Guide

১. পরিচায়ক, রা.চি. ২০।৩০৬।১৯, ২১, ২৮ ; ৩০৭।২

২. পরিদর্শয়িতা, রা.চি. ২০।৩০৬।২৩

৩. পাণ্ডা, য়ু. ডা. ১।৬০৩।১৫

Halo

কিরণকিরীট, মা. ২।১৭০।১১

Harmony

=সংগতি, আ. ৯।৫২১।১৫-১৬

Hedonism

সুখতত্ত্বশাস্ত্র, ছি. ১৭৪।২১

Hedonist

সুখবাদী, স. ১২।৪৮৯।১৪

Home Rule

১. স্বকীয় শাসন, শি. ১২।৫১৯।২০

২. স্বরাজতন্ত্র, পা ২২।৪৫৫।২১

৩. স্বায়ত্তশাসন, আ. ৩।৫৭৩।১, ৪, ৬, ১০-১১, ১৯, ২০ ; রা.চি. ২০। ২৮৪।১৭ ; ২৯৯।১৬, ১৮ ; =৩২১।৩০

Honeymoon (?)

প্রণয়যাপন, লো. ৬।৫৮৫।২

Hospitable

আতিথেয়, পা. ২২।৪৫১।২১

Hotbed

জনন-যোগ্য, অ. অ-২।৫৪৫।২

Houshold commission

=গার্হস্থ্য বিভাগ, রা.চি. ২০।৩২২।২,৫

Human interest

=মানবের প্রতি ঔৎসুক্য, খৃ. ৩৮।১৮ (তু° ঔৎসুক্যজনক)

Humanism

মানবরস, সা. ৮।৩১৭।১

Humanity

১. মানবিকতা, মা. ধ. ২০।৩৯২।২০,২১

২. =সার্বজনীন উদারতা, বি. অ-১। ৩৭৭।৯

Humourous

=হাসিয়ে, সে. ২৬।২৩৪।১২

Hunger strike

=প্রায়োপবেশন, শে. ১৯।১৫১।১১-১৩

Idle capital

মরা ধন, র. ১৫।৩৪৭।৬,৭,১৫ ; ৩৪৮।৮ ; ৩৫২।২

Idle tears

১. =অকারণ অশ্রুবিন্দু, বি. ৫।৪৫৯।২৩

২. =বাজে চোখের জল, বি. ৪৫৯।২৪

Illumination

=উজ্জ্বলতা, রা.চি. ২০।৩০৬।২৬

Immediate cause

আশু কারণ, রা.চি. ২০।২৯০।২০

Imperialism

সাম্রাজ্যিকতা. শা. ১৪।৫১২।১০,১৬

Imperialistic

সাম্রাজ্যিক, রা.চি. ২০।২৮৭।১২ ; পা. ২২।৪৯১।২১ ; ৪৯২।৭,৯

Impersonal

১. অব্যক্তিক, ভা. ৪।৪০৯।১৬

২. =নির্ব্যক্তিক, যো. ৯।২১২।২৩ ;

৩. =নৈর্ব্যক্তিক, রা. চি. ২০।৩৩২।২০ ; মা.ধ. ২০।৩৯৩।৩ ; ৩৯৫।১১ ; সা.প. =২৩।৪২৫।১৬ ; ৪২৬।২ ; ৪২৯।১০ ; ৫২৭।২৮ ; তি. স. ২৫।২৬১।১৯ ; আ.ক্ল.বি. ৭।১৮ ; প. প. প্রা. ১৪১।২৮ ; সা. স্ব. ১৫।১৪

Impulse

=প্রৈতি, প্র. ১২।৬৩৯।৮ (তু° energy)

Inanimate

১. অজীব, সা.প. ২৩।৩৯৩।২৮ ; চি. ষ. ১১০।১৭

২. অজীববাচক, বা. ২৬।৪৩৬।১৪

৩. অপ্রাণ, বি. ২৫।৪১৩।৭ ; সা. স্ব. ২১। ১৩, ১৫

৪. অপ্রাণী, বা. ২৬।৪৪৭।২৭

Inanimate object

অপ্রাণ পদার্থ, সা. স্ব. ১৩।২১

Incoming

আগামিক, বি. ১৭।৭।১৪

Indecent

কুশ্রী, য়ু. প. ১।৫৬২।৩,৫

Indigo

১. অতিনীল, বি. ২৫।৩৫৮।২০

২. অতিনীলিম, চি. প. ।১০৪।৬

৩. নীলিম রশ্মি, চি. চ. ।২০২।১৭

Individual

বিশেষ ব্যক্তি, স. অ-২।১০৯।৫-৬

Individualism

=ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ধ. ১৩।৪২৬।৭,১৫,২২

Informative

সংবাদী, ছ. ২৬।১১।৮

Infra-red light

লাল উজানি আলো, বি. ২৫।৩৫৮ ২৭ ; ৩৫৯।১০

Inn

পান্থাবাস, রা.চি. ২০।২৭৭।৫

Inscribed

লিপীকৃত, পা. ২২।৪৬৩।২৭

Inscription

=প্রাচীনলিপি, সা. প. ২৩।৩৮০।১২

Instantaneous

তাৎক্ষণিক, বি. ২৫।৩৮২।৪

Instinct

১. প্রবৃত্তি, সা.প. ২৩।৩৮২।১৪

২. বৃত্তি, সা.প. ২৩।৩৮২।১১, ১২, ১৬,১৭

৩. সহজ প্রবৃত্তি, প. ২।৫৬৮।১৩ ;

৪. সহজ সংস্কার, স. ১২।২০৯।১২, ১২ ১৪, ১৫

Instinctively

সংস্কারাধীনে, চা. ৪।৪৮০।৮

Institution[1]

১. =প্রতিষ্ঠান, শ. ১২।৫৮৪।১৩, ১৬-১৭

Insularity

দ্বৈপায়নতা, ক.ই.ক. ১৮।৫৫৩।২১ ; ভা.রা.রা. ১২।১২

Interesting

১. =উপাদেয়, সে. ২৬।২৮২।৭ ; চি.প. চি. ১২১।১৩ ; সা. স্ব. ৬।১৩

২. ঔৎসুক্যজনক, নৌ. ৫।স্থ ১।১৬ ; প্রা. ৫।৫৩৯।২৬ ; সা. ৮।৩৪২।৩ ; = প. ২৮৭।৪ (?)

৩. কৌতুকাবহ, প. ২।৬২৪।২৩ ; লো. ৬।৫৯৩।১৫ ; ৬১১।২৩ ; আ. ৯।৪৯৯।২১

৪. চিত্তগ্রাহী, অ. অ-২।৫৩৪।১৭

১. "প্রতিষ্ঠান কথাটা আমাকে বানাইতে হইল। ইংরেজি কথাটা institution." শব্দতত্ত্ব ১২।৫৮৪। বস্তুত কথাটি নতুন নয় ; অর্থটি নতুন।

Interim
মধ্যকালীন, অ. অ-২।৫৪৭।৬
Intermediate education
=মাধ্যমিক শিক্ষা, শি. ১২।২৯১।১৪,১৫
Internal
অন্তর্বিষয়ী, ব. হা. ।। স্থ ১।১
International
সার্বজাতিক, তি. স. ২৫।২৩৮।২৮ ; প. স. ২৬।৫৩৯।২৫ ; চি. দ্বি. ২।৫৫।২০ ; শি. ২৬৬।১১
Interned
অন্তরায়িত, প.প.প্রা. ৬০।৯ ; শি. ২৩৮।৯
Internment
অন্তরায়ণ, কা. ২৪।২৮৯।২৩
Introspective
অন্তর্মনস্ক, স. ১২।২৩৭।১
Islanders
দ্বৈপায়নগণ, রা. ১০।৪২৪।২৩
Jingoism
সমরোৎসাহ, স. ১২।৪৮১।৪
Journalistic
১. খবরের-কাগজি, শে.ক. ১০।২৯০।১৩ ;
২. খবুরে-কাগজি, ছ. ২১।৪২০।২৯ ;
৩. সংবাদপাত্রিক, তি. স. ২৫।৩১৫।২২
Keeping Company
সঙ্গ রক্ষা, গো. ৬।২৮৪।২০
Keepsake
স্মরণচিহ্ন, স. অ-২।৬০।১১,১২ ;
গ্র. ৫।৫৬৩।১১,১১,১১,১২ ; ৯।৫৪৮।৯
Kernel
১. শস্যাংশ, ধ. ১৩।৩৭৩।২১ ;
২. শস্য-অংশ, প. ২৬।৫১৬।৭
Kerosene stove
কেরোসিন-চুলা, চো. বা. ৩।৩৩৮।৭
Laboratory
১. কারখানাঘর, আ. ৩।৫৪৭।১৯ ;
প্রা. ৫।৫০৭।২১-২৫ ;
২. পরীক্ষাশালা, বি. অ-১।৩৭৬।২৩ ;
গ. ২০।২১৮।৭ ; গ. ২২।২৬৫।২৪ ;
৩. বিজ্ঞানপরীক্ষাগার, বি. ২৫।৩৮৬।৬ ; ৩৯২।২০ ;
৪. বিজ্ঞানপরীক্ষাশালা, প. ১০।৫৭৪।১০
৫. বিজ্ঞানশালা, পু. ১৬।১২৪।১৮
Labour-saving machine
মিতশ্রমিক যন্ত্র, স. ১০।৫১৪।১৬
Labourer
১. কর্মিক, রা.চি. ২০।২৮৬।১৮ ; ৩১৪।৭ ; ৩১৭।৫ ; কা. ২৪।৩০৩।২২ ; স. ২।২৯ ; ৫।১৮ ;
২. শ্রমী, স. ১০।৫১২।২৩ ; ৫১৪।২৮
Lacerta
=গোধিকা, বি. ২৫।৩৮৪।৩
Landscape
ভূদৃশ্য, সে. ২৬।২৯২।১৮
Landscape (painting)
ভূদৃশ্যচিত্র, জা. ১৯।৩৫১।১৭
Lapse of time
কালাতিক্রমণ দোষ, সঞ্চয়িতা. ভূ ১।২৫
Law and order
=বিধি এবং ব্যবস্থা, স. স. ২৬।৬৩৯।১২
Leader
দেশনায়ক, স. ১০।৪৮৭
Leather suitcase
চর্মপেটক, য়ু. ডা. ১।৫৯২।১১
Liberal
গতিশীল, য়ু. প. ১।৫৭৪।২০
Lift
কলের দোলা, য়ু. ডা. ১।৬০২।৬

Light year

আলো বছর, আ. অ-২।৬৯১।২৪ ;
বি. ২৫।৩৭৬।২৬,২৮ ; স্ফু. ১৩৭।৫

Linear decoration

রেখালংকার, পা. ২২।৪৮০।১০

Litterateur

সাহিত্যকার, সা. ৮।৩৪০।১৪ ; ৩৪৭।১ ;
৩৫০।১ ; ৩৫২।১১,২৩,২৭ ; ৩৫৩।১৪ ;
৪১৭।১৮ ; ৪৩২।১৭ ; ৪৯০।২০

Local

১. প্রাদেশিক, সা. স্ব. ২২।১১ ;
২. স্থানিক, আ. ৩।৫৬৪।২৪ ; পা. ১৬।-
৪৮৭।৫ ; সা.প. ২৩।৪৪১।৩; ৪৪৯।৭ ;
কা. ২৪।৩৩৭।২২ ; শি. ২৬৩।১৬

Local vernacular

=স্থানীয় প্রচলিত ভাষা, গ্র. ৬।৬৪৫।৭

Loose

ঢলকো, মু. প. ১।৫৫৮।১৩

Loyalty

=নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা, বা. ২৬।৪৮৮।৩

Lie flat

চ্যাপ্টা হইয়া শোয়া, স্ব. ১১।৪৯২।২১,২৬

Majority

বৃহদাংশিক, সং. ৩।২ ; ৫।১২

Map

ভূচিত্র, সা. স্ব. ৭।৯

Materialism

১.=তামসিকতা, প. প. প্রা. ২০৭।৭ ;
২. বস্তুতত্ত্ব, গ. ২৩।৩৪৮।১১

Materialist

১. বস্তু উপাসক, প. স. ২৬।৪৬৫।২৭ ;
২. বস্তুতান্ত্রিক, শি. ৩০৫।১০,১৫ ;
৩. বস্তুবাদী, প. ১৮।৫৩৭।২৯

Materialistic

=আধিভৌতিক, প.প.প্রা. ৪৭।১

Mathematician

গাণিতিক, পা. ২২।৪৮৮।৯ ; সা. প. ২৩।-
৪৩৬।৩০

Matriarchy

মাতৃশাসনতন্ত্র, প. ১৮।৪৪৬।২৩

Matron

কর্ত্রী, নৌ. ৫।১৭৯।৬ ; ২০১।১০ ; ২২৭।১৯

Mausoleum

১. সমাধিমন্দির, ক. অ-১।৪৫।২৪ ;
২. সমাধিঘর, মা.ধ. ২০।৬৯৪।২১ ;
৩. সমাধিভবন, স. অ-২।৭৭।১৬ ; বি.
৫।৪৭৭।১৩

Mechanic

১. যন্ত্রতত্ত্ববিৎ, কা. ২৪।৩৩২।২৮ ;
২. যন্ত্রী, আ. ৩।৬১৮।২৬ ; কা. ৭।১৫৩।-
২৪ ; স. ১২।৪৬৯।২৯ ; সা. প. ২৩।-
৩৯৭।১৮

Mechanics

১. যন্ত্রবিজ্ঞান, রা. চি. ২০।৩০২।১১ ;
২. যন্ত্রবিদ্যা, তি. স. ২৫।২৪৬।২৪ ;
২৪৭।৪

Mechanisation

১. যন্ত্রীভবন, কা. ২৪।৪০৫।১৬
২, যান্ত্রিকতা, শি. ২৫৫।১৯ ; ২৫৬।৪

Mechanist

যান্ত্রিক, সা. ৮।৪৭৪।১

Mediterranean Sea

মধ্যধরণী সাগর, চি. ভৃ. ৫৭।১ ; চি. চ.
১২০।৪

Memorial

স্মরণস্তম্ভ, মু. প. ১।৫৪০।১৯ ; চা. ৪।৫১৫।

১০-১১ ; ৫২৪।১ ; যা. ১৯।৩৭৮।১ ; গ্র. ১০।৬৬০।৮ ; ই. ১০৫।১২

Mesmerism

=সম্মোহন, শা. ১৪।৪০৬।২৬

Metamorphorised rock

=শিলবিকার, শ. ১২।৫৮০।১

Metaphysics

তত্ত্ববিদ্যা, শ. ১২।৫৮০।২৬-২৭

Meteorology

১. =নভোবিদ্যা, শ. ১২।৫৮১।২৯

২. আবহতত্ত্ব, শি. ৩০৫।৬

Metrist

১. ছন্দোবিৎ, ছ. ২১।৩১৩।৬ ; ৩১৪।৫

২. ছান্দসিক, ছ. ২১।৩১৩।৩

Mid-Victorian

মধ্যভিক্টোরীয়, সা. প. ২৩।৪২২।১২ ; ৪৩৪।৪, ৯

Milksop

ঘাতকাতর, অ. অ-২।৫৭২।১৬

Miner

খনিক, সা. প. ২৩।৪৯৭।৭, ২০

Mineralogy

১. খনিবিদ্যা, তি. স. ২৫।২৪৭।২৪

২. খনিজবিদ্যা, তি. স. ২৫।২৪৭।৮, ২৪

Minority

ন্যূনাংশিক, স. ৩।২ ; ৫।১৪

Modernism

একালীনতা, গো. ৬।১৭৩।৬

Monasticism

=মঠাশ্রয়ী ব্যবস্থা, স. ১৮।৩৮৪।১৯

Monogamy

=অন্বয়-বিবাহ, ছ. ২১।৩৬৭।২৭-২৮

Monosyllabic

একমাত্রিক, শ. ১২।৩৮৬।১৩ ; ৩৮৭।১০, ২৫, ২৫ ; ৩৯০।১, ৬ ; ৫৭৫।১০, ১১, ১৫ ; ৫৭৬।১২

Moonlight Sonata

চন্দ্রালোক-গীতিকা, শে. ক. ১০।২৭৪।২৯

Moral education

চারিত্রনৈতিক শিক্ষা, গো. ৬।২৮৬।২১

Morbid

রুগ্‌ণ, ধ. ১৩।৪২১।১৪

Mountain lake

শৈলসরোবর, সা. ৮।৪৭৭।৫

Mourning dress

শোকবস্ত্র, য়ু. প. ১।৪৬১। ২৫

Multiplied

বহুগুণীকৃত, রা. চি. ২০।৩৩৫।২১

Museum

১. পরিদর্শনশালা, সা. ৮।৩৫৩।২৭

২. স্থাপত্যশালা, য়ু. প. ১।৫৪১।২৭

Mute insensate things

=নির্বাক নিশ্চেতন পদার্থ, শে. ক. ১০। ৩৫৪।১৫-১৬

Mutual admiration

অন্যোন্যস্তুতি, সে. ২৬।২৮৯।৩০

Mystic

১. মরমিয়া, সা. প. ২৩।৩৯৪।১৪

Mysticism

=ভাবকুহেলিকা, শি. ১২।৩০২।২২-২৩

Nation

মহাজাতি, আ. ৩।৫১৫।২০ ; শি. ২৬২।- ১৯ ; ৩৩৮।২০

National Congress

১. মহাজনসভা, আ. ৩।৫১৫।১৩

২. সার্বজনিক সভা, আ. ৩।৫১৫।১৩

Nativity

জন্মসংগীত, বি. ৫।৪৪০।৩

Natural leader

১. =প্রকৃত মোড়ল, প. ১০।৫৭৬।৩

২. =স্বাভাবিক অধিনেতা,প.১০।৫৭৬।৩

৩. =স্বাভাবিক চালক, প. ১০।৫৮০।৮

Naturalisation

স্বভাবীকরণ, শি. ২৭০।২৫

Naturalness

সহজতা, শি. ১২।৩০৬।৮

Navy and Air force

নৌবায়ুরথী সৈনিক, অ. অ-২।৫৩৫।১০ ;

Necktie

১. ফাঁসি, যু. প. ১।৫৬৭।৫

Negative

১. অভাবাত্মক,বি.অ-১।৩৭৬।১৬ ;রা.১০। ৩৯১।২৮ ; শ. ১২।৫৬০।১৩ ; জা. ১৯। ৩৪৭।৩ ; ভা. রা. রা. ২০।১০ ; ২১।৯

২. অভাবার্থসূচক, শ. ১২।৩৪২।২

৩. ঋণাত্মক, গো. ৬।৫৩২।৮,৯

৪. নঞর্থক, রা. চি. ২০।৩৪১।১১ ; মা. ধ. ২০।৩৮৮।৩০ ; কা. ২৪।৪৫৭।২১ ; বু. ১২।৫ ; ম. গা. ১৩।৬

৫. নাস্তিবাচক, স. ১২।৪৭৯।১০

৬. না-ধর্মী, বি. ২৫।৩৬২।২৪-২৫ ; ৩৬৪। ১৬, ২২

৭. নেতিবাচক,[১] সম. ৬।২৪

৮. শূন্যাত্মক, বা. ১৯।৪২৮।১৭

Nerve-shattering

শিরা ছেঁড়া, বাঁ. ২৪।১৭৪।২৩

Night-dress

রাতকাপড়, যু. ডা. ১।৬১৯।২০ ; তি. স. ২৫।৩০১।২১ ; ৩০২।১৩

Nod

শিরঃকম্পন, যু. প. ১।৫৪৫।২০ ; ৫৪৬।১৪

Non-co-operation Movement

অসহকার-আন্দোলন, কা. ২৪।৩৫৪।২২

Not the game but the chase

শিকার পাওয়া নহে, শিকারের পশ্চাতে অনুধাবন করা, ধ. ১৩।৪২৯।১৭-১৮

Nude

বিবেশ, গ. ২০।১৯৭।৫

Nudity

অনাবরণ, সা. ৮।৪৮৪।২৩,২৫

Nurse

সেবাকারিণী, চো. বা. ৩।৪৫৭।১৩-১৪

Nursery

১. ধাত্রীশালা, স. ৬।১৮ ;

২. শিশুপালনবাস, রা. চি. ২০।২৯২।১১

Nursing Home

=শুশ্রূষাগার, প. প. প্রা. ৪৯।৫ ; চি. প. ২৮৫।১১

Nursling

স্নুত, সা. প. ২৩।৩৬২।৫

Objective

বস্তুগত, স. অ-২।৯২ ; ৯৩।৯,১১ ; ৯৬। ৩০ ; ১২৭।১৫ ; বা. ১৯।৪৪২।৫

Objectivism

বস্তুতত্ত্ববিদ্যা, র. ১৫।৩৪৯।১ ; ৩৭৭।২৬

Objectivist

বস্তুতত্ত্ববিদ্, বা. ১৯।৩৬৬।১২

Objectivity

=বহিরাশ্রয়িতা, আ.ব্র.বি. ৫৯।১০

---

১. ইংরাজি সোপান ও ইংরাজি সহজশিক্ষা বইখানিতে বহু উল্লেখ আছে।

Oblivion
বিস্মৃতিলোক, বি. ৫।৪৬২।১
Oil-colour
বর্ণতৈল, প্রা. ৫।৫৪৬।১৮
Oilpaper
তেলাকাগজ, ছ. ১১।৪২১।২
Omnibus
=বিশ্বত্বহ, প. স. ২৬।৫১৪।৩০
Optional
স্বৈচ্ছিক, শি. ২৯১।২০
Organic
১. জৈব, শি. ৩১১।১২ ;
=সা. স্ব. ৬।১৬-১৭ ;
২. জৈবিক, রা. ১০।৪৬৪।৮,১১ ;
ছ. ২১।২৯৮।১৫ ; সা. স্ব. ৬।২১
Organisation
=ব্যূহবদ্ধতা, স. ১০।৫২১।৭-৮
Original
১. অনন্যতন্ত্র, চা. ৪।৪৭৯।২৮ ;
২. =স্বকীয়তন্ত্র, চা. ৪।৫১০।২৬
Originality
১. =অনন্যতন্ত্রতা, চা. ৪।৪৭৯।২৬, ২৭, ২৮ ; ৪৮০।৪ ;
২. অনন্যতন্ত্রত্ব, চা. ৪।৪৭৯।২৮ ; ৪৮০।১
৩. =অপূর্বতা, সা. প. ২৩।৪১০।৩
৪. মৌলিন্য (মৌলীন্য), শি. ২৩৪।১৮ ; ২৩৫।৬
Other-worldliness
=পারলৌকিক বৈষয়িকতা, আ. ৯।৫১৬।২০-২১
Paper-weight
কাগজ-চাপা, চো. বা. ৩।৪৪৮।২৩ ; গো. ৬।১৪৭।২৪ ; ৩১৬।৬ ; ঘো. ৯।২৪৬।১৬, ২৬ ; ২৪৭।১ ; ২৫১।১৫ ; পু. ১৬।৮০।৯ ; শে. ১৯।১৬০।১৩
Paradise Lost
স্বর্গচ্যুতি, প্রা. ৫।৫৩৪।২১
Paradise Regained
স্বর্গপ্রাপ্তি, প্রা. ৫।৫৩৪।২২
Paralell line
সমরেখা, সা. ৮।৪৮৫।২৩
Parasite
১. পরজীবী, শি. ২৫১।১৩
২. পরাশিত, অ. অ-২।৫৮১।৮, ১২ ; স. ৩।২৮, ৫।১, ১১
৩. পরাশ্রিত জীব, কা. ২৪।৪২৭।১১ ; শি. ২০৯।১৫
৪. পরাসক্ত, শি. ২৫১।৯, ১০, ২৪
Park
আরামবাগ, ছ. ২১।৩৫৬।২৫, ২৬
Park of recreation
আরামবাগ, রা. চি. ২০।৩২৫।১৮
Parliament
রাষ্ট্রসভা, আ. ৩।৫১৭।২
Part
পালা, গো. ৬।২৬০।১০
Partial disarmament
অস্ত্রলাঘব, সা. প. ২৩।৪৪৯।১৬
Passion (?)
আকৃষ্টিপরতা, অ. অ-২।৫৭২।১৭
Passive
১. অকর্তৃক, সা. প. ২৩।৪৫৭।৭
২. অকর্মক, ধ. ৮।২৫১।৮
৩. =অকারী, রা. চি. ২০।৩০৫।১৭
৪. =অক্রিয়, সা. প. ২৩।৪৫৬।২৭-২৮ ; বা. ২৬।৪৪৪।১১

Passport

ছাড়চিঠি, মু. ১৪।২১৯।৪ ; গ. ২৪।২৩০।৭

Patriarchy

পিতৃশাসনতন্ত্র, প. ১৮।৪৪৬।২৩

Patriot

স্বাদেশিক, আ. ৩।৬১২।২৬

Patriotic

দেশাত্মবোধী, রা. চি. ২০।২৮৪।২ ; গ. ২৪।২০৭।২৮ ; ২০৮।২১ ; কা. ২৪।৪৪৪।-৩ ; ৪৫১।২৬

Patriotism

১. দেশহিতৈষা, আ. ৩।৫৭৫।২০-২১, ২৮, ৩০ ; ৫৮৫।১৯ ; ৫৮৬।৪ ; ৫৮৯।-২৮-২৯

২. দৈশিকতা, বি. পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬২, পৃ. ২

৩. স্বদেশহিতৈষিতা, আ. ৩।৫৭৫।১৫,২৫

৪. স্বদেশীয়তা, ভা. ৪।৪৭২।২৮

৫. স্বাদেশিকতা, আ. ৩।৫৬০।১১ ;
=পরি. ১০।৬২০।২৪ ; জী. ১৭।৩৪৮

Pattern

=রূপকল্প, হ. ২১।৩৪২।২২ ; ৩৫০।৯

Pavilion

=মণ্ডপ, রা. চি. ২০।৩২৬।৬

Pedestrian

পদাতিক, স. ১০।৫০৪।২০

Pendulum

দোলাদণ্ড, চি. প. ১৯।৮

Penmanship

লেখকিয়ানা, আ. ৯।৫২৫।১৫

Penny wise and Pound foolish

১. =কড়ায় কড়া কাহনে কানা, স. ১২।-২০৬।১৮, ১৯ ;

২. পয়সার বেলায় পাকা টাকার বেলায় বোকা, প. স. ২৫।৫৪৬।২০

Peripatetic school

১. পান্থশিক্ষালয়, রা. চি. ২০।৩১৭।১৫ ;

২. ভ্রমণবিদ্যালয়, রা. চি. ২০।৩১৬।৯

Personality

১. =পুরুষ, সা. প. ২৩।৪৪৩।১৯-২০ ;

২. =ব্যক্তিস্বরূপ, বা. ১৯।৪১৯।১১ ; হ. ২১।৩৬৩।২৮ ; সা. প. ২৩।৪০৪।২৬; ৪৩৭।১৩ ; ৪৫৪।৫

Personal magnetism

=বৈয়ক্তিক চৌম্বকশক্তি, চি.ষ. ১২৭।২৪

Perspective

১. পরিপ্রেক্ষণ তত্ত্ব, শা. ১৪।২৮৮।৬ ;

২. পরিপ্রেক্ষণিকা, সা. প. ২৩।৫২৫।১৪ ; শি. ২৭০।১২

৩ পরিপ্রেক্ষণী, স. স. ২৬।৬৩৯।২২

৪. =পরিপ্রেক্ষিত, সো. ৩। সূ.২।১ ;=বা ১৯।৪৩৯।১৯-২০ ; সা. প. ২৩।৪৫৭-।১২ ; বি. ১৩৯।১৭ ; ম. গা. ২৪।১১

৫. প্রেক্ষণী, গ. ২৬।৩৬২।২৫

Pessimist

দুঃখবাদী, স. ১২।৪৮১।১৪

Phantom

=উপচ্ছায়া, স. অ-২।১০২।৩২

Philologist

১. ভাষাবিজ্ঞানী, বা. ২৬।৩৭৬।১২, ২০, ২২ ; ৪৩৮।৪

২. শব্দতাত্ত্বিক, সা. ৮।৫০৭।২৩

Photogenic

চিত্রযোগ্যতা, ক.ই.ক. ১৮।৫৫৫।১৮

Physics

১. পদার্থতত্ত্ব, ক. ৭।১৭৭।২৪

২. বস্তুতত্ত্ব, আ. ৩।৩৫০।২৮ ; প্র. নি.

৪।২৬২।২৯ ; র. ১৫।৩৭৮।২৭ ; ৩৭৯-।১৩ ; =যা ১৯।৪৩৩।১

Physiology

১. শরীরতত্ত্ব, শে. ১৯।১৫৬।৮, ৯

২. শরীরতন্ত্র, ভা ৪।৩৯৯।২৩ ; ৪১২।১৬

৩. শরীরবিজ্ঞান, সা প. ২৩।৪০৫।৮ ; বা. ২৬।৪৫৬।৭

Physiologist

শরীরতত্ত্ববিদ্‌, ছ. ২১।৩৩৯।১৪

Picture-gallery

চিত্রভাণ্ডার, রা. চি ২০।৩০৬।৭ ; সা. স্ব. ৫।১৮

Pilot

মাঝি, সে. ২৬।২৯৫।৯

Pioneer

=পুরোযায়ী, রা. চি ২০।৩০২।১৪

Planchette

টেবিলচালা, জী. ১৭।৩৬৪।৯

Point

=ব্যাখ্যানসূচি, গ্র. ২৩।৫০৮।২

Police Rule

পুলিশ রাজকর্তা, স. ১০।৫০৩।২৭

Political

রাষ্ট্রনীতিক, আ: ৩।৫২২।১৫ ; ৫২৫।২৫

Political leader

রাষ্ট্রনেতা, রা. চি. ২০।৩৪১।১।১ ;

Political Science

রাষ্ট্রতত্ত্ব, ক.ই.ক. ১৮।৫৬১।২৩

Politician

১. রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ (-দ্‌), আ. ৩।৫১৬।১৬ ; কা. ২৪।৩৩২।২৮

২. রাষ্ট্রতাত্ত্বিক, শে. ক. ১০।২৭৬।২১

৩. রাষ্ট্রনীতিক, আ. ৩।৫৫৯।২২ ;

৪. রাষ্ট্রনীতিবিৎ, রা. চি. ২০।২৮৯।৮

Politics

১. রাষ্ট্রতন্ত্র, আ. ৩।৫১৭।৭ ; ৫১৯।৫ ; স্ব. ১১।৪৮৫।১৮ ; প. ১৮।৫২৫।২৩ ; ক.ই.ক. ১৮।৫৬০।২৭ ; ৫৬১।১

২. রাষ্ট্রনীতি, আ. ৩।৫৫৯।১৯ ; ৫৬০।-১১ ; রা. ১০।৪৪৯।২৪ ; রা.চি. ২০।-৩৪০।১৭ ; কা. ২৪।৩৭২।২৩

৩ রাষ্ট্রনীতিতন্ত্র, আ. ৩।৫১৭।৬

Polyarchy

বহুরাজকতা, রা. ১০।৪৪২

Popularity

জনাদর, কা. ২৪।৪১৩।২২

Positive

১. অস্তিত্ববাচক (Affirmative), বা. ২৬।৪৪৮।১৯ ;

২. অস্তিবাচক, ই.স.শি. অ-২।৪৪৩।২২ ;

৩. অস্মিতাসূচক, সা.প. ২৩।৩৫৭।৮ ;

৪. ইতিবাচক, ই. অ-২।২৮৬।২৩ ; ৪৩২-।২৫ ;

৫. কর্তৃভাবক, আ. ৩।৬০৫।২ ;

৬. ধনাত্মক, গো. ৬।৫৩২।৯ ;

৭. পূর্ণাত্মক, যা ১৯।৪২৮।১৬ ;

৮. ভাবাত্মক, প্রা. ৫।৫২৪।২৫ ; রা. ১০-।৩৯১।২৮, ২৯ ;

৯. ভাবার্থক, ভা.রা.রা. ২০।১২।১০ ;

১০. সদর্থক, রা. চি. ২০।৩৪১।১২ ; মা.ধ. ২০।৩৮৮।৩০ ; কা. ২৪।৪৫৭।২১ ; বু. ১২।৫ ; ম. গা ১৩।৬ ;

১১. =হাঁধর্মী, বি. ২৫।৩৬২।২৪-২৫ ; ৩৬৪।১৭, ২১, ২২ ; ৩৭১।১০

Reason

=প্রজ্ঞা, মা.ধ. ২০।৩৮২।১৫

Red Sea

রোহিত সমুদ্র, চি.চ. ৪।১২০।৪

Reflex action

=প্রতিবৃত্তি ক্রিয়া, স. ১০।৫০৩।১৮

Region study

=স্থানিক তথ্যসন্ধান, র়া.চি.২০।৩০৫।=১৯, ২৬

Repetition

=পুনর্বৃত্তি, শ. ১২।৩৭১।২

Report

তালিকা, আ. ৩।৫৬৭।২৫

Resignation

=দুঃখস্বীকার, শা. ১৪।৪৬৬।২২, ২৮

Retired

অবসৃত, রা. ১০।৪৩৭।৬

Retranslation

প্রত্যনুবাদ, অ.অ-২।৫০৯।৪, ১৯ ; ৫১৪।১৩

Reunion

=মিলনসভা, আ. ৯।৪০৭।২৫

Righteous indignation

=ঘৃণামিশ্রিত আক্রোশ, য়ু.ডা.১।৫১৬।২৯

Rolling stone gathers no moss

গড়ানে পাথরের কপালে শ্যাওলা জোটে না, শে.ক. ১০।৩০১।৭

Romance

১. =ঐতিহাসিক উপন্যাসরস, আ. ৯।-৫০০।১-২

২. =কাহিনীরস, আ.স্ম.বি. ৫৩।৩-৪

Room Heater

তাপসঞ্চার যন্ত্র, অ. অ-২।৫৩৩।১১

Rotation

স্বাবর্তন, আ. অ-২।৬৯২।২৩, ২৩ ; ৬৯৩।২৫

Routine

দিনপদ্ধতি, আ. ১২১।৪

Sailors' House

নাবিকাশ্রম, য়ু.ডা. ১।৫৯৬।১০

Sanatorium

১. =আরোগ্যালয়, র়া.চি. ২০।৩১৮।১৮

২. আরোগ্যশালা, র়া.চি. ২০।৩২৭।১

৩. আরোগ্যাশ্রম, র়া.চি. ২০।৩১৮।৮

৪. স্বাস্থ্যনিবাস, র়া.চি. ২০।৩১৮।১৭, ১৮

Sandpaper

বেলা-কাগজ, যো. ৯।২৩১।১১

Sanscritized

=সংস্কৃতান্বিত, প্র.৩।৬৪৫।১(চৈত্র ১৩১১)

Scepticism

সংশয়বাদ, জী. ১৭।৩৭৭।১১

Science

বিজ্ঞানশাস্ত্র, শে. ১৯।১৬৮।১৩

Scientific

বিজ্ঞানী, প্র. ২৩।৬২।১৮ ; বা. ২৬।৩৮২।২৪ ; ৪৫৫।১৯

Scientist

বিজ্ঞানী, সেঁ. ২২।৪৯।৪ ; আ. ২৩।১০৮-।৪ ; ন. ২৪।১০।২ ; তি.স. ২৫।২৪৭।২১ ; ২৭৭।২৩ ; বি. ২৫।৩৬০।২,১৫ ; ৩৬২।৪।-২৪ ; ৩৬৫।২৩ ; ৩৬৬।৬ ; ৩৬৮।২৬ ; ৩৬৯।১২ ; বা. ২৬।৩৮৯।১৯

Screen

তিরস্করিণী, প্রা. ৫।৫৩৬।১১

Seagull

১. সমুদ্রপাখি, ম. ১৫।৪২।২৪

২. সিন্ধুশকুন, শে. ১০।১৫৫।১৩

Self-centred

আত্মকেন্দ্রিত, প্র.প্র. ১।স্থ.১।২৪-২৫

Self-complacence

আত্মসুখতৃপ্তি, আ. ৩।৬০৮।১৪

Self-consciousness

আত্মচেতনা, আ. ৩।৫৪৪।৫

Self-contradiction

১. স্বতোবিরুদ্ধতা, শা. ১৬।৪৬৪।১৮ ; কা. ২৪।৩৭৫।২৫

২. স্বতোবিরোধিতা, শা. ১৬।৪৬৪।১৮ ; বি. ১৩৭।১৬

৩. স্বতোবিরোধ, প. ২।৫৪৫।২০ ; আ. ৩।৫৪৬।২৮ ; সা. ৮।৪৭৭।২০

Self-contradictory

১. স্বতোবিরুদ্ধ, সা.প. ২৩।৪৩৫।১৫ ; ৪৪১।১৭ ; শি. ২৭৯।১১ ; প.প.প্রা. ৯২।২

২. স্বতোবিরোধী, ব্র. অ-২।২১২।১০

৩. স্ববিরোধী, মা.ধ. ২০।৩৮২।১১ ; ৩৮৬।১৩

Sense of humour

হাস্যতাবোধ, প. ২।৫৬৮।৬

Sensitiveness

সাড়শক্তি, চি.ব. ১১৮।১৩

Sentence

=পদ, শ. ১২।৫৩৫।১৫

Sentimentalism

১. =ভাববাতিকতা, রা. ১০।৪৭০।২৬-২৭

২. =ভাবাতিশয্য, কা. ২৪।৩৯১।১১

৩. হৃদয়ালুতা, প. ২।৫৬৮।১৯

Slang

অপভাষা, অ. অ-২।৫৮৬।২৬ ; বা. ২৬। ৪২৯।১৭

Sociology

১. সমাজতত্ত্ব, আ. ৩।৫৮৬।৯ ; প. ১৩। ৫৬।১ ; রা.চি. ২০।২৮৯।২৫

২. সমাজনীতি, প. ১৩।৫৮।১৭

৩. সমাজবিজ্ঞান, রা.চি. ২০।৩০২।১১

Socio-monarchy

সমাজ-রাজতন্ত্র, আ. ৩।৫৪৩।২৬

Soloist

একককণ্ঠী, চি.প. ১১৩।৭

Somnabulistic

১. স্বপ্নগতা, ছি. ১১৩।১৬

২. স্বপ্নচালিত, গো.বা. ৩।৩৮৯।২২-২৩ ; প্র. ১৫।৫৩৫।২৮

Sovereignty

সার্বভৌমিকতা, চা. ৪।৫২৩।১৬ ; হা. ৬।৭১।১৬ ; কা ২৪।২৪৭।২১ ; সা.স্ব. ২৫।১৮

Spare the rod and spoil the child

বেত বাঁচাইলে ছেলে মাটি করা হয়, সা.প. ২৩।৩৭২।২৫-২৬

Speaker

সভানায়ক, সা.প. ২৩।৪৮৭।১৪

Spectrum

১. বর্ণলিপি, আ. অ-২।৬৯০।১৭ ; ৬৯১।-২৯ ; বি. ২৫।৩৫৯।২৪, ২৭

২. বর্ণসপ্তক, বি. ২৫।৩৭৭।২৩ ; ৩৭৮।২৯

Squat

চৌকা হইয়া বসা, গো. ৬।১৭৭।১৯ ; রা. ১০।৩৯৬।৯

State

রাষ্ট্রিক, বা. ১৯।৩৬৯।১৯, ২১

Statesman

রাষ্ট্রনায়ক, রা.চি. ২০।৩৪৩।৭

Static

১. স্থিতিপ্রধান, সা. ৮।৪১১।১

২. স্থিতিপ্রবণ, ছ. ২১।৪০৩।৭

Statistician

১. শুমারনবিশ, স. ১০।৫১২।১২

২. সাংখ্যিক, রা.চি. ২০।২৮৬।২০ ; মা.ধ. ২০।৪২৫।২৬ ; বা. ২৬।৩৭২।৯

Statistics

১. সংখ্যাতত্ত্ব, শা. ১৩।৫৩১।২

২. সাংখ্যতথ্য, রা.চি. ২০।৩৩৯।২

Statuary

মূর্তিশালা, মা. ৪।স্থ.J.১

Stellar music

জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সংগীত, প. ২।৬০৩।১-২

Steward

=সেবক (যাত্রীদের) য়ু.প. ১।৫৩২।৩

Stimulus

=তাড়না, চি.প. ১০৯।১২

Stratosphere

স্তব্ধস্তর, বি. ২৫।৪০৯।৭-৮

Style

১. =ছাঁদ, আ. ৯।৫২৩।২২

২. রচনারেখা, শে.ক. ১০।২৭৮।৮

৩. =রীতি, আ. ৯।৫২৩।২৫

Sub-consciousness

১. উপচেতনলোক, আ. ৫৫।৩

২. মগ্নচৈতন্য, বা. ২৬।৪০৫।১৮

Sublime

=মহান[১]

Sublimity

১. =অদ্ভুতরস, স. ১২।২২৯।১৪

২. মহিমা[১]

১ অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র (১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯)।

Success brings success

সিদ্ধিই সিদ্ধিকে টানে, কা. ২৪।৪২১।১৯

Suggestion

১. =ভাব, প. ১৮।৫১৫।১৫

২. =ভাবব্যঞ্জনা, স. ১৮।৩৩৯।১,২

Sunday school

রবিবাসরিক স্কুল, য়ু.প. ১।৫৬৩।২৩

Sun goggles

রোদ বাঁচাবার রঙিন চশমা, ছ. ১১।৪১৮।২৫

Symmetry

১. =সম্মিতি, ছ. ২১।৩৬০।২, ২৪ ; ৪৩০।৯

২. সুমিতি, সা.স্ব. ১৯।১৮, ১৯, ১৯

Tablet

১. নাম-খোদিত সমাধিপাষাণ, গ্র. ৫।৫৬৩।৬ (পৌষ ১২৯২)

২. সমাধিস্তম্ভ, বি. ৫।৪৬১।২৩

Tail-coat

১. =লাঙুলকোট, য়ু.প. ১।৫৪৫।৯

২. =লেজকোট, য়ু.প. ১।৫৪৫।১২

Temporary

ক্ষণিক-ব্যবহার্য, অ. অ-২।৫৪৩।৮

Terminuss

শেষ মোকাম, বাঁ. ২৪।১৭৪।১৩

Testimonial

সাদরপত্র, গ. ২১।২৩৮।৭

Theory of evolution

অভিব্যক্তিতত্ত্ব, স. ১২।৪৮১।২৭

Theory of gravitation

আকর্ষণতত্ত্ব, শি. ২৫৯।১

Theory of natural selection

প্রাকৃত নির্বাচনতত্ত্ব, য়ু.আ. ১।৫৯০।১১ ;

প. ২।৫৯৮।৮, ৮,৯-১০, ১১ ; ধ.১৩।৪১৭।-২০ ; সা.প. ২৩।৩৮৬।১৫,১৬,১৭ ; ৪৩৭।১৬

To err is human, to forgive, divine

দোষ করা মানবের ধর্ম, ক্ষমা করা দেবতার, প্র.নি. ৪।৩১০।১০-১১

Toast

১. তোষ, ছি. ২১৭।৮

২. তোস, চি.চ. ২২৩।৫

Tragedy

১. বিরহান্তক, বা. ২৬।৩৮৬।৭

২. শোকান্ত নাটক, বি. অ-১।৩৫৯।৯

Tragic

পরিণামদারুণ, আ. ৯।৫০১।৫

Transliteration

প্রত্যক্ষরীকরণ, প.প.প্রা. ৬৩।৬

Trinitarianism

ত্রিত্ববাদ, প.স. ২৬।৫৪৫।৫

Troposphere

=ক্ষুব্ধস্তর, বি. ২৫।৪০৮।৩০

Truncheon

হ্রস্বযষ্টি (কনস্টেবলের) সো. ৬।৬০৩।৩

Twigs

=কাঠিকুঠি, ইং. অ-২।৩২৬।২০

Twilight

১. প্রদোষ, কা.কা. ২।৮৩।১৭ ;
পা. ২২।৪৩৪।১৮ ; সা.প. ২৩।৫২০।৩

২. প্রদোষ আলো, চি.প. ৫০।১৮ (২৯শে বৈশাখ ১৩৩১) ; প্র. ১৫।৫৪১।১৭ (১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪)

Twominded

দ্বৈতমনা[১]

Twomindedness

দ্বৈতমানস, বা দ্বৈমানসিকতা[১]

Type

শ্রেণীগত, সা.প. ২৩।৪৫৯।২৩

Ultra-violet ray

১. =বেগনি-পারের আলো, বি. ২৫। ৩৫৮।২৫ ; ৪০৬।২৪

২. বেগনি-পারের রশ্মি, বি. ২৫।৪০৬। ১৭, ১৮

৩. বেগনি-পেরোনো আলো, সে. ২৬। ১৯১।২২-২৩ ; ২৮৭।১৬-১৭

Underground train

পাতাল-বাষ্পযান, যু.ভা. ১।৬০৩।১

Universal brotherhood

সার্বজাতিকতা, প. ১৮।৪৫১।১৭

Unproductive labour

=বন্ধ্য-শ্রম, ই. ১১৫।১

Unreal

১. অবাস্তবিক, আ. ৩।৫৮৫।১৩

২. অযথার্থ, সা.প. ২৩।৪০৩।৭

Unstable equilibrium

=ভারসাম্যের প্রতিষ্ঠাতা, ছ. ২১। ৩৫২।১ ; ৩৬৯।৯

Universal

১. বিশ্বজনীন, বি. অ-১।৩৪৮।৮ ; স. ১৮। ৩৫২।৬ ; ৩৭৭।৭ ; ৩৯২।১২ (বহু)

২. বিশ্বভূমীন, মা. ধ. ২০।৩৮৭।৯ ; ৩৯৬। ২৫ ; ৪৩০।৪

Up train

উজান ট্রেন, ন. ২৪।৩৭।৯

Utilize

ব্যবহার করা ('বিপদকে ব্যবহার করা') কা. ২৪।৪৩২।১২

[১] অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র (৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭)।

Variation

=বৈষম্য, ছিন্নপত্রাবলী. ৪৮০।১১

Veil

উর্দি (শুশ্রূষাকারিণীর) অ. অ-২।৫১৮।২৩

Vegetarian

১. উদ্ভিজ্জভোজী. বি. অ-১।৩৪৯।৯, ১৩, ১৪

২. উদ্ভিজ্জাশী, রা. ১০।৪২৭।২৩

Vehemence

সংরাগ, ছ. ২১।৩৫২।২৭, গ্র. ১৩।৫৪৩।২৯

Vigilance Association

=চৌকিদার দল, আ. ৩।৬০২।১৩-১৪

Vigorous protest

=বলবান অস্বীকৃতি, বাঁ. ২৪।১৭৮।২২ (তু. প্রচণ্ড অস্বীকার, ৫।২৭১।৪)

Visitors' Room

অতিথিদের প্রতীক্ষাশালা, য়ু.ডা. ১।৬০২ ।২৫

Vitamin

প্রাণীন পদার্থ, শি. ২৫০।৯

Voice

কণ্ঠ, য়ু. প. ১।৫৪২।১৯

Volcano

১. অগ্নিগিরি, শৈ. অ-১।৪৮৮।২২ ; যা. ১৯।৪৮০।৩; রা. চি. ২০।৩৪৭।১৮ ; প্রা. ২২।:৮।১৭

২. আলামুখী, অ. অ-২।৫৬২।৫, ৯, ১৩

Voluntary

১. বিণ =ঐচ্ছিক, চি. প.৭৪।৪

২. বি. =স্বেচ্ছাকৃত্য, চি. প. ৭৩।২৩

Volunteer

স্বয়ংব্রতী, অ. অ-২।৫২৫।১৩

Waiting-room

১. যাত্রিশালা, চো. বা. ৩।৪৩৬।২৫ ; ৪৮৪।৪ ; প. ১৩।১৩।১৩ ; ১৪।১

২. যাত্রীঘর, প. ১৩।১৪।৯, ১৫ ; ১৫।২৪

Warmth

উত্তাপ, সা ৮।৪৭৪।১৫ ; চি.প. ১৩০।১ ; ১৬৭।৯ ;

Waste-paperbasket

১. ছেঁড়া-কাগজের ঝুড়ি, পু. ১৬।৫৭

২. পতৎগ্রহ, চি. প. ২৪৫।১-৩

Water-mill

জলযন্ত্র, পু. ১৬।৯৬।১৬

(The) West

সূর্যাস্তভূমি, রা. ১০।৩৯২।৬

Westernism

পাশ্চাত্যিকতা, শে. ক. ১০।৩৫৮।২৪

Whistle

১. শিঙে, বি. ২৫।৩৭৯।১

২. শৃঙ্গ, বি. ২৫।৩৭৯।২

Wide experience

বিস্তৃত অভিজ্ঞতা, তি. স. ২৫।২৫০।১১

Widower

বিস্ত্রীক, যা. ১৯।৫২৩।২৬

Wild goose chase

বুনো হাঁস শিকারের চেষ্টা, শে. ক. ১০।৩৬২।৬-৭

Windmill (wheel driven by wind)

১. বায়ুচক্র, আ. ঞ্চ. বি. ১৭।১৮

২. বায়ুচলচক্র যন্ত্র. রা. চি. ২০।৩০৩।১৬

৩. (জলতোলা) হাওয়া-যন্ত্র, চা. ১৩।২৯৩।৩

Wit

=মূর্ত হাসি, সে. ২৬।২৮২।১-২

Wrist watch

কজি ঘড়ি, চা. ১৩।২৯৪।৪ ; শ্যা. ২০।১২২।৯ ; খা. ২১।২৯।১৮ ; সে. ২৬।২৪৮।৯, ২২ ; সা. স্ব. ১১।১০

Yellow peril

=পীতসংকট, কা. ২৪।৩০২।১৬

Zealot

কদ্যুৎসাহী, পা. ২২।৪৭৭।১৪

পরিশিষ্ট

মূল প্রবন্ধ ছাপা হবার পর নতুন কিছু তথ্য লক্ষ্যগোচর হয়েছে, সেই-সব তথ্য এখানে প্রথমেই সংযোজন অংশে দেওয়া গেল। সংশোধন অংশের কিছু মুদ্রাকর-প্রমাদ কিছু লেখকের স্বকৃত প্রমাদ।

সংযোজন

Black and white Association[1]
গোরা-কালা-সম্মিলনী, চা. ১৩।৩১০।২৭

Concord
স্বরৈক্য*

Desertion
ত্যাগপত্র, গো. ৬।৫৬৩।২৩

Discord
বিস্বর*

Graphic
রেখাঙ্কন চিত্রিত, চি. ব. ১১০।৩

Harmony
স্বরসংগম বা স্বরসংগতি*

Humdrum
=তুচ্ছ, সা. ৮ ৩৯০।২

Inorganic matter
=জড়পদার্থ, চি. ব. ১০৯।১২

Laboratory
৩. রাসায়নিক পরীক্ষাশালা, শা. ১৬।৩৫৮।৫ ;

Mediterranean Sea
মধ্যধরণী সাগর, গী.[2] ১১।১৬৩ পৃ., ১৬৩ পৃ.

Negative
৮. নেতিভাবক, আ. ৩।৬০৫।২

Original Sin
=গোড়ায় গলদ, কা. ২৪।৩৩৫।২৭

Part
১. অংশ, গো. ৬।২৮৪।৯ ;

Pathology
রোগতত্ত্ব, দ্বি. ১১।৪৩৮।২৬

Programme
১. কার্যতালিকা, রা. চি. ২০।৩০২।১৩
২. কার্যপদ্ধতি, রা. চি. ২০।৩০২।৬

Red Sea
১. লোহিত সমুদ্র, গী. ১১।১৫৬ পৃ.
২. রোহিত সাগর, গী. ১১।১৬৫ পৃ., ১৬৬ পৃ.

A bird in the hand is worth two in the bush
১. ঝোপের মধ্যে গণ্ডাখানেক পাখি থাকার চেয়ে মুঠোর মধ্যে একটা পাখি ঢের ভালো। ছি. ১২।৫-৬
২. দুটো পাখী ঝোপে থাকার চেয়ে একটা পাখী হাতে থাকা ভালো। চিঠিপত্র অষ্টম খণ্ড পৃ. ৬৭*

Building castle in the air
আসমানের উপর কত ঘরবাড়িই না বাঁধিয়াছিল। ব. হা. ১।৪১২।১৮-১৯

Enough is as good as a feast
যা যথেষ্ট সেটাই ভূরিভোজের সমান-দরের, যা ধ. ২০।৩৮২।২৮-২৯

Example is better than precept
উপদেশের অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক ফলপ্রদ। ব্য. ৭।৫১০।১১

---

১ শ্রীপ্রশান্ত মণ্ডল জানিয়েছেন।
২ গী.=গীতিমাল্য

Knowledge is power
জ্ঞানই বল, স ১২।২৫৩।২০

Symphony
ধ্বনিমিলন*

Symphonic
সংধ্বনিক*

There is many a slip 'twixt the cup and the lip
ওষ্ঠ এবং পাত্রের মধ্যে অনেকগুলি ব্যাঘাত। চিঠিপত্র অষ্টমখণ্ড পৃ. ১০০[৩]

To err is human, to forgive, divine.
২. ভুল করা মানবধর্ম, মার্জনা করা দেবধর্ম, স. ১২।৩৫০।১৩, ১৪

Truth is beauty
সত্যই সৌন্দর্য, সা. স্ব. ৬।১

Where there is a will, there is a way.
ইচ্ছা যেখানে পথ সেখানেই আছে, শি. ১২।৩১৪।১১

সংশোধন

Abstract, Abstraction, Centripetal, Characteristics, Cosmic Ray ১., Force of gravitation ২., Fossil, Fossilized, Generalization, Government, Guide, Infra-red light, Instinct, Interesting ২., Metaphysics, Monosyllabic, Not the game but the chase, Parasite, Stratosphere, Type, Wild goose—এই ইংরাজি শব্দগুলির পরে বাংলা অনুবাদের আগে = চিহ্ন বসিবে।

Batik, Bourgeosie, Carbonic Acid, Carbonic Gas, Cemetery, Terminus—শুদ্ধ বানান হবে।

অবচ্ছিন্ন (Abstract, Abstraction), সার্বভৌমক (Cosmopolitan), পাঞ্চবার্ষিক সংকল্প (Five Year Plan), বেলে-কাগজ (Sand paper), প্রাকৃতিক (Theory of Natural Selection), ভারসাম্যের অপ্রতিষ্ঠতা (Unstable eqilibrium)—শুদ্ধ রূপ হবে।

অন্যান্য ভুলের নির্ভুল রূপ

Abstract = অবচ্ছিন্ন, শা. ১৪।...

Carbon-di oxide
...যা. ১১।৪৩২।১০

Cemetery..., বি. ৫।৪৭৭।২৪

Charade...হা. ৬। মুখবন্ধ

Deserving...অ. অ-২।...

Force of Gravitation ১...প ২।৬২৪।২৬

Galvanometer...চি. স্ব...

Guide = পাণ্ডা, য়ু. ডা, ১।৬১৫।৩০

Humanism...সা. ৮।৩৯৭।১

Interesting ১...চি. প. ১২১।১৭
২...= চি. প....

Keepsake...স. অ-২।৬২।...

Mausoleum ১..., ক. অ-১।৪৬।৫
৩..., স. অ-২।৭৯।...

Mourning dress...য়ু. প. ১।৫৬১।২৫

Penny wise and Pound foolish
২...প. স. ২৬।...

Physics ২...আ. ৩।৫৫০।২৮;

Power of observation
১...আ. ৩।৫৮৬।১২
২...গ্র. ৩।৬৪৭।১

Progressive...সা. প. ২৩।৫১৭।২১

Righteous Indignation
...য়ু. ডা. ১।৬১৬।২৯

Speaker...পা. ২২।...

Stimulus...চি. স্ব....

---

৩. শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত পত্র, নভেম্বর ১৯২৭। 'তীর্থঙ্কর', ১ম সং, ১৩৪৬।

৪. শ্রীসুবিমল লাহিড়ী জানিয়েছেন।

ইহার সাহিত্য পরিচয়ের প্রথম
সূচনাকালে তাহাকে দেখিয়াছি।
তখন গিরি-নিঃসৃত নির্ঝরের মত সে
ছিল ক্ষীণ-ধারা, অসমাপ্তির
প্রস্তরস্তূপে তাহার প্রবাহ ব্যাহত।
অবশেষে একদা পূর্ণতালাভ করিয়া
নিজের ঐশ্বর্যে যখন সে প্রতিষ্ঠিত
হইল তখনও তাহাকে দেখিলাম।
কিন্তু সেদিনও মনের মধ্যে আশঙ্কা
ছিল। কেননা বাংলা দেশের পলি
মাটিতে যেমন কোনো কীর্তিমন্দির

সুখী হয় না তেমনি
মিলনী শক্তির অভাবে আমাদের
দেশে কোনো একসংঘ পাকা
হইয়া টিঁকিতে পারে না, রন্ধ্রে
রন্ধ্রে দল বিরোধের দুর্বার টান
তাহার ভিত্তিতে ভিত্তিতে প্রবিষ্ট
বিদারণকারী বিনাশকে পরিপুষ্ট
ও প্রসারিত করিতে থাকে।
বেশি করিয়া একমাত্র বঙ্গীয় সাহিত্য
পরিষদের জন্যেই এরূপ দুর্যোগ

হতে পারে। এ পর্যন্ত যাঁহারা অনেক
রচনা করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা
সংস্কৃতবাদী পুরুষ। তথাপি তাঁহাদের
বিবেক সংস্কৃত ইহাকে সন্ধিভেদ হইতে
রক্ষা করিতে পারে নাই। বস্তুত
বঙ্গবাণীর চিত্ত ইহাকে গভীরভাবে
রক্ষা করিয়াছে। সাহিত্য বঙ্গবাণীর
সত্য সম্পদ, সাহিত্যে বঙ্গবাণী আপন
গৌরব উপলব্ধি করে। বাংলা দেশে
সাহিত্য পরিষৎ আপন সার্থকতার
আশ্রয় পাইয়াছে। তাই আজ

আটত্রিশ বৎসর কালের অভিজ্ঞতার
দ্বারা সংযুক্ত এই পরিষৎকে
নিঃসংশয়িত কণ্ঠে অভিবাদিত
করিবার দিন আজ আসিল। এই
দিন পূর্ণতর প্রাণশক্তি বহন
করিয়া বৎসরে বৎসরে প্রত্যাবর্তন
করুক এই কামনা করি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবস-উৎসবে অভিনন্দন

রবীন্দ্র-সংগ্রহ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

রবীন্দ্রকাব্যে পাঠভেদ

সন্ধ্যাসংগীত

শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক রচনার যে প্রভূত এবং বারংবার সংস্কার করেছেন, রবীন্দ্রসাহিত্য যাঁরা বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা সকলেই সে কথা অবগত আছেন। বিশ্বভারতী-সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়ে তার কিছু কিছু নিদর্শন উল্লিখিতও হয়েছে। তবে পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণের অভাবে এই-সকল পাঠপরিবর্তনের পরিমাণ যে কি বিপুল, সে-সম্বন্ধে পাঠকের ধারণা স্পষ্ট হতে পারে নি।

বর্তমান সংকলনে আমরা সন্ধ্যাসংগীত গ্রন্থের পাঠান্তর সংগ্রহে প্রয়াসী হয়েছি, তার থেকে এ বিষয়ে একটা আভাস পাওয়া যেতে পারবে।[১]

আমরা বিভিন্ন মুদ্রিত পাঠই এখানে সংকলন করেছি। মুদ্রিত হবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ অনেক রচনার যেরূপ সংস্কার করেছেন তা জানতে পারা যায় পাণ্ডুলিপি দেখলে, যেমন 'গদ্যকবিতা'র পাণ্ডুলিপি, এগুলি রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে— তাতে দেখা যায়, নূতন ধারায় রচিত কবিতাগুলি প্রকাশের পূর্বে কবি বার বার পরীক্ষা করে দেখেছেন, একই কবিতা একাধিকবার নূতন করে লিখেছেন। 'শেষ সপ্তক' গ্রন্থে শ্রীকানাই সামন্ত কর্তৃক সংকলিত সংযোজনে এর দৃষ্টান্ত মুদ্রিত আছে, সাতাশ সংখ্যক কবিতার ("আমার এই ছোটো কলসিটা পেতে রাখি") দুটি পাঠান্তরে, এর একটি কবি নিজেই প্রকাশ করেছিলেন, অন্যটি শ্রীকানাই সামন্ত কর্তৃক সংগৃহীত। শেষ সপ্তকের উক্ত সংযোজনে সংগৃহীত, মূল গ্রন্থে প্রকাশিত অনেকগুলি কবিতার 'ছন্দোবদ্ধ রূপ বা রূপান্তর'ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিশ্বভারতী-সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলীর বিংশ খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে, 'আফ্রিকা' ("উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে") গদ্য-কবিতার 'মিলহীন পদ্যছন্দে' লিখিত দুটি পাঠের সঙ্গেও আশা করি অনেকে পরিচিত। অনুরূপ আরও কতকগুলি কবিতার স্বতন্ত্র রূপ রবীন্দ্র-রচনাবলীতে, সঞ্চয়িতায় ও অন্য কোনো কোনো গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে।

এ সকল নিদর্শন দ্বারা রবীন্দ্রনাথের রচনা-সংস্কারের প্রবৃত্তি ও তার প্রকৃতি বোঝা গেলেও, সংস্কারের পরিমাণ জানা যায় না, এ কথা পূর্বেই বলেছি। বস্তুতঃ এইরকম পরিবর্তন কাব্যনাট্যের ক্ষেত্রেও সুপ্রচুর, এবং গদ্যের ক্ষেত্রেও অপ্রচুর নয়।

এ সকল পাঠপরিবর্তন সংগ্রহের জন্য যে বিপুল আয়োজন আবশ্যক এককালে নিশ্চয়ই তার ব্যবস্থা হবে, এবং এই আপাত-নীরস কর্মের জন্য যে নিরলস নিষ্ঠার প্রয়োজন

১ ইতিপূর্বে 'দেশ' রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংখ্যায় (২২ বৈশাখ ১৩৬৯), বর্তমান সংকলয়িতাদ্বয় কর্তৃক সংগৃহীত, 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার পাঠভেদ-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।

এককালে সে রকম নিষ্ঠাবান কর্মীও প্রভূত সংখ্যায় উৎপন্ন হবেন; আপাততঃ আমাদের ক্ষুদ্র সাধ্য অতিসীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে অন্ততঃ এইটুকু ফল আশা করা যেতে পারে যে, বর্তমান চেষ্টায় ত্রুটিবিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতার আলোচনায় ভবিষ্যৎকালের কর্মীরা কিছু পরিমাণে লাভবান হতে পারবেন।

সন্ধ্যাসংগীতের শেষ কবিতার পঞ্চাশ ছত্রের মধ্যে ষোলোটি ছত্র স্বনির্বাচিত সঞ্চয়িতায় রবীন্দ্রনাথ রক্ষা করেছেন, আর লিখেছেন যে, ঐ গ্রন্থের "আর কোনো লেখাই আমি স্বীকার করতে পারব না।" ১৯১৫ সালের 'কাব্যগ্রন্থ' প্রকাশকালে কবিতা-নির্বাচন সম্বন্ধে এরূপ নির্মম হতে পারেন নি, তবু লিখেছেন, "সন্ধ্যা-সঙ্গীতের পূর্ববর্তী আমার সমস্ত কবিতা আমার কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে বাদ দিয়াছি। যদি সুযোগ পাইতাম তবে সন্ধ্যা-সঙ্গীতকেও বাদ দিতাম।"

তবু আমরা যে পাঠান্তর-সংকলনের কাজে বিশেষভাবে সন্ধ্যাসংগীত নির্বাচন করেছি তার কারণ—

"...যখন আপন মনে একা ছিলাম, তখন জানি না কেমন করিয়া, কাব্যরচনার যে সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল।...

"[সন্ধ্যাসংগীতের] দুটো-একটা কবিতা লিখিতেই মনের মধ্যে ভারি একটা আনন্দের আবেগ আসিল, আমার সমস্ত অন্তঃকরণ বলিয়া উঠিল— বাঁচিয়া গেলাম, যাহা লিখিতেছি এ দেখিতেছি সম্পূর্ণ আমারই।...

"এই স্বাধীনতার প্রথম আনন্দের বেগে ছন্দোবন্ধকে আমি একেবারেই খাতির করা ছাড়িয়া দিলাম। নদী যেমন কাটা খালের মতো সিধা চলে না আমার ছন্দ তেমনি আঁকিয়া বাঁকিয়া নানা মূর্তি ধারণ করিয়া চলিতে লাগিল।...বিহারী চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার বঙ্গসুন্দরী কাব্যে যে ছন্দের প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা তিনমাত্রামূলক...একদা এই ছন্দটাই আমি বেশি করিয়া ব্যবহার করিতাম।...সন্ধ্যাসংগীতে আমি ইচ্ছা করিয়া নহে, কিন্তু স্বভাবতই এই বন্ধন ছেদন করিয়াছিলাম।...কোনোপ্রকার পূর্বসংস্কারকে খাতির না করিয়া এমনি করিয়া লিখিয়া যাওয়াতে যে-জোর পাইলাম তাহাতেই প্রথম এই আবিষ্কার করিলাম যে, যাহা আমার সকলের চেয়ে কাছে পড়িয়া ছিল তাহাকেই আমি দূরে সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছি। কেবলমাত্র নিজের উপর ভরসা করিতে পারি নাই বলিয়াই নিজের জিনিসকে পাই নাই। হঠাৎ স্বপ্ন হইতে জাগিয়াই যেন দেখিলাম, আমার হাতে শৃঙ্খল পরানো নাই।...

"আমার কাব্যলেখার ইতিহাসের মধ্যে এই সময়টাই আমার পক্ষে সকলের চেয়ে স্মরণীয়।"[২]

২ জীবনস্মৃতি, "সন্ধ্যাসংগীত" অধ্যায়

আর, স্মরণীয় বলেই এই সময়কার কবিতাগুলির সম্পূর্ণ মূর্তি, এবং বিভিন্ন পর্বে কাব্য হিসাবে এগুলির ত্রুটিমোচনের কবি যে চেষ্টা করেছেন তার বিবরণ, রবীন্দ্রনাথের 'কাব্য-লেখার ইতিহাস' যাঁরা অনুসরণ করবেন তাঁদের পক্ষে আশা করি মূল্যবান বিবেচিত হবে।

আমরা এখানে সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলির যে পাঠ মুদ্রিত করছি তা কবির জীবিতকালে শেষ সংস্করণের, অর্থাৎ রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ডের (বিশ্বভারতী, ১৯৩৯) পাঠ। তার সঙ্গে পূর্বসংস্করণগুলির যেখানে যেখানে পার্থক্য যথাসাধ্য তার উল্লেখ করা হয়েছে। এইরূপ 'শেষ সংস্করণ' সকল ক্ষেত্রেই যে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পরিদৃষ্ট ও অনুমোদিত অতএব প্রামাণিক, নির্বিচারে এ কথা ধরে নেওয়া যায় না, কারণ সকল পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ তাঁর পক্ষে তত্ত্বাবধান করা সম্ভবই ছিল না; এবং তা যে তিনি করেন নি সে কথাও অনেকেই জানেন। কিন্তু আলোচ্য শেষ সংস্করণের বিশেষ একটি প্রামাণিকতা আছে; ১৯৩৯ সালে বিশ্বভারতী যখন রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশ আরম্ভ করেন তখন কোনো কোনো বই রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে সংস্কার করে দিয়েছিলেন, সন্ধ্যাসংগীত তার অন্যতম। ভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথের সংশোধিত প্রুফও রক্ষিত হয়েছে, তার কোনো-কোনো পৃষ্ঠার প্রতিলিপি এইসঙ্গে মুদ্রিত হল।

তবু একটা কথা থেকে যায়। ইণ্ডিয়ান প্রেস যখন রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন (১৯১৫) তার অন্তর্গত সন্ধ্যাসংগীতেও কতকগুলি পাঠ-পরিবর্তন হয়। যথাস্থানে সেগুলি উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সে পরিবর্তনগুলি ঐ কাব্যগ্রন্থ-সংস্করণেই সীমাবদ্ধ থেকে গেল; অতঃপর ১৯৩৪ সালে বইটি যখন স্বতন্ত্র আকারে আবার ছাপা হয়, তখন যে-কোনো কারণেই হোক ব্যবহৃত হল কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের (১৯১৫) পূর্বে প্রকাশিত সন্ধ্যাসংগীতের [১৯১১] কপি, দুয়ের পাঠ তুলনা করলেই তা বোঝা যায়। ১৯১৫ সালে কাব্যগ্রন্থ-সংস্করণে যে-সকল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সেগুলির সাধারণতঃ যে ব্যবহার প্রত্যাশিত ছিল তা হল না অর্থাৎ নূতন মুদ্রণের অঙ্গীভূত হল না। কবির ইচ্ছানুযায়ী পাঠপরিবর্তনগুলি পরিত্যাগ করা হল নিশ্চিন্তভাবে এ রকম মনে করবার কারণ নেই। তার পর রবীন্দ্রনাথ যখন রবীন্দ্র-রচনাবলী সংস্করণের জন্য সন্ধ্যাসংগীতের সংশোধন করেন তখন ঐ ১৯১১ সালের পুস্তকের বিশ্বভারতী-প্রচারিত পুনর্মুদ্রণের কপি অবলম্বন করেন; ১৯১৫ সালের সংশোধনগুলি তার অঙ্গীভূত নয়, এবং সে পরিবর্তনগুলির প্রতি তাঁর দৃষ্টিও আকৃষ্ট হয় নি। সে পরিবর্তনগুলি সম্বন্ধে অবহিত থেকেও যদি তিনি পূর্বতন পাঠগুলির পুনরুদ্ধার করতেন তবে অবশ্যই স্বতন্ত্র কথা হত। প্রবীণ বয়সে কাব্যগ্রন্থ-সংস্করণে তিনি যে-সকল পাঠ-পরিবর্তন করেছিলেন, রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশকালে যদি সেগুলি তাঁর দৃষ্টি-বহির্ভূত না থাকত, তা হলে, হয় তিনি সেগুলি রক্ষা করতেন, কিংবা আরও সংশোধন করতেন, পূর্বতন পাঠে ফিরে যেতেন না এ রকম মনে করা অসংগত হবে না। আমাদের এই অনুমানে হয়তো অনেকেই একমত

হবেন।[৩] সে ক্ষেত্রে কবির জীবিতকালে উক্ত শেষ সংস্করণের প্রামাণিকতাও ঐ সামান্ত পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা ও কাব্যগ্রন্থ-সংস্করণের পাঠগুলি উল্লেখ করা ছাড়া আপাততঃ বর্তমান সংকলয়িতাদের কিছু করণীয় অবশ্য নেই।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

১ গান আরম্ভ। ৪৫ ছত্র।

রবীন্দ্র-রচনাবলী :

অথবা শিথিল কলেবরে

কাব্যগ্রন্থ ৩ :

অথবা শিথিল দেহলতা

২ তারকার আত্মহত্যা। ২৩ ছত্র।

রবীন্দ্র-রচনাবলী :

জলন্ত অঙ্গার খণ্ড ঢাকিতে আঁধার হৃদি

কাব্যগ্রন্থ ৩ :

জলন্ত অঙ্গার যেন লুকাতে কালিমা তার

৩ অসহ্য ভালোবাসা। ৩-৬ ছত্র।

রবীন্দ্র-রচনাবলী :

বুক-ফাটা প্রাণ-ফাটা মোর ভালোবাসা
এত বুঝি ভালো নাহি লাগে।
এত ভালোবাসা বুঝি পার না সহিতে ;
এত বুঝি পার না বহিতে।

কাব্যগ্রন্থ ৩ :

একান্ত আমার ভালবাসা
এত বুঝি ভালো নাহি লাগে।
এত বুঝি পার না সহিতে,
এত ভার পার না বহিতে।

---

৩ অবশ্য এ রকম কথা বলা যেতে পারে যে, সন্ধ্যাসংগীত সম্বন্ধে সঞ্চয়িতায় কবি যে মন্তব্য করেছেন, সন্ধ্যাসংগীতের অধিকাংশ কবিতা রবীন্দ্র-রচনাবলীতে রক্ষা করে সে-মতও তো তিনি পরিবর্তন করেছেন। কিন্তু সঞ্চয়িতায় কবিতা নির্বাচন এক, সমগ্র রচনাবলীতে সংগ্রহ আর। সে যুক্তিতে পুরাতন পাঠে প্রত্যাবর্তন সমর্থিত হয় না, বিশেষতঃ যখন দেখি কবিতাগুলিকে স্থান দিলেও যথাসাধ্য তার সংশোধন করেছেন, কয়েকটি কবিতার কতকগুলি ছত্র বাদ দিয়েছেন, 'অসহ্য পুনরাবৃত্তি' বলে একটি কবিতাকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণই বর্জন করেছেন।

৪ অনুগ্রহ। ৮৯ ছত্র।

রবীন্দ্র-রচনাবলী :

বহু কষ্টে অশ্রুবিন্দু দেয়

কাব্যগ্রন্থ ৩ :

অনুগ্রহ অশ্রুবিন্দু দেয়

৫ আবার। ৫ ছত্র।

রবীন্দ্র-রচনাবলী :

সবাই আমার সখা সবাই আমার বঁধু,

কাব্যগ্রন্থ ৩ :

সবাই আমার বন্ধু, সবাই আমার সাথী,

১৮ ছত্র।

রবীন্দ্র-রচনাবলী :

সমীর কোমল-মন আসে হেথা অনুক্ষণ

কাব্যগ্রন্থ ৩ :

বায়ু হেথা দেয় আনি কোমল পরশখানি

২৮-৩০ ছত্র।

রবীন্দ্র-রচনাবলী :

আমার এ মুখপানে চায়।
নীরবে চাহিয়া রহে নীরব নয়নে কহে,
"সখা, আজ বিদায়, বিদায়।"

কাব্যগ্রন্থ ৩ :

পূরবের স্বর্ণ বাতায়নে
নীরবে চাহিয়া রহে নীরব নয়নে কহে,
"ভালো হল দেখা তোমা সনে।"

সংগ্রাম সংগীত। ১৫ ছত্র।

রবীন্দ্র-রচনাবলী :

দুরন্ত অশান্তি এক দিয়াছে ছাড়িয়া।

কাব্যগ্রন্থ ৩ :

দুরন্ত অশান্তি-কীট দিয়াছে ছাড়িয়া।

৩৫ ছত্র।

রবীন্দ্র-রচনাবলী :

জগতের একেকটি গ্রাম।

কাব্যগ্রন্থ ৩ :

এতদিন যাহা হারিলাম।

স্থচী প্রণয়নে ব্যবহৃত পত্রিকা বা গ্রন্থ

১ ভারতী ১২৮৭-৮৯

এই তিন বৎসরের ভারতীতে সন্ধ্যাসংগীতের নিম্নলিখিত কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল[৪]—

দুদিন	জ্যৈষ্ঠ	১২৮৭
দুঃখ আবাহন	ফাল্গুন	১২৮৭
তারকার আত্মহত্যা	জ্যৈষ্ঠ	১২৮৮
সুখের বিলাপ	আষাঢ়	১২৮৮
আশার নৈরাশ্য	শ্রাবণ	১২৮৮
শিশির	ভাদ্র	১২৮৮
পরাজয় সঙ্গীত,	কার্তিক	১২৮৮
গান সমাপন	অগ্রহায়ণ	১২৮৮
গান আরম্ভ[৫]	পৌষ	১২৮৮
অনুগ্রহ	মাঘ	১২৮৮
সংগ্রাম সঙ্গীত	ফাল্গুন	১২৮৮
আমি-হারা	বৈশাখ	১২৮৯

[illegible]

হয়েছে ; ভারতীর সঙ্গে প্রথম সংস্করণে যে-সকল ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে কেবল সেই-সকল ক্ষেত্রেই ভারতীর স্বতন্ত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

২ সন্ধ্যা সঙ্গীত। প্রথম সংস্করণ। সন ১২৮৮ [১৮৮২]

গ্রন্থকারের 'বিজ্ঞাপন'। "আমার রচিত কবিতার মধ্যে যে গুলি সন্ধ্যা-সঙ্গীত নামে উক্ত হইতে পারে, সেই গুলিই এই পুস্তকে প্রকাশিত হইল। ইহার অধিকাংশ কবিতাই গত দুই বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছে, কেবল "বিষ ও সুধা" নামক দীর্ঘ কবিতাটি বাল্যকালের রচনা।"

এই সংস্করণে কবিতা-সংখ্যা মোট ২৫।[৬]

সূচী।	পাষাণী
উপহার [১]	অনুগ্রহ
গান আরম্ভ	আবার

৪ এই তালিকাটি নিম্নোক্ত প্রবন্ধ থেকে গৃহীত: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, "রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী", শনিবারের চিঠি, পৌষ ১৩৪৬।

৫ "কবিতা সাধনা" নামে

৬ গ্রন্থারম্ভের 'উপহার' (পরবর্তী নাম 'সন্ধ্যা') ও গ্রন্থ 'সমাপ্ত' হবার পর যোজিত 'উপহার' ('সঞ্চয়িতা'র 'দৃষ্টি' নামে অংশতঃ মুদ্রিত) কবিতা দুটি সূচীপত্রে উল্লিখিত নেই।

সন্ধ্যা	দুদিন
তারকার আত্মহত্যা	পরাজয় সঙ্গীত
আশার নৈরাশ্য	শিশির
পরিত্যক্ত	সংগ্রাম-সঙ্গীত
সুখের বিলাপ	আমি-হারা
হৃদয়ের গীতিধ্বনি	দুঃখ-আবাহন
শান্তি-গীত	কেন গান শুনাই
অসহ্য ভালবাসা	গান সমাপন
হলাহল	বিষ ও সুধা
কেন গান গাই	উপহার [২]

৩ সন্ধ্যা-সঙ্গীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৮১৪ শক [১৮৯২ বা ৯৩]।

'বিষ ও সুধা' কবিতাটি এই সংস্করণে বর্জিত হয়, আর পুনর্মুদ্রিত হয় নি।

৪ কাব্য গ্রন্থাবলী। ১৫ই আশ্বিন ১৩০৩। [১৮৯৬]। সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

এ পর্যন্ত যতদূর জানা যায় তাতে অনুমান হয় যে, এই কাব্যগ্রন্থাবলীর অন্তর্গত সন্ধ্যা-সংগীত এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ।

এই সংস্করণে 'কেন গান গাই' ও 'কেন গান শুনাই' কবিতা দুটি বর্জিত হয়, আর পুনর্মুদ্রিত হয় নি।

৫ কাব্যগ্রন্থ। প্রথম খণ্ড। ১৩১০ সন। [১৯০৩]। মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত।

"বাহিরের সঙ্গে যখন জীবনটার যোগ ছিল না, যখন নিজের হৃদয়েরই মধ্যে আবিষ্ট অবস্থায় ছিলাম, যখন কারণহীন আবেগ ও লক্ষ্যহীন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আমার কল্পনা নানা ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছিল তখনকার অনেক কবিতা [মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত] নূতন গ্রন্থাবলী হইতে বর্জন করা হইয়াছে; কেবল সন্ধ্যাসংগীতে-প্রকাশিত কয়েকটি কবিতা হৃদয়-অরণ্য বিভাগে স্থান পাইয়াছে।"—জীবনস্মৃতি, 'সন্ধ্যাসংগীত' অধ্যায়

উক্ত হৃদয়-অরণ্য বিভাগে সন্ধ্যাসংগীতের এই 'কয়েকটি কবিতা' (১০) আছে—

উপহার [১][৭]	আবার
গান আরম্ভ[৮]	পরাজয়-সংগীত
তারকার আত্মহত্যা	শিশির
আশার নৈরাশ্য	সংগ্রাম-সংগীত
সুখের বিলাপ	আমি-হারা[৯]

৬ সন্ধ্যাসঙ্গীত। প্রকাশক শ্রীপাঁচকড়ি মিত্র, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা।

৭ 'সন্ধ্যা' নামে ৮ 'আবাহন' নামে ৯ 'পথভ্রষ্ট' নামে

কার্ত্তিক প্রেস, ২০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত। [১৯১১]।

৩ ও ৪ -সংখ্যক গ্রন্থে প্রথম সংস্করণের যে তিনটি কবিতা ক্রমশঃ বর্জিত হয় তা ছাড়া অন্য সব কবিতাই এ সংস্করণে মুদ্রিত হয়েছে।

৭ কাব্যগ্রন্থ। প্রথম খণ্ড। ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। ১৯১৫।

ভূমিকা। "সন্ধ্যা-সঙ্গীতের পূর্ব্ববর্ত্তী আমার সমস্ত কবিতা আমার কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে বাদ দিয়াছি। যদি সুযোগ পাইতাম তবে সন্ধ্যা-সঙ্গীতকেও বাদ দিতাম। কিন্তু সকল জিনিষেরই একটা আরম্ভ তো আছেই। সে আরম্ভ কাঁচা এবং দুর্ব্বল, কিন্তু সম্পূর্ণতার খাতিরে তাহাকেও স্থান দিতে হয়।

"সন্ধ্যা-সঙ্গীত হইতেই আমার কাব্যস্রোত ক্ষীণভাবে সুরু হইয়াছে। এইখান হইতেই আমার লেখা নিজের পথ ধরিয়াছে। পথ যে তৈরি ছিল তাহা নহে— গতিবেগে আপনি পথ তৈরি হইয়া উঠিয়াছে। তখন শক্তি অল্প, বাধা বিস্তর,—নিজের কাব্যরূপকে তখনো স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই নাই, ভালো মন্দ বিচার করিবার কোনো আদর্শ মনের মধ্যে ছিল না। তাহা ছাড়া, প্রথম রচনার সকলের চেয়ে মস্ত দোষ এই যে তাহার মধ্যে সত্যের অভাব থাকে। কেননা সত্যকে মানুষ ক্রমে ক্রমে পায়—অথচ সত্যকে পাইবার পূর্ব্বেই তাহার কর্ম্ম আরম্ভ হইয়া থাকে ; সেই কর্ম্মের মধ্যে আবর্জ্জনার ভাগই বেশি থাকে।

"মানুষের জীবন তাহার প্রতিদিনের আবর্জ্জনা প্রতিদিন মোচন করিয়া তাহা মার্জ্জনা করিয়া চলে। যুবা আপনার শৈশবের হামাগুড়িকে জমাইয়া রাখে না। দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্যভাণ্ডারে আবর্জ্জনাগুলাকে একেবারে দূর করিয়া দেওয়া যায় না। যাহা একবার প্রকাশ হইয়াছে তাহাকে বিদায় করা কঠিন।

"অতএব সন্ধ্যা-সঙ্গীতকে দিয়া কাব্যগ্রন্থাবলী আরম্ভ করা গেল। ইহার কবিতাগুলির মধ্যে কবির লজ্জার কারণ যথেষ্ট আছে। কিন্তু যদি তাহার পরবর্ত্তী রচনায় কোনো গৌরবের বিষয় থাকে তবে এই প্রথম প্রয়াসের নিকট সে জন্য ঋণ স্বীকার করিতেই হইবে। ...আশ্বিন ১৩২১"।

কবিতা-সংখ্যা ৬-সংখ্যক গ্রন্থের অনুরূপ।

৮ চয়নিকা। 'বিশ্বভারতী সংস্করণ', ১৩৩২ [১৯২৬][১০]

এই সঞ্চয়নে "সন্ধ্যা" ('অয়ি সন্ধ্যে, অনন্ত আকাশতলে বসি একাকিনী') ও "তারকার আত্মহত্যা" কবিতা দুটি গৃহীত।

৯ সঞ্চয়িতা। পৌষ ১৩৩৮ [১৯৩১]

ভূমিকা। "সঞ্চয়িতার কবিতাগুলি সঙ্কলনের ভার আমি নিজে নিয়েছি। ...এই সঙ্কলন উপলক্ষ্যে একটি কথা বলবার সুযোগ পাব প্রত্যাশা ক'রে এ কাজে হাত দিয়েছি।

১০ চয়নিকার প্রথম সংস্করণে [১৯০৯] সন্ধ্যাসংগীতের কোনো কবিতা গৃহীত হয় নি। এই প্রসঙ্গে 'চয়নিকা'র অন্যান্য সবগুলি সংস্করণ দেখবার সুযোগ হয় নি।

যাঁরা আমার কবিতা প্রকাশ করেন অনেকদিন থেকে তাঁদের সম্বন্ধে এই অনুভব করচি যে, আমার অল্প বয়সের সে সকল রচনা স্খলিত পদে চলতে আরম্ভ করেচে মাত্র, যারা ঠিক কবিতার সীমার মধ্যে এসে পৌঁছয়নি, আমার গ্রন্থাবলীতে তাদের স্থান দেওয়া আমার প্রতি অবিচার।...

"সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত ও ছবি ও গান এখনো যে বই আকারে চলচে, একে বলা যেতে পারে কালাতিক্রমণ দোষ। ...ঐ তিনটি কবিতাগ্রন্থের আর কোনো অপরাধ নেই কেবল একটি অপরাধ লেখাগুলি কবিতার রূপ পায়নি।...

"ইতিহাস রক্ষার খাতিরে এই সঙ্কলনে ঐ তিনটি বইয়ের যে কয়টি লেখা সঞ্চয়িতায় প্রকাশ করা গেল তা ছাড়া ওদের থেকে আর কোনো লেখাই আমি স্বীকার করতে পারব না।..."

প্রসঙ্গক্রমে পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, সন্ধ্যাসংগীতের "উপহার" [২] ('ভুলে গেছি, কবে তুমি') কবিতাটির কয়েকটি মাত্রছত্র সঞ্চয়িতায় "দৃষ্টি" নামে সংকলিত হয়েছে।

১০ রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ড। ১৩৪৬ আশ্বিন [১৯৩৯]

সূচনা। "এই গ্রন্থাবলীতে আমার কাব্যরচনার প্রথম পরিচয় নিয়ে দেখা দিয়েছে সন্ধ্যাসংগীত। তার পূর্বেও অনেক লেখা লিখেছি,...সেগুলি ছিল যাকে বলে কপিবুক, বাইরে থেকে নকল করবার সাধনায়।...

"সেই কপিবুক-যুগের চৌকাঠ পেরিয়েই প্রথম দেখা দিল সন্ধ্যাসংগীত। তাকে আমের বোলের সঙ্গে তুলনা করব না, করব কচি আমের গুটির সঙ্গে, অর্থাৎ তাতে তার আপন চেহারাটা সবে দেখা দিয়েছে শ্যামল রঙে। রস ধরেনি, তাই তার দাম কম। কিন্তু সেই কবিতাই প্রথম স্বকীয় রূপ দেখিয়ে আমাকে আনন্দ দিয়েছিল। অতএব সন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়। সে উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু আমারই বটে। সে সময়কার অন্য সমস্ত কবিতা থেকে আপন ছন্দের বিশেষ সাজ প'রে এসেছিল। সে সাজ বাজারে চলিত ছিল না।"

এই সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ "সন্ধ্যা" ('ব্যথা বড় বাজিয়াছে প্রাণে') কবিতাটি বর্জন করেন।

সংক্ষেপ-সূত্র

পূর্বপৃষ্ঠায় উল্লিখিত যে-সকল পত্রিকা ও গ্রন্থ থেকে পাঠান্তর সংগৃহীত হয়েছে টীকায় সেগুলি সংক্ষেপে এইরূপে উল্লিখিত হয়েছে—

ভারতী ১২৮৭-৮৯	ভারতী
সন্ধ্যাসঙ্গীত প্রথম সংস্করণ	প্রথম সংস্করণ
সন্ধ্যাসঙ্গীত দ্বিতীয় সংস্করণ	দ্বিতীয় সংস্করণ
কাব্যগ্রন্থাবলী। সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত	কাব্যগ্রন্থ ১
কাব্যগ্রন্থ। মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত	কাব্যগ্রন্থ ২
সন্ধ্যাসঙ্গীত, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস [১৯১১]	[১৯১১] সংস্করণ
কাব্যগ্রন্থ। ইণ্ডিয়ান প্রেস	কাব্যগ্রন্থ ৩
চয়নিকা, বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১৩৩২	বিশ্বভারতী-চয়নিকা
সঞ্চয়িতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৩৮	সঞ্চয়িতা
রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড বিশ্বভারতী (১৯৩৯)	রচনাবলী

স্বীকৃতি

এই সংকলনকর্মে শ্রীঅমলেন্দু বসু, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের নানারূপ পরামর্শ পেয়ে উপকৃত হয়েছি।

বিশ্বভারতী-কর্তৃপক্ষ অনুগ্রহপূর্বক কবিতাগুলি এই পত্রিকায় মুদ্রণের অনুমতি দিয়েছেন, এজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

উপহার

অয়ি সন্ধ্যে,

অনন্ত আকাশতলে বসি একাকিনী,

কেশ এলাইয়া

মৃদু করি স্নেহময় মোহময় মুখ

জগতেরে কোলেতে লইয়া,

মৃদু মৃদু ও কী কথা কহিস্ আপন মনে

মৃদু মৃদু গান গেয়ে গেয়ে,

জগতের মুখ পানে চেয়ে।

প্রতিদিন শুনিয়াছি আজো তোর সেই কথা

নারিনু বুঝিতে।

প্রতিদিন শুনিয়াছি আজো তোর সেই গান

নারিনু শিখিতে।

চোখে শুধু লাগে ঘুমঘোর,

প্রাণ শুধু ভাবে হয় ভোর।

হৃদয়ের অতি দূর দূর দূর দূরান্তরে

মিলাইয়া কণ্ঠস্বর তোর কণ্ঠস্বরে

রবীন্দ্র রচনাবলী

[illegible] উদাসী প্রবাসী যেন

তোর সাথে তোরি গান করে।

অয়ি সন্ধ্যা, তোরি যেন স্বদেশের প্রতিবেশী

তোরি যেন আপনার ভাই

প্রাণের প্রবাসে মোর দিশা হারাইয়া

[illegible] বেড়াই সদাই।

[illegible]

শোনে যেন স্বদেশের গান,

[illegible] সাড়া

[illegible] খুলে দেয় প্রাণ।

চারিদিকে [illegible] ব্যাকুল হ'য়ে

খুঁজিয়ে বেড়ায় যেন তোরে!

ডাকে যেন তোর নাম ধ'রে।

যেন তার [illegible] পুরাণো [illegible] স্মৃতি

জাগিয়া উঠেরে ঐ গানে।

ওই তারকার মাঝে যেন তার গৃহ ছিল,

হাসিত কাঁদিত ওইখানে।

কবি-কর্তৃক সংশোধিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর (১৯৩৯) প্রুফ

সন্ধ্যাসংগীত

সন্ধ্যা[১]

অয়ি সন্ধ্যে,
অনন্ত আকাশতলে বসি একাকিনী,
কেশ এলাইয়া[২]
মৃদু মৃদু ও কী কথা কহিস আপন মনে
গান গেয়ে গেয়ে,[৩] ৫
নিখিলের[৪] মুখপানে চেয়ে।
প্রতিদিন শুনিয়াছি, আজও তোর কথা[৫]
নারিনু বুঝিতে।
প্রতিদিন শুনিয়াছি, আজও তোর গান[৬]
নারিনু শিখিতে। ১০
চোখে[৭] লাগে ঘুমঘোর,
প্রাণ শুধু ভাবে হয় ভোর।[৮]
হৃদয়ের অতিদূর দূর দূরান্তরে
মিলাইয়া কণ্ঠস্বর তোর কণ্ঠস্বরে
উদাসী প্রবাসী যেন[৯] ১৫
তোর সাথে তোরি গান করে।

অয়ি সন্ধ্যা, তোরি যেন স্বদেশের প্রতিবেশী
তোরি যেন আপনার ভাই
প্রাণের প্রবাসে মোর দিশা হারাইয়া
বেড়ায় সদাই।[১০] ২০
শোনে যেন স্বদেশের গান,[১১]
দূর হতে কার পায় সাড়া[১২]
খুলে দেয় প্রাণ।[১৩]
যেন কী পুরানো স্মৃতি[১৪]
জাগিয়া উঠে রে ওই গানে। ২৫
ওই তারকার মাঝে যেন তার গৃহ ছিল
হাসিত কাঁদিত ওইখানে।[১৫]

আরবার ফিরে যেতে চায়
পথ তবু খুঁজিয়া না পায়।
কত না পুরানো কথা, কত না হারানো গান, ৩০
কত না প্রাণের দীর্ঘশ্বাস,
শরমের আধো হাসি, সোহাগের আধো বাণী,
প্রণয়ের আধো মৃদু ভাষ,
সন্ধ্যা, তোর ওই অন্ধকারে
হারাইয়া গেছে একেবারে।[১৬] ৩৫
পূর্ণ করি অন্ধকার তোর
তারা সবে ভাসিয়া বেড়ায়
যুগান্তের প্রশান্ত হৃদয়ে
ভাঙাচোরা জগতের প্রায়।
যবে এই নদীতীরে বসি তোর পদতলে ৪০
তারা সবে দলে দলে আসে,
প্রাণেরে ঘেরিয়া চারি পাশে;[১৭]
হয়তো একটি হাসি একটি আধেক হাসি
সমুখেতে ভাসিয়া বেড়ায়,
কভু ফোটে কভু বা মিলায়।[১৮] ৪৫
আজি[১৯] আসিয়াছি সন্ধ্যা, বসি তোর অন্ধকারে
মুদিয়া নয়ান
সাধ গেছে গাহিবারে— মৃদু স্বরে শুনাবারে
দু-চারিটি গান।[২০]
যেথায় পুরানো গান যেথায় হারানো হাসি ৫০
যেথা আছে বিস্মৃত স্বপন
সেইখানে সযতনে রেখে দিস গানগুলি,
রচে দিস সমাধিশয়ন।[২১]
জানি সন্ধ্যা, জানি তোর স্নেহ,
গোপনে ঢাকিবি তার দেহ— ৫৫
বসিয়া সমাধি-'পরে নিষ্ঠুরকৌতুকভরে
দেখিস হাসে না যেন কেহ।
ধীরে শুধু ঝরিবে শিশির,
মৃদু শ্বাস ফেলিবে সমীর।
স্তব্ধতা[২২] কপোলে হাত দিয়ে ৬০

একা সেথা রহিবে বসিয়া,
মাঝে মাঝে দু-একটি তারা
সেথা আসি পড়িবে খসিয়া।

১ প্রথম সংস্করণ ও কাব্যগ্রন্থ ২-এর পূর্ববর্তী অন্যান্য সংস্করণে এই কবিতাটির নাম ছিল 'উপহার'। কাব্যগ্রন্থ ২-এ নাম হয় 'সন্ধ্যা'। তদবধি এই দুইটি নামেরই ব্যবহার দেখা যায়— সন্ধ্যাসঙ্গীত [১৯১১], কাব্যগ্রন্থ ৩, ও সন্ধ্যাসঙ্গীত বিশ্বভারতী-পুনর্মুদ্রণে (১৩৩৪) পূর্বতন উপহার নামই আছে, বিশ্বভারতী-চয়নিকাতে 'সন্ধ্যা'। সন্ধ্যাসঙ্গীত বিশ্বভারতী-পুনর্মুদ্রণ (১৩৩৪) থেকে রবীন্দ্র-রচনাবলীর জন্য প্রস্তুত প্রুফে রবীন্দ্রনাথ 'উপহার' নাম কেটে পুনরায় 'সন্ধ্যা' করে দেন।

২ এই ছত্রের পর প্রথম সংস্করণে আরও দুইটি ছত্র ছিল—

নত করি স্নেহময় মোহময় মুখ
জগতেরে কোলেতে লইয়া,

অন্যান্য সংস্করণেও এই ছত্র দুটি আছে; তবে কাব্যগ্রন্থ ৩-এ ছত্র দুটি অংশতঃ পরিবর্তিত হয়েছে—

নত করি স্নেহমাখা মোহময় মুখ
মাথা হেলাইয়া,

রচনাবলীতে কবি এই দুই ছত্র বর্জন করেন।

৩ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে ছত্রটি এইরূপ—

মৃদু মৃদু গান গেয়ে গেয়ে,

রচনাবলীতে 'মৃদু মৃদু' বর্জিত।

৪ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে 'নিখিলের' স্থলে 'জগতের'। কাব্যগ্রন্থ ৩-এ 'ধরণীর'।

৫ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে 'কথা' স্থলে 'ওই কথা'।

৬ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে 'গান' স্থলে 'ওই গান'।

৭ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে 'চোখে' স্থলে 'চোখে শুধু'। কাব্যগ্রন্থ ২-এ ছত্রটি নেই।

৮ ১১-১২ ছত্র কাব্যগ্রন্থ ২-এ বর্জিত।

৯ এই ছত্রটি প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে এইরূপ—

কে জানে রে কোথাকার উদাসী প্রবাসী যেন

১০ এই ছত্রটি, বিশ্বভারতী-চয়নিকা ব্যতীত অন্যান্য সংস্করণে এইরূপ—

কেঁদে কেঁদে বেড়ায় সদাই।

উক্ত চয়নিকাতে এই ছত্রটি নেই।

কাব্যগ্রন্থ ২-এ এই ছত্রের পরেই আলোচ্য রচনাবলী-সংস্করণের ৩০শ ছত্র, 'কত না পুরানো কথা কত না হারানো গান' আছে; অর্থাৎ পূর্ববর্তী সংস্করণগুলির ২২টি ছত্র বর্জিত।

চয়নিকাতেও এই ২২টি ছত্র বর্জিত, তৎপূর্ববর্তী চার ছত্রও ('অয়ি সন্ধ্যা···কেঁদে কেঁদে বেড়ায় সদাই') বর্জিত।

উক্ত ২২শ ছত্র অন্যান্য সংস্করণে কিভাবে পরিবর্জিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে পরবর্তী পাদটীকা-গুলিতে (১১-১৫) তা বর্ণিত হল।

১১ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে এই ছত্রের পূর্বে অপর একটি ছত্র ছিল—

যখন শুনে সে তোর স্বর

১২ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে ছত্রটি এইরূপ—

সহসা সুদূর হতে অমনি সে দেয় সাড়া,

১৩ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে ছত্রটি এইরূপ—

অমনি সে খুলে দেয় প্রাণ।

এই ছত্রের পর প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে আরও তিনটি ছত্র ছিল—

চারিদিকে চেয়ে দেখে— আকুল ব্যাকুল হয়ে
খুঁজিয়ে বেড়ায় যেন তোরে
ডাকে যেন তোর নাম ধরে।

১৪ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে ছত্রটি এইরূপ—

যেন তার কত শত পুরাণ সাধের স্মৃতি

কাব্যগ্রন্থ ৩-এ 'যেন তোর কত শত···' মুদ্রিত আছে—'তোর' সম্ভবতঃ মুদ্রণপ্রমাদ

১৫ এর পর প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে আরও নয় ছত্র ছিল—

বিজন গভীর রাতে ওই তারকার মাঝে
বসিয়া গাহিত যেন গান,
ওইখান হতে যেন জগতের চারিদিক
দেখিত সে মেলিয়া নয়ান!
সেই সব পড়ে বুঝি মনে,
অশ্রুবারি ঝরে দুনয়নে।
কত আশা, কত সখা, প্রাণের প্রেয়সী তার
হোথা বুঝি ফেলে আসিয়াছে,
প্রাণ বুঝি তাহাদের কাছে

কাব্যগ্রন্থ ৩-এ এই ছত্রগুলির কোনো-কোনো ক্ষেত্রে পাঠ-পরিবর্তন হয়েছিল। যথা—'জগতের চারিদিক' স্থলে 'কোন্ সুদূরের পথে'; 'দেখিত' স্থলে 'চাহিত'; 'কত আশা, কত সখা, প্রাণের প্রেয়সী তার' স্থলে 'যেন পূর্বজনমের প্রথম প্রেয়সী তার'; 'হোথা বুঝি' স্থলে 'ওইখানে'।

১১-১৫ সংখ্যক টীকায় যে 'অন্যান্য সংস্করণে'র উল্লেখ করা হয়েছে সেই প্রসঙ্গে ১০ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য। সেখানে উল্লিখিত হয়েছে যে, আলোচ্য ছত্রগুলিই কাব্যগ্রন্থ ২ ও চয়নিকাতে বর্জিত।

১৬ কাব্যগ্রন্থ ২-এ এর পরবর্তী চার ছত্র (৩৬-৩৯) বর্জিত।

১৭ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে এই ছত্রের পর আরও তিনটি ছত্র ছিল—

হয়ত একটি কথা, একটি আধেক বাণী
চারিদিক হতে বারে বার
শ্রবণেতে পশে অনিবার।

কাব্যগ্রন্থ ২-এ এই ছত্রগুলি, ও পরবর্তী তিন ছত্র (৪৩-৪৫ : হয়তো একটি হাসি…কভু বা মিলায়) বর্জিত।

১৮ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে এই ছত্রের পর আরও সাতটি ছত্র ছিল—

হয়ত একটি ছায়া, একটি সুখের ছায়া
আমার মুখের পানে চায়,
চাহিয়া নীরবে চলে যায়!
অয়ি সন্ধ্যা, স্নেহময়ী, তোর স্বপ্নময় কোলে
তাই আমি আসি নিতি নিতি,
স্নেহের আঁচল দিয়ে প্রাণ মোর দিস ঢেকে
এনে দিস অতীতের স্মৃতি!

কাব্যগ্রন্থ ২-এ এই সাত ছত্রের শেষ চার ছত্র বর্জিত। চয়নিকাতে এই সাত ছত্রের প্রথম তিন ছত্র বর্জিত। কাব্যগ্রন্থ ১ ও চয়নিকাতে 'অয়ি সন্ধ্যা স্নেহময়ী,' স্থলে 'অয়ি সন্ধ্যা, স্নেহময়' পাঠ আছে।

১৯ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে 'আজ'; কাব্যগ্রন্থ ২, ৩ ও সন্ধ্যাসঙ্গীতে [১৯১১] 'আজি'।

২০ এই ছত্রের পর প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে আরও চারটি ছত্র ছিল—

সে গান না শোনে কেহ যদি,
যদি তারা হারাইয়া যায়,
সন্ধ্যা, তুই সযতনে গোপনে বিজনে অতি
ঢেকে দিস্ আঁধারের ছায়।

প্রথম ছত্রের 'শোনে'র স্থলে চয়নিকায় 'শুনে' আছে।

২১ কাব্যগ্রন্থ ২ ও চয়নিকার পরবর্তী ছত্রগুলি (৫৪-৬০ : 'জানি সন্ধ্যা…খসিয়া') বর্জিত।

২২ কাব্যগ্রন্থ ৩-এ 'স্তব্ধতা' স্থলে 'মরণ'।

গান আরম্ভ[১]

চারি দিকে খেলিতেছে মেঘ,[২]
বায়ু আসি করিছে চুম্বন—
সীমাহারা নভস্তল[৩] দুই বাহু পসারিয়া[৪]
হৃদয়ে করিছে আলিঙ্গন।[৫]

অনন্ত এ আকাশের কোলে[৬] ৫
টলমল মেঘের মাঝার
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর[৭]
তোর তরে কবিতা আমার![৮]
যবে আমি আসিব হেথায়[৯]
মন্ত্র পড়ি ডাকিব তোমায়।[১০] ১০
বাতাসে উড়িবে তোর বাস,
ছড়ায়ে পড়িবে কেশপাশ,
ঈষৎ মেলিয়া আঁখিপাতা
মৃদু হাসি পড়িবে ফুটিয়া—
হৃদয়ের মৃদুল কিরণ ১৫
অধরেতে পড়িবে লুটিয়া।[১১]
এলোথেলো কেশপাশ লয়ে
বসে বসে খেলিবি[১২] হেথায়,
উষার অলক দুলাইয়া
সমীরণ যেমন খেলায়। ২০
চুমিয়া চুমিয়া ফুটাইব
আধফোটা[১৩] হাসির কুসুম,
মুখ লয়ে বুকের মাঝারে
গান গেয়ে পাড়াইব ঘুম।
কৌতুকে করিয়া কোলাকুলি ২৫
আসিবে মেঘের শিশুগুলি,
ঘিরিয়া দাঁড়াবে তারা সবে
অবাক হইয়া চেয়ে রবে।[১৪]

মেঘ হতে নেমে ধীরে ধীরে
আয় লো কবিতা, মোর বামে ৩০

চম্পক-অঙ্গুলি দুটি[১৫] দিয়ে
অন্ধকার[১৬] ধীরে সরাইয়ে
যেমন করিয়া উষা নামে।[১৭]
বায়ু হতে আয় লো কবিতা
আসিয়া বসিবি মোর পাশে— ৩৫
কে জানে বনের কোথা হতে
ভেসে ভেসে সমীরণস্রোতে
সৌরভ যেমন করে আসে।[১৮]
হৃদয়ের অন্তঃপুর হতে
বধূ মোর, ধীরে ধীরে আয়— ৪০
ভীরু প্রেম যেমন করিয়া
ধীরে উঠে হৃদয় ধরিয়া,
বঁধুর পায়ের কাছে গিয়ে
অমনি মুরছি পড়ে যায়।[১৯]
অথবা শিথিল কলেবরে[২০] ৪৫
এস তুমি, বসো মোর পাশে—[২১]
মরণ যেমন করে আসে,
শিশির যেমন করে ঝরে,
পশ্চিমের আঁধারসাগরে
তারাটি যেমন করে যায়, ৫০
অতি ধীরে[২২] মৃদু হেসে সিঁদুর সীমন্তদেশে
দিবা সে যেমন করে আসে
মরিবারে স্বামীর চিতায়
পশ্চিমের জ্বলন্ত শিখায়।
পরবাসা ক্ষীণ-আয়ু একটি মুমূর্ষু বায়ু[২৩] ৫৫
শেষ কথা বলিতে বলিতে
তখনি যেমন[২৪] মরে যায়
তেমনি, তেমনি করে এস—
কবিতা রে,[২৫] বধূটি আমার,[২৬]
দুটি শুধু পড়িবে নিশ্বাস,[২৭] ৬০
দুটি শুধু বাহিরিবে বাণী,
বাহু দুটি হৃদয়ে জড়ায়ে[২৮]
মরমে রাখিবি মুখখানি।

১ কবিতাটি ভারতী পৌষ ১২৮৮ সংখ্যায় 'কবিতা সাধনা' নামে ও কাব্যগ্রন্থ ২-এ 'আহ্বান' নামে মুদ্রিত।

২ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে এই ছত্রের পূর্বে আরও দুইটি ছত্র ছিল—

ডাকি তোরে, আয়রে হেথায়,
সাধের কবিতা তুই আয়!

'ভারতী'তে এই ছত্রের পাঠ—

ডাকি আমি, আয়রে হেথায়,
কবিতা রে, আয় তুই আয়!

এবং এর পরের ছত্রের পাঠ—

চারিদিকে মেঘ খেলিতেছে

৩ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে 'নভস্থল'; কাব্যগ্রন্থ ১ ও তদবধি 'নভস্তল'।

৪ প্রথম সংস্করণে এর পর একটি অতিরিক্ত ছত্র ছিল—

ভাই বোলে, সখা বোলে,

দ্বিতীয় সংস্করণে ও তদবধি এই ছত্র বর্জিত।

৫ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে 'হৃদয়ে' স্থলে 'বুকেতে'। কাব্যগ্রন্থে ১ ও তদবধি 'হৃদয়ে'; কাব্যগ্রন্থ ৩-এ 'হৃদয়'।

৬ কাব্যগ্রন্থ ২-এ এর পূর্ববর্তী সকল ছত্রই বর্জিত।

৭ ভারতীতে 'এইখানে ঘর বাঁধিয়াছি'।

৮ এই ছত্রের পরে, প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে অতিরিক্ত এই ছত্রগুলি ছিল—

আহা এ কি নিভৃত নিলয়,
আহা এ কি শান্তি নিকেতন!
অতি দূরে ছায়া-রেখা সম
পৃথিবীর শ্যামল কানন।

কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি বর্জিত।

৯ নবম ও দশম ছত্রের পাঠ প্রথম সংস্করণে এইরূপ ছিল—

হেথা আমি আসিব যখনি
তোরে আমি ডাকিব রমণী!

বর্তমান পাঠ দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে প্রচলিত।

১০ এই ছত্রের পর প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে এই কয়টি অতিরিক্ত ছত্র ছিল—

মেঘেতে মেঘেতে মিলে মিলে
হেলে দুলে বাতাসে বাতাসে,
হাসি হাসি মুখখানি করি
নামিয়া আসিবি মোর পাশে।

এই কয় ছত্র কাব্যগ্রন্থ ২-এ বর্জিত হয়েছিল ; রচনাবলীতে কবি পুনরায় এই ছত্রগুলি বাদ দেন।

১১ এই ছত্রের পর প্রথম সংস্করণে অতিরিক্ত আটটি ছত্র ছিল—

একখানি জোছনার মত
বাতাসের পথ ছুঁয়ে ছুঁয়ে,
হিল্লোল-আকুল কমলিনী
বাতাসে পড়িবি নুয়ে নুয়ে।
পৃথিবী হইতে অতি দূরে
এই হেথা মেঘময় পুরে,
গলাটি জড়ায়ে ধরি মোর
ব'সে র'বি কোলের উপর।

দ্বিতীয় সংস্করণে এই আট ছত্রের প্রথম চার ছত্র বর্জিত হয়। কাব্যগ্রন্থ ১-এ আরও দুই ছত্র ('পৃথিবী…পুরে'), মোট ছয় ছত্র, বর্জিত হয়। এই ছয় ছত্র সন্ধ্যাসঙ্গীত [১৯১১] ও কাব্যগ্রন্থ ৩-এও বর্জিত। কাব্যগ্রন্থ ২-এ এই ছয় ছত্র বর্জিত থাকে, তৎপূর্ববর্তী চার ছত্রও (১৩-১৬ ছত্র : 'ঈষৎ…লুটিয়া') বর্জিত হয়।

উপরে উদ্‌ধৃত আট ছত্রের অবশিষ্ট দুই ছত্রও ('গলাটি…উপর') রচনাবলীতে বর্জিত হয়।

১২ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে 'খেলিব'।

১৩ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে 'আধফুটো' ; রচনাবলীতে 'আধফোটা'। কবির দৃষ্ট প্রুফে এই পরিবর্তন নেই।

১৪ এই ছত্রের পর প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে আরও এই চারটি ছত্র ছিল—

তাই তোরে ডাকিতেছি আমি
কবিতা রে, আয় এক বার,
নিরিবিলি ছুটিতে মিলিয়া
র'ব' হেথা, বধূটি আমার!

কাব্যগ্রন্থ ২-এ, এই চার ছত্রের সঙ্গে তার পূর্ববর্তী চার ছত্রও (২৫-২৮ : 'কৌতুকে …রবে') বর্জিত।

১৫ ভারতীতে 'চম্পক-অঙ্গুলি দুটি' স্থলে 'চম্পক আঙুলগুলি'।

১৬ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে 'অন্ধকার' স্থলে 'মেঘরাশি'। কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি 'অন্ধকার'।

১৭ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে এই ছত্রের পাঠ—

উষাটি যেমন করে নামে।

কাব্যগ্রন্থ ২-এ 'উষাটি' স্থলে 'উষসী'।

বর্তমান পাঠ সন্ধ্যাসঙ্গীত [১৯১১] সংস্করণে পাওয়া যায়, তদবধি প্রচলিত।

১৮ ৩৪-৩৮ ছত্র কাব্যগ্রন্থ ২-এ বর্জিত।

১৯ এই ছত্রের পর প্রথম সংস্করণে আরও ৪৩টি ছত্র আছে—

পরের হৃদয় হোতে উঠে
আয় তুই কবিতা আমার,
গিরির আঁধার গুহা হোতে
মৃদু মৃদু অতি ক্ষীণ স্রোতে
যেমন করিয়া উথলায়
ছোট এক নির্ঝরের ধার।
তেমনি করিয়া তুই আয়,
আয় তুই কবিতা আমার।

চকিতে করিয়া ছিন্ন ঘন-ঘোর মেঘরাশি,
বিদ্যুৎ যেমন নেমে আসে,
হে কবিতা, তেমন করিয়া
এসো না এসো না মোর পাশে।
দূর দুরান্তর হোতে প্রচণ্ড নিশ্বাস ফেলি
ঝটিকা যেমন ছুটে আসে,
দশ দিশি থরহরি ত্রাসে।
আত্মঘাতী পাগলের মত
এলোথেলো মেঘ শত শত
শত শত বজ্রের ছুরি
বার বার হানিতেছে বুকে,
যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করি,
ছুটিতেছে ঝটিকার মুখে।
এমন ঝটিকা রূপ ধরি,
এলোমেলো উন্মাদিনী বেশে,
এসো না, কবিতা, কভু তুমি
এ আমার বিজন প্রদেশে।
ছিঁড়ে ফেলি লোহার শৃংখল,
ভেঙ্গে ফেলি হৃদি কারাগার,
আঁখি ফেটে অনল নিকলে,
ধ'রে অতি ভীষণ আকার,
পলক না ফেলিতে ফেলিতে
যেমন ছুটিয়া ক্রোধ আসে,
হৃদয়ের অন্তঃপুর হোতে
তেমন এসো না মোর পাশে।
যা' কিছু সম্মুখে পায়, গলাইয়া জ্বলাইয়া
আগ্নেয়-গিরির প্রাণ হোতে
উঠে যথা অগ্নির নির্ঝর
কবিতা, আগ্নেয় মূর্ত্তি ধরি
পরের হৃদয় ভেদ করি,
এসো না এ হৃদয়ের পর।
এসো তুমি ঊষার মতন
এসো তুমি সৌরভের প্রায়,
প্রেম উঠে যেমন করিয়া
নির্ঝর যেমন উথলায়।

এর অংশের ২৫শ ছত্রের পাঠ ভারতীতে এইরূপ ছিল—'আমার এ বিজন প্রদেশে।' সন্ধ্যাসঙ্গীত দ্বিতীয় সংস্করণে এই ৪৩টি ছত্রের প্রথম আটটি ছত্র ভিন্ন অন্য ছত্রগুলি বর্জিত হয়। কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি উক্ত আটটি ছত্রও বর্জিত।

২০ কাব্যগ্রন্থ ৩-এ 'কলেবরে' স্থলে 'দেহলতা'।

২১ এই ছত্রের পর প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে আরও দুইটি ছত্র ছিল—

শোয়াইয়া তুষার শয়নে,
চুমি চুমি মুদিত নয়নে,

কাব্যগ্রন্থ ৩-এ 'তুষার' স্থলে 'হিমানী', 'চুমি চুমি' স্থলে 'চুমি ক্লান্ত'। রচনাবলীতে ছত্র দুইটি বর্জিত।

২২ কাব্যগ্রন্থ ৩-এ 'ধীরে' স্থলে 'ধীর'।

২৩ এই ছত্রের পর প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে আরও তিনটি ছত্র ছিল—

স্বদেশ কানন পানে ধায়

শ্রান্ত পদ উঠিতে না চায় ;

যেমনি কাননে পশে, কুল-বধূটির পাশে,

এর দ্বিতীয় ছত্রটি কাব্যগ্রন্থ ৩-এ এইরূপ—

শ্রান্ত পাখা চলিতে না চায় ;

এই তিনটি ছত্র রচনাবলীতে বর্জিত। কাব্যগ্রন্থ ২-এ এই তিনটি ছত্র, তার পূর্ববর্তী পাঁচ ছত্র (৫১-৫৫), ও পরবর্তী দুই ছত্র (৫৬-৫৭) বর্জিত।

২৪ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে 'অমনি'।

২৫ ভারতীতে 'রে' স্থলে 'হে'।

২৬ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে এই ছত্রের পর আর দুইটি ছত্র ছিল—

ম্লান মুখে করুণা বসিয়া,

চোখে ধীরে ঝরে অশ্রু ধার।

ভারতীতে এর দ্বিতীয় ছত্রের পাঠ ছিল—

চোখে ঝরে শত অশ্রু ধার।

২৭ এই ছত্র কাব্যগ্রন্থ ২-এ বর্জিত।

২৮ এই ছত্র কাব্যগ্রন্থ ২-এ বর্জিত।

তারকার আত্মহত্যা

জ্যোতির্ময় তীর হতে আঁধারসাগরে
ঝাঁপায়ে পড়িল এক তারা,
একেবারে উন্মাদের পারা।
চৌদিকে অসংখ্য তারা রহিল চাহিয়া
অবাক্ হইয়া—
এই-যে জ্যোতির বিন্দু আছিল তাদের মাঝে
মুহূর্তে সে গেল মিশাইয়া।
যে সমুদ্রতলে
মনোদুঃখে আত্মঘাতী
চির-নির্বাপিত-ভাতি ১০
শত মৃত তারকার
মৃতদেহ রয়েছে শয়ান
সেথায় সে করেছে পয়াণ।

কেন গো, কী হয়েছিল তার।
একবার শুধালে না কেহ— ১৫
কী লাগি সে তেয়াগিল দেহ।

যদি কেহ শুধাইত
আমি জানি কী যে সে কহিত।
যতদিন বেঁচে ছিল
আমি জানি কী তারে দহিত। ২০
সে কেবল হাসির যন্ত্রণা,
আর কিছু না।[১]
জলন্ত অঙ্গারখণ্ড ঢাকিতে আঁধার হৃদি[২]
অনিবার হাসিতেই রহে,
যত হাসে ততই সে দহে। ২৫
তেমনি, তেমনি তারে[৩] হাসির অনল
দারুণ উজ্জ্বল—
দহিত, দহিত তারে, দহিত কেবল।[৪]
জ্যোতির্ময় তারাপূর্ণ বিজন তেয়াগি
তাই আজ ছুটেছে সে নিতান্ত মনের ক্লেশে ৩০
আঁধারের তারাহীন বিজনের লাগি।

কেন গো, তোমরা যত তারা[৫]
উপহাস করি তারে হাসিছ অমন ধারা।
তোমাদের হয়নি তো ক্ষতি,[৬]
যেমন আছিল আগে তেমনি রয়েছে জ্যোতি। ৩৫
সে কি কভু ভেবেছিল মনে—
(এত গর্ব আছিল কি তার ?)[৭]
আপনারে[৮] নিবাইয়া তোমাদের করিবে আঁধার।[৯]
গেল, গেল, ডুবে গেল, তারা এক ডুবে গেল,
আঁধারসাগরে— ৪০
গভীর নিশীথে
অতল আকাশে।
হৃদয়, হৃদয় মোর, সাধ কি রে যায় তোর[১০]
ঘুমাইতে ওই মৃত তারাটির পাশে

ওই আঁধারসাগরে ৪৫
এই গভীর নিশীথে
ওই অতল আকাশে।

১ প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পর আরও ছয় ছত্র ছিল—

মনে তার ছিলনাক' সুখ
মুখে তারে হাসিতে হইত।
প্রতি সন্ধ্যা বেলা
একেলা একেলা—
হাসির রাজ্যের মাঝে একটি বিষাদ শুধু
ম্লান-মনে হাসি-মুখে কেবলি ভ্রমিত।

দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছয় ছত্রের প্রথম দুই ছত্র রক্ষিত; তৃতীয় ও চতুর্থ ছত্র বর্জিত; পঞ্চম ও ষষ্ঠ ছত্র এইরূপে পুনর্লিখিত—

হাসির হাটের মাঝে একটি বিষাদ শুধু
ম্লান-মনে হাসি-মুখে জাগিয়া রহিত।

কাব্যগ্রন্থ ১-এ এই ছয় ছত্র সম্পূর্ণই বর্জিত হয়, তদবধি অন্যান্য সংস্করণেও বর্জিত। কাব্যগ্রন্থ ২-এ এই ছয় ছত্র, এবং আরও তিন ছত্র (২৩-২৫ : 'জলন্ত অঙ্গার খণ্ড…দহে') বর্জিত।

২ কাব্যগ্রন্থ ৩-এ ছত্রটি এইভাবে পুনর্লিখিত—

জলন্ত অঙ্গার যেন লুকাতে কালিমা তার

৩ কাব্যগ্রন্থ ২-এ এই ছত্রের 'তেমনি, তেমনি তারে'অংশ বর্জিত।

৪ এই ছত্রের পর প্রথম সংস্করণে এই চারটি ছত্র ছিল—

যে গান গাহিতে হ'ত
সে গান তাহার গান নয়,
যে কথা কহিতে হ'ত,
সে কথা তাহার কথা নয়।

কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি বর্জিত।

৫ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে এই ছত্রের পাঠ ছিল—

তবে গো তোমরা কেন সহস্র সহস্র তারা

রচনাবলীতে কবি এই ছত্রের পাঠ-পরিবর্তন করেন।

৬ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে এই ছত্রের পাঠ ছিল—

কহিতেছ—"আমাদের কি হয়েছে ক্ষতি?

রচনাবলীতে কবি এই ছত্রের পাঠ-পরিবর্তন করেন।

৩৯শ ছত্রের পরে প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে একটি ছত্র ছিল, এই পাঠ-পরিবর্তনের

আনুষঙ্গিকরূপে সেটিও বর্জন করেন। বর্জিত ছত্রটি এই—

হেন কথা বলিও না আর।

এই ছত্রটি কাব্যগ্রন্থ ৩-এও বর্জিত।

৭ চয়নিকাতে এই ছত্রটি বন্ধনী- ও প্রশ্ন-চিহ্ন-বর্জিত।

৮ ভারতীতে 'আপনাকে'।

৯ এই ছত্রের পর প্রথম সংস্করণে আরও বারোটি ছত্র ছিল—

নিজের প্রাণের জ্বালা
আঁধারে সে ডুবাতে গিয়াছে।
নিজের মুখের জ্যোতি
আঁধারে সে নিভাতে গিয়েছে।
হৃদয় তাহার
চাহে না হইতে জ্যোতি,
চাহে শুধু হইতে আঁধার।
যেথায় সে ছিল, সেথা রাখে নাই চিহ্ন লেশ,
থাকে নাই ভস্ম-অবশেষ।
ওই কাব্য-গ্রন্থ হ'তে নিজের অক্ষর
মুছিয়া ফেলেছে একেবারে,
উপহাস করিও না তারে।

ভারতীতে এই বারো ছত্রের অষ্টম-দশম ছত্রের পাঠ—

যেথায় সে ছিল, সেথা চিহ্নমাত্র রাখে নাই
ভস্ম-শেষ মাত্র থাকে নাই।
ওই কাব্যগ্রন্থ হ'রত নিজের অক্ষর

"হয়ত" মুদ্রণপ্রমাদ বলে বোধ হয়।

এই বারো ছত্রের ৫-৮ এই তিন ছত্র ("হৃদয়···আঁধার) দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত।

কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি সম্পূর্ণ বারো ছত্রই বর্জিত।

১০ চয়নিকাতে শেষ পাঁচ ছত্র (৪৩-৪৭ : 'হৃদয়···আকাশে') বর্জিত।

আশার নৈরাশ্য

ওরে আশা, কেন তোর হেন দীনবেশ!
নিরাশারই মতো যেন বিষণ্ণ বদন কেন—
যেন অতি সংগোপনে
যেন অতি সন্তর্পণে
অতি ভয়ে ভয়ে প্রাণে করিস প্রবেশ।

ফিরিবি কি প্রবেশিবি ভাবিয়া না পাস,
কেন, আশা, কেন তোর কিসের তরাস।[১]

আজ আসিয়াছ দিতে যে সুখ-আশ্বাস,
নিজে তাহা কর না বিশ্বাস,
তাই হেন মৃদু গতি,[২] ১০
তাই উঠিতেছে ধীরে দুখের নিশ্বাস।
বসিয়া মরমস্থলে কহিছ চোখের জলে—
"বুঝি হেন দিন রহিবে না,
আজ যাবে, আসিবে তো কাল,[৩]
দুঃখ যাবে, ঘুচিবে যাতনা।" ১৫
কেন, আশা, মোরে কেন হেন প্রতারণা।
দুঃখক্লেশে আমি কি ডরাই,
আমি কি তাদের চিনি নাই।
তারা সবে আমারি কি নয়।
তবে, আশা, কেন এত ভয়।[৪] ২০
তবে কেন বসি মোর পাশ
মোরে, আশা, দিতেছ আশ্বাস।[৫]

বলো, আশা, বসি মোর চিতে,
"আরো দুঃখ হইবে বহিতে,
হৃদয়ের যে প্রদেশ হয়েছিল ভস্মশেষ ২৫
আর যারে হত না সহিতে,
আবার নূতন প্রাণ পেয়ে
সেও পুন থাকিবে দহিতে।"

করিয়ো না ভয়,[৬]
দুঃখ-জ্বালা আমারি কি নয়? ৩০
তবে কেন হেন ম্লান মুখ,
তবে কেন হেন দীন বেশ?
তবে কেন এত ভয়ে ভয়ে
এ হৃদয়ে করিস প্রবেশ?[৭]

১ এই ছত্রের পর প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে আরও দুইটি ছত্র ছিল—

বহুদিন আসিস্ নি প্রাণের ভিতর,

তাই কি সঙ্কোচ এত তোর ?

রচনাবলীতে ছত্র দুইটি বর্জিত।

কাব্যগ্রন্থ ২-এ উক্ত দুই ছত্র, এবং পূর্ববর্তী দুই ছত্রও (৬-৭) বর্জিত।

২ এই ছত্রটি প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে এইরূপ ছিল—

তাই মুখ ম্লান অতি তাই হেন মৃদু-গতি

রচনাবলীতে পরিবর্তিত।

৩ এই ছত্র প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ এবং কাব্যগ্রন্থ ১-এ এইরূপ ছিল—

আজ যাবে, কাল আসিবেক,

কাব্যগ্রন্থ ২-এ এই ছত্রটির পাঠ—

আজ যাবে, কাল ত আসিবে,

সন্ধ্যাসংগীত [১৯১১] ও তদবধি বর্তমান পাঠ আছে।

৪ ভারতীতে এই ছত্রের পাঠ—

আমি কি তাদের করি ভয় ?

৫ কাব্যগ্রন্থ ২-এ, এর পরবর্তী যাবতীয় ছত্র বর্জিত।

৬ এই ছত্রের পূর্বে প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে অপর একটি ছত্র ছিল—

আরো কি সহিতে আছে একে একে মোর কাছে

রচনাবলীতে ছত্রটি বর্জিত।

এই ছত্রটি প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে এইরূপ ছিল—

খুলে বল করিও না ভয় !

রচনাবলীতে পরিবর্তিত।

৭ এই ছত্রের পর প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রগুলি ছিল—

বলিতে কি আসিয়াছ, ফুরায়ে এসেছে

এ জীবন মোর ?

জীবনের দীর্ঘ রাত্রি হইতেছে ভোর ?

তবে এস, এস আশা,

তবে হাস, হাস আশা,

তবে কেন হেন ম্লান মুখ ?

নিরাশার মত দীন বেশ ?

তবে কেন এত ভয়ে ভয়ে

এ হৃদয়ে করিস্ প্রবেশ ?

সব গেছে কাঁদিতে কাঁদিতে,
বাকি যাহা আছে আর, শুধু, শুধু, অশ্রুধার,
যাবে তাহা হাসিতে হাসিতে।

এই ছত্রগুলি কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি বর্জিত।

পরিত্যক্ত

চলে গেল, আর কিছু নাই কহিবার।
চলে গেল, আর কিছু নাই গাহিবার।
শুধু গাহিতেছে আর শুধু কাঁদিতেছে
দীনহীন হৃদয় আমার শুধু বলিতেছে,
"চলে গেল সকলেই চলে গেল গো, ৫
বুক শুধু ভেঙে গেল, দ'লে গেল গো।"

বসন্ত[১] চলিয়া গেলে বর্ষা[২] কেঁদে কেঁদে বলে,
"ফুল গেল, পাখি গেল—
আমি শুধু রহিলাম, সবই গেল গো।"
দিবস ফুরালে রাতি স্তব্ধ হয়ে রহে, ১০
শুধু কেঁদে কহে,
"দিন গেল, আলো গেল, রবি গেল গো—
কেবল একেলা আমি, সবই গেল গো।"
উত্তরবায়ুর সম প্রাণের বিজনে মম
কে যেন কাঁদিছে শুধু, ১৫
"চলে গেল, চলে গেল,
সকলেই চলে গেল গো।"

উৎসব ফুরায়ে গেলে ছিন্ন শুষ্ক মালা
পড়ে থাকে হেথায় হোথায়—
তৈলহীন শিখাহীন ভগ্ন দীপগুলি ২০
ধুলায় লুটায়—
একবার ফিরে কেহ দেখে নাকো ভুলি,
সবে চলে যায়।

পুরানো মলিন ছিন্ন বসনের মতো
মোরে ফেলে গেল, ২৫
কাতর নয়নে চেয়ে রহিলাম কত—
সাথে না লইল।

তাই প্রাণ গাহে শুধু, কাঁদে শুধু, কহে শুধু,
"মোরে ফেলে গেল,
সকলেই মোরে ফেলে গেল ৩০
সকলেই চলে গেল গো।"

একবার ফিরে তারা চেয়েছিল কি?
বুঝি চেয়েছিল।
একবার ভুলে তারা কেঁদেছিল কি?
বুঝি কেঁদেছিল[৩] ৩৫
বুঝি ভেবেছিল—
লয়ে যাই— নিতান্ত কি একেলা কাঁদিবে?[৪]
তাই বুঝি ভেবেছিল।
তাই চেয়েছিল।
তার পরে? তার পরে! ৪০
তার পরে বুঝি হেসেছিল।[৫]
একফোঁটা অশ্রুবারি মুহূর্তেই শুকাইল।[৬]
তার পরে? তার পরে!
চলে গেল।[৭]
তার পরে? তার পরে! ৪৫
ফুল গেল, পাখি গেল, আলো গেল, রবি গেল,
সবই গেল, সবই গেল গো—
হৃদয় নিশ্বাস ছাড়ি কাঁদিয়া কহিল,
"সকলেই চলে গেল গো,
আমারেই ফেলে গেল গো।"

১ প্রথম সংস্করণে 'সকলি'
দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে বর্তমান পাঠ প্রচলিত।

২ প্রথম সংস্করণে 'গীত'
দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে বর্তমান পাঠ প্রচলিত।

৩ কাব্যগ্রন্থ ৩-এ এই ছত্রের পরবর্তী সাত ছত্র (৩৬-৪২) বর্জিত।

৪ এই ছত্রের পর প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে দুইটি ছত্র ছিল—

না-না কি হইবে লয়ে ?

কি কাজে লাগিবে ?

রচনাবলীতে বর্জিত।

৫ এই ছত্রের পর প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে এই ছত্র ছিল—

হসিত কপোলে তারি

রচনাবলীতে বর্জিত।

৬ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে এই ছত্রের পাঠ—

…মুহূর্তেই শুকাইয়া গেল!

রচনাবলীতে পরিবর্তিত।

৭ এই ছত্রের পর প্রথম সংস্করণে এই কয়টি ছত্র ছিল—

হাসিল, গাহিল,

কহিল চাহিল,

হাসিতে হাসিতে গাহিতে গাহিতে

চলে গেল!

দ্বিতীয় সংস্করণে ও তদবধি বর্জিত।

সুখের বিলাপ

অবশ নয়ন নিমীলিয়া
সুখ কহে নিশ্বাস ফেলিয়া,[১]
"এমন জোছনা সুমধুর,
বাঁশরি বাজিছে দূর দূর,
যামিনীর হসিত নয়নে ৫
লেগেছে মৃদুল ঘুমঘোর।
নদীতে উঠেছে মৃদু ঢেউ,
গাছেতে নড়িছে মৃদু পাতা ;
লতায় ফুটিয়া ফুল দুটি
পাতায় লুকায় তার মাথা ; ১০
মলয় মৃদুরে বনভূমে
কাঁপায়ে গাছের ছায়াগুলি
লাজুক ফুলের মুখ হতে

ঘোমটা দিতেছে খুলি খুলি।
এমন মধুর রজনীতে ১৫
একেলা রয়েছি বসিয়া,
যামিনীর হৃদয় হইতে
জোছনা পড়িছে খসিয়া।"

হৃদয়ে একেলা শুয়ে শুয়ে
সুখ শুধু এই গান গায়, ২০
"নিতান্ত একেলা আমি যে
কেহ, কেহ, কেহ নাই হায়।"
আমি তারে শুধাইনু গিয়া,
"কেন, সুখ, কার কর আশা?"
সুখ শুধু কাঁদিয়া কহিল, ২৫
"ভালোবাসা, ভালোবাসা গো।[২]
সকলি, সকলি হেথা আছে—
কুসুম ফুটেছে গাছে গাছে,
আকাশে তারকা রাশি রাশি,
জোছনা ঘুমায় হাসি হাসি। ৩০
সকলি, সকলি হেথা আছে—
সেই শুধু, সেই শুধু নাই,
ভালোবাসা নাই শুধু কাছে!"[৩]

অবশ নয়ন নিমীলিয়া
সুখ কহে নিশ্বাস ফেলিয়া, ৩৫
"এই তটিনীর ধারে, এই শুভ্র জোছনায়,
এই কুসুমিত বনে, এই বসন্তের বায়,
কেহ মোর নাই একেবারে,
তাই সাধ গেছে কাঁদিবারে।[৪]
তাই সাধ যায় মনে মনে— ৪০
মিশাব এ যামিনীর সনে,
কিছুই রবে না আর প্রাতে,
শিশির রহিবে পাতে পাতে।[৫]
সাধ যায় মেঘটির মতো

কাঁদিয়া মরিয়া গিয়া আজি ৪৫
অশ্রুজলে হই পরিণত।"

সুখ বলে, "এ জন্ম ঘুচায়ে
সাধ যায় হইতে বিষাদ।"
"কেন সুখ, কেন হেন সাধ?"
"নিতান্ত একা যে আমি গো ৫০
কেহ যে, কেহ যে নাই মোর।"
"সুখ, কারে চায় প্রাণ তোর?
সুখ, কার করিস রে আশা?"
সুখ শুধু কেঁদে কেঁদে বলে,
"ভালোবাসা, ভালোবাসা গো।" ৫৫

১ সন্ধ্যাসঙ্গীত [১৯১১]-এ এই ছত্রের পাঠ 'সুখে কহে…' আছে। স্পষ্টতঃই মুদ্রণপ্রমাদ।
প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রের পর এই তিনটি ছত্র ছিল—

"নিতান্ত একেলা আমি,
কেহ—কেহ—কেহ নাই হেথা,
কেহ—কেহ—কেহ নাই মোর।

কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি বর্জিত।
কাব্যগ্রন্থ ২-এ এই কয় ছত্র ও পরবর্তী ৩-১৪ ছত্র বর্জিত।

২ কাব্যগ্রন্থ ২-এ এই ছত্রের পরবর্তী ২৭-৪৬ ছত্র বর্জিত।

৩ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রের পর এই ছত্রগুলি ছিল—

নিতান্তই একেলা ফেলিয়া
ভালবাসা, গেলি কি চলিয়া?
আবার কি দেখা হবে রে?
আর কি রে ফিরিয়া আসিবি?
আর কি রে হৃদয়ে বসিবি?
উভয়ে উভের মুখ চেয়ে
আবার কাঁদিব কবে রে?
অভিমান ক'রে মোর পরে
দুখেরে কি করিলি বরণ?
তারি বুকে মাথা রেখে করিলি শয়ন?
তারি গলে দিলি মালা?
তারি হাতে দিলি হাত?

সতত ছায়ার মত
রহিলি কি তারি সাথ ?
তাই আমি কুসুম-কাননে
নিতান্ত একেলা বসি রে,
জোছনা হাসিয়া কাঁদিতেছে
সুখের নিশির শিশিরে !"

দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রাবলীর ষষ্ঠ ছত্রের পাঠ 'উভয়ে উভয়ে...'
কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি ছত্রগুলি বর্জিত।

৪ প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পর এই কয় ছত্র ছিল—

আজি এ গভীর রজনীতে—
জোছনা-মগন নীরবতা,
সুদূর বাঁশির মৃদু স্বর
মলয়ের কানে কানে কথা,
সহসা জাগায়ে দিল মোরে,
চমকি চাহিনু ঘুম-ঘোরে,
ভালবাসা সে আমার নাই,
চারি দিকে শূন্য এই ঠাঁই,
ঘুমায়ে ছিলাম, ভাল ছিনু,
জাগিয়া একি এ নিরখিনু ;
দেখিনু, নিতান্ত একা আমি,
কেহ মোর নাই একেবারে !
তাই সাধ গেছে কাঁদিবারে !

দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রাবলীর প্রথম দশ ছত্র রক্ষিত।
কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি সবকটি ছত্রই বর্জিত।
কাব্যগ্রন্থ ৩-এ ৪৪-৪৬ ছত্র বর্জিত।

হৃদয়ের গীতিধ্বনি

ও কী সুরে গান গাস, হৃদয় আমার ?
শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, বসন্ত শরৎ নাই,
দিন নাই, রাত্রি নাই— অবিরাম অনিবার
ও কী সুরে গান গাস, হৃদয় আমার ?
বিরলে বিজন বনে বসিয়া আপন মনে

ভূমি-পানে চেয়ে চেয়ে, একই গান গেয়ে গেয়ে—[১]
দিন যায়, রাত যায়, শীত যায়, গ্রীষ্ম যায়,
তবু গান ফুরায় না আর।
মাথায় পড়িছে পাতা, পড়িছে শুকানো ফুল,
পড়িছে শিশিরকণা, পড়িছে রবির কর, ১০
পড়িছে বরষা-জল ঝরঝর ঝরঝর,
কেবলি মাথার 'পরে করিতেছে সমস্বরে
বাতাসে শুকানো পাতা মরমর মরমর—
বসিয়া বসিয়া সেথা, বিশীর্ণ মলিন প্রাণ
গাহিতেছে একই গান একই গান একই গান। ১৫

পারিনে শুনিতে আর, একই গান একই গান।
কখন থামিবি তুই, বল্ মোরে বল্ প্রাণ!
একেলা ঘুমায়ে আছি—
সহসা স্বপন টুটি
সহসা জাগিয়া উঠি ২০
সহসা শুনিতে পাই
হৃদয়ের এক ধারে
সেই স্বর ফুটিতেছে,
সেই গান উঠিতেছে—
কেহ শুনিছে না যবে ২৫
চারি দিকে স্তব্ধ সবে
সেই স্বর সেই গান অবিরাম অবিশ্রাম
অচেতন আঁধারের শিরে শিরে চেতনা সঞ্চারে।

দিবসে মগন কাজে, চারি দিকে দলবল,
চারি দিকে কোলাহল। ৩০
সহসা পাতিলে কান শুনিতে পাই সে গান,
নানাশব্দময় সেই জনকোলাহল
তাহারি প্রাণের মাঝে একমাত্র শব্দ বাজে—
এক সুর, এক ধ্বনি, অবিরাম[২] অবিরল—
যেন সে কোলাহলের হৃদয়স্পন্দন-ধ্বনি— ৩৫
সমস্ত ভুলিয়া যাই, বসে বসে তাই গনি।

ঘুমাই বা জেগে থাকি, মনের দ্বারের কাছে
কে যেন বিষণ্ণ প্রাণী দিনরাত বসে আছে—
চিরদিন করিতেছে বাস,
তারি শুনিতেছি যেন নিশ্বাস-প্রশ্বাস। ৪০

এ প্রাণের ভাঙা ভিতে স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে
ঘুঘু এক বসে বসে গায় একস্বরে,
কে জানে কেন সে গান গায়।
গলি সে কাতর স্বরে স্তব্ধতা কাঁদিয়া মরে,
প্রতিধ্বনি করে হায়-হায়।[৩] ৪৫

হৃদয় রে, আর কিছু শিখিলিনে তুই,
শুধু ওই গান!
প্রকৃতির শত শত রাগিণীর মাঝে
শুধু ওই তান![৪]
তবে থাম্ থাম্ ওরে প্রাণ, ৫০
পারিনে শুনিতে আর একই গান, একই গান।

১ প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পর আরও একটি ছত্র ছিল—

এক্-ই গান গেয়ে গেয়ে

দ্বিতীয় সংস্করণে ও তদবধি বর্জিত।

২ প্রথম সংস্করণে 'অবিরল'।

দ্বিতীয় সংস্করণে ও তদবধি পরিবর্তিত।

৩ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রের পর এই ছয় ছত্র ছিল—

পারিনে শুনিতে আর, এক্-ই গান, এক্-ই গান।
কখন্ থামিবি তুই—বল্ মোরে—বল্ প্রাণ।
হরষের গান আমি গাহিবারে চাহি যত,
তোর এ বিষণ্ণ সুর শ্রবণেতে পশে তত—
যে সুরে আরম্ভ করি শেষ নাহি হয় তায়
তোমারি সুরের সাথে অলক্ষ্যে মিলিয়া যায়।

কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি বর্জিত।

৪ প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পর এই ১১ ছত্র ছিল—

কি গাহিবে আর!

এক আশা, এক সুখ—এক ছিল যার
সেই এক হারায়েছে তার—
কি গাহিবে আর !
এক গান গেয়ে শুধু সমস্ত জগতে ফেরে
"যে এক গিয়েছে মোর তাই ফিরাইয়া দেরে !
আর কিছু চাহিনেরে !"
ভ্রমিতেছে শুধাইয়া সারা জগতের কাছে—
"যে এক আছিল মোর—সে মোর কোথায় আছে !"
বিধাতার কাছে শুধু এক ভিক্ষা মাগিতেছে—
দিন নাই, রাত্রি নাই, এক ভিক্ষা মাগিতেছে—
"দাও গো ফিরায়ে মোরে, যে এক হারায়ে গেছে !"
তাই এক গান গাহে একেলা বসিয়া
অবিরাম—অনিবার—
কি গাহিবে আর !

তোর গান শুনিবে না কেহ !
নাই বা শুনিল ।
তোর গানে কাঁদিবে না কেহ ।
নাই বা কাঁদিল ।

দ্বিতীয় সংস্করণে ও তদবধি এই ছত্রাবলীর প্রথম ১৫ ছত্র বর্জিত ।
শেষ চার ছত্রও রচনাবলীতে কবি বর্জন করেন ।

দুঃখ-আবাহন

আয় দুঃখ, আয় তুই,
তোর তরে পেতেছি আসন,
হৃদয়ের প্রতি শিরা টানি টানি উপাড়িয়া
বিচ্ছিন্ন শিরার মুখে তৃষিত অধর দিয়া
বিন্দু বিন্দু রক্ত তুই করিস শোষণ ;
জননীর স্নেহে তোরে করিব পোষণ ।
হৃদয়ে আয় রে তুই হৃদয়ের ধন ।[১]

নিভৃতে ঘুমাবি[২] তুই হৃদয়ের নীড়ে ;
অতি গুরু তোর ভার[৩]—

দু-একটি শিরা তাহে যাবে বুঝি ছিঁড়ে, ১০
যাক ছিঁড়ে।
জননীর স্নেহে তোরে করিব বহন
দুর্বল বুকের 'পরে করিব ধারণ,
একেলা বসিয়া ঘরে অবিরল একস্বরে
গাব তোর কানে কানে ঘুম পাড়াবার গান ১৫
মুদিয়া আসিবে তোর শ্রান্ত দু-নয়ান।
প্রাণের ভিতর হতে উঠিয়া নিশ্বাস
শ্রান্ত কপালেতে তোর করিবে বাতাস,
তুই[৪] নীরবে[৫] ঘুমাস।

আয়, দুঃখ, আয় তুই, ব্যাকুল এ হিয়া। ২০
দুই হাতে মুখ চাপি হৃদয়ের ভূমি-'পরে
পড়্ আছাড়িয়া।
সমস্ত হৃদয় ব্যাপি একবার উচ্চস্বরে
অনাথ শিশুর মত ওঠ্ রে কাঁদিয়া।
প্রাণের মর্মের কাছে ২৫
একটি যে ভাঙা বাদ্য আছে
দুই হাতে তুলে নে রে, সবলে বাজায়ে দে রে
নিতান্ত উন্মাদ-সম ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্।
ভাঙে তো ভাঙিবে বাদ্য, ছেঁড়ে তো ছিঁড়িবে তন্ত্রী—
নে রে তবে তুলে নে রে, সবলে বাজায়ে দে রে ৩০
নিতান্ত উন্মাদ-সম ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্।
দারুণ আহত হয়ে দারুণ শব্দের ঘায়
যত আছে প্রতিধ্বনি বিষম প্রমাদ গনি
একেবারে সমস্বরে
কাঁদিয়া উঠিবে যন্ত্রণায়— ৩৫
দুঃখ, তুই আয় তুই আয়।

নিতান্ত একেলা এ হৃদয়।[৬]
আর কিছু নয়,
কাছে আয় একবার, তুলে ধর্ মুখ তার,
মুখে তার আঁখি দুটি রাখ্, ৪০

একদৃষ্টে চেয়ে শুধু থাক্‌।
আর কিছু নয়,
নিরালয় এ হৃদয়
শুধু এক সহচর চায়।
তুই দুঃখ, তুই কাছে আয়। ৪৫
কথা না কহিস যদি[৭] বসে থাক নিরবধি
হৃদয়ের পাশে দিনরাতি।
যখনি খেলাতে চাস হৃদয়ের কাছে যাস,
হৃদয় আমার চায় খেলাবার সাথি।[৮]

আয় দুঃখ হৃদয়ের ধন, ৫০
এই হেথা পেতেছি আসন
প্রাণের মর্মের কাছে
এখনো যা রক্ত আছে
তাই তুই করিস শোষণ।

১ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে এই ছত্রের পর এই দুই ছত্র ছিল—

যখনি হইবি শ্রান্ত বুকেতে রাখিস মাথা।
সে বিছানা সুকোমল শিরায় শিরায় গাঁথা।

কাব্যগ্রন্থ ৩-এ 'যখনি' স্থলে 'যখন'।
রচনাবলীতে কবি এই দুই ছত্র বর্জন করেন।

২ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে 'নিভৃতে ঘুমাবি'-র স্থলে 'সুখেতে ঘুমাস' ছিল।
রচনাবলীতে কবি এই পরিবর্তন করেন।

৩ প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পাঠ ছিল—

অতি গুরুভার তুই—

দ্বিতীয় সংস্করণে পাঠ ছিল—

অতি গুরুভার তোর—

কাব্যগ্রন্থ ১ থেকে বর্তমান পাঠ প্রচলিত।

৪ ভারতীতে 'তুই' ছিল না।
প্রথম সংস্করণে ও তদবধি 'তুই' প্রচলিত।

৫ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে 'নীরবে' স্থলে 'সুখেতে'।
রচনাবলীতে পরিবর্তিত।

৬ প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পর একটি ছত্র ছিল—

কেহ নাই, যারে ডেকে দুটি কথা কয়।

দ্বিতীয় সংস্করণে ও তদবধি বর্জিত।

প্রথম সংস্করণে ৪৬ ছত্রের এই অংশের পাঠ ছিল—

কহিতে না চাস্ যদি

দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে বর্তমান পাঠ প্রচলিত।

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রের পর এই ছত্রগুলি ছিল —

যখনি খেলাতে চাস প্রাণের প্রান্তরে যাস্
সেথায় ভস্মের স্তূপ আছে ;
মিলি তোরা দুই ভাই, ফুঁ দিয়ে উড়াস্ ছাই,
সতত থাকিস্ কাছে কাছে।
সহসা দেখিতে যদি পাস্
দগ্ধ-শেষ অস্থি রাশ রাশ,
তাই নিয়ে খেলেনা গড়িস্,
তাই নিয়ে হাসিস্ কাঁদিস্ !
প্রাণের যেথায়
অলক্ষ্যেতে শোণিতের কল্প বহে যায়,
যাস্‌রে সেথায়,
খুড়িস্ বালুকা-রাশি অস্থি খণ্ড দিয়া
শোণিত উঠিবে উথলিয়া ?
লয়ে সে শোণিত ধারা মিশায়ে ভস্মের স্তূপে
গড়িস ভস্মের ঘর,
গড়িস ভস্মের নর,
গড়িস্ খেলানা নানারূপে।
তাই নিয়ে ভাঙিস গড়িস,
তাই নিয়ে খেলানা করিস,
অস্থি, আর ভস্ম, আর হৃদয় শোণিত ধার,
তাই নিয়ে খেলানা গড়িস;
দুই ভায়ে সতত খেলিস।

দুঃখ, তুই আয় মোর কাছে !
তুই ছাড়া কে আমার আছে !
প্রমোদে হয়েছি আমি শ্রান্ত অতিশয়,
পারিনে হাসিতে আর কঙ্কালের হাসি,
মাংসহীন অস্থিদন্ত ময়।
শুধু হাসি, শুধু হাসি, আর কিছু নয়।

বেশ ছিনু, বেশ ছিনু আগে,
যৌবনের কুঞ্জবন দহি দহি অনুক্ষণ
শুকায়ে আসিয়াছিল জ্বলন্ত নিদাঘে,
মাঝেতে বহিল কেন বসন্তের বায়
শুষ্ক কুঞ্জবনে ?
রাশি রাশি শুষ্ক পাতা শুষ্ক শাখা যত
মাতি উঠি বসন্ত পবনে
ঝর ঝর ঝর ঝরে ভাঙ্গা কণ্ঠ স্বরে
উচ্ছ্বাসিল প্রমোদের গান,
সহসা স্বপন টুটে প্রতিধ্বনি এল ছুটে
প্রাণের চৌদিক হতে, দেখিবারে, শুধাইতে
শুষ্ক কুঞ্জ-বনান্তরে
কত—কত দিন পরে
কে এলরে কে এলরে কে ধরিল তান।”
পাতায় পাতায় মিলি
শাখায় শাখায় মিলি
ধরিয়াছে গান।
সে কি ভাল লাগে ?
শুকান' পাতার স্বর শুকান' শাখার গান
সে কি ভাল লাগে ?
তাই এ হৃদয় ভিক্ষা মাগে
বরষা হওগো উপনীত।
ঝর ঝর অবিরল ঝরিয়া পড়ুক জল
শুনি ব'সে অশ্রুর সঙ্গীত।

ভারতীতে এই ছত্রাবলীর ৪৫ ছত্রে 'ধরিয়াছে গান' স্থলে 'ধোরেছিল গান' ছিল।

দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রাবলীর ষষ্ঠ ছত্রের পাঠ, 'দগ্ধ-শেষ অস্থি রাশ রাশ' স্থলে 'দগ্ধ-শেষ আস্থ এক রাশ,' ছিল।

কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি এই ৫২ ছত্র বর্জিত।

শান্তিগীত

ঘুমা দুঃখ হৃদয়ের ধন,
ঘুমা তুই, ঘুমা রে এখন।
সুখে সারা দিনমান শোণিত করিয়া পান
এখন তো মিটেছে তিয়াষ?
দুঃখ তুই সুখেতে ঘুমাস।[১] ৫

আজ জোছনার রাত্রে বসন্তপবনে,
অতীতের পরলোক ত্যজি শূন্যমনে,
বিগত দিবসগুলি শুধু একবার
পুরানো খেলার ঠাঁই দেখিতে এসেছে
এই হৃদয়ে আমার— ১০
যবে বেঁচেছিল তারা এই এ শ্মশানে
দিন গেলে প্রতিদিন পুড়াত যেখানে
একেকটি আশা আর একেকটি সুখ;
সেইখানে আসি তারা বসিয়া রয়েছে
অতি ম্লান মুখ। ১৫
সেখানে বসিয়া তারা সকলে মিলিয়া
অতি মৃদু স্বরে
পুরানো কালের গীতি নয়ন মুদিয়া
ধীরে গান করে।[২]
দুঃখ, তুই ঘুমা। ২০
ধীরে উঠিতেছে গান,
ক্রমে ছাইতেছে প্রাণ,
নীরবতা ছায় যথা সন্ধ্যার গগন।
গানের প্রাণের মাঝে তোর তীব্র কণ্ঠস্বর
ছুরির মতন। ২৫
তুই থাম্ দুঃখ, থাম্।
তুই ঘুমা দুঃখ, ঘুমা।[৩]

কাল উঠিস আবার,
খেলিস দুরন্ত খেলা হৃদয়ে আমার;

হৃদয়ের শিরাগুলি ছিঁড়ি ছিঁড়ি মোর ৩০
তাইতে রচিস তন্ত্রী বীণাটির তোর,
সারাদিন বাজাস বসিয়া
ধ্বনিয়া হৃদয়।
আজ রাত্রে রব শুধু চাহিয়া চাঁদের পানে,
আর কিছু নয়।

১ প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পর এই কয় ছত্র ছিল—

প্রশান্ত যামিনী আজি
কুসুম শয্যার পরে আঁচল পেতেছে,—
আকুল জোছনা,
বসন্ত-হৃদয়া আর ফুলন্ত-স্বপনা
শ্যামল-যৌবনা পৃথিবীর
বুকের উপরে আসি মরিয়া যেতেছে।
তবে ঘুমা দুঃখ ঘুমা।

স্বপনের ঘোরে যেন বেড়ায় ভ্রমিয়া
শিশু-সমীরণ,
কুসুম ছুঁইয়া,
ঘুমে যেন চলে না চরণ—
দুই পা চলিতে যেন পড়িছে শুইয়া
প্রশান্ত সরসী কোলে দেহটি থুইয়া;
দুঃখ তুই ঘুমা।

দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রাবলীর চতুর্থ ছত্রটি বর্জিত, অন্য ছত্রগুলি আছে।
কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি এই যাবতীয় ছত্র বর্জিত।

২ প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পর এই কয় ছত্র ছিল—

বাঁশরীর স্বর দিয়া
তারকার কর দিয়া
প্রভাতের স্বপ্ন দিয়া
ইন্দ্রধনু-বাষ্পময় ছবি আঁকিতেছে।
বুকে—ঢেকে রাখিতেছে।

দ্বিতীয় সংস্করণে ও তদবধি বর্জিত।

৩ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রের পর এই কয় ছত্র ছিল—

প্রাণের একটি ধারে আছে রে আঁধার ঠাঁই,
শুকানো পাতার পরে ঘুমাস্ সেথাই।
আঁধার গাছের ছায়ে রয়েছে কুয়াশা করি,
শুকানো ফুলের দল পড়িছে মাথার পরি,
সুমুখে গাহিছে নদী কল কল একতান,
রজনীর চক্রবাকী কাঁদিয়া গাহিছে গান ;
ঘুমাস্ সেথাই—
আজ রাত্রে র'ব শুধু চাহিয়া চাঁদের পানে,
আর কিছু নয়—
—বহুদিন পরে দেখা মুমূর্ষু প্রণয়ী যথা
আঁকড়িয়া ধরে বুক একটি কহে না কথা—
পুরাতন দিবসের যত কথাগুলি
শত গীতময়—
প্রাণের উপরে আসি রহিবে পড়িয়া
মরমে মরিয়া।
আজ তুই ঘুমা'—

দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রাবলীর একাদশ ছত্রের পাঠ 'আঁকড়িয়া ধরে বুক…' স্থলে 'আঁকড়িয়া রহে বুকে…' ছিল।

কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি এই যাবতীয় ছত্র বর্জিত।

অসহ্য ভালোবাসা

বুঝেছি গো বুঝেছি সজনি,
কী ভাব তোমার মনে জাগে—
বুক-ফাটা প্রাণ-ফাটা মোর ভালোবাসা[১]
এত বুঝি ভালো নাহি লাগে।
এত ভালোবাসা বুঝি পার না সহিতে,[২]
এত বুঝি পার না বহিতে।

যখনি গো নেহারি তোমায়—
মুখ দিয়া আঁখি দিয়া বাহিরিতে চায় হিয়া,
শিরার শৃঙ্খলগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিতে চায়,
ওই মুখ বুকে ঢাকে, ওই হাতে হাত রাখে, ১০

কী করিবে ভাবিয়া না পায়,
যেন তুমি কোথা আছ খুঁজিয়া না পায়।[৩]
মন মোর পাগলের হেন প্রাণপণে শুধায় সে যেন,
"প্রাণের প্রাণের মাঝে কী করিলে তোমারে গো পাই,
যে ঠাঁই রয়েছে শূন্য কী করিলে সে শূন্য পুরাই!" ১৫
এইরূপে দেহের দুয়ারে
মন[৪] যবে থাকে যুঝিবারে,
তুমি চেয়ে দেখ মুখ-বাগে—
এত বুঝি ভালো নাহি লাগে।[৫]
তুমি চাও যবে মাঝে মাঝে ২০
অবসর পাবে তুমি কাজে
আমারে ডাকিবে একবার—
কাছে গিয়া বসিব তোমার,
মৃদু মৃদু সুমধুর বাণী
কব তব কানে কানে রানী। ২৫
তুমিও কহিবে মৃদু ভাষ,
তুমিও হাসিবে মৃদু হাস,
হৃদয়ের মৃদু খেলাখেলি—
ফুলেতে ফুলেতে হেলাহেলি।[৬]
চাও তুমি দুখহীন প্রেম ৩০
ছুটে যেথা ফুলের সুবাস,
উঠে যেথা জোছনালহরী,
বহে যেথা বসন্তবাতাস।
নাহি চাও আত্মহারা প্রেম
আছে যেথা অনন্ত পিয়াস, ৩৫
বহে যেথা চোখের সলিল,
উঠে যেথা দুখের নিশ্বাস।
প্রাণ যেথা কথা ভুলে যায়,
আপনারে ভুলে যায় হিয়া,
অচেতন চেতনা যেথায় ৪০
চরাচর ফেলে হারাইয়া।[৭]

এমন কি কেহ নাই, বল্ মোরে বল্[৮] আশা,
মার্জনা করিবে মোর অতি— অতি ভালোবাসা![৯]

১ কাব্যগ্রন্থ ৩-এ এই ছত্রের পাঠ—

একান্ত আমার ভালবাসা

২ কাব্যগ্রন্থ ৩-এ এই ছত্র দুটির (৫-৬) পাঠ—

এত বুঝি পার না সহিতে,

এত ভার পার না বহিতে।

৩ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রের পর এই দুই ছত্র ছিল—

যেন তুমি কাছে আছ তবু যেন কাছে নাই,

যেন আমি কাছে আছি, তবু যেন কাছে নাই,

কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি বর্জিত।

৪ বিশ্বভারতী-পুনর্মুদ্রণ সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৩৩৪)-এ 'মন' স্থলে 'মনে'। মুদ্রণ-প্রমাদ বলে ধরা যেতে পারে।

৫ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রের পর এই দুই ছত্র ছিল—

বুঝি গো ভাবিয়া নাহি পাও,

হেন ভাব দেখিতে না চাও!

দ্বিতীয় সংস্করণে ছত্রদ্বয়ের প্রথম ছত্রে 'বুঝি গো ভাবিয়া…' স্থলে 'বুঝি কিছু ভাবিয়া…' ছিল।

কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি বর্জিত।

৬ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রের পর এই দুই ছত্র ছিল—

বুঝিতে পার না তুমি অনন্ত এ আদর-পিপাসা,

ভাল নাহি লাগে তব জগত-তেয়াগী ভালবাসা।

কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি বর্জিত।

৭ প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পর এই দুই ছত্র ছিল—

এমন কি কেহ নাই বিশাল—বিশাল ভবে,

এ তুচ্ছ হৃদয়খানা ধূলি হ'তে তুলি লবে!

দ্বিতীয় সংস্করণে ও তদবধি বর্জিত।

৮ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে 'বল'। কাব্যগ্রন্থ ৫-এ ও তদবধি 'বল্'।

৯ প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পর এই চার ছত্র ছিল—

যদি থাকে কোথায় সে একবার দেখে আসি,

জনমের মত তারে একবার ভালবাসি!

দেখি আর ভালবাসি, তার কোলে মাথা রাখি,

একটি কথা না কয়ে অমনি মুদি এ আঁখি।

দ্বিতীয় সংস্করণে ও তদবধি বর্জিত।

হলাহল

এমন ক'দিন কাটে আর ![1]
ললিত গলিত হাস, জাগরণ, দীর্ঘশ্বাস,
সোহাগ, কটাক্ষ, মান, নয়নসলিলধার,
মৃদু হাসি—মৃদু কথা—আদরের, উপেক্ষার—
এই শুধু, এই শুধু, দিনরাত এই শুধু— ৫
এমন ক'দিন কাটে আর !
কটাক্ষে মরিয়া যায়, কটাক্ষে বাঁচিয়া উঠে,
হাসিতে হৃদয় জুড়ে, হাসিতে হৃদয় টুটে,
ভীরুর মতন আসে দাঁড়ায়ে রহে গো পাশে
ভয়ে ভয়ে মৃদু হাসে, ভয়ে ভয়ে মুখ ফুটে, ১০
একটু আদর পেলে অমনি চরণে[2] লুটে,
অমনি হাসিটি জাগে মলিন অধরপুটে,
একটু কটাক্ষ হেরি অমনি সরিয়া যায়—[3]
অমনি জগৎ যেন শূন্য মরুভূমি-হেন,
অমনি মরণ যেন প্রাণের অধিক ভায় ![4] ১৫

প্রণয় অমৃত এ কি ? এ যে ঘোর হলাহল—
হৃদয়ের শিরে শিরে প্রবেশিয়া ধীরে ধীরে
অবশ করেছে দেহ, শোণিত করেছে জল ![5]
কাজ নাই, কর্ম নাই, বসে আছে[6] এক ঠাঁই,
হাসি ও কটাক্ষ লয়ে খেলেনা গড়িছে যত, ২০
কভু ঢুলে পড়া আঁখি কভু অশ্রুভারে নত !

দূর করো, দূর করো, বিকৃত এ ভালোবাসা,
জীবনদায়িনী নহে, এ যে গো হৃদয়নাশা !
কোথায় প্রণয়ে মন যৌবনে ভরিয়া উঠে,
জগতের অধরেতে হাসির জোছনা ফুটে, ২৫
চোখেতে সকলি ঠেকে বসন্তহিল্লোলময়,
হৃদয়ের শিরে শিরে শোণিত সতেজে[7] বয়—
তা নয়, একি এ হল, একি এ জর্জর মন !
হাসিহীন দু অধর, জ্যোতিহীন দু নয়ন !

দূরে যাও, দূরে যাও, হৃদয় রে দূরে যাও— ৩০
ভুলে যাও, ভুলে যাও, ছেলেখেলা ভুলে যাও।
দূর করো, দূর করো, বিকৃত এ ভালোবাসা—
জীবনদায়িনী নহে, এ যে গো হৃদয়নাশা।

১ প্রথম সংস্করণে প্রথম ছত্রের পর একটি ছত্র ছিল—

দিনরাত—দিনরাত—অবিরাম—অনিবার।

দ্বিতীয় সংস্করণে ও তদবধি বর্জিত।

২ কাব্যগ্রন্থ ৩-এ 'চরণে' স্থলে 'চরণ'। সম্ভবতঃ মুদ্রণপ্রমাদ।

৩ প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পর একটি ছত্র ছিল—

অমনি কাঁদিয়া সারা, মরমে মরিয়া যায়।

দ্বিতীয় সংস্করণে ও তদবধি বর্জিত।

৪ প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পর এই কয় ছত্র ছিল—

চাহে না শুনিতে কথা তবুও প্রাণের ব্যথা
কেঁদে কেঁদে সেধে সেধে তাহারে শুনাতে চায়,
ভুলেও স্বপনে তারে দেখিতে চাহে না হা-রে
তবু সাথে সাথে রহে চরণধূলার প্রায়।
দলিতেও যে হৃদয় মনে নাহি পড়ে তার
লয়ে সেই তুচ্ছ মন কেঁদে কেঁদে অনুক্ষণ
ভয়ে ভয়ে পদতলে দিতে চায় উপহার।
দেখুক্ বা না দেখুক্—জানুক্ বা না জানুক্
ভাবুক্ বা না ভাবুক্—সেই পদতল সার।
জানে সে পাষাণময় কিছুতে কিছু না হয়,
সুমুখে দাঁড়ায়ে তারি তবু সাধ কাঁদিবার।
যেন সে কম্পিত-কায় ভিক্ষা মাগিবারে চায়
তুমিও কাঁদ' গো প্রভু হেরি এই অশ্রুধার।
এই শুধু—এই শুধু—দিবারাত এই শুধু—
এমন ক'দিন কাটে আর।

দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রাবলীর তৃতীয় ছত্রে 'স্বপনে' স্থলে 'স্বপন' আছে, এবং ৮-৯ ছত্র (দেখুক্ বা না দেখুক্…সেই পদতল সার।) বর্জিত।

কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি এই যাবতীয় ছত্র বর্জিত।

৫ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রের পর এই দুই ছত্র ছিল—

বালিকা-হৃদয় সম ক'রেছে পুরুষ-মন,
পরের মুখেতে চেয়ে কাঁদে শুধু অনুক্ষণ।

কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি বর্জিত।

৬ কাব্যগ্রন্থ ১-এ 'বসে আছে' স্থলে 'বসে আছ'। সম্ভবতঃ মুদ্রণপ্রমাদ।

৭ সন্ধ্যা-সঙ্গীত [১৯১১]-এ 'সতেজে' স্থলে 'সহজে'। কাব্যগ্রন্থ ৩ এবং বিশ্বভারতী পুনর্মুদ্রণ সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৩৩৪)-এও এই পাঠ আছে।

রচনাবলীতে পুনরায় 'সতেজে'। এই পুনরাবর্তন কবি-কৃত বলে জানা যায় না।

অনুগ্রহ

এই-যে জগৎ[১] হেরি আমি,
মহাশক্তি জগতের স্বামী,
এ কি হে তোমার অনুগ্রহ ?
হে বিধাতা কহ মোরে কহ।
ওই-যে সমুখে[২] সিন্ধু, এ কি অনুগ্রহবিন্দু ? ৫
ওই-যে আকাশে শোভে চন্দ্র সূর্য গ্রহ,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তব অনুগ্রহ ?
ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র একজন
আমারে যে করেছ সৃজন,
এ কি শুধু অনুগ্রহ করে ১০
ঋণপাশে বাঁধিবারে মোরে ?
করিতে করিতে যেন খেলা[৩]
কটাক্ষে করিয়া অবহেলা,
হেসে ক্ষমতার হাসি অসীম ক্ষমতা হতে
ব্যয় করিয়াছ এক রতি ১৫
অনুগ্রহ ক'রে মোর প্রতি ?
শুভ্র শুভ্র জুঁই দুটি ওই-যে রয়েছে ফুটি
ও কি তব অতি শুভ্র ভালোবাসা নয় ?
বলো মোরে, মহাশক্তিময়,
ওই-যে জোছনা হাসি ওই-যে তারকারাশি, ২০
আকাশে হাসিয়া ফুটে রয়,
ও কি তব ভালোবাসা নয় ?
ও কি তব অনুগ্রহহাসি
কঠোর পাষাণ লৌহময় ?
তবে হে হৃদয়হীন দেব, ২৫
জগতের রাজ-অধিরাজ,
হানো তব হাসিময় বাজ,

মহা অনুগ্রহ হতে তব
মুছে তুমি ফেলহ আমারে—
চাহি না থাকিতে এ সংসারে।[৫] ৩০

ভালোবাসি আপনা ভুলিয়া,
গান গাহি হৃদয় খুলিয়া,
ভক্তি করি পৃথিবীর মতো,
স্নেহ করি আকাশের প্রায়।
আপনারে দিয়েছি ফেলিয়া, ৩৫
আপনারে গিয়েছি ভুলিয়া,
যারে ভালোবাসি তার কাছে
প্রাণ শুধু ভালোবাসা চায়।[৫]

সাক্ষী আছ তুমি অন্তর্যামী
কতখানি ভালোবাসি আমি, ৪০
দেখি যবে তার মুখ হৃদয়ে দারুণ সুখ
ভেঙে ফেলে হৃদয়ের দ্বার,
বলে, "এ কী ঘোর কারাগার!"

প্রাণ বলে, "পারিনে সহিতে,
এ দুরন্ত সুখেরে বহিতে।" ৪৫
আকাশে হেরিলে শশী আনন্দে উথলি উঠি
দেয় যথা মহাপারাবার
অসীম আনন্দ উপহার,
তেমনি সমুদ্র-ভরা আনন্দ তাহারে দিই
হৃদয় যাহারে ভালোবাসে, ৫০
হৃদয়ের প্রতি ঢেউ উথলি গাহিয়া উঠে
আকাশ পুরিয়া[৬] গীতোচ্ছ্বাসে।
ভেঙে ফেলি উপকূল পৃথিবী ডুবাতে চাহে,
আকাশে উঠিতে চায় প্রাণ—
আপনারে ভুলে গিয়ে হৃদয় হইতে চাহে ৫৫
একটি জগতব্যাপী গান।
তাহারে কবির অশ্রু হাসি

দিয়েছি কত-না রাশি রাশি,
তাহারি কিরণে ফুটিতেছে
হৃদয়ের আশা ও ভরসা, ৬০
তাহারি হাসি ও অশ্রুজল
এ প্রাণের[৭] বসন্ত বরষা।

ভালোবাসি, আর গান গাই—
কবি হয়ে জন্মেছি ধরায়—
রাত্রি এত ভালো নাহি বাসে, ৬৫
উষা এত গান নাহি গায়।[৮]

ভালোবাসা স্বাধীন মহান,
ভালোবাসা পর্বত-সমান।
ভিক্ষাবৃত্তি করে না তপন
পৃথিবীরে চাহে সে যখন— ৭০
সে চাহে উজ্জ্বল করিবারে,
সে চাহে উর্বর করিবারে,
জীবন করিতে প্রবাহিত,
কুসুম করিতে বিকশিত।
চাহে সে বাসিতে শুধু ভালো, ৭৫
চাহে সে করিতে শুধু আলো,[৯]
স্বপ্নেও কি ভাবে কভু ধরা,
তপনেরে অনুগ্রহ করা ?
যবে আমি যাই তার কাছে
সে কি মনে ভাবে গো তখন ৮০
অনুগ্রহ ভিক্ষা মাগিবারে
এসেছে ভিক্ষুক একজন ?[১০]
অনুগ্রহ পাষাণমমতা,
করুণার কঙ্কাল কেবল,
ভাবহীন বজ্রে গড়া হাসি— ৮৫
স্ফটিককঠিন অশ্রুজল।
অনুগ্রহ বিলাসী গর্বিত,
অনুগ্রহ দয়ালু কৃপণ—

বহু কষ্টে[11] অশ্রুবিন্দু দেয়
শুষ্ক আঁখি করিয়া মন্থন। ৯০
নীচ হীন দীন অনুগ্রহ
কাছে যবে আসিবারে চায়,
প্রণয় বিলাপ করি উঠে—
গীতগান ঘৃণায় পলায়।

হে দেবতা, অনুগ্রহ হতে ৯৫
রক্ষা করো অভাগা কবিরে,
অপযশ অপমান দাও—
দুঃখ জ্বালা বহিব এ শিরে।
সম্পদের স্বর্ণকারাগারে,
গরবের অন্ধকার-মাঝ, ১০০
অনুগ্রহ রাজার মতন
চিরকাল করুক বিরাজ।
সোনার শৃঙ্খল ঝংকারিয়া
গরবের স্ফীত দেহ লয়ে
অনুগ্রহ আসে নাকো যেন ১০৫
আমাদের[12] স্বাধীন আলয়ে।

গান আসে ব'লে গান গাই,
ভালোবাসি ব'লে ভালোবাসি,
কেহ যেন মনে নাহি করে
মোরা কারো কৃপার প্রয়াসী। ১১০
নাহয় শুনো না মোর গান,
ভালোবাসা ঢাকা রবে মনে।
অনুগ্রহ ক'রে এই কোরো—
অনুগ্রহ কোরো না এ জনে।

১ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে 'জগৎ' স্থলে 'জগত'।
সন্ধ্যাসঙ্গীত [১৯১১] থেকে বর্তমান পাঠ প্রচলিত।
২ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে 'সমুখে' স্থলে 'সম্মুখে'।
রচনাবলীতে 'সমুখে'। এই পরিবর্তন কবি-কৃত কিনা বলা যায় না।

৩ দ্বিতীয় ও পরবর্তী সংস্করণগুলিতে এই ছত্রটি বর্জিত।
রচনাবলীতে পুনর্গৃহীত। এই পুনরাবর্তন কবি-কৃত বলে জানা যায় না।

৪ প্রথম ও অন্যান্ত সংস্করণে এই ছত্রের পর আর একটি ছত্র ছিল—

কবি হয়ে জন্মেছি এ ধরায়,

রচনাবলীতে বর্জিত।

৫ প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পর এই ছত্রগুলি ছিল—

ধনরত্নময় এ সংসার,
কিছু নাহি চায় প্রাণ আর,
দুঃখ ক্লেশে কিছু না ডরায়,
ধনমান যশ নাহি চায়,
ধনী হতে ধনী সেই জন
তাইতে সে দরিদ্র মতন,
তাইতে চায় না তার প্রাণ
দরিদ্রের ধন ধনমান,
সংসারে রাখে না কোন আশা,
সব সাধ তার মিটে যায়,
একটু পাইলে ভালবাসা,
একটি হৃদয় যদি পায়!
আপনারে বিলাবে যেথায়—
এমন হৃদয় এক চায়!

দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রাবলীর প্রথম চার ছত্র বর্জিত।
কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি যাবতীয় ছত্র বর্জিত।

৬ প্রথম সংস্করণে 'পুরিয়া' স্থলে 'ডুবায়ে'।
দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে বর্তমান পাঠ প্রচলিত।

৭ ভারতীতে 'প্রাণের' স্থলে 'হৃদের'। প্রথম সংস্করণ থেকে বর্তমান পাঠ প্রচলিত।

৮ প্রথম ও অন্যান্ত সংস্করণে এই ছত্রের পর এই চার ছত্র ছিল—

ভাল বেসে কি পেয়েছি আমি!
গান গেয়ে কি পাইনু, স্বামি!
আয়ের পর্বত-ভরা-ব্যথা,
আর দুটি অনুগ্রহ কথা!

কাব্যগ্রন্থ ৩-এ এই ছত্রাবলীর প্রথম ছত্রের পাঠ—

তাই দিয়ে কি নিয়েছি আমি,

রচনাবলীতে এই চার ছত্র বর্জিত।

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রাবলীর পর আরও চার ছত্র ছিল—

পৃথিবীর এ কি হীন দশা।
প্রণয় কি দাসত্ব ব্যবসা ?
নয় নয় কখন তা নয়,
ভালবাসা ভিক্ষাবৃত্তি নয়,

কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি এই চার ছত্র বর্জিত।

৯ কাব্যগ্রন্থ ৩-এ এই ছত্রের পর দশ ছত্র (৭৭-৮৬) বর্জিত।

১০ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এবং কাব্যগ্রন্থ ১-এ এই ছত্রের পর এই কয় ছত্র ছিল—

জানে না কি অনুগ্রহে তার
বার বার পদাঘাত করি,
ভালবাসা ভক্তি ভরে লয়ে
শতবার মস্তকেতে ধরি।

সন্ধ্যাসঙ্গীত[১৯১১]-এ ও তদবধি বর্জিত।

কাব্যগ্রন্থ ৩-এ এর পরের চার ছত্রও (৮৩-৮৬) বর্জিত।

১১ কাব্যগ্রন্থ ৩-এ 'বহুকষ্টে' স্থলে 'অনুগ্রহ'।

১২ প্রথম সংস্করণে 'আমাদের' স্থলে 'কবিদের'।

বর্তমান পাঠ দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে প্রচলিত।

আবার

তুমি কেন আসিলে[১] হেথায়
এ আমার সাধের আবাসে ?
এ আলয়ে যে নিবাসী থাকে,
এ আলয়ে যে অতিথি আসে,
সবাই আমার সখা, সবাই আমার বঁধু[২]
সবারেই আমি ভালোবাসি,
তারাও আমারে ভালোবাসে—
তুমি তবে কেন এলে হেথা
এ আমার সাধের আবাসে ?[৩]

এ আমার প্রেমের আলয়, ১০
এ মোর স্নেহের নিকেতন ;
বেছে বেছে কুসুম তুলিয়া
রচিয়াছি কোমল আসন।

কেহ হেথা নাইকো নিঠুর,
কিছু হেথা নাইকো কঠিন, ১৫
কবিতা আমার প্রণয়িনী
এইখানে আসে প্রতিদিন।[৪]
সমীর কোমল-মন আসে হেথা অনুক্ষণ[৫]
যখনি সে পায় অবকাশ,
যখনি প্রভাত ফুটে, যখনি সে জেগে উঠে[৬] ২০
ছুটিয়া সে আসে[৭] মোর পাশ।
দুই বাহু প্রসারিয়া আমারে বুকেতে নিয়া
কত শত বারতা শুধায়,
সখা মোর প্রভাতের বায়।
আকাশেতে তুলে আঁখি বাতায়নে বসে থাকি ২৫
নিশি যবে পোহায়-পোহায়,
উষার আলোকে হারা সখী মোর শুকতারা
আমার এ মুখপানে চায়।[৮]
নীরবে চাহিয়া রহে, নীরব নয়নে কহে,
"সখা, আজ বিদায়, বিদায়।"[৯] ৩০

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার বাতাস
প্রতিদিন আসে মোর পাশ।[১০]
দেখে, আমি বাতায়নে, অশ্রু ঝরে দু নয়নে,
ফেলিতেছি দুখের নিশ্বাস।[১১]
অতি ধীরে আলিঙ্গন করে, ৩৫
কথা কহে সকরুণ স্বরে,
কানে কানে বলে, "হায় হায়!"
কোমল কপোল দিয়া কপোল চুম্বন করি
অশ্রুবিন্দু সুধীরে শুকায়।
সবাই আমার মন বুঝে, ৪০
সবাই আমার দুঃখ জানে,
সবাই করুণ আঁখি মেলি
চেয়ে থাকে এই মুখপানে।
যে কেহ আমার ঘরে আসে
সবাই আমারে ভালোবাসে— ৪৫

তবে কেন তুমি এলে হেথা
এ আমার সাধের আবাসে ?[১২]

ফেরো ফেরো, ও নয়ন রসহীন[১৩] ও বয়ন
আনিয়ো না এ মোর আলয়ে—
আমরা সখারা মিলি আছি হেথা নিরিবিলি ৫০
আপনার মনোদুঃখ লয়ে।
এমনি হয়েছে শান্ত মন,
ঘুচেছে দুঃখের কঠোরতা ;
ভালো লাগে বিহঙ্গের গান,
ভালো লাগে তটিনীর কথা। ৫৫
ভালো লাগে কাননে দেখিতে
বসন্তের কুসুমের মেলা,
ভালো লাগে সারাদিন বসে
দেখিতে মেঘের ছেলেখেলা।[১৪]
এইরূপে সায়াহ্নের কোলে ৬০
রচেছি গোধূলি-নিকেতন,
দিবসের অবসান-কালে
পশে হেথা রবির কিরণ।
আসে হেথা অতি দূর হতে
পাখিদের বিরামের তান, ৬৫
ম্রিয়মাণ সন্ধ্যা-বাতাসের
থেকে থেকে মরণের গান।
পরিশ্রান্ত অবশ পরানে
বসিয়া রয়েছি এইখানে।[১৫]

যাও মোরে যাও ছেড়ে, নিয়ো না নিয়ো না কেড়ে, ৭০
নিয়ো না নিয়ো না মন মোর।
সখাদের কাছ হতে ছিনিয়া নিয়ো না মোরে,
ছিঁড়ো না এ প্রণয়ের[১৬] ডোর।[১৭]
আবার হারাই যদি এই গিরি, এই নদী,
মেঘ বায়ু কানন নির্ঝর, ৭৫

আবার স্বপন ছুটে একেবারে যায় টুটে
এ আমার গোধূলির ঘর,
আবার আশ্রয়হারা ঘুরে ঘুরে হই সারা
ঝটিকার মেঘখণ্ড-সম
দুঃখের বিদ্যুৎ-ফণা ভীষণ ভুজঙ্গ এক ৮০
পোষণ করিয়া বক্ষে মম—
তাহা হলে এ জনমে নিরাশ্রয় এ জীবনে[১৮]
ভাঙা ঘর আর গড়িবে না,
ভাঙা হৃদি আর জুড়িবে না![১৯]
কাল সবে গড়েছি আলয়, ৮৫
কাল সবে জুড়েছি হৃদয়,
আজি তা দিয়ো না যেন ভেঙে,
রাখো তুমি রাখো এ বিনয়।

১ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে 'আসিলে' স্থলে 'আইলে'।
রচনাবলীতে পরিবর্তিত।

২ কাব্যগ্রন্থ ৩-এ এই ছত্রের পাঠ—
সবাই আমার বন্ধু, সবাই আমার সাথী,

৩ কাব্যগ্রন্থ ২-এ এই ছত্রের পর চার ছত্র (১০-১৩) বর্জিত।

৪ কাব্যগ্রন্থ ২-এ এই ছত্রের পর সাত ছত্র (১৮-২৪) বর্জিত।

৫ কাব্যগ্রন্থ ৩-এ এই ছত্রের পাঠ—
বায়ু হেথা দেয় আনি কোমল পরশখানি

৬ কাব্যগ্রন্থ ৩-এ এই ছত্রের পাঠ—
প্রভাত যখনি ফুটে, আলোক সে জেগে উঠে,

৭ প্রথম সংস্করণে 'ছুটিয়া সে আসে' স্থলে 'ছুটিয়া আইসে'।
দ্বিতীয় সংস্করণে ও তদবধি বর্তমান পাঠ প্রচলিত।
কাব্যগ্রন্থ ৩-এ 'অমনি সে আসে'।

৮ কাব্যগ্রন্থ ৩-এ এই ছত্রের পাঠ—
পুরবের স্বর্ণ বাতায়নে
কাব্যগ্রন্থ ২-এ পরবর্তী দুই ছত্র (২৯-৩০) বর্জিত।

৯ কাব্যগ্রন্থ ৩-এ এই ছত্রের পাঠ—
"ভালো হল দেখা তোমা সনে।"

১০ কাব্যগ্রন্থ ৩-এ এই ছত্রের পর দুই ছত্র (৩৩-৩৪) বর্জিত।

১১ কাব্যগ্রন্থ ২-এ এই ছত্রের পর নয় ছত্র (৩৫-৪৩) বর্জিত।

১২ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রের পর এই পাঁচ ছত্র ছিল—

চাহিতে জান না তুমি অশ্রুময় আঁখি তুলি
অশ্রুময় নয়নের পানে ;
চিন্তাহীন, ভাবহীন শূন্য হাসিময় মুখে
ও কি দৃষ্টি হান' এ বয়ানে,
চেয়ে চেয়ে কৌতুক নয়ানে।

কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি বর্জিত।

কাব্যগ্রন্থ ২-এ এ ছাড়াও পরবর্তী চার ছত্র (৪৮-৫১) বর্জিত।

১৩ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে 'রসহীন' স্থলে 'ভাবহীন'। রচনাবলীতে পরিবর্তিত।
কাব্যগ্রন্থ ৩-এ 'রসহীন'। তবে সেখানে এই ছত্রের পাঠে 'নয়ন' স্থলে 'নয়ান' এবং 'বয়ন' স্থলে 'বয়ান' আছে।

১৪ কাব্যগ্রন্থ ২-এ এই ছত্রের পর দশ ছত্র (৬০-৬৯) বর্জিত।

১৫ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রের পর এই দশ ছত্র ছিল—

কহিয়া নিষ্ঠুর বাণী, কঠোর কটাক্ষ হানি,
আবার ভেঙ্গো না এ আলয়,
হৃদয়েতে কোর না প্রলয়।
প্রতিদিন সাধিয়া সাধিয়া,
পদতলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
প্রকৃতির সাথে আজি করেছি প্রণয় ;
গাছ পালা সরোবর, গিরি নদী নিরঝর,
সকলের সাথে আজি করেছি প্রণয়,
মনে সদা জাগে এই ভয়,
আবার হারাতে পাছে হয়।

কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি বর্জিত।

১৬ প্রথম সংস্করণে 'প্রণয়ের' স্থলে 'সখ্যতার'।
দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে বর্তমান পাঠ প্রচলিত।

১৭ কাব্যগ্রন্থ ২-এ এই ছত্রের পর এগারো ছত্র (৭৪-৮৪) বর্জিত।

১৮ প্রথম সংস্করণে 'জীবনে' স্থলে 'জনমে'।
দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে বর্তমান পাঠ প্রচলিত।

১৯ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রের পর একটি ছত্র ছিল—

একটি কথা না বোলে, যাও চোলে, যাও চোলে,

কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি বর্জিত।

পাষাণী

জগতের বাতাস করুণা,[১]
করুণা সে রবিশশী তারা,
জগতের শিশির করুণা—
জগতের বৃষ্টিবারিধারা।
জননীর স্নেহধারা-সম ৫
এই-যে জাহ্নবী বহিতেছে,
মধুরে তটের কানে কানে
আশ্বাস-বচন কহিতেছে—
এও সেই বিমল করুণা
হৃদয় ঢালিয়া বহে যায়, ১০
জগতের তৃষা নিবারিয়া
গান গাহে করুণ ভাষায়।
কাননের ছায়া সে করুণা,
করুণা সে উষার কিরণ,
করুণা সে জননীর আঁখি, ১৫
করুণা সে প্রেমিকের মন।
এমন যে মধুর করুণা,
এমন যে কোমল করুণা,
জগতের হৃদয়-জুড়ানো
এমন যে বিমল করুণা— ২০
দিন দিন বুক ফেটে যায়,
দিন দিন দেখিবারে পাই,
যারে ভালোবাসি প্রাণপণে
সে করুণা তার মনে নাই।
পরের নয়নজলে তার না হৃদয় গলে, ২৫
দুখেরে সে করে উপহাস,
দুখেরে সে করে অবিশ্বাস।
দেখিয়া হৃদয় মোর তরাসে শিহরি উঠে,
প্রেমের কোমল প্রাণে শত শত শেল ফুটে,
হৃদয় কাতর হয়ে নয়ন মুদিতে চায়, ৩০
কাঁদিয়া সে বলে, "হায় হায়,

এ তো নহে আমার দেবতা,
তবে কেন রয়েছে হেথায় ?"[২]

তুমি নও, সে জন তো নও,
তবে তুমি কোথা হতে এলে ? ৩৫
এলে যদি এস তবে কাছে,
এ হৃদয়ে যত অশ্রু আছে
একবার সব দিই ঢেলে,
তোমার সে কঠিন পরান
যদি তাহে একতিল গলে, ৪০
কোমল হইয়া আসে মন
সিক্ত হয়ে অশ্রুজলে-জলে।
কাঁদিবারে শিখাই তোমায়—
পরদুঃখে ফেলিতে নিশ্বাস,
করুণার সৌন্দর্য অতুল ৪৫
ও নয়নে করে যেন বাস।
প্রতিদিন দেখিয়াছি আমি
করুণারে করেছ পীড়ন,
প্রতিদিন ঐ মুখ হতে
ভেঙে গেছে রূপের মোহন। ৫০
কুবলয়-আঁখির মাঝারে
সৌন্দর্য পাই না দেখিবারে,
হাসি তব আলোকের প্রায়
কোমলতা নাহি যেন তায়,
তাই মন প্রতিদিন কহে, ৫৫
"নহে নহে, এ জন সে নহে।"

শোনো বঁধু, শোনো, আমি করুণারে ভালোবাসি।
সে যদি না থাকে তবে ধূলিময় রূপরাশি।
তোমারে যে পূজা করি, তোমারে যে দিই ফুল,
ভালোবাস বলে যেন কখনো কোরো না ভুল। ৬০
যে জন দেবতা মোর কোথা সে আছে না জানি,
তুমি তো কেবল তার পাষাণপ্রতিমাখানি।

তোমার হৃদয় নাই, চোখে নাই অশ্রুধার,
কেবল রয়েছে তব পাষাণ-আকার তার।[৩]

১ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম ছত্রের পূর্বে এই কয় ছত্র ছিল—

ঘৃণা হলাহল যদি পাই
ভালবাসা ক'রে বিনিময়,
বুক ফেটে অশ্রু পড়ে ঝরে,
বৃন্ত টুটে আশা যায় ম'রে,
তবুও তাহাও প্রাণে সয় ;
যারে আমি হৃদয়েতে ধরি,
তারে আমি যাহা মনে করি
যদি দেখি সে জন তা' নয় ;
দিন দিন শুভ্র জ্যোতি তার
একটু একটু যায় মিশে,
মুকুট হইতে মোতি তার
একটি একটি পড়ে খ'সে,
শুকায়ে, টুটিয়া, ঝোরে, সব যায় সোরে সোরে,
অবশেষে দেখিবারে পাই,—
ভালবেসে এসেছি যাহারে
সেজন সমুখে মোর নাই।
মরীচিকা-মূর্ত্তি সম হৃদি মরু-স্থলে মম
প্রতিদিন তিল তিল কোরে
প্রণয়-প্রতিমা যায় সোরে ;
প্রাণ মন ব্যাকুল হইয়া—
পিছু পিছু যেতেছে ধাইয়া,
তৃষাতুর হরিণের মত
বহিছে অনলময় শ্বাস,
আগ্রহ-কাতর আঁখি দিয়া
চিকরিয়া পড়িছে হুতাশ,
সকাতর চোখের উপরে
পলে পলে তিল তিল করে
সে মূরতি মিশাইয়া যায়,
শূন্য প্রাণ কাতর নয়নে

একবার চারিদিকে চায়,
কাহারেও দেখিতে না পায়।
প্রাণ লয়ে মরীচিকা খেলা!
একি নিদারুণ খেলা হায়!

করুণার উপাসক আমি,
জগতে কি আছে তার চেয়ে!
আহা কি কোমল মুখখানি!
আহা কি করুণ কচি মেয়ে!
উষার প্রথম হাসি-রেখা
অধরেতে মাখান তাহার,
কোমল বিমল শিশিরেতে
আঁখি দুটি ভাসে অনিবার।
জগতে যা' কিছু শোভা আছে
পেয়েছে তা' করুণার কাছে!

কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি বর্জিত।

২ প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পর এই চার ছত্র ছিল—

আমি যারে চাই, সে রমণী
করুণা-অমিয়াময় মন,
যেদিকে পড়িবে আঁখি তার
করুণা করিবে বিতরণ!

দ্বিতীয় সংস্করণে ও তদবধি বর্জিত।

৩ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রের পর আরও আট ছত্র ছিল—

তোমারে যখন পূজি কল্পনা করিয়া লই—
তোমারি মাঝারে আছে দেবী সে করুণাময়ী!
তাই এ মন্দির হতে রাখিতে পারিনে দূরে,
এখনো রয়েছ তাই হৃদয়ের সুর-পুরে,
কল্পনা মায়ের কোলে যে বালারে দেখেছিনু,
কল্পনার তুলি দিয়ে যে বালারে এঁকেছিনু,
তারি মত মুখ তব, তেমনি মধুর বাণী
থাক' তবে থাক' হেথা পাষাণ প্রতিমাখানি!

কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি বর্জিত।

দুই দিন[১]

আরম্ভিছে শীতকাল, পড়িছে নীহারজাল,
শীর্ণ বৃক্ষশাখা যত ফুলপত্রহীন ;
মৃতপ্রায়[২] পৃথিবীর মুখের উপরে
বিষাদে প্রকৃতিমাতা শুভ্র বাষ্পজালে-গাঁথা
কুজ্ঝটি-বসনখানি দেছেন টানিয়া। ৫
পশ্চিমে গিয়েছে[৩] রবি, স্তব্ধ সন্ধ্যাবেলা,
বিদেশে আসিনু[৪] শ্রান্ত পথিক একেলা।

রহিনু দু'দিন।
এখনো রয়েছে শীত, বিহঙ্গ গাহে না গীত,
এখনো ঝরিছে পাতা, পড়িছে তুহিন। ১০
বসন্তের প্রাণভরা চুম্বন-পরশে
সর্ব অঙ্গ শিহরিয়া পুলকে-আকুল-হিয়া
মৃতশয্যা হতে ধরা জাগেনি হরষে।
এক দিন দুই দিন ফুরাইল শেষে,
আবার উঠিতে হল, চলিনু বিদেশে।[৫] ১৫

এই-যে ফিরানু মুখ, চলিনু পুরবে,
আর কি রে[৬] এ জীবনে ফিরে আসা হবে!
কত মুখ দেখিয়াছি দেখিব না আর।
ঘটনা ঘটিবে কত, বরষ বরষ শত[৭]
জীবনের 'পর দিয়া হয়ে যাবে পার— ২০
হয়তো-বা[৮] একদিন অতি দূর দেশে,
আসিয়াছে সন্ধ্যা হয়ে, বাতাস যেতেছে বয়ে,
একেলা নদীর ধারে[৯] রহিয়াছি বসে—
হু হু করে উঠিবেক সহসা এ হিয়া,
সহসা এ মেঘাচ্ছন্ন স্মৃতি উজলিয়া ২৫
একটি অস্ফুট রেখা সহসা দিবে যে[১০] দেখা,
একটি মুখের ছবি উঠিবে জাগিয়া,
একটি গানের ছত্র পড়িবেক মনে,
দু-একটি স্বর তার উদিবে স্মরণে,

অবশেষে একেবারে সহসা সবলে ৩০
বিস্মৃতির বাঁধগুলি ভাঙিয়া চূর্ণিয়া ফেলি
সেদিনের কথাগুলি বন্যার মতন
একেবারে বিপ্লাবিয়া ফেলিবে এ মন।[১১]

শতফুলদলে গড়া সেই মুখ তার
স্বপনেতে প্রতিনিশি হৃদয়ে উদিবে আসি ৩৫
এলানো আকুল কেশে, আকুল নয়নে।[১২]
সেই মুখ সঙ্গী মোর হইবে বিজনে,
নিশীথের অন্ধকার আকাশের পটে
নক্ষত্র-গ্রহের মতো[১৩] উঠিবেক ফুটে
ধীরে ধীরে রেখা রেখা সেই মুখ তার ৪০
নিঃশব্দে মুখের পানে চাহিয়া আমার।
চমকি উঠিব জাগি শুনি ঘুমঘোরে
"যাবে তবে? যাবে?" সেই ভাঙা-ভাঙা স্বরে।[১৪]

ফুরাল দু'দিন—
শরতে যে শাখা হয়েছিল পত্রহীন ৪৫
এ দু-দিনে সে শাখা উঠে নি মুকুলিয়া
অচল শিখর-'পরি যে তুষার ছিল পড়ি
এ দু'দিনে কণা তার যায়নি গলিয়া,[১৫]
কিন্তু[১৬] এ দু'দিন তার শত বাহু দিয়া
চিরটি জীবন মোর রহিবে বেষ্টিয়া। ৫০
দু'দিনের পদচিহ্ন চিরদিন[১৭] তরে
অঙ্কিত রহিবে শত বরষের শিরে।*

১ প্রথম ও পরবর্তী সংস্করণগুলিতে কবিতাটির নাম 'দুদিন'। বিশ্বভারতী পুনর্মুদ্রণ সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৩৩৪)-এ ও তদবধি 'দুই দিন'। মনে হয় মুদ্রণপ্রমাদের অনুবর্তন।

২ ভারতীতে 'মৃতপ্রায়' স্থলে 'অর্দ্ধমৃত'।

৩ ভারতীতে 'গিয়েছে' স্থলে 'গিয়াছে'।

৪ ভারতীতে 'আসিনু' পাঠ ছিল; প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে 'আইনু'; রচনাবলীতে পুনরায় পরিবর্তিত।

৫ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রের পর ১৪ ছত্র ছিল—

* কবিতাটি ভারতী ১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'শ্রীদিক্‌শূন্য ভটাচার্য্য' স্বাক্ষরে প্রকাশিত।

একখানা ভাঙা লঘু মেঘের মতন
কত গিরি হতে গিরি বেড়াতেছি ফিরি ফিরি
যে দিকে লইয়া যায় অদৃষ্ট পবন।
আসিলাম একবার শুভ-দৈব বলে
ফুলে ফুলে ভরা এক শ্যামল অচলে ঃ
রহিনু দুদিন—
সাঁঝের কিরণ পিয়া— নির্ঝরের জলে গিয়া
ইন্দ্র ধনু নিরখিয়া খেলিলাম কত,
ডুবে গেনু জোছনায়, আঁধার পাখার গায়
বসালেম তারা শত শত।
ফুরালো দুদিন—
সহসা আরেক দিকে বহিল পবন,
দুদিনের খেলাধুলা ফুরাল আমার,
আবার—আরেক দিকে চলিনু আবার।

ভারতীতে এই স্তবকাবলীর পঞ্চম স্তবে '…এক শ্যামল অচলে,' স্থলে '…এক হরিত অচলে' এবং সপ্তম স্তবে 'নির্ঝরের' স্থলে 'নিঝরের' পাঠ ছিল।

কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি যাবতীয় স্তব বর্জিত।

৬ ভারতীতে 'রে' স্থলে 'গো'। প্রথম সংস্করণ থেকে বর্তমান পাঠ প্রচলিত।

৭ ভারতীতে এই স্তবের পাঠ—

ঘটনা ঘটিবে শত, বরষ বরষ কত

প্রথম সংস্করণ থেকে বর্তমান পাঠ প্রচলিত।

৮ ভারতীতে 'হয়তো-বা' স্থলে 'হয়তো গো'।

প্রথম সংস্করণ থেকে বর্তমান পাঠ প্রচলিত।

৯ ভারতীতে 'ধারে' স্থলে 'তীরে'।

প্রথম সংস্করণ থেকে বর্তমান পাঠ প্রচলিত।

১০ ভারতীতে 'দিবে যে' স্থলে 'দিবেক'। প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে 'দিবে রে'।

বিশ্বভারতী পুনর্মুদ্রণ সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৩৩৪) থেকে বর্তমান পাঠ প্রচলিত।

১১ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে এই স্তবের পর ১৪ স্তব ছিল—

পাষাণ মানব মনে সহিবে সকলি।
ভুলিব, যতই যাবে বর্ষ বর্ষ চলি—
কিন্তু আহা, দুদিনের তরে হেথা এনু,
একটি কোমল প্রাণ ভেঙে রেখে গেনু!
তার সেই মুখখানি—কাঁদো কাঁদো মুখ,
এলানো কুন্তল জালে ছাইয়াছে বুক,

বাষ্পময় আঁখি দুটি অনিমিখ আছে ফুটি
আমারি মুখের পানে ; অঞ্চল লুটিছে,—
থেকে থেকে উচ্ছ্বসিয়া কাঁদিয়া উঠিছে,
সেই সে মুখানি,—আহা করুণ মুখানি,—
সুকুমার কুসুমটি—জীবন আমার—
বুক চিরে হৃদয়ের হৃদয় মাঝার
শত বর্ষ রাখি যদি দিবস রজনী
মেটে না মেটে না তবু তিয়াষ আমার ;—

ভারতীতে এই ছত্রাবলীর চতুর্থ ছত্রে 'প্রাণ' স্থলে 'হৃদি' ; সপ্তম ছত্রে 'অনিমিখ' স্থলে 'অনিমিষ'।

দ্বিতীয় ও অন্যান্য সংস্করণে এই ছত্রাবলীর দশম ছত্রটি বর্জিত।

রচনাবলীতে যাবতীয় ছত্র বর্জিত।

১২ ভারতীতে এই ছত্রের পাঠ—

এলানো কুন্তল জাল আকুল নয়ন

প্রথম সংস্করণ থেকে বর্তমান পাঠ প্রচলিত।

১৩ প্রথম, দ্বিতীয় সংস্করণে ও কাব্যগ্রন্থ ১-এ 'নক্ষত্র-গ্রহের মতো' স্থলে 'নক্ষত্র তারার মাঝে' ; সন্ধ্যাসঙ্গীত [১৯১১] ও কাব্যগ্রন্থ ৩-এ 'নক্ষত্র গ্রহের মাঝে'।

বিশ্বভারতী পুনর্মুদ্রণ সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৩৩৪) থেকে বর্তমান পাঠ প্রচলিত।

১৪ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রের পর ৫টি ছত্র ছিল—

সাহারার অগ্নিশ্বাস একটি পবনোচ্ছ্বাস
বহিয়া গেলাম চলি মুহূর্তের তরে
স্নিগ্ধচ্ছায়া সুকুমার ফুল-বন পরে,—
কোমলা যূথীর এক পাপড়ি খসিল,
ম্রিয়মাণ মুখ তার নোয়ায়ে পড়িল।

ভারতীতে এই ছত্রাবলীর দ্বিতীয় ছত্রের স্থলে তৃতীয় ছত্র এবং তৃতীয় ছত্রের স্থলে দ্বিতীয় ছত্র ছিল।

কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি ছত্রগুলি বর্জিত।

১৫ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে এই ছত্রের পর দুটি ছত্র ছিল—

কিন্তু এ দুদিন মাঝে একটি পরাণে
কি বিপ্লব বাধিয়াছে কেহ নাহি জানে।

রচনাবলীতে বর্জিত।

১৬ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে 'কিন্তু' স্থলে 'শুধু'।

রচনাবলীতে পরিবর্তিত।

১৭ ভারতীতে 'চিরদিন' স্থলে 'চিরকাল'।

প্রথম সংস্করণ থেকে বর্তমান পাঠ প্রচলিত।

'দু দিন' কবিতার পাণ্ডুলিপি। রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী

ছদিন কবিতার পাণ্ডুলিপি

বর্তমান সংকলনে যে-সকল পাঠভেদ সমাহৃত হয়েছে সবই সাময়িক পত্র বা গ্রন্থ থেকে অর্থাৎ মুদ্রিত রচনা থেকে গৃহীত— এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সন্ধ্যাসংগীতের কোনো পাণ্ডুলিপি রক্ষিত হয়েছে বলে জানা যায় নি ; তবে এর একটি কবিতার কিয়দংশের পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত 'মালতী-পুথি'তে পাওয়া যায়। সাধারণভাবে বলতে গেলে এই পাণ্ডুলিপি 'ভারতী'র পাঠের অনুরূপ ; যে-সকল স্থানে পার্থক্য আছে তা নীচে উল্লিখিত হল।

৩৪ ছত্রের পর ভারতীতে যে ১৪ ছত্র ছিল (পাদটীকা সংখ্যা ১১) তার ষষ্ঠ ছত্রে 'জালে'র স্থলে পাণ্ডুলিপিতে 'জাল'।

৩৬ ছত্রের পাঠ ভারতীতে—

এলানো কুন্তল জাল আকুল নয়ন

পাণ্ডুলিপিতে—

এলানো কুন্তল পাশে আকুল নয়নে

৪৩ ছত্রের পাঠ পাণ্ডুলিপিতে—

"গেলে সখা ? গেলে ?" সেই ভাঙা ভাঙা স্বরে।

ভারতী থেকে বর্তমান পাঠ প্রচলিত।

৪৮ ছত্রের পরবর্তী পঙ্‌ক্তিগুলির পাঠ ভারতী ও পাণ্ডুলিপিতে অভিন্ন। তবে শেষ স্তবকের অপর একটি পাঠও পাণ্ডুলিপিতে আছে সেটি নীচে মুদ্রিত হল।—

কুরালো ছদিন

কেহ নাহি জানে এই দুইটি দিবসে—
কি বিপ্লব বাধিয়াছে একটি হৃদয়ে।
দুইটি দিবস
চির জীবনের স্রোত দিয়াছে ফিরায়ে—
এই দুই দিবসের পদ চিহ্ন গুলি
শত বরষের শিরে রহিবে অঙ্কিত।
এই দুই দিবসের হাসি অশ্রু মিলি
হৃদয়ে স্থাপিবে চির বসন্ত বরষা

পরাজয়-সংগীত

ভালো করে যুঝিলিনে, হল তোরি পরাজয়—
কী আর ভাবিতেছিস, ম্রিয়মাণ, হা হৃদয়!
কাঁদ্ তুই, কাঁদ্, হেথা আয়,
একা বসে বিজনে বিদেশে।

জানিতাম জানিতাম হা রে ৫
এমনি ঘটিবে অবশেষে।[১]

সংসারে যাহারা ছিল সকলেই জয়ী হল,
তোরি শুধু হল পরাজয়—
প্রতি রণে প্রতি পদে একে একে ছেড়ে দিলি
জীবনের রাজ্য সমুদয়। ১০
যতবার প্রতিজ্ঞা করিলি
ততবার পড়িল টুটিয়া,
ছিন্ন আশা বাঁধিয়া তুলিলি
বার বার পড়িল লুটিয়া।[২]
"সান্ত্বনা-সান্ত্বনা" করি ফিরি ১৫
সান্ত্বনা কি মিলিল রে মন ?
জুড়াইতে ক্ষত বক্ষঃস্থল
ছুরিরে করিলি আলিঙ্গন।
ইচ্ছা, সাধ, আশা যাহা ছিল
অদৃষ্ট সকলি লুটে নিল। ২০

মনে হইতেছে আজি জীবন হারায়ে গেছে,
মরণ হারায়ে গেছে হায়।
কে জানে এ কী এ ভাব ? শূন্যপানে চেয়ে আছি
মৃত্যুহীন মরণের প্রায়।
পরাজিত এ হৃদয় জীবনের দুর্গ মম ২৫
মরণে করিল সমর্পণ,
তাই আজ জীবনে মরণ।[৩]

জাগ্ জাগ্ জাগ্ ওরে, গ্রাসিতে এসেছে তোরে
নিদারুণ শূন্যতার ছায়া,
আকাশ-গরাসী তার কায়া। ৩০
গেল তোর চন্দ্র সূর্য, গেল তোর গ্রহ তারা,
গেল তোর আত্ম আর পর।
এইবেলা প্রাণপণ কর্।
এইবেলা ফিরে দাঁড়া তুই,
স্রোতোমুখে ভাসিস্‌নে আর। ৩৫

যাহা পাস আঁকড়িয়া ধর্‌—
সম্মুখে অসীম পারাবার,
সম্মুখেতে চির অমানিশি,
সম্মুখেতে মরণ বিনাশ।
গেল, গেল, বুঝি নিয়ে গেল 80
আবর্ত করিল বুঝি গ্রাস।[১]

১ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রের পর এই ছত্রগুলি ছিল—

হৃদয়ের পানে চেয়ে কাঁদিয়াছি প্রতিদিন
বিধাতা, কেন গো তারে স্বজিয়াছ দীন হীন?
হীন-বল, ক্ষীণ-তনু, টলমল পায়ে পায়,
একটু বহিলে বায়ু লুটায়ে পড়িতে চায়,
আশ্রয় চলিয়া গেলে, আর সে আঁখি না মেলে,
অমনি ধুলায় পড়ে, অমনি মরিয়া যায়।
কত কি করিতে সাধ কিছু না করিতে পারে,
তরঙ্গে বায়ুতে মিলি খেলায়ে বেড়ায় তারে।
প্রাণের নিভৃতে পশি, প্রতিদিন বসি, বসি,
মরমের অস্থি দিয়ে একেকটি আশা গড়ে
দুর্ব্বল মনের আশা প্রতিদিন ভেঙ্গে পড়ে।
অতীত, শিয়রে বসি কাঁদিয়া শুনায় গান,
কত সুখ-স্বপনের আরম্ভ ও-অবসান।
ফুটিতে পারিত ফুল, না ফুটিয়া ঝ'রে গেল,
গাহিতে পারিত পাখী, না গাহিয়া ম'রে গেল।
জলদ-মূরতিবৎ, অতি দূরে ভবিষ্যৎ
ফুটন্ত আশার ফুল লইয়া দাঁড়ায়ে আছে,
বর্ত্তমান তারি পানে ছুটিছে আকুল প্রাণে
যত যায়—যত যায় কিছুতে পায় না কাছে।
মন, কত দিন ধোরে দেখিয়া আইনু তোরে
বুঝিলাম বিফল প্রয়াস।
সংসার-সমরে ঘোর পরাজয় আছে তোর
অপমান আর উপহাস।

কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি বর্জিত।

২ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রের পর এই চার ছত্র ছিল—

যাহা কিছু চাহিলি করিতে
করিতে নারিলি কিছু তার,
কাঁদিলিরে যাহাদের তরে
তারা না কাঁদিল একবার।

কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি বর্জ্জিত।

কাব্যগ্রন্থ ২-এ এ ছাড়াও পরবর্তী ছয় ছত্র (১৫-২০) বর্জ্জিত।

৩ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রের পর এই ছত্রগুলি ছিল—

হৃদয় রে, কি করিলি ? সব তুই ছেড়ে এলি
দেখিলিনে কে আছে কোথায় ?
প্রিয়জন, পরিজন, শৈশবের সহচর,
ঘরে ঘরে আছে যে সেথায় ;
সুখ দুঃখ আশা প্রেম, হাসি আর অশ্রুজল
কবিতা কল্পনা সেথা আছে।
তুই সব ছেড়ে দিলি, তুই পলাইয়া এলি,
তাদের রাখিলি কার কাছে ?

হৃদয়, হৃদয় মোর, দেখ্‌রে সম্মুখে তোর
অনন্ত কিছু না এক দাঁড়ায়ে রয়েছে ঘোর।
সেথা দাঁড়াবার ঠাঁই এক তিল মাত্র নাই
পড়িবি তাহারো নাই স্থান।
নেমে যাবি, নেমে যাবি, দিন রাত্রি নেমে যাবি,
দিন-রাত্রি-হীন সেই আঁধার বিমান—
যত যাবি, তত যাবি, নাই পরিমাণ।

কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি বর্জ্জিত।

৪ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রের পর আরও ছত্র ছিল—

ওই দেখ্‌ সুখ চলে গেল,
ওই দেখ্‌ দুঃখ চলে যায়,
ওই দেখ্‌ হাসি মিশাইল,
ওই দেখ্‌ অশ্রু শুখায়
কবিতা, এ হৃদয়ের প্রাণ,
সকল ত্যজিনু যার লাগি
সকলে ত্যজিয়া গেল যদি,
সেও ওই যেতেছে তেয়াগি।

আয় না, আয় না রে হৃদয়,
আর ত বিলম্ব ভাল নয়। ১০

কেমনে ভাবিব ওরে, কল্পনা ত্যেজেছে মোরে,
খুঁজিব সমস্ত হৃদি—ভাব নাই—কথা নাই—
কাঁদিতে ভুলিয়া যাব যতই কাঁদিতে চাই।
মরুময় হৃদয়েতে বহিব কি চির দিন
কঠোর, অচল শুভ্র দুঃখের তুষার ভার?
কল্পনা কিরণ দিয়া গলায়ে গলায়ে তারে
সঙ্গীত-নির্ঝর স্রোতে ঢালিতে নারিব আর?
স্রোত হীন শব্দহীন কঠিন দুঃখের কায়,
কল্পনা করিতে গেলে হৃদয় ফাটিয়া যায়।

হৃদয়রে, ওঠ্ একবার,
সব যাক, সব যাক আর,
কল্পনারে ডেকে আন্ মনে,
অশ্রু জল থাক্ দুনয়নে।
সেই শুধু শেষ অবশেষ
সুখ দুঃখ আশা ভরসার।
প্রাণপণে রাখ্ তাহা ধরে
সেও যেন হারাসনে আর।
কাঁদিবার রাখিস্ সম্বল
কল্পনা ও নয়নের জল।

সে যদি হারায়ে যায়, হৃদয় রে হায় হায়
কে সহিবে দুঃখহারা দুখ,
কেমনে দেখিব বল অশ্রুহীন নেত্র মেলি
হৃদি-হীন হৃদয়ের মুখ?
সে যদি হারায়ে যায়, হৃদয় রে হায় হায়
আজ তবে কেঁদে নিই আয়,
শেষ অশ্রুবারি আজি ঢালি রে প্রাণের সাধে
গেয়ে নিই যত প্রাণ চায়।
বল্ "ওই যায় যায়— সুখ যায়, দুঃখ যায়,
হাসি যায়, অশ্রুজল যায়।"
বল্ "ওই দাঁড়াইয়া, আলিঙ্গন বাড়াইয়া
শূন্যতা, আকাশব্যাপী কায়।"

বল্ "যাহা গেল, তাহা চিরকাল তরে গেল,
পাব না তা মুহূর্তের তরে।
তবে আয়, অশ্রু আয়, বিদায়ের শেষ দেখা
আর দেখা হবে না ত পরে।"

এই ছত্রাবলীর পাঠ ভারতীতে নিম্নলিখিতরূপ পরিবর্তিত—
পঞ্চম ছত্রে 'কবিতা, এ হৃদয়ের' স্থলে 'কবিতা, যে হৃদয়ের' ছিল।
দশম ছত্রের পর আরও চার ছত্র ছিল—

নিরাশা অনলপূর্ণ অন্তিম আশার বলে,
অন্ধভাবে অদৃষ্টেরে কর শেষ-আক্রমণ,
কে জানে, হতেও পারে, সহসা পৃথিবীতলে,
পড়িবে বিদীর্ণ হয়ে রাক্ষসের আয়তন।

একাদশ ছত্রে 'কেমনে ভাবিব ওরে' স্থলে 'কেমনে ভাবি ওরে' ছিল। স্পষ্টতঃই মুদ্রণপ্রমাদ।
ছাব্বিশ ছত্রের পর আর একটি ছত্র ছিল—

একমাত্র আশ্রয় সাগরে,

ভারতীতে ও দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রাবলীর তৃতীয় ছত্রে 'মিশাইল' স্থলে 'মিলাইল'। প্রথম সংস্করণে 'মিশাইল' মুদ্রণপ্রমাদ বলে ধরা যেতে পারে।
কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি যাবতীয় ছত্র বর্জিত।

শিশির

শিশির কাঁদিয়া শুধু বলে,
"কেন মোর হেন ক্ষুদ্র প্রাণ—
শিশুটির কল্পনার মতো
জনমি অমনি অবসান?[১]
ঘুম-ভাঙা উষা-মেয়েটির ৫
একটি সুখের অশ্রু হায়,
হাসি তার ফুরাতে ফুরাতে
এ অশ্রুটি শুকাইয়া[২] যায়।"

টুকটুকে মুখখানি নিয়ে
গোলাপ হাসিছে মুচকিয়ে, ১০
বকুল প্রাণের সুধা দিয়ে,
বায়ুরে মাতাল করি তুলে—

প্রজাপতি ভাবিয়া না পায়
কাহারে তাহার প্রাণ চায়,
তুলিয়া অলস পাখা দুটি ১৫
ভ্রমিতেছে ফুল হতে ফুলে—
সেই হাসি-রাশির মাঝারে
আমি কেন থাকিতে না পাই!
যেমনি নয়ন মেলি, হায়,
সুখের নিমেষটির প্রায়, ২০
অতৃপ্ত হাসিটি মুখে লয়ে
অমনি কেন গো মরে যাই!"

শুয়ে শুয়ে অশোক-পাতায়
মুমূর্ষু শিশির বলে, "হায়,
কোনো সুখ ফুরায়নি যার ২৫
তার কেন জীবন ফুরায়?"

"আমি কেন হইনি শিশির?"
কহে কবি নিশ্বাস ফেলিয়া।
"প্রভাতেই যেতেম শুকায়ে
প্রভাতেই নয়ন মেলিয়া।[৪] ৩০
হে বিধাতা, শিশিরের মতো
গড়েছ আমার এই প্রাণ,
শিশিরের মরণটি কেন
আমারে করনি তবে দান?"[৫]

১ কাব্যগ্রন্থ ২-এ এই ছত্রের পরবর্তী ২২ ছত্র (৫-২৬) বর্জিত।

২ সন্ধ্যাসঙ্গীত [১৯১১] এবং বিশ্বভারতী পুনর্মুদ্রণ (১৩৩৪)-এ এবং কাব্যগ্রন্থ ৩-এ এই ছত্রের পাঠ 'শুকাইয়া' স্থলে 'ফুরাইয়া'।

৩ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রের পর এই ছত্রগুলি ছিল—

ফুলটির আঁখি ফুটাইয়া,
মলয়ের প্রাণ জুড়াইয়া,
কাননের শ্যামল কপোলে
অশ্রুময় হাসি বিকাশিয়া,—

প্রভাত না ছুটিতে ছুটিতে,
মালতী না ফুটিতে ফুটিতে
এই হাসি-বিন্দুটির প্রাণ
কোথায় যে যায় মিলাইয়া।
বিশাল এ জগতের মাঝ,
আর কিছু নাই মোর কাজ?
প্রভাতের জগতের পানে
হেরি শুধু অবাক্ নয়ানে,
হাসিটি ফুটিয়া উঠে মুখে,
ডুবে যাই প্রভাতের সুখে,
দুই দণ্ড হাসিতে ভাসিয়া
হাসির কোলেতে ম'রে যাই।
আর কিছু—কিছু কায নাই?

দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রাবলীর শেষ ছত্রের পাঠ—

আর কিছু—আর কিছু নাই?

কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি যাবতীয় ছত্র বর্জিত।

৪ কাব্যগ্রন্থ ২-এ এই ছত্রের পরবর্তী ৪ ছত্র (৩১-৩৪) বর্জিত।

৫ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রের পর আরও ছত্র ছিল—

আমি, দেব, প্রভাতের কবি,
ভালবাসি প্রভাতের রবি,
ভালবাসি প্রভাতের ফুল,
ভালবাসি প্রভাতের বায়।
ওই দেখ, মধ্যাহ্ন আইল,
চারিদিকে ফুল শুকাইল,
জনমেছি যাহাদের সাথে
তাহারা সবাই চ'লে যায়।
হাসি হয়ে জনম লভিনু
অশ্রু হয়ে বেঁচে আছি হায়।
শিশিরে অমর করি যদি
গড়িতে বাসনা ছিল, বিধি,
অমর করনি কেন ফুল?
উষা কেন চ'লে যায় তবে?
উষার যে লভিনু জনম,
উষা গেলে সে কেন রহিবে?

যে দিকেই ফিরাই নয়ন,
দুঃখ শোক মরণ কেবল।
ওহে প্রভু, করুণা আগার,
এ শোকের জগত-মাঝার,
তুমি কি ফেলেছ মোরে, কবি,
তোমার একটি অশ্রু জল?
বহিতে পারি না সখা, আর,
মৃত্যুময় জীবন আমার,
তোমার সে তপন-কিরণে
এ শিশির মিলাইতে চায়।"
তাই কবি কহিল কাঁদিয়া
"শিশির হ'তেম যদি হায়!"

কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি বর্জিত।

সংগ্রাম-সংগীত

হৃদয়ের সাথে আজি[১]
করিব রে করিব সংগ্রাম।
এতদিন কিছু না করিনু,
এতদিন বসে রহিলাম,
আমি এই হৃদয়ের সাথে[২]
একবার করিব সংগ্রাম।[৩]

বিদ্রোহী এ হৃদয় আমার
জগৎ করিছে ছারখার।
গ্রাসিছে চাঁদের কায়া ফেলিয়া আঁধার ছায়া[৪]
সুবিশাল রাহুর আকার। ১০
মেলিয়া আঁধার গ্রাস দিনেরে দিতেছে ত্রাস,
মলিন করিছে মুখ তার।[৫]
উষার মুখের হাসি লয়েছে কাড়িয়া,
গভীর বিরামময় সন্ধ্যার প্রাণের মাঝে
দুরন্ত অশান্তি এক[৬] দিয়াছে ছাড়িয়া। ১৫
প্রাণ হতে মুছিতেছে অরুণের রাগ,

দিতেছে প্রাণের মাঝে কলঙ্কের দাগ।
প্রাণের পাখির গান দিয়াছে থামায়ে,
বেড়াত যে সাধগুলি মেঘের দোলায় দুলি
তাদের দিয়াছে[৭] হায় ভূতলে নামায়ে। ২০
ক্রমশই বিছাইছে অন্ধকার পাখা,
আঁখি হতে সব কিছু পড়িতেছে ঢাকা।
ফুল ফুটে, আমি আর দেখিতে না পাই ;
পাখি গাহে, মোর কাছে গাহে না সে আর ;
দিন হল, আলো হল, তবু দিন নাই, ২৫
আমি শুধু নেহারি পাখার অন্ধকার।
মিছা বসে রহিব না আর,
চরাচর হারায় আমার।
রাজ্যহারা ভিখারির সাজে
দগ্ধ ধ্বংস-ভস্ম-'পরি[৮] ভ্রমিব কি হাহা করি ৩০
জগতের মরুভূমি-মাঝে ?

আজ তবে হৃদয়ের[৯] সাথে
একবার করিব সংগ্রাম।
ফিরে নেব, কেড়ে নেব আমি
জগতের একেকটি গ্রাম।[১০] ৩৫
ফিরে নেব রবিশশীতারা,[১১]
ফিরে নেব সন্ধ্যা আর ঊষা,
পৃথিবীর শ্যামল যৌবন,
কাননের ফুলময় ভূষা।
ফিরে নেব হারানো সংগীত, ৪০
ফিরে নেব মৃতের জীবন,
জগতের ললাট হইতে
আঁধার করিব প্রক্ষালন।
আমি হব সংগ্রামে বিজয়ী,
হৃদয়ের হবে পরাজয়, ৪৫
জগতের দূর হবে ভয়।[১২]

হৃদয়েরে রেখে দেব বেঁধে,
বিরলে মরিবে[১৩] কেঁদে কেঁদে।

দুঃখে বিঁধি কষ্টে বিঁধি জর্জর করিব হৃদি—
বন্দী হয়ে কাটাবে দিবস, ৫০
অবশেষে হইবে সে বশ,
জগতে রটিবে মোর যশ।
বিশ্বচরাচরময় উচ্ছ্বসিবে জয় জয়,
উল্লাসে পুরিবে চারি ধার,
গাবে রবি, গাবে শশী, গাবে তারা শূন্যে বসি, ৫৫
গাবে বায়ু শত শত বার।
চারি দিকে দিবে হুলুধ্বনি,
বরষিবে কুসুম-আসার,
বেঁধে দেব বিজয়ের মালা
শান্তিময় ললাটে আমার। ৬০

১ কাব্যগ্রন্থ ২-এ ১-২ ছত্র স্থলে ৩-৪ ছত্র এবং ৩-৪ ছত্রের স্থলে ১-২ ছত্র ব্যবহৃত।

২ কাব্যগ্রন্থ ২-এ ৫-৬ ছত্র বর্জিত।

৩ প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পর এই ছত্রগুলি ছিল—

ওই দেখ, ওই আসে, বুঝি চরাচর গ্রাসে
আমার হৃদয় অন্ধকার।
মেলিয়া অলস আঁখি, কেমনে বসিয়া থাকি?
আক্রমিছে জগৎ আমার।
জগৎ করিছে হাহাকার।
বিলাপে পূরিল চারিধার।
কাঁদে রবি, কাঁদে শশি, কেঁদে তারা পড়ে খসি,
কেঁদে উঠে বায়ু শত বার।
চেয়ে দেখে দশ দিশি, কাঁদে দিবা, কাঁদে নিশি,
মৌন সন্ধ্যা অমঙ্গল গণি,
দশ দিকে কাঁদে প্রতিধ্বনি।
ক্রন্দনের কোলাহল আক্রমিছে নভস্থল,
শতমুখী বন্যার মতন,
কোলাহল সিন্ধু মাঝে জগৎ তরীর মত
করিতেছে উত্থান পতন।
এ আমার বিদ্রোহী হৃদয়
আমারে যে করিয়াছে জয়।

যে দিকে মেলিছে আঁখি জ্বলে তরু মরে পাখী,
সে দিক হতেছে মরুময় !
চরাচরে আগুন লাগায়,
চারিদিকে দুর্ভিক্ষ জাগায় ।
পরাণের অন্তঃপুরে কাঁদিছে আকাশ পুরে
স্নেহ প্রেম বিধবার বেশে !
মৃত শিশু লয়ে বুকে আশা বসি ম্লান মুখে,
ভস্মময় শ্মশান-প্রদেশে !
সুখ, অতি সুকুমার, সহিতে নারিল আর,
কেঁদে কেঁদে ম'রে গেল শোকে !
জল নাই করুণার চোখে,
ফুল নাই কল্পনার বনে,
হাসি নাই স্মৃতির আননে !

দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রাবলীর নবম ছত্রে 'চেয়ে দেখে' স্থলে 'চেয়ে থাকে' ; দ্বাদশ ছত্রে 'নভস্থল' স্থলে 'নভতল' । কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি এই ছত্রাবলী বর্জিত ।

৪ প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পাঠ—

ফেলিয়া আঁধার ছায়া গ্রাসিছে চাঁদের কায়া

দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে বর্তমান পাঠ প্রচলিত ।

৫ কাব্যগ্রন্থ ২-এ এর পরবর্তী ১৪ ছত্র (১৩-২৬) বর্জিত ।

৬ কাব্যগ্রন্থ ৩-এ 'অশান্তি এক' স্থলে 'অশান্তি-কীট' ।

৭ প্রথম ও পরবর্তী সংস্করণগুলিতে 'দিয়াছে' স্থলে 'দিয়েছে' ।
বিশ্বভারতী-পুনর্মুদ্রণ সন্ধ্যাসঙ্গীতে (১৩৩৪) থেকে বর্তমান পাঠ প্রচলিত ।

৮ প্রথম সংস্করণে 'দগ্ধ ধ্বংস-ভস্ম-'পরি' স্থলে 'ভস্ম, দগ্ধ, ধ্বংস পরি' ।
দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে বর্তমান পাঠ প্রচলিত ।

৯ কাব্যগ্রন্থ ২-এ 'হৃদয়ের' স্থলে 'হৃদয়েরি' ।

১০ কাব্যগ্রন্থ ২-এ এই ছত্রের পাঠ—

এতদিন যাহা হারিলাম ।

১১ কাব্যগ্রন্থ ১ ও পরবর্তী সংস্করণগুলিতে এই ছত্রটি বর্জিত ।
রচনাবলীতে ছত্রটি পুনর্গৃহীত । এই পুনরাবর্তন কবি-কৃত বলে জানা যায় না ।

১২ কাব্যগ্রন্থ ২-এ এর পরবর্তী ১০ ছত্র (৪৭-৫৬) বর্জিত ।

১৩ কাব্যগ্রন্থ ৩-এ 'মরিবে' স্থলে 'মরিব' ।

আমি-হারা[১]

হায় হায়,[২]
জীবনের তরুণ বেলায়,
কে ছিল রে হৃদয়-মাঝারে,
দুলিত রে অরুণ-দোলায়।
হাসি তার ললাটে ফুটিত, ৫
হাসি তার ভাসিত নয়নে,
হাসি তার ঘুমায়ে পড়িত
সুকোমল অধরশয়নে।[৩]
ঘুমাইলে, নন্দনবালিকা
গেঁথে দিত স্বপনমালিকা; ১০
জাগরণে, নয়নে তাহার[৪]
ছায়াময় স্বপন জাগিত;
আশা তার পাখা প্রসারিয়া
উড়ে যেত উধাও হইয়া,
চাঁদের পায়ের কাছে গিয়ে ১৫
জ্যোৎস্নাময় অমৃত মাগিত।
বনে সে তুলিত শুধু ফুল,
শিশির করিত শুধু পান,
প্রভাতের পাখিটির মতো
হরষে করিত শুধু গান।— ২০
কে গো সেই, কে গো হায় হায়,
জীবনের তরুণ বেলায়
খেলাইত হৃদয়-মাঝারে
দুলিত রে অরুণ দোলায়?
সচেতন অরুণকিরণ ২৫
কে সে প্রাণে এসেছিল নামি?
সে আমার শৈশবের কুঁড়ি,
সে আমার সুকুমার আমি।

প্রতিদিন বাড়িল আঁধার,
পথমাঝে উড়িল রে ধূলি, ৩০

হৃদয়ের অরণ্য-আঁধারে
দুজনে আইনু পথ ভুলি।"
নয়নে পড়িছে তার রেণু,
শাখা বাজে সুকুমার কায়,
ঘন ঘন বহিছে নিশ্বাস ৩৫
কাঁটা বিঁধে সুকোমল গায়।
ধুলায় মলিন হল দেহ,
সভয়ে মলিন হল মুখ,
কেঁদে সে চাহিল মুখপানে
দেখে মোর ফেটে গেল বুক। ৪০

কেঁদে সে কহিল মুখ চাহি,
"ওগো মোরে আনিলে কোথায়?
পায় পায় বাজিতেছে বাধা,
তরুশাখা লাগিছে মাথায়।
চারি দিকে মলিন আঁধার, ৪৫
কিছু হেথা নাহি যে সুন্দর,
কোথা গো শিশির-মাখা ফুল,
কোথা গো প্রভাতরবিকর?"
কেঁদে কেঁদে সাথে সে চলিল,
কহিল সে সকরুণ স্বর, ৫০
"কোথা গো শিশির-মাখা ফুল,
কোথা গো প্রভাত রবিকর।"
প্রতিদিন বাড়িল আঁধার,
পথ হল পঙ্কিল মলিন—
মুখে তার কথাটিও নাই, ৫৫
দেহ তার হল বলহীন।
অবশেষে একদিন, কেমনে, কোথায়, কবে
কিছুই যে জানিনে গো হায়,
হারাইয়া গেল সে কোথায়।"

রাখো দেব, রাখো, মোরে রাখো, ৬০
তোমার স্নেহেতে মোরে ঢাকো.

আজি চারি দিকে মোর   এ কী অন্ধকার ঘোর,
একবার নাম ধরে ডাকো।
পারি না যে সামালিতে, কাঁদি গো আকুল চিতে,
কত রব মৃত্তিকা বহিয়া। ৬৫
ধূলিময় দেহখানি   ধূলায় আনিছে টানি,[৭]
ধূলায় দিতেছে ঢাকি হিয়া।[৮]

হারায়েছি আমার আমারে,
আজি[৯] আমি ভ্রমি অন্ধকারে।
কখনো বা সন্ধ্যাবেলা   আমার পুরানো সাথি ৭০
মুহূর্তের তরে আসে প্রাণে,
চারি দিকে[১০] নিরখে নয়ানে।
প্রণয়ীর শ্মশানেতে   একেলা বিরলে আসি
প্রণয়ী যেমন কেঁদে যায়,
নিজের সমাধি-'পরে   নিজে বসি উপছায়া ৭৫
যেমন নিশ্বাস ফেলে হায়,
কুসুম শুকায়ে গেলে   যেমন সৌরভ তার
কাছে কাছে কাঁদিয়া বেড়ায়,
সুখ ফুরাইয়া গেলে   একটি মলিন হাসি
অধরে বসিয়া কেঁদে চায়, ৮০
তেমনি সে আসে প্রাণে—   চায় চারি দিক-পানে
কাঁদে, আর কেঁদে চলে যায়।
বলে শুধু, "কী ছিল, কী হল,
সে সব কোথায় চলে গেল।"

বহুদিন দেখি নাই তারে, ৮৫
আসেনি এ হৃদয়-মাঝারে।
মনে করি মনে আনি   তার সেই মুখখানি,
ভালো করে মনে পড়িছে না।
হৃদয়ে যে ছবি ছিল   ধূলায় মলিন হল,
আর তাহা নাহি যায় চেনা। ৯০
ভুলে গেছি কী খেলা খেলিত,
ভুলে গেছি কী কথা বলিত।

যে গান গাহিত সদা　　সুর তার মনে আছে,
কথা তার নাহি পড়ে মনে।
যে আশা হৃদয়ে লয়ে　　উড়িত সে মেঘ চেয়ে　　৯৫
আর তাহা পড়ে না স্মরণে।
শুধু যবে হৃদি-মাঝে চাই
মনে পড়ে— কী ছিল, কী নাই।

১ কাব্যগ্রন্থ ২-এ কবিতাটির নাম 'পথভ্রষ্ট'।

২ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম ছত্রের পূর্বে ১৬ ছত্র ছিল—

পরাণের অন্ধকার অরণ্য মাঝারে
আমি মোর হারাল' কোথায় ?
ভ্রমিতেছি পথে পথে, খুঁজিতেছি তারে—
ডাকিতেছি, আয়, আয়, আয়,
আর কি সে আসিবে না হায়।
আর কিরে পাবনা'ক তায় ?
হৃদয়ের অন্ধকারে　　গভীর অরণ্য তলে
আমি মোর হারাল' কোথায় ?
দিবস শুধায় মোরে—রজনী শুধায়,
নিতি তারা অশ্রুবারি ফেলে,
শুধায় আকুল হ'য়ে চন্দ্র সূর্য্য তারা
"কোথা তুমি, কোথা তুমি গেলে।"
আঁধার হৃদয় হতে উঠিছে উত্তর
"মোরে কোথা ফেলেছি হারায়ে।"
হৃদয়ের হায় হায় হাহাকার ধ্বনি
ভ্রমিতেছে নিশীথের বায়ে।

কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি বর্জিত।

কাব্যগ্রন্থ ২-এ তদুপরি ২০ ছত্র (১-২০) বর্জিত।

৩ প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পর চারটি ছত্র ছিল—

হাসি-শিশু আননে তাহার
খেলাইত চপল চরণে,
রবিকর খেলায় যেমন
তটিনীর নয়নে নয়নে।

দ্বিতীয় সংস্করণে ও তদবধি বর্জিত।

৪ প্রথম সংস্করণে এই ছত্রটি ভ্রমক্রমে দুইবার মুদ্রিত।

৫ কাব্যগ্রন্থ ২-এ পরবর্তী ৮ ছত্র (৩৩-৪০) বর্জিত।

৬ কাব্যগ্রন্থ ২-এ পরবর্তী ২৫ ছত্র (৬০-৮৪) বর্জিত।

৭ প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পাঠ—

ধুলিময় দেহ মম ধুলায় আনিছে ডাকি

দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে বর্তমান পাঠ প্রচলিত।

৮ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রের পর দশটি ছত্র ছিল—

মলিন দেহের ভারে হৃদয় চলিতে নারে
হৃদয় পড়িছে ভুমে লুটি,
বিমল হৃদয় মাঝে পড়িছে দেহের ছায়া,
দেহের কলঙ্ক উঠে ফুটি!
জড়ের সহিত রণে হারিবে হৃদয় মোর?
মৃত্তিকার দাসত্ব করিবে?
এক মুষ্টি ধূলি লেগে অনন্ত হৃদয় মোর
চিরস্থায়ী কলঙ্ক ধরিবে?
হৃদে লাগে মৃত্তিকার ছাপ,
এ কি নিদারুণ অভিশাপ!

কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি বর্জিত।

৯ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে 'আজ'।

বিশ্বভারতী-পুনর্মুদ্রণ সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৩৩৪) থেকে 'আজি'।

১০ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে 'চারি দিকে' স্থলে 'চারিদিক'।

বিশ্বভারতী-পুনর্মুদ্রণ সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৩৩৪) থেকে বর্তমান পাঠ প্রচলিত।

গান-সমাপন

জনমিয়া এ সংসারে কিছুই শিখিনি আর
শুধু গাই গান।
স্নেহময়ী মার কাছে শৈশবে শিখিয়াছিনু
দু-একটি তান।
শুধু জানি তাই, ৫
দিবানিশি তাই শুধু গাই।
শতছিদ্রময় এই হৃদয়-বাঁশিটি লয়ে
বাজাই সতত—
দুঃখের কঠোর স্বর রাগিণী হইয়া যায়,
মৃদুল নিশ্বাসে পরিণত। ১০

আঁধার জলদ যেন   ইন্দ্রধনু হয়ে যায়,
ভুলে যাই সকল যাতনা।
ভালো যদি না লাগে সে গান
ভালো সখা, তাও গাহিব না।

এমন পণ্ডিত কত   রয়েছেন শত শত   ১৫
এ সংসারতলে,
আকাশের দৈত্যবালা   উন্মাদিনী চপলারে
বেঁধে রাখে দাসত্বের লোহার শিকলে।
আকাশ ধরিয়া হাতে   নক্ষত্র-অক্ষর দেখি
গ্রন্থ পাঠ করিছেন তাঁরা,[১]   ২০
জ্ঞানের বন্ধন যত   ছিন্ন করে দিতেছেন
ভাঙি ফেলি অতীতের কারা।[২]
আমি তার কিছুই করি না,
আমি তার কিছুই জানি না।
এমন মহান্ এ সংসারে   ২৫
জ্ঞানরত্নরাশির মাঝারে
আমি দীন শুধু গান গাই,
তোমাদের মুখপানে চাই।[৩]
ভালো যদি না লাগে সে গান
ভালো সখা, তাও গাহিব না।   ৩০

বড়ো ভয় হয়,[৪] পাছে   কেহই না দেখে তারে
যে জন কিছুই শেখে নাই।
ওগো সখা, ভয়ে ভয়ে তাই
যাহা জানি সেই গান গাই,
তোমাদের মুখপানে চাই।   ৩৫
শ্রান্ত দেহ হীনবল,   নয়নে পড়িছে জল,
রক্ত ঝরে চরণে আমার,
নিশ্বাস বহিছে বেগে,   হৃদয়-বাঁশিটি মম
বাজে না বাজে না বুঝি আর।
দিন গেল, সন্ধ্যা গেল,   কেহ দেখিলে না চেয়ে[৫]   ৪০
যত গান গাই।

বুঝি কারো অবসর নাই।
বুঝি কারো ভালো নাহি লাগে
ভালো সখা, আর গাহিব না।[৬]

১ ভারতীতে 'যাঁরা'। বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ থেকে প্রচলিত।

২ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রের পর চারটি ছত্র ছিল—

কেহ বা বসিয়া আছে লক্ষ্মীর পায়ের কাছে,
গণিছে রতন,
মাথার কিরীট হতে ছুটিছে রতন-বিভা,
জগৎ চাহিয়া আছে অবাক্ মতন।

কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি বর্জিত।

৩ প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পর আর একটি ছত্র ছিল—

আর আমি কিছুই জানি না!

দ্বিতীয় সংস্করণে ও তদবধি বর্জিত।

৪ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে 'বড় ভয় হয়,' স্থলে 'বড় ভয় হ'ত,'।
কাব্যগ্রন্থ-১ থেকে বর্তমান পাঠ প্রচলিত।

৫ ভারতীতে 'কেহ দেখিলে না চেয়ে' স্থলে 'কেহনা দেখিলে চেয়ে'।
বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ থেকে প্রচলিত।

৬ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রের পর আরও ৩৪টি ছত্র ছিল—

কিছুই করি না আমি শুধু আমি গান গাই,
তা'ও আমি গাহিব না আর?
কেমনে কাটিবে দিন, কেমনে কাটিবে রাত,
হৃদয় আমার!
এ ভাঙা বাঁশিটি মোর ধুলায় ফেলিয়া দিব,
একেলা পথের ধারে রহি
দেখিব পথিক যত ফিরিতেছে ইতস্ততঃ
ধনমান যশোভার বহি!
মলিন আমারে দেখি যদি কারো মনে পড়ে,
যদি কেহ-ডাকে দয়া ক'রে,
যদি কেহ বলে শেষে, "যে একটি গান জান'
একবার শুনাওত মোরে";
গাহিতে চাহিব যত মনে পড়িবে না তত,
রুদ্ধ-কণ্ঠে আসিবে না গান,

আকুল নয়ন জলে হয়ত থামিতে হবে,
ধূলিতে পড়িব ম্রিয়মাণ।
একটি যা' গান জানি তাহাও যাইব ভুলি,
পথপ্রান্তে ধূলিময় দেহ।
সংসারের কোলাহল বুঝিতে নারিব কিছু
আমি যেন অতীতের কেহ।
ভাল সখা, তাই হোক্ তবে,
আর আমি গান গাহিব না।

সংসারের কেহই না— কিছুই না আমি,—
প্রাণ যবে ত্যজিবে এ দেহ,
কিছুই শিখিনি আমি, কিছু জানিতামনাক'
তা' বলে কি কাঁদিবে না কেহ?
কেহই কি বলিবে না "একটি জানিত গান
বেড়াইত সেই গান গাহিয়া গাহিয়া,
দ্বারে দ্বারে মমতা চাহিয়া।
সে গান শোনেনি কেহ তার,
মুছায়নি দুখ-অশ্রুধার,
মরণ সদয় হয়ে, গেছে তারে ডেকে লয়ে
শুনিতে একটি তার গান,
মুছাইতে সজল নয়ান।"

দ্বিতীয় সংস্করণে এই ছত্রাবলীর ২৮-২৯ ছত্র (বেড়াইত সেই গান···মমতা চাহিয়া) বর্জিত। কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি যাবতীয় ছত্র বর্জিত।

উপহার[১]

ভুলে গেছি কবে তুমি ছেলেবেলা একদিন[২]
মরমের কাছে এসেছিলে,[৩]
স্নেহময় ছায়াময় সন্ধ্যাসম[৪] আঁখি মেলি
একবার বুঝি হেসেছিলে[৫]।

বুঝি গো সন্ধ্যার কাছে শিখেছে সন্ধ্যার মায়া ৫
ওই আঁখি দুটি—
চাহিলে হৃদয়পানে মরমেতে পড়ে ছায়া,
তারা উঠে ফুটি।

আগে কে জানিত বলো কত কী লুকানো ছিল
হৃদয়নিভৃতে, ১০
তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া
পাইনু দেখিতে।

কখনো গাওনি তুমি, কেবল নীরবে রহি
শিখায়েছ গান—
স্বপ্নময় শান্তিময় পুরবীরাগিণী তানে ১৫
বাঁধিয়াছ প্রাণ।

আকাশের পানে চাই, সেই সুরে গান গাই
একেলা বসিয়া।
একে একে সুরগুলি, অনন্তে[৬] হারায়ে যায়
আঁধারে পশিয়া।[৭] ২০

বলো দেখি কতদিন আসনি এ শূন্য প্রাণে।
বলো দেখি কতদিন চাওনি হৃদয়পানে,
বলো দেখি কতদিন শোননি এ মোর গান—
তবে সখী গান-গাওয়া হ'ল বুঝি অবসান।[৮]

যে রাগ শিখায়েছিলে সে কি আমি গেছি ভুলে? ২৫
তার সাথে মিলিছে না সুর?
তাই কি আস না প্রাণে, তাই কি শোন না গান—
তাই সখী, রয়েছ কি দূর?
ভালো সখী, আবার শিখাও,
আরবার মুখপানে চাও, ৩০
একবার ফেলো অশ্রুজল
আঁখিপানে দুটি আঁখি তুলি।[৯]
তা হলে পুরানো সুর আবার পড়িবে মনে,
আর কভু যাইব না ভুলি।

সেই পুরাতন চোখে মাঝে মাঝে চেয়ো সখী, ৩৫
উজলিয়া স্মৃতির মন্দির।

এই পুরাতন প্রাণে মাঝে মাঝে এসো সখী,
শূন্য আছে প্রাণের কুটির।
নহিলে আঁধার মেঘরাশি
হৃদয়ের আলোক নিবাবে,[১০] ৪০
একে একে ভুলে যাব সুর,
গান গাওয়া সাঙ্গ হয়ে যাবে।

১ কাব্যগ্রন্থ ৩-এ কবিতার নাম 'সমাপন'। সঞ্চয়িতায় নাম 'দৃষ্টি'।

২ সঞ্চয়িতায় ১-৪ ছত্র বর্জিত।

৩ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে 'এসেছিলে' স্থলে 'এয়েছিলে'। রচনাবলীতে পরিবর্তিত।

৪ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে 'সন্ধ্যাসম' স্থলে 'সন্ধ্যাময়'।
বিশ্বভারতী-পুনর্মুদ্রণ সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৩৩৪) থেকে বর্তমান পাঠ প্রচলিত।

৫ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে 'বুঝি হেসেছিলে' স্থলে 'শুধু চেয়েছিলে'। রচনাবলীতে পরিবর্তিত।
প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পর চার ছত্র ছিল—

স্তরে স্তরে এ হৃদয় হয়ে গেল অনাবৃত,
হৃদয়ের দিশি দিশি হয়ে গেল উদ্ঘাটিত,
একে একে শত শত ফুটিতে লাগিল তারা,
তারকা-অরণ্য মাঝে নয়ন হইল হারা।

দ্বিতীয় সংস্করণে ও তদবধি বর্জিত।

৬ কাব্যগ্রন্থ ৩-এ 'অন্তরে'।

৭ সঞ্চয়িতায় এর পরবর্তী যাবতীয় ছত্র (২১-৪২) বর্জিত।

৮ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে এই ছত্রের পর চার ছত্র ছিল—

বল মোরে বল দেখি, এ আমার গানগুলি
কেন আর ভাল নাহি লাগে,
প্রাণের রাগিণী শুনি নয়নে জাগেনা আভা
কেন সখি কিসের বিরাগে ?

রচনাবলীতে বর্জিত।

৯ প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পরিবর্তে এই ছত্রটি ছিল— একবার শোন গানগুলি,
দ্বিতীয় সংস্করণে ও তদবধি পরিবর্তিত।

১০ প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে 'নিভাবে'। রচনাবলীতে পরিবর্তিত। এই পরিবর্তন কবি-কৃত বলে জানা যায় না।

পরবাসী ক্ষীণ আয়ু একটি মুমূর্ষু বায়ু
স্বদেশ কানন পানে ধায়,
প্রাণ পণ ছুটিতে না চায়
যেমনি কাননে পশে, ফুলবধূটির পাশে,
শেষ কথা বলিতে বলিতে
তখনি অমনি ম'রে যায়!
তেমনি, তেমনি ক'রে এসো,
কবিতা রে, বধূটি আমার,
ম্লান মুখে করুণা বসিয়া
চোখে ধীরে ঝরে অশ্রু ধার;
দুটি শুধু পড়িবে নিশ্বাস,
দুটি শুধু বাহিরিবে বাণী,
বাহু দুটি হৃদয়ে জড়ায়ে
মরমে রাখিবি মুখখানি!

সন্ধ্যা

দুখ বড়ো বাজিয়াছে প্রাণে,
সন্ধ্যা তুই ধীরে ধীরে আয়
কাছে আয়—আরো কাছে আয়—
সঙ্গীহারা হৃদয় আমার
তোর বুকে লুকাইতে চায়।

তোর কাছে ফেলিবে নিশ্বাস,
তোর কাছে কহি মনকথা,
তোর কাছে করি প্রসারিত
প্রাণের নিভৃত নীরবতা।
তোর গান শুনিতে শুনিতে
তোর তারা গুণিতে গুণিতে,
নয়ন মুদিয়া আসে মোর,
হৃদয় হইয়া আসে ভোর—
স্বপন-গোধূলিময় প্রাণ
হারায় প্রাণের মাঝে তোর।
একটি কথাও নাই মুখে,
চেয়ে শুধু রোস্ মুখ পানে
অনিমেষ-আয়ত নয়ানে।
ধীরে শুধু ফেলিস্ নিশ্বাস,
ধীরে শুধু কানে কানে গা'স্
ঘুম-পাড়াবার মৃদু গান,

কবি-কর্তৃক সংশোধিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর (১৯৩৯) প্রুফ

বর্জিত কবিতা

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, সন্ধ্যাসংগীতের বিভিন্ন সংস্করণে ক্রমশঃ চারটি কবিতা সম্পূর্ণ ই বর্জিত হয়েছে—সন্ধ্যা, কেন গান গাই, কেন গান শুনাই, বিষ ও সুধা। সন্ধ্যা-সংগীতের পুরাতন সংস্করণ ব্যতীত এগুলি এখন আর দেখতে পাবার উপায় নেই; এগুলি নীচে পুনর্মুদ্রিত হল। সন্ধ্যাসংগীতের রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত শেষ সংস্করণে অর্থাৎ রবীন্দ্র-রচনাবলীতে কবি 'সন্ধ্যা' কবিতাটি বর্জন করেন; এখানে প্রথম সংস্করণের পাঠ মুদ্রিত হয়েছে ও পরবর্তী সংস্করণের পাঠ-পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। 'কেন গান গাই' ও 'কেন গান শুনাই' কবিতা দুটিও প্রথম সংস্করণ অনুযায়ী; দ্বিতীয় সংস্করণেও কবিতা দুটি মুদ্রিত হয়েছিল, বিশেষ কোনো পাঠ-পরিবর্তন হয় নি। 'বিষ ও সুধা' দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত হয়, প্রথম সংস্করণ অনুযায়ী মুদ্রিত হল।

সন্ধ্যা

ব্যথা বড় বাজিয়াছে প্রাণে,
সন্ধ্যা তুই ধীরে ধীরে আয়!
কাছে আয়—আরো কাছে আয়—
সঙ্গীহারা হৃদয় আমার
তোর বুকে লুকাইতে চায়! ৫
আমার ব্যথার তুই ব্যথী,[১]
তুই মোর এক মাত্র সাথী,
সন্ধ্যা তুই আমার আলয়,
তোরে আমি বড় ভাল বাসি—
সারাদিন ঘুরে ঘুরে ঘুরে[২] ১০
তোর কোলে ঘুমাইতে আসি,
তোর কাছে ফেলিরে নিশ্বাস;
তোর কাছে কহি মনোকথা,[৩]
তোর কাছে করি প্রসারিত
প্রাণের নিভৃত নীরবতা। ১৫
তোর গান শুনিতে শুনিতে
তোর তারা গুণিতে গুণিতে,
নয়ন মুদিয়া আসে মোর,

হৃদয় হইয়া আসে ভোর—
স্বপন গোধূলিময় প্রাণ ২০
হারায় প্রাণের মাঝে তোর।
একটি কথাও নাই মুখে,
চেয়ে শুধু রোস মুখ পানে
অনিমেষ আনত নয়ানে।
ধীরে শুধু ফেলিস নিশ্বাস, ২৫
ধীরে শুধু কানে কানে গাস্
ঘুম-পাড়াবার মৃদু গান,
কোমল কমল কর দিয়ে
ঢেকে শুধু দিস্ দুনয়ান,
ভুলে যাই সকল যাতনা ৩০
জুড়াইয়া আসে মোর প্রাণ।
তাই তোরে ডাকি একবার,
সঙ্গীহারা হৃদয় আমার[৪]
তোর বুকে লুকাইয়া মাথা
তোর কোলে ঘুমাইতে চায়, ৩৫
সন্ধ্যা তুই ধীরে ধীরে আয়।
আঁধার আঁচল দিয়ে তোর
আমার দুখেরে ঢেকে রাখ,
বল্ তারে ঘুমাইতে বল্
কপালেতে হাতখানি রাখ্, ৪০
জগতেরে ক'রে দে আড়াল,[৫]
কোলাহল করিয়া দে দূর—
দুখেরে কোলেতে করে নিয়ে
র'চে দে নিভৃত অন্তঃপুর।
তা হলে সে কাঁদিবে বসিয়া,[৬] ৪৫
কল্পনার খেলেনা গড়িবে,
খেলিয়া আপন মনে' কাঁদিয়া কাঁদিয়া, শেষে
আপনি সে ঘুমায়ে পড়িবে।

আয় সন্ধ্যা ধীরে ধীরে আয়,
হাতে লয়ে স্বপনের ডালা, ৫০

গুন গুন মন্ত্র পড়ি পড়ি
গাঁথিয়া দে স্বপনের মালা,
জড়ায়ে দে আমার মাথায়,
স্নেহ-হস্ত বুলায়ে দে গায় ।

স্রোতস্বিনী ঘুম ঘোরে, গাবে কুলু কুলু কোরে ৫৫
ঘুমেতে জড়িত আধ গান,
ঝিল্লিরা ধরিবে একতান,
দিন-শ্রমে শ্রান্ত বায়ু গৃহ[৭] মুখে যেতে যেতে
গান গাবে অতি মৃদু স্বরে,
পদ শব্দ শুনি তার তন্দ্রা ভাঙ্গি লতা পাতা ৬০
ভৎর্সনা করিবে মর মরে ।
ভাঙ্গা ভাঙ্গা[৮] গানগুলি মিলিয়া হৃদয় মাঝে
মিশে যাবে স্বপনের সাথে,
নানাবিধ[৯] রূপ ধরি ভ্রমিয়া বেড়াবে তারা,
হৃদয়ের গুহাতে গুহাতে । ৬৫

আয় সন্ধ্যা ধীরে ধীরে আয়,[১০]
আন তোর স্বর্ণ মেঘ জাল,
পশ্চিমের সুবর্ণ প্রাঙ্গণে
খেলিবি মেঘের ইন্দ্রজাল ।
ওই তোর ভাঙ্গা মেঘগুলি, ৭০
হৃদয়ের খেলেনা আমার,
ওইগুলি কোলে কোরে নিয়ে
সাধ যায় খেলি অনিবার ।
ওই তোর জলদের পর,
বাঁধি আমি কত শত ঘর । ৭৫
সাধ যায় হোথায় লুটাই,
অস্তগামী রবির মতন,
লুটায়ে লুটায়ে পড়ি শেষে
সাগরের ওই প্রান্ত দেশে
তরল কনক নিকেতন । ৮০

ছোট ছোট ওই তারাগুলি,
ডাকে মোরে আঁখি পাতা খুলি।
স্নেহময় আঁখি গুলি যেন
আছে শুধু মোর পথ চেয়ে,
সন্ধ্যার আঁধারে বসি বসি ৮৫
কহে যেন গান গেয়ে গেয়ে
"কবে তুমি আসিবে হেথায়
অন্ধকার নিভৃত নিলয়ে,
জগতের অতি প্রান্ত দেশে
প্রদীপটি রেখেছি জ্বালায়ে। ৯০
বিজনেতে রয়েছি বসিয়া
কবে তুমি আসিবে হেথায়।"
সন্ধ্যা হলে মোর মুখ চেয়ে
তারাগুলি এই গান গায়!
আয় সন্ধ্যা ধীরে ধীরে আয় ৯৫
জগতের নয়ন ঢেকে দে
আঁধার আঁচল পেতে দিয়ে
কোলেতে মাথাটি রেখে দে! ৯৮

১ দ্বিতীয় সংস্করণে ৬-৭ ছত্র বর্জিত ; কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি এ ছাড়াও ৮-১১ ছত্র বর্জিত।
২ দ্বিতীয় সংস্করণে 'ঘুরে ঘুরে ঘুরে' স্থলে 'ঘুরে ঘুরে শেষে'।
৩ সন্ধ্যাসঙ্গীত [১৯১১]-এ 'মনকথা' ; কাব্যগ্রন্থ ৩-এ 'মন-কথা'।
৪ কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি ৩৩-৩৭ ছত্র বর্জিত।
৫ এই ছত্র কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি বর্জিত।
৬ কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি ৪৫-৪৮ ছত্র বর্জিত।
৭ দ্বিতীয় সংস্করণে ও কাব্যগ্রন্থ ১-এ 'গৃহ' স্থলে 'গৃহে'। স্পষ্টতঃই মুদ্রণপ্রমাদ।
৮ কাব্যগ্রন্থ ৩-এ 'ভাঙা ভাঙা'র পরিবর্তে 'গুঞ্জরিত'।
৯ কাব্যগ্রন্থ ৩-এ 'নানাবিধ'-এর পরিবর্তে 'নানা সব'।
১০ কাব্যগ্রন্থ ১-এ ও তদবধি ৬৬-৯৪ ছত্র বর্জিত।

কেন গান গাই

গুরুভার মন লয়ে, কত বা বেড়াবি ব'য়ে ?
এমন কি কেহ তোর নাই,
যাহার হৃদয় পরে মিলিবে মুহূর্ত্ত তরে
হৃদয়টি রাখিবার ঠাঁই ?
"কেহ না, কেহ না !"

সংসারে যে দিকে ফিরে চাই
এমন কি কেহ তোর নাই,—
তোর দিন শেষ হ'লে, স্মৃতিখানি ল'য়ে কোলে,
শোয়াইয়া বিষাদের কোমল শয়নে,
বিমল শিশির-মাখা প্রেম ফুলে দিয়ে ঢাকা
চেয়ে রবে আনত নয়নে ?
হৃদয়েতে রেখে দিবে তুলে,
প্রতিদিন ঢেকে দিবে ফুলে,
মনোমাঝে প্রবেশিয়ে বিন্দু বিন্দু অশ্রু দিয়ে
বৃন্ত-ছিন্ন প্রেম ফুলগুলি
রাখিবেক জিয়াইয়া তুলি ?
এমন কি কেহ তোর নাই ?
"কেহ না, কেহ না !"

প্রাণ তুই খুলে দিলি, ভালবাসা বিলাইলি,
কেহ তাহা তুলে না লইল,
ভূমিতলে পড়িয়া রহিল ;
ভালবাসা কেন দিলি তবে
কেহ যদি কুড়ায়ে না লবে ?
কেন সখা কেন ?
"জানি না, জানি না !"

বিজনে বনের মাঝে ফুল এক আছে ফুটে'
শুধাইতে গেনু তার কাছে,
"ফুল, তুই এ আঁধারে পরিমল দিস্ কারে,
এ কাননে কেবা তোর আছে !

৪১

যখন পড়িবি তুই ঝ'রে,
শুকাইয়া দলগুলি ধূলিতে হইবে ধূলি,
মনে কি করিবে কেহ তোরে।
তবে কেন পরিমল ঢেলে দিস্ অবিরল
ছোট মনখানি ভ'রে ভ'রে?
কেন, ফুল, কেন?
সেও বলে "জানি না, জানি না।"

সখা, তুমি গান গাও কেন,
কেহ যদি শুনিতে না চায়
ওই দেখ পথ মাঝে যে যাহার নিজ কাজে
আপনার মনে চলে যায়।
কেহ যদি শুনিতে না চায়
কেন তবে, কেন গাও গান,
আকাশে ঢালিয়া দাও প্রাণ?
গান তব ফুরাইবে যবে,
রাগিণী কারো কি মনে রবে?
বাতাসেতে স্বরধার খেলিয়াছে অনিবার,
বাতাসে সমাধি তার হবে।
কাহারো মনেও নাহি রবে,
কেন সখা গান গাও তবে?
কেন, সখা, কেন?
"জানি না, জানি না।"
বিজন তরুর শাখে একাকী পাখীটি ডাকে,
শুধাইতে গেনু তার কাছে,
"পাখী তুই এ আঁধারে গান শুনাইবি কারে?
এ কাননে কেবা তোর আছে।
যখনি ফুরাবে তোর প্রাণ,
যখনি থামিবে তোর গান,
বন ছিল যেমন নীরবে,
তেমনি নীরব পুন হবে।
যেমনি থামিবে গীত, অমনি সে সচকিত
প্রতিধ্বনি আকাশে মিলাবে,

তোর গান তোরি সাথে যাবে।
আকাশে ঢালিয়া দিয়া প্রাণ,
তবে, পাখী, কেন গাস্ গান?
কেন, পাখি, কেন?
সেও বলে "জানি না, জানি না।"

১ দ্বিতীয় সংস্করণে 'ফুটে আছে'।
২ এই ছত্রটি দ্বিতীয় সংস্করণে নেই।

কেন গান শুনাই

এস সখি, এস মোর কাছে,
কথা এক শুধাবার আছে।
চেয়ে তব মুখ পানে ব'সে এই ঠাঁই—
প্রতিদিন যত গান তোমারে শুনাই,
বুঝিতে কি পার' সখি কেন যে তা গাই?
শুধু কি তা' পশে কানে? কথা গুলি তার
কোথা হ'তে উঠিতেছে ভাব একবার?
বুঝনা কি হৃদয়ের
কোন্ খানে শেল ফুটে
তবে প্রতি কথা গুলি
আর্ত্তনাদ করি উঠে!"
যখন নয়নে উঠে বিন্দু অশ্রুজল,
তখন কি তাই তুই দেখিস্ কেবল?
দেখ না কি কি-সমুদ্র হৃদয়েতে উথলিছে,
শুধু কণামাত্র তার আঁখি-প্রান্তে বিগলিছে!
যখন একটি শুধু উঠেরে নিশ্বাস,
তখন কি তাই শুধু শুনিবারে পাস্?
শুনিস্ না কি-ঝটিকা হৃদয়ে বেড়ায় ছুটে,
একটি উচ্ছ্বাস শুধু বাহিরেতে ফুটে!
যে কথাটি বলি আমি শোন শুধু তাই?
শোন না কি যত কথা বলা হইল না?
যত কথা বলিবারে চাই?

আমি কি শুনাই গান
ভাল মন্দ করিতে বিচার ?
যবে এ নয়ন হ'তে বহে অশ্রুধার—
শুধু ফিরে দেখিবি তখন
সে অশ্রু উজ্জ্বল কি না হীরার মতন ?

আমার এ গান তোরে যখন শুনাই—
নিন্দা বা প্রশংসা আমি কিছু নাহি চাই—
যে হৃদি দিয়েছি তোরে
তাই তোরে দেখাবারে চাই,
তারি ভাষা বুঝাবারে চাই,
তারি ব্যথা জানাবারে চাই,
আর কিবা চাই ?
সেই হৃদি দেখিলি যখন,
তারি ভাষা বুঝিলি যখন,
তারি ব্যথা জানিলি যখন
তখন একটি বিন্দু অশ্রুবারি চাই !
(আর কিবা চাই !)

আয় সখি কাছে মোর আয়,
কথা এক, শুধাব তোমায়—
এত গান শুনালেম এত অনুরাগে
কথা তার বুকে কিলো লাগে ?
একটি নিশ্বাস কিলো জাগে ?
কথা শুধু শুনিয়া কি যাস্ ?
ভাল মন্দ বুঝিস্ কেবল ?
প্রাণের ভিতর হতে
উঠে না একটি অশ্রুজল ?

বিষ ও সুধা

অস্ত গেল দিনমণি। সন্ধ্যা আসি ধীরে
দিবসের অন্ধকার সমাধির পরে
তারকার ফুলরাশি দিল ছড়াইয়া।
সাবধানে অতি ধীরে নায়ক যেমন
ঘুমন্ত প্রিয়ার মুখ করয়ে চুম্বন
দিন-পরিশ্রমে ক্লান্ত পৃথিবীর দেহ
অতি ধীরে পরশিল সায়াহ্নের বায়ু।
দুরন্ত তরঙ্গগুলি যমুনার কোলে
সারাদিন খেলা করি পড়েছে ঘুমায়ে।
ভগ্ন দেবালয় খানি যমুনার ধারে,
শিকড়ে শিকড়ে তার ছায়ি জীর্ণ দেহ
বট অশথের গাছ জড়াজড়ি করি
আঁধারিয়া রাখিয়াছে ভগন হৃদয়,
দুয়েকটি বায়ুচ্ছ্বাস পথ ভুলি গিয়া
আঁধার আলয়ে তার হয়েছে আটক,
অধীর হইয়া তারা হেথায় হোথায়
হু হু করি বেড়াইছে পথ খুঁজি খুঁজি!
শুন সন্ধ্যে! আবার এসেছি আমি হেথা,
নীরব আঁধারে তব বসিয়া বসিয়া
তটিনীর কলধ্বনি শুনিতে এয়েছি।
হে তটিনী, ও কি গান গাইতেছ তুমি!
দিন নাই, রাত্রি নাই এক তানে শুধু
এক সুরে এক গান গাইছ সতত—
এত মৃদুস্বরে ধীরে, যেন ভয় করি
সন্ধ্যার প্রশান্ত স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় পাছে!
এ নীরব সন্ধ্যাকালে তব মৃদু গান
একতান ধ্বনি তব শুনে মনে হয়
এ হৃদি-গানেরি যেন শুনি প্রতিধ্বনি!
মনে হয় যেন তুমি আমারি মতন
কি এক প্রাণের ধন ফেলেছ হারায়ে।
এস স্মৃতি, এস তুমি এ ভগ্ন হৃদয়ে,—

সায়াহ্ন-রবির মৃদু শেষ রশ্মি-রেখা
যেমন পড়েছে ওই অন্ধকার মেঘে
তেমনি ঢাল এ হৃদে অতীত-স্বপন।
কাঁদিতে হয়েছে সাধ বিরলে বসিয়া,
কাঁদি একবার, দাও সে ক্ষমতা মোরে!

যাহা কিছু মনে পড়ে ছেলেবেলাকার
সমস্ত মালতীময়—মালতী কেবল
শৈশবকালের মোর স্মৃতির প্রতিমা।
দুই ভাই বোনে মোরা আছিনু কেমন!
আমি ছিনু ধীর শান্ত গম্ভীর-প্রকৃতি,
মালতী প্রফুল্ল অতি সদা হাসি হাসি।
ছিল না সে উচ্ছ্বসিনী নির্ঝরিণী সম
শৈশব-তরঙ্গবেগে চঞ্চলা সুন্দরী,
ছিল না সে লজ্জাবতী লতাটির মত
সরম-সৌন্দর্য্যভরে ম্রিয়মাণ পারা।
আছিল সে প্রভাতের ফুলের মতন,
প্রশান্ত হরষে সদা মাখানো মুখানি;
সে হাসি গাহিত শুধু উষার সঙ্গীত—
সকলি নবীন আর সকলি বিমল।
মালতীর শান্ত সেই হাসিটির সাথে
হৃদয়ে জাগিত যেন প্রভাত পবন,
নূতন জীবন যেন সঞ্চরিত মনে।
ছেলেবেলাকার যত কবিতা আমার
সে হাসির কিরণেতে উঠেছিল ফুটি।
মালতী ছুঁইত মোর হৃদয়ের তার,
তাইতে শৈশব-গান উঠিত বাজিয়া।
এমনি আসিত সন্ধ্যা, শ্রান্ত জগতেরে
স্নেহময় কোলে তার ঘুম পাড়াইতে।
সুবর্ণ-সলিল-সিক্ত সায়াহ্ন-অম্বরে
গোধূলির অন্ধকার নিঃশব্দ চরণে
ছোট ছোট তারাগুলি দিত ফুটাইয়া,
নন্দন বনের যেন চাঁপা ফুল দিয়ে

ফুলশয্যা সাজাইত সুরবালাদের।
মালতীরে লয়ে পাশে আসিতাম হেথা;
সন্ধ্যার সঙ্গীতস্বরে মিলাইয়া স্বর
মৃদুস্বরে শুনাতেম শৈশব-কবিতা।
হর্ষময় গর্ব্বে তার আঁখি উজলিত—
অবাক্ ভক্তির ভাবে ধরি মোর হাত
একদৃষ্টে মুখপানে রহিত চাহিয়া।
তার সে হরষ হেরি আমারো হৃদয়ে
কেমন মধুর গর্ব্ব উঠিত উথলি!
ক্ষুদ্র এক কুটীর আছিল আমাদের,
নিস্তব্ধ-মধ্যাহ্নে আর নীরব সন্ধ্যায়
দূর হতে তটিনীর কলস্বর আসি
শান্ত কুটীরের প্রাণে প্রবেশিয়া ধীরে
করিত সে কুটীরের স্বপন রচনা।
দুইজনে ছিনু মোরা কল্পনার শিশু—
বনে ভ্রমিতাম যবে, সুদূর নির্ঝরে
বনশ্রীর পদধ্বনি পেতাম শুনিতে!
যাহা কিছু দেখিতাম সকলেরি মাঝে
জীবন্ত প্রতিমা যেন পেতেম দেখিতে!
কত জোছনার রাত্রে মিলি দুইজনে
ভ্রমিতাম যমুনার পুলিনে পুলিনে,
মনে হত এ রজনী পোহাতে চাবে না,
সহসা কোকিল রব শুনিয়া উষায়,
সহসা যখনি শ্যামা গাহিয়া উঠিত,
চমকিয়া উঠিতাম, কহিতাম মোরা
"এ কি হল! এরি মধ্যে পোহাল রজনী!"
দেখিতাম পূর্ব্বদিকে উঠেছে ফুটিয়া
শুকতারা, রজনীর বিদায়ের পথে,
প্রভাতের বায়ু ধীরে উঠিছে জাগিয়া
আসিছে মলিন হয়ে আঁধারের মুখ।
তখন আলয়ে দোঁহে আসিতাম ফিরি,
আসিতে আসিতে পথে শুনিতাম মোরা
গাইছে বিজন-কুঞ্জে বউ-কথা-কও।

ক্রমশঃ বালক কাল হল অবসান,
নীরদের প্রেম-দৃষ্টে পড়িল মালতী,
নীরদের সাথে তার হইল বিবাহ।
মাঝে মাঝে যাইতাম তাদের আলয়ে ;
দেখিতাম, মালতীর শান্ত সে হাসিতে
কুটীরেতে রাখিয়াছে প্রভাত ফুটায়ে।

সঙ্গীহারা হয়ে আমি ভ্রমিতাম একা,
নিরাশ্রয় এ হৃদয় অশান্ত হইয়া
কাঁদিয়া উঠিত যেন অধীর উচ্ছ্বাসে।
কোথাও পেতনা যেন আরাম বিশ্রাম।
অন্যমনে আছি যবে, হৃদয় আমার
সহসা স্বপন ভাঙ্গি উঠিত চমকি।
সহসা পেতনা ভেবে, পেতনা খুঁজিয়া
আগে কি ছিলরে যেন এখন তা নাই।
প্রকৃতির কি-যেন-কি গিয়াছে হারায়ে
মনে তাহা পড়িছে না। ছেলেবেলা হতে
প্রকৃতির যেই ছন্দ এসেছি শুনিয়া
সেই ছন্দোভঙ্গ যেন হয়েছে তাহায়,
সেই ছন্দে কি কথায় পড়েছে অভাব—
কানেতে সহসা তাই উঠিত বাজিয়া,
হৃদয় সহসা তাই উঠিত চমকি।
জানিনা কিসের তরে, কি মনের দুখে
দুয়েকটি দীর্ঘশ্বাস উঠিত উচ্ছ্বসি।
শিখর হতে শিখরে, বন হতে বনে,
অন্যমনে একেলাই বেড়াতাম ভ্রমি—
সহসা চেতন পেয়ে উঠিয়া চমকি
সবিস্ময়ে ভাবিতাম, কেন ভ্রমিতেছি,
কেন ভ্রমিতেছি তাহা পেতেম না ভাবি।

একদিন নবীন বসন্ত সমীরণে
বউ-কথা-কও যবে খুলেছে হৃদয়,
বিষাদে সুখেতে মাখা প্রশান্ত কি ভাব

প্রাণের ভিতরে যবে রয়েছে ঘুমায়ে,
দেখিনু বালিকা এক, নির্ঝরের ধারে
বন ফুল তুলিতেছে আঁচল ভরিয়া !
দুপাশে কুন্তল-জাল পড়েছে এলায়ে
মুখেতে পড়েছে তার উষার কিরণ ।
কাছেতে গেলাম তার, কাঁটা বাছি ফেলি
কানন-গোলাপ তারে দিলাম তুলিয়া ।
প্রতিদিন সেইখানে আসিত দামিনী,
তুলিয়া দিতাম ফুল, শুনাতেম গান,
কহিতাম বালিকারে কতকি কাহিনী,
শুনি সে হাসিত কভু, শুনিতনা কভু,
আমি ফুল তুলে দিলে ফেলিত ছিঁড়িয়া !
ভৎর্সনার অভিনয়ে কহিত কতকি !
কভুবা ভ্রূকুটি করি রহিত বসিয়া,
হাসিতে হাসিতে কভু যাইত পলায়ে,
অলীক সরমে কভু হইত অধীর ।
কিন্তু তার ভ্রূকুটিতে, সরমে, সঙ্কোচে,
লুকানো প্রেমেরি কথা করিত প্রকাশ !
এইরূপে প্রতি উষা যাইত কাটিয়া ।
একদিন সে বালিকা না আসিত যদি
হৃদয় কেমন যেন হইত বিকল—
প্রভাত কেমন যেন যেতনা কাটিয়া—
দিন যেত অতি ধীরে নিরাশ-চরণে !
বর্ষচক্রে আর বার আসিল ফিরিয়া,
নূতন বসন্তে পুনঃ হাসিল ধরণী,
প্রভাতে অলস ভাবে, বসি তরুতলে,
দামিনীরে শুধালেম কথায় কথায়
"দামিনী, তুমি কি মোরে ভালবাস বালা ?"
অলীক-সরম-রোষে ভ্রূকুটি করিয়া
ছুটে সে পলায়ে গেল দূর বনান্তরে—
জানি না কি ভাবি পুনঃ ছুটিয়া আসিয়া
"ভালবাসি—ভালবাসি—" কহিয়া অমনি
সরমে-মাখানো মুখ লুকালো এ বুকে ।

এইরূপে দিন যেত স্বপ্ন-খেলা খেলি।
কত ক্ষুদ্র অভিমানে কাঁদিত বালিকা
কত ক্ষুদ্র কথা লয়ে হাসিত হরষে—
কিন্তু জানিতাম কি রে এই ভালবাসা
দুদিনের ছেলেখেলা আর কিছু নয়?
কে জানিত প্রভাতের নবীন কিরণে
এমন শতেক ফুল উঠেরে ফুটিয়া
প্রভাতের বায়ু সনে খেলা সাঙ্গ হলে,
আপনি শুকায়ে শেষে ঝরে পড়ে যায়—
ওই ফুলে থুয়েছিনু হৃদয়ের আশা,
ওই কুসুমের সাথে খসে পড়ে গেল!
আর কিছু কাল পরে এই দামিনীরে
যে কথা বলিয়াছিনু আজো মনে আছে।
"দামিনী, মনে কি পড়ে সে দিনের কথা?
বল দেখি কত দিন ওই মুখখানি
দেখিনি তোমার? তাই দেখিতে এসেছি!
জোছনার রাত্রে যবে বসেছি কাননে,
দুয়েকটি তারা কভু পড়িছে খসিয়া,
হতবুদ্ধি দুয়েকটি পথহারা মেঘ
অনন্ত আকাশ-রাজ্যে ভ্রমিছে কেবল,
সে নিস্তব্ধ রজনীতে হৃদয়ে যেমন
একে একে সব কথা উঠেগো জাগিয়া,
তেমনি দেখিনু যেই ওই মুখখানি
স্মৃতি-জাগরণকারী রাগিণীর মত
ওই মুখখানি তব দেখিনু যেমনি
একে একে পুরাতন সব স্মৃতিগুলি
জীবন্ত হইয়া যেন জাগিল হৃদয়ে।
মনে আছে সেই সখি আর একদিন
এমনি গম্ভীর সন্ধ্যা, এই নদীতীর,
এই খানে এই হাত ধরিয়া তোমার
কাতরে কহেছি আমি নয়নের জলে,
"বিদায় দাওগো এবে চলিনু বিদেশে,
দেখো সখি এত দিন বাসিয়াছ ভাল

দুদিন না দেখে যেন যেওনা ভুলিয়া !
সংসারের কর্ম্ম হতে অবসর লয়ে
আবার ফিরিয়া যবে আসিব দামিনি,
নব-অতিথির মত ভেবোনা আমারে
সম্ভ্রমের অভিনয় কোরোনা বালিকা !"
কিছুই উত্তর তার দিলে না তখন,
শুধু মুখপানে চেয়ে কাতর নয়নে
ভৎর্সনার অশ্রুজল করিলে বর্ষণ !
যেন এই নিদারুণ সন্দেহের মোর
অশ্রুজল ছাড়া আর নাইক উত্তর !
আবার কহিনু আমি ওই মুখ চেয়ে
"কে জানে মনের মধ্যে কি হয়েছে মোর
আশঙ্কা হতেছে যেন হৃদয়ে আমার
ওই স্নেহ-সুধা-মাখা মুখখানি তোর
এ জনমে আর বুঝি পাবনা দেখিতে।"
নীরব গম্ভীর সেই সন্ধ্যার আঁধারে
সমস্ত জগৎ যেন দিল প্রতিধ্বনি
"এ জনমে আর বুঝি পাব না দেখিতে।"
গভীর নিশীথে যথা আধ ঘুম ঘোরে
সুদূর শ্মশান হতে মরণের রব
শুনিলে হৃদয় উঠে কাঁপিয়া কেমন,
তেমনি বিজন সেই তটিনীর তীরে
একাকী আঁধারে যেন শুনিনু কি কথা
সমস্ত হৃদয় যেন উঠিল শিহরি !
আরবার কহিলাম "বিদায়—ভুলো না।"
তখন কি জানিতাম এই নদীতীরে
এই সন্ধ্যাকালে আর তোমারি সমুখে
এমনি মনের দুখে হইবে কাঁদিতে ?
তখনো আমার এই বাল্য জীবনের
প্রভাত-নীরদ হতে নব-রক্ত-রাগ
যায়নি মিলায়ে সখি, তখনো হৃদয়
মরীচিকা দেখিতেছিল দূর শূন্য-পটে !
নামিনু সংসার-ক্ষেত্রে বুঝিনু একাকী,

যাহা কিছু চাহিলাম পাইনু সকলি !
তখন ভাবিনু যাই প্রেমের ছায়ায়
এতদিনকার শ্রান্তি যাবে দূর হয়ে।
সন্ধ্যাকালে মরুভূমে পথিক যেমন
নিরখিয়া দেখে যবে সম্মুখে পশ্চাতে
সুদূরে দেখিতে পায় প্রান্ত দিগন্তের
সুবর্ণ জলদ জালে মণ্ডিত কেমন,
সে দিকে তারকাগুলি চুম্বিছে প্রান্তর,
সায়াহ্ন-বালার সেথা পূর্ণতম শোভা
কিন্তু পদতলে তার অসীম বালুকা
সারাদিন জ্বলি জ্বলি তপন কিরণে
ফেলিছে সায়াহ্নকালে জ্বলন্ত নিশ্বাস।
তেমনি এ সংসারের পথিক যাহারা
ভবিষ্যত অতীতের দিগন্তের পানে
চাহি দেখে স্বর্গ সেথা হাসিছে কেবল
পদতলে বর্ত্তমান মরুভূমি সম !
স্মৃতি আর আশা ছাড়া সত্যকার সুখ
মানুষের ভাগ্যে সখি ঘটেনাক বুঝি !
বিদেশ হইতে যবে আইসে ফিরিয়া
অতি হতভাগা যেও সেও ভাবে মনে
যারে যারে ভালবাসে সকলেই বুঝি
রহিয়াছে তার তরে আকুল-হৃদয়ে !
তেমনি কতই সখি করেছিনু আশা,
মনে মনে ভেবেছিনু কত না হরষে
দামিনী আমার বুঝি তৃষিত নয়নে
পথ পানে চেয়ে আছে আমারি আশায় !
আমি গিয়ে কব তারে হরষে কাঁদিয়া
"মুছ অশ্রুজল সখি, বহু দিন পরে
এসেছে বিদেশ হতে ললিত তোমার"
অমনি দামিনী বুঝি আহ্লাদে উথলি
নীরব অশ্রুর জলে কবে কত কথা !
ফিরিয়া আসিনু যবে—একি হল জ্বালা !
কিছুতে নয়ন জল নারি সামালিতে !

ফের' ফের' চাহিও না এ আঁখির পানে,
প্রাণে বাজে অশ্রুজল দেখাতে তোমায়
জেনো গো রমণি, জেনো, এত দিন পরে
কাঁদিয়া প্রণয় ভিক্ষা করিতে আসিনি,
এ অশ্রু দুঃখের অশ্রু—এ নহে ভিক্ষার !
কখনো কখনো সখি অন্য মনে যবে
সুবিজন বাতায়নে রয়েছ বসিয়া
সম্মুখে যেতেছে দেখা বিজন প্রান্তর
হেথা হোথা দুয়েকটি বিচ্ছিন্ন কুটীর—
হুহু করি বহিতেছে যমুনার বায়ু—
তখন কি সে দিনের দুয়েকটি কথা
সহসা মনের মধ্যে উঠে না জাগিয়া ?
কখন যে জাগি উঠে পার না জানিতে !
দূরতম রাখালের বাঁশিস্বর সম
কভু কভু দুয়েকটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুর
অতি মৃদু পশিতেছে শ্রবণ বিবরে ;
আধ জেগে আধ ঘুমে স্বপ্ন আধ-ভোলা—
তেমনি কি সে দিনের দুয়েকটি কথা
সহসা মনের মধ্যে উঠে না জাগিয়া ?
স্মৃতির নির্ঝর হতে অলক্ষ্যে গোপনে,
পথহারা দুয়েকটি অশ্রুবারিধারা
সহসা পড়ে না ঝরি নেত্র প্রান্ত হতে,
পড়িছে কি না পড়িছে পার না জানিতে !
একাকী বিজনে কভু অন্য মনে যবে
বসে থাকি, কত কি যে আইসে ভাবনা,
সহসা মুহূর্ত্ত পরে লভিয়া চেতন
কি কথা ভাবিতেছিনু নাহি পড়ে মনে
অথচ মনের মধ্যে বিষণ্ণ কি ভাব
কেমন আঁধার করি রহে যেন চাপি,
হৃদয়ের সেই ভাবে কখন কি সখি
সে দিনের কোন ছায়া পড়ে না স্মরণে ?
ছেলেবেলাকার কোন বন্ধুর মরণ
স্মরিলে যেমন লাগে হৃদয়ে আঘাত,

তেমনি কি সখি কভু মনে নাহি হয়
সে সকল দিন কেন গেল গো চলিয়া
যে দিন এ জন্মে আর আসিবে না ফিরি!
পুরাতন বন্ধু তারা, কত কাল আহা
খেলা করিয়াছি মোরা তাহাদের সাথে,
কত সুখে হাসিয়াছি দুঃখে কাঁদিয়াছি
সে সকল সুখ দুঃখ হাসি কান্না লয়ে
মিশাইয়া গেল তারা আঁধার অতীতে।

* * *

চলিনু দামিনী পুনঃ চলিনু বিদেশে—
ভাবিলাম একবার দেখিব মুখানি
একবার শুনাইব মরমের ব্যথা,
তাই আসিয়াছি সখি, এ জনমে আর
আসিব না দিতে তব শান্তিতে ব্যাঘাত,
এ জন্মের তরে সখি কহ একবার
একটি স্নেহের বাণী অভাগার পরে
ভ্রমিয়া বেড়াব যবে সুদূর বিদেশে
সে কথার প্রতিধ্বনি বাজিবে হৃদয়ে।"

থাম স্মৃতি—থাম তুমি, থাম এইখানে
সমুখে তোমার ওকি দৃশ্য মর্ম্মভেদী?
মালতী আমার সেই প্রাণের ভগিনী,
শৈশব কালের মোর খেলাবার সাথী,
যৌবন কালের মোর আশ্রয়ের ছায়া,
প্রতি দুঃখ প্রতি সুখ প্রতি মনোভাব
যার কাছে না বলিলে বুক যেত ফেটে,
সেই সে মালতী মোর হয়েছে বিধবা!
আপনার দুঃখে মগ্ন স্বার্থপর আমি
ভাল করে পারিনু না করিতে সান্ত্বনা।
নিজের চোখের জলে অন্ধ এ নয়নে
পরের চোখের জল পেনুনা দেখিতে।
ছেলেবেলাকার সেই পুরাণো কুটীরে
হাসিতে হাসিতে এল মালতী আমার

সে হাসির চেয়ে ভাল তীব্র অশ্রুজল !
কে জানিত সে হাসির অন্তরে অন্তরে
কাল-রাত্রি অন্ধকার রয়েছে লুকায়ে !
একদিনো বলে নি সে কোন দুঃখ কথা,
একদিনো কাঁদে নি সে সমুখে আমার !
জানি জানি মালতী সে স্বর্গের দেবতা !
নিজের প্রাণের বহ্নি করিয়া গোপন,
পরের চোখের জল দিত সে মুছায়ে।
ছেলেবেলাকার সেই হাসিটি তাহার
সমস্ত আনন তার রাখিত উজ্জ্বলি
কত না করিত যত্ন করিত সান্ত্বনা।
হাসিতে হাসিতে কত করিত আদর !
কিন্তু হা শ্মশানে যথা চাঁদের জোছনা
শ্মশানের ভীষণতা বাড়ায় দ্বিগুণ—
মালতীর সেই হাসি দেখিয়া তেমনি
নিজের এ হৃদয়ের ভগ্ন-অবশেষ
দ্বিগুণ পড়িত যেন নয়নে আমার !
তাহার আদর পেয়ে ভুলিনু যাতনা,
কিন্তু হায় দেখি নাই, বিজন শয্যায়
কত দিন কাঁদিয়াছে মালতী গোপনে !
সে যখন দেখিত, তাহার বাল্যসখা
দিনে দিনে অবসাদে হইছে মলিন,
দিনে দিনে মন তার যেতেছে ভাঙ্গিয়া
তখন আকুলা বালা রাত্রে একাকিনী
কাঁদিয়া দেবতা কাছে করেছে প্রার্থনা—
বালিকার অশ্রুময় সে প্রার্থনা গুলি
আর কেহ শুনে নাই অন্তর্যামী ছাড়া !
দেখি নাই কত রাত্রি একাকিনী গিয়া
যমুনার তীরে বসি কাঁদিত বিরলে !
একাকিনী কেঁদে কেঁদে হইত প্রভাত,
এলোথেলো কেশপাশে পড়িত শিশির,
চাহিয়া রহিত উষা ম্লান মুখপানে !

বিষময়, বহ্নিময়, বজ্রময় প্রেম,
এ স্নেহের কাছে তুই ঢাক্ মুখ ঢাক্।
তুই মরণের কীট, জীবনের রাহু,
সৌন্দর্য্য-কুসুম-বনে তুই দাবানল,
হৃদয়ের রোগ তুই, প্রাণের মাঝারে
সতত রাখিস্ তুই পিপাসা পুষিয়া,
ভুজঙ্গ বাহুর পাকে মর্ম্ম জড়াইয়া
কেবলি ফেলিস্ তুই বিষাক্ত নিশ্বাস,
আগ্নেয় নিশ্বাসে তোর জলিয়া জলিয়া
হৃদয়ে ফুটিতে থাকে তপ্ত রক্তস্রোত !
জরজর কলেবর, আবেশে অসাড়,
শিথিল শিরার গ্রন্থি, অচেতন প্রাণ,
স্খলিত জড়িত বাণী, অবশ নয়ন,
আশা ও নিরাশা পাকে ঘুরিছে হৃদয়,
ঘুরিছে চোখের পরে জগৎ সংসার !
এই প্রেম, এই বিষ, বজ্র-হুতাশন
কবে রে পৃথিবী হতে যাবে দূর হয়ে !
আয় স্নেহ, আয় তোর স্নিগ্ধ-সুধা ঢালি
এ জলন্ত বহ্নিরাশি দেরে নিবাইয়া !
অগ্নিময় বৃশ্চিকের আলিঙ্গন হতে,
সুধাসিক্ত কোলে তোর তুলেনে তুলেনে !
প্রেম-ধুমকেতু ওই উঠেছে আকাশে,
ঝলসি দিতেছে হায় যৌবনের আঁখি,
কোথা তুমি ধ্রুবতারা ওঠ একবার,
ঢাল এ জলন্ত নেত্রে স্নিগ্ধ-মৃদু-জ্যোতি !
তুমি সুধা, তুমি ছায়া, তুমি জ্যোৎস্নাধারা,
তুমি স্রোতস্বিনী, তুমি উষার বাতাস,
তুমি হাসি, তুমি আশা, মৃদু অশ্রুজল,
এস তুমি এ প্রেমেরে দাও নিভাইয়া !
একটি মালতী যার আছে এ সংসারে
সহস্র দামিনী তার ধূলিমুষ্টি নয় !

ক্রমশঃ হৃদয় মোর এল শান্ত হয়ে

যন্ত্রণা বিষাদে আসি হ'ল পরিণত।
নিস্তরঙ্গ সরসীর প্রশান্ত হৃদয়ে
নিশীথের শান্ত বায়ু ভ্রমেগো যখন,
এত শান্ত এত মৃদু পদক্ষেপ তার
একটি চরণচিহ্ন পড়েনা সরসে,
তেমনি প্রশান্ত হৃদে প্রশান্ত বিষাদ
ফেলিতে লাগিল ধীরে মৃদুল নিঃশ্বাস!
নিরখিয়া নিদারুণ ঝটিকার মাঝে
হাসিময় শান্ত সেই মালতী কুসুমে
ক্রমশঃ হৃদয় মোর এল শান্ত হয়ে।
কিন্তু হায় কে জানিত সেই হাসিময়
সুকুমার ফুলটির মর্ম্মের মাঝারে
মরণের কীট পশি করিতেছে ক্ষয়!
হইল প্রফুল্লতর মুখখানি তার,
হইল প্রশান্ততর হাসিটি তাহার;
দিবা যবে যায় যায়, হাসিময় মেঘে
দূর আঁধারের মুখ করয়ে উজ্জ্বল—
এ হাসি তেমনি হাসি কে জানিত তাহা!
একদা পূর্ণিমারাত্রে নিস্তব্ধ গভীর
মুখ পানে চেয়ে বালা, হাত ধরি মোর
কহিল মৃদুলস্বরে—যাই তবে ভাই!—
কোথা গেলি—কোথা গেলি মালতী আমার
অভাগা ভ্রাতারে তোর রাখিয়া হেথায়!
দুঃখের কণ্টকময় সংসারের পথে
মালতী, কে লয়ে যাবে হাত ধরি মোর?
সংসারের ধ্রুবতারা ডুবিল আমার।
তেমন পূর্ণিমা রাত্রি দেখিনি কখনো,
পৃথিবী ঘুমাইতেছে শান্ত জোছনায়;
কহিনু পাগল হয়ে—রাক্ষসী-পৃথিবী
এত রূপ তোরে কভু সাজেনা সাজেনা!

মালতী শুকায়ে গেল, সুবাস তাহার
এখনো রয়েছে কিন্তু ভরিয়া কুটীর।

তাহার মনের ছায়া এখনো যেনরে
সে কুটীরে শান্তিরসে রেখেছে ডুবায়ে !
সে শান্ত প্রতিমা মম মনের মন্দির
রেখেছে পবিত্র করি রেখেছে উজ্জ্বলি !

—

কবিতাগুলির পাদটীকায় যেখানে 'অন্যান্য সংস্করণ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে বুঝতে হবে অন্যান্য যে যে সংস্করণে প্রাসঙ্গিক কবিতাটি আছে। কোন্ সংস্করণে কোন্ কবিতা বর্জিত হয়েছে তা সূচনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

কবিতাগুলির ছত্র- ও স্তবক-বিন্যাসে রবীন্দ্র-রচনাবলীর বিশ্বভারতী-সংস্করণের প্রথম মুদ্রণ অনুসৃত হয়েছে। পাদটীকায় উল্লিখিত কবিতাংশের ছত্রবিন্যাসে, ঐ টীকায় যে-সংস্করণ প্রথমে উল্লেখ আছে, তার অনুসরণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ছত্র- ও স্তবক-বিন্যাস সকল সংস্করণে এক নয় অর্থাৎ একই কবিতার পাঠ বিভিন্ন সংস্করণে এক থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছত্রসংখ্যার তারতম্য ঘটেছে।

কবিতাগুলির বিভিন্ন সংস্করণের পাঠে যতিচিহ্নের পরিবর্তন উল্লেখ করা হয় নি।

স্পষ্টতঃই যা মুদ্রণপ্রমাদ সাধারণতঃ পাদটীকায় তার উল্লেখ করা হয় নি। তবে মুদ্রণপ্রমাদের ফলে শব্দটি যেখানে কোনো অর্থবোধক স্বতন্ত্র একটি শব্দে পরিণত হয়েছে সেখানে তার উল্লেখ করা হয়েছে।

কাব্যে পাঠান্তর

শ্রীঅমলেন্দু বসু

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে একদা এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্য-সমিতির অধিবেশনে শেক্‌স্‌পীয়র-গ্রন্থাবলীর পাঠভেদ-সমস্যা সম্বন্ধে জনৈক বিদ্বান আলোচনা শুরু করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে যদিও আঠারো শতকে অনেক খ্যাতিমান পণ্ডিত শেক্‌স্‌পীয়র-গ্রন্থাবলীর সম্পাদনা করেছিলেন ও তদুপলক্ষে নিজ নিজ বিচারসংগত পাঠ নির্ণয় করেছিলেন,

অশুদ্ধিসংশোধন

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৭২	৩	২২শ	২২টি
৩৭৪	৫	হৃদয়ে করিছে আলিঙ্গন[৫]	হৃদয়ে[৫] করিছে আলিঙ্গন
৩৭৫	২	অন্ধকার[১৩]	অন্ধকার[১৬]
৩৭৬	১৫	কাব্যগ্রন্থে	কাব্যগ্রন্থ
৩৭৮	২৩	এর	এই
৩৯৬	১১	নিয়ে	দিয়ে
৩৯৬	৩২	শুধু	শুধু
৩৯৮	২৮	ঘুমা।[৬]	ঘুমা।[৩]
৪২৩	১৫ ছত্রের পর		৪৫ ছত্রের পাঠ—পাণ্ডুলিপিতে 'হোয়েছিল পত্রহীন' স্থলে আর-একটি পাঠও দৃষ্ট হয়— 'হোতে খোয়েছে পল্লব।'
৪৩০	৩৩	লভিনু	লভিল
৪৩১	১৯	আমি	আজি
৪৩৪	২২	সন্ধ্যাসঙ্গীতে	সন্ধ্যাসঙ্গীত
৪৩৪	২৬	কাব্যগ্রন্থ[২]	কাব্যগ্রন্থ[৩]

রচিত কয়েকটি ছত্রে—

Dig in thy deep dark prison, O miner ! and finding be thankful ;
Though unpolished by thee, unto thee unseen in perfection,

While thou art eating black bread in the poisonous air of thy cavern,
Far away glitters the gem on the peerless neck of a Princess.

ভিক্টরীয় কবি ক্লাফ-এর কয়েকটি ছত্র। খনির নীচুতলায় কাজ করছে যারা তাদের স্বেদাক্ত কর্মের সার্থকতা কোথায়? অনেক বিষাক্ত বায়ু সেবনের পরে তারা একটি পাথরের টুকরো পায়, সে-পাথরের সংস্কারবিদ্যা তাদের জানা নেই, তারা শুধু অ-সংস্কৃত পাথর খুঁড়ে পেয়েই খালাস, কিন্তু এই পাথরটি যখন কুশলী মণিকারের হাতে রূপান্তরিত হয়ে কোনও তন্বী রাজকন্যার মর্মরসিত কণ্ঠে শোভা পায়, তখন তাদের শ্রম সার্থক। অনেকের ধারণায় রাজকন্যার সঙ্গে তুলনীয় কাব্যরসবিলাসী অভিজাত সমালোচক, খনিকর্মীর সঙ্গে তুলনীয় পুঁথিকর্মী, সম্পাদনকর্মী।

আমাদের এই জাত-মানা দেশে সমালোচকরাও নীচু জাতে ও উঁচু জাতে বিভক্ত হবেন সেটা আশ্চর্য নয় কিন্তু এই ভেদবোধ অলীক, অগ্রাহ্য, আত্মঘাতী। ইওরোপের শ্রেষ্ঠ সমালোচকমাত্রেই আলোচ্য সাহিত্যের পাঠশুদ্ধি সম্বন্ধে সচেতন থেকেছেন। ডক্টর জন্‌সন্‌ শেক্‌স্‌পীয়র-গ্রন্থাবলী সম্পাদনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং সম্পাদকীয় ভূমিকা-প্রবন্ধে পাঠসংস্কার বিষয়ে যে-সব মূলনীতি উপস্থাপিত করেছিলেন সেগুলি আজও টেক্‌স্‌চুয়ল্‌ ক্রিটিসিজ্‌ম্‌-এর— পাঠকেন্দ্রিক সমালোচনার— মূলনীতি বলে স্বীকৃত। অনুরূপ সম্পাদকীয় অধ্যবসায় ও আত্মশাসন কোল্‌রিজের অসংযমী স্বভাবে সম্ভব ছিল না কিন্তু তবুও শেক্‌স্‌পীয়রের পাঠশুদ্ধি বিষয়ে তাঁর অনেক বিবেচনা সর্বজনশ্রদ্ধার্হ। ব্র্যাড্‌লি, গ্রীয়র্সন্‌, মিড্‌ল্‌টন্‌ মারি, এলিয়ট, লীভিস, সকলেই পাঠকেন্দ্রিক সমালোচনার মূল্য অসংকোচে মেনেছেন। (আমি কেবল ইংরেজ সমালোচকদের উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত থাকছি, অনুরূপ উদাহরণ যে ফরাসী, জার্মান, ইতালীয় সাহিত্যের ইতিহাসেও মিলবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।) যদি কোনো সমালোচক-যশঃপ্রার্থী পাঠকেন্দ্রিক আলোচনা সম্বন্ধে উন্নাসিক থেকেও থাকেন, তাঁর সমালোচনা অন্তিম বিচারে স্থায়ী হয় নি কেননা এহেন সমালোচনা আসলে পল্লবগ্রাহী আত্মাশ্রয়ী আপ্তবাক্য মাত্র। সাহিত্য-সমালোচনার কারয়িত্রী দায়িত্ব বিস্মৃত হওয়া সকলের পক্ষেই বিপৎসংকুল। সত্য বটে কারয়িত্রী সমালোচনার পশ্চাতে বিদ্যমান নান্দনিক তত্ত্ব ও নীতি কিন্তু নিছক তত্ত্ব ও নীতি সাহিত্য-সমালোচনার আওতার বাইরে চলে যায়, চলে যায় দর্শনবিদ্যার কোনো কোনো অধ্যায়ে। পক্ষান্তরে তত্ত্বজ্ঞ ও নীতিজ্ঞ হওয়ার পরেও সাহিত্য-সমালোচক কখনো ভুলতে পারেন না যে the play's the thing, the poem's the thing (নাটকটিই আসল জিনিস, কবিতাটিই আসল জিনিস), কাব্যবিশেষ ও নাটকবিশেষের অনুধ্যান থেকেই তাঁর সমালোচনা উৎসারিত। অতএব মূল্যবিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে তাঁকে স্থির জানতে হবে আলোচ্য কবিতা বা নাটকের যে পাঠ তিনি পেয়েছেন তা খাঁটি কি না। নির্ভরযোগ্য পাঠেই যে সংগত সমালোচনার বুনিয়াদ সে কথার স্পষ্টীকরণের জন্য শেক্‌স্‌পীয়রের "পঞ্চম হেন্‌রি" নাটক থেকে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। এই নাটকে স্যর জন্‌ ফল্‌স্টাফের মৃত্যু বর্ণিত হচ্ছে।—

Nay, sure, he's not in hell: he's in Arthur's bosom, if ever man went to Arthur's bosom. A' made a finer end, and went away an it had been any christom child; a' parted even just between twelve and one, even at the turning o' the tide: for after I saw him fumble with the sheets and play with flowers and smile upon his fingers' end, I knew there was but one way; for his nose was as sharp as a pen, and a' babbled of green fields.

—*Henry V*, II, iii, Hostess

এই উদ্ধৃতির শেষ বাক্যাংশটি লক্ষ্য করুন, 'his nose was as sharp' ইত্যাদি, বিশেষতঃ 'a' babbled of green fields'। মৃত্যুপথযাত্রী ফল্‌স্টাফের হাড়-জিরজিরে শরীরের ছবি পাই একটি যথাযথ উপমায়—তার নাক হয়ে গিয়েছিল কলমের মতো তীক্ষ্ণ। (বিশেষ ক'রে নাকের উল্লেখ কেন? কারণ, বিখ্যাত প্রাচীন বৈদ্য হিপোক্রেটিস মরণোন্মুখ ব্যক্তির যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে নাকের তীক্ষ্ণতার কথা বিশেষ করে উল্লিখিত হয়েছে। এ জাতীয় বর্ণনা মধ্যযুগীয় ইওরোপে এত বহুলপ্রচার লাভ করেছিল যে সাধারণ লোকেও মৃত্যুর বর্ণনায় এ-সব উপমা প্রয়োগ করত যদিও তারা জানত না উপমাগুলি প্রথমে কে বা কারা ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু 'কলম' কেন? অন্য এক বিখ্যাত বৈদ্য গালেন মরণোন্মুখ ব্যক্তির বর্ণনায় একটি শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন যার উচ্চারণসাদৃশ্যে মনে করা যায় যে শব্দটি quill, অর্থাৎ কলম। অতএব উপরের উদ্ধৃতির বর্ণনাকারিণী বলছেন, তার নাক হয়ে গিয়েছিল কলমের মতো তীক্ষ্ণ।) এর পরের বাক্যাংশটি শেক্‌স্‌পীয়র-পাঠশুদ্ধির সর্বোজ্জ্বল উদাহরণ। ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ফোলিও সংস্করণে বাক্যাংশটি ছিল, and a table of green fields, যার বিশেষ গ্রহণযোগ্য মানে হয় না। হয়তো অতি ক্লিষ্ট মানে একটা কিছু খাড়া করা যায়, করা গেছেও, এই শতকেও করা গেছে, কিন্তু সেই ক্লিষ্ট মানে এই হৃদয়স্পর্শী বর্ণনার অন্য অংশগুলির সঙ্গে সুসংগত নয়। বেশ কিছুকাল পর্যন্ত পাঠকগণ a table of green fields এই পাঠে অস্বস্তিবোধ করতেন, পাঠটি সহজবোধ্য অথবা আদৌ বোধগম্য মনে হত না, পাঠকের অনুমান হত এই কথাটির আড়ালে কোথায় যেন একটা সুসংগত অভিধা হারিয়ে গেছে। এমন সময় আঠারো-শতকী শেক্‌স্‌পীয়র-সম্পাদক টিবল্‌ড্‌ এই পাঠটির সংস্কার করলেন, বললেন a table হবে না, হবে a' babld, অর্থাৎ (আধুনিক বানানে) a' (=he) babbled। শেক্‌স্‌পীয়রের যুগে যে-হস্তলিপি প্রচলিত ছিল তাতে b ও t, d ও e দেখতে প্রায় একই রকমের ছিল, সুতরাং একটু জড়ানো লেখা পুঁথি দেখে ছাপতে গিয়ে মুদ্রাকরের কিঞ্চিৎ প্রমাদ হওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়। সংস্কার-কৃত কথাটির মানে চমৎকার মিলে যায় সম্পূর্ণ বাক্যবন্ধটির সঙ্গে, তা ছাড়া কথাটি নিজগুণেই সুন্দর অর্থবহ কেননা মরণোন্মুখ ব্যক্তি babble করবেন, এলোমেলো বকবেন, এ তো প্রত্যাশিত ব্যাপার। টিবল্‌ড্‌ সহৃদয়

অনুমানে যে বাক্য-পরিবর্তন করেছিলেন, বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান-প্রণালীতে দেখা গেছে যে সে অনুমান সত্য।

শেক্‌স্‌পীয়র থেকেই আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি, 'হ্যাম্‌লেট' নাটক থেকে। হ্যাম্‌লেটের একটি বিখ্যাত স্বগতোক্তি শুরু হয়েছে এইভাবে—

O, that this too too solid flesh would melt,
Thaw, and resolve itself into a dew !

যদিও দু-একজন সম্পাদক solid কথাটিতে রাজকুমার হ্যাম্‌লেটের মেদবহুল দেহের আভাস পেয়েছেন, তাঁদের হাস্যকর ভাষ্য ছেড়ে দেওয়ার পরে solid কথাটির সুসংগত মানে পাওয়া যায় কি? মানে হবে নিশ্চয় রূপকাশ্রিত মানে, কিন্তু মেদ কোন্ অর্থে কঠিন? দ্বিতীয় ছত্রের dew ও প্রথম ছত্রের solid flesh, এই দুইয়ে বিপরীতার্থ জ্ঞান করলে – একটা কঠিন স্থূল শরীরী অস্তিত্ব যেন আলগোছে রূপান্বিত হয়ে গেল একটা অনির্দিষ্ট-অবয়ব তরলতায়; গ্লানি-লাঞ্ছিত দেহের সীমা ছাড়িয়ে ক্ষুব্ধ মানবাত্মা অসীমের অভিসারী হল; — এমন মানে করলে solid কথাটি গ্রাহ্য হতে পারে, তবুও একটু সংশয় থেকে যায়, মেদ কী অর্থে তরলিত হতে পারে? কিন্তু কথাটি যে solid সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত কি? এই পাঠরূপ আমরা পেয়েছি ১৬২৩ সনের ফোলিও সংস্করণে। এই সংস্করণের পূর্বে প্রকাশিত প্রথম কোয়ার্টো সংস্করণে (১৬০৩) পাচ্ছি too much griev'd and sallied, দ্বিতীয় কোয়ার্টো সংস্করণে (১৬০৪) পাচ্ছি too too sallied। এ ক্ষেত্রে sallied শব্দটি খুবই সংগত— বিক্ষুব্ধ, লাঞ্ছিত, এই অর্থে। কিন্তু ইদানীংকার কোনো কোনো পুঁথিজ্ঞানী অনুমান করছেন যে ফোলিওতে যে solid শব্দটি আছে ওটি আসলে sulid = sullied, মানে কলঙ্কিত, কুরঞ্জিত। (সে যুগের হস্তাক্ষরে u ও o এই দুটি অক্ষরে বিভ্রমাত্মক সাদৃশ্য হতে পারত যেমন আজকাল u ও n, m ও w, এ সব জোড়া অক্ষরে বিভ্রম হতে পারে।) পরের ছত্রের সঙ্গে এই শব্দটির সংগতি পাওয়া যায়—কলঙ্ক-রঞ্জিত মেদ গ'লে তরলিত হোক, অর্থাৎ মেদ = কঠিন বরফ। (শীতপ্রধান দেশে রাস্তায় জমা তুষার পথযাত্রীর পায়ে পায়ে বিশ্রী একটা ম্লান বিকৃত বর্ণ ধারণ করে; গলে গিয়েই, জলধারায় পরিবর্তিত হলে পরেই, তার মুক্তি, তার সুস্থ অস্তিত্ব।) এ মানেও সুন্দর, এখানেও বাক্‌প্রতিমাটি সহজে সমগ্র পটভূমির সঙ্গে মিলেছে। তিনটি মানেই যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তা হলে প্রশ্ন হচ্ছে আমি সম্পাদক হিসেবে অথবা সাধারণ পাঠক হিসেবেই কোন্ পাঠটি গ্রহণ করব? কোন্‌টিকে শেক্‌স্‌পীয়রের মূল পাঠ বলে গণ্য করব?— এ প্রশ্ন নিঃসংশয়েই গুরুভার প্রশ্ন, এমন প্রশ্ন যা কোনো সবিবেকী সম্পাদক অথবা পাঠক এড়াতে পারেন না। এই ছত্র দুইটি নাটকটির অতীব মূল্যবান অংশের অংশ, এখানে অভিধা অস্পষ্ট থাকলে মূল্যবান অংশটিরও অভিধা অস্পষ্ট থাকবে, ফলে সমগ্র নাটকটি সম্বন্ধে আমাদের সমালোচকীয় সম্বুদ্ধি ও উপভোগ ব্যাহত ও অসম্পূর্ণ থাকবে।

অতএব সিদ্ধান্ত যে শিল্পভোগধর্মী সমালোচনা বলে কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ সাহিত্যকৃতি

সম্ভব নয়, নিছক কাব্যরসবিলাস অবাস্তব ও অলীক, ভোগধর্মী আলোচনা ও পাঠকেন্দ্রিক আলোচনা নিবিড়ভাবে পরস্পর-সংপৃক্ত। পাঠকেন্দ্রিক আলোচনায় শুদ্ধ পাঠ যখন নির্ণীত হল, তখন (তার পূর্বে নয়) রসভোগের কাল। পক্ষান্তরে রসবোধ না থাকলে লেখকের চিন্তা ও প্রকাশ-পারম্পর্যের সঙ্গে একাত্ম হওয়া যাবে না, আর তা না হলে শুদ্ধ পাঠনির্ণয়ের মননশক্তিও থাকবে না। শুদ্ধ পাঠনির্ণয়ে যে কতটা সহৃদয় মননশক্তির আবশ্যক সে কথা উপরের শেক্‌স্‌পীয়র-পাঠ দুইটির বিশ্লেষণে নিশ্চয় যথেষ্ট প্রকট হয়েছে।

২

শুদ্ধ পাঠনির্ণয় তা হলে নেহাৎ the dull duty of an editor নয়, (যেমন বলেছিলেন ইংরেজ কবি পোপ্‌ যাঁর নিজ সম্পাদকীয় কৃতিত্ব নিন্দনীয় নয়) সম্পাদকের কর্ম নীরস নয়, এ কর্ম অখণ্ড সমালোচনা-কর্মেরই একটি শাখা।

কিন্তু পাঠান্তর-সমস্যা আদৌ উদ্ভূত হয় কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর আর-একটি প্রশ্নের উত্তরে নিহিত। যে পাঠ আমাদের অধ্যয়নবস্তু তার মূল কোথায়, সে পাঠ যে শুদ্ধ অন্ততঃ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য তার প্রমাণ কোথায়?

যে কবিতাটি আমার অধ্যয়নবস্তু সেটি হয়তো কবি মুখে মুখে রচনা করেছিলেন। বিশেষতঃ তিনি যদি প্রাচীনকালের কবি হয়ে থাকেন অথবা নিজে লিখন-পঠনক্ষম না হয়ে থাকেন (অথবা যে অনগ্রসর সমাজে তাঁর বাস সেখানে যদি লিখন-পঠনের পদ্ধতি অজ্ঞাত বা অপ্রচলিত থেকে থাকে), তা হলে তাঁর রচনাটি মুখে মুখেই চলতে থাকবে যতদিন-না কেউ ওটিকে লিপিতে ধরে রাখেন। বস্তুতঃ অনেক প্রাচীন সমাজের সাহিত্য, অনেক অপ্রাচীন অথচ অনগ্রসর সরল সমাজের সাহিত্য, মৌখিক প্রকাশেই সীমাবদ্ধ, অনেক ক্ষেত্রে তার কোনো লিখিত রূপের অস্তিত্বই ঘটে নি সমসময়ে। (হয়তো পরবর্তীকালে কেউ মৌখিক রূপটিকে লিখিত রূপ দিয়ে থাকবেন)। কাব্যজগতের একটি বিশাল অংশ 'অরাল ট্র্যাডিশন্‌'-এর, মৌখিক পরম্পরার অন্তর্গত। ইওরোপীয় ব্যালাডগুলি, আমাদের ভাষায় বাউল গান ও ছড়াগুলি, এই মৌখিক পরম্পরার নিদর্শন। যেহেতু এক পুরুষ-পর্যায় থেকে অন্য পুরুষ পর্যায়ে এই-সব রচনা মুখে মুখেই চলে এসেছে, এমন সম্ভব (সম্ভব কেন, প্রায় নিশ্চিত) যে রচনাগুলির আদি রূপটি কালক্রমে অল্পবিস্তর পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। ব্যালাড ও ছড়াগুলির বিভিন্ন পাঠ এই পরিবর্তনে উৎপন্ন। ব্যালাড ও ছড়াগুলি তো বস্তুতঃ বিশেষ কোনো লেখক-মানসের ধারক নয়, মুখে মুখে ঘুরে ফিরে সেগুলির অনন্য ব্যক্তিকতা লোপ পেয়ে যায় (গোড়াতে হয়তো মাত্র একজন অথবা দু-তিনজন লেখকের অনন্য মানস রচনাটিতে বিধৃত ছিল), এ-সব পদ্যরচনায় সমাজ-মানসের অথবা গোষ্ঠী-মানসের প্রতিচ্ছবি। যতদিন-না লিপিবদ্ধ হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এ-সব পদ্যের পাঠ পরিবর্তনশীল, পরিবর্তন-সম্ভব। যখন লিপিবদ্ধ হয়ে গেল তখন পদ্যটির পাঠ (অন্ততঃ বিশেষ একটি

পাঠ) যেন শিলীভূত হয়ে গেল। যে লিপিকার যে পাঠটি পেয়েছেন তিনি সেটিকেই লিপিতে ধরেছেন। এ ভাবে আলাদা আলাদা লিপিকারের পাঠে প্রভেদ উৎপন্ন হয়, একই ব্যালাডে বা ছড়ায় (বা অন্য কোনো রচনায়) পাঠ-তারতম্য প্রকট হয় যদিও প্রত্যেক লিপিকারই নিষ্ঠার সহিত একটি বিশেষ পাঠ লিপিবদ্ধ করেছেন।

পাঠ-তারতম্যের অন্য কারণও হতে পারে। অনুমান করা যাক যে দুজন লিপিকার একই সময়ে একই বাউলের গান শুনলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতধ্বনির লিপিকরণে প্রবৃত্ত হলেন। গানের লিপিকৃত দুই রূপে প্রভেদ থাকা খুবই স্বাভাবিক। উচ্চারিত বাক্যগুলি খুবই সম্ভবতঃ দুজন লিপিকারের কানে এক ধ্বনি বহন করে নি, যৎ শ্রুতং তল্লিখিতং, যিনি যেমন শুনেছেন তিনি তেমন লিখেছেন। যেকালে বানানও শিলীভূত হয় নি (ইংরেজি লিপিতে তো ডক্টর জনসনের বিখ্যাত অভিধানের আগে পর্যন্ত বানান ছিল বহুরূপী), পৃথক পৃথক লিপিতে একই পাঠের পৃথক পৃথক বানান থাকত আর কালে এই বানান-বৈষম্যই নানাপ্রকার পাঠপ্রমাদ ও পাঠসংশয় সৃষ্টি করত। শ্রুতিবৈষম্য থেকে যে বানান-বৈষম্য ও ধ্বনিবৈষম্য, ধ্বনিবৈষম্য থেকে যে শব্দবৈষম্য অর্থাৎ পাঠবৈষম্য হতে পারে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ অবশ্য সর্বদেশীয় মৌখিক ধারাবাহী লোকসাহিত্যে মেলে, তা ছাড়া এই বৈষম্যপ্রবণতা আধুনিক (অর্থাৎ লিখিত ও সযত্নে মুদ্রিত) সাহিত্যেও কখনো কখনো লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি একদা স্যার ওয়ালটার স্কট ওয়র্ডস্বোয়র্থের একটি ছত্র ('ইয়ারো ভিজিটেড্' নামক কবিতা থেকে) এইভাবে উদ্ধৃত করেছিলেন: "A softness chill and holy"। মূলে আছে still and holy। কবি বড়ই মর্মাহত হয়েছিলেন কেননা যদিচ chill ও still দুটিই সমধ্বনি শব্দ, সুতরাং একের পরিবর্তে অন্যের প্রয়োগে ছন্দের কোনো বিকৃতিসাধন হয় না তবুও শীতল ও পবিত্র এই দুটি শব্দে কবির ঈপ্সিত ভাবসংগতি রক্ষিত হয় নি, শীতল ও নিথর এই দুটি শব্দ বিনিময়-শব্দ নয়। বলা যেতে পারে, এটি মাত্র ক্ষীণস্মৃতির দৃষ্টান্ত, ঠিক পাঠ-সমস্যার নয়, তা হলে আর-একটি দৃষ্টান্ত বিবেচনা করুন। আমার ইস্কুল-জীবনে একদা কোথাও সংগীত-আসরে একটি গান শুনেছিলাম, 'রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি বেলাশেষের তান'। গানটি কার রচনা জানতাম না, দু-তিন বছর পরে জেনেছিলাম। কিন্তু গানটি নিশ্চয় সাধারণ জনসমাজেও আদর পেয়েছিল কেননা আমার প্রথম শোনার অনতিপরেই ঢাকা শহরের গাড়িওয়ালা এবং শাঁখারির মুখে গানটির এই পাঠ শুনেছি—

রাজপুরীতে বাজায় বংশী দিনের শ্যাষের তান

... ...

ঘরে আমার রাইখবার লাগে বহুত লোকের মন
বহুত বংশী বহুত হাঁসি বহুত পিরজন।

ঢাকাই 'কুটনি'র উচ্চারণ শুধু বানানের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় না কিন্তু স্থানীয় উচ্চারণের দিকে নির্দেশ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। পাঠান্তর কয়টি লক্ষ্য করার বিষয়।

"পিরজন" মানে সত্যিই 'প্রিয়জন' শব্দটি না মূল 'আয়োজনে'র পরিবর্তে 'প্রয়োজন' শব্দের বিকৃত রূপ তা জানি না। নেহাৎ রবীন্দ্রনাথের গান বলে এহেন পাঠান্তর স্থায়ী হতে পারে নি কিন্তু এই প্রণালীতেই মুদ্রণপূর্ব যুগের অসংখ্য গান ও কবিতার পাঠান্তর সংসাধিত হয়েছে।

যে-ক্ষেত্রে মূল রচনাটি স্বয়ং প্রবহমান, পরিবর্তনশীল, অ-স্থির, সে ক্ষেত্রে পাঠবৈচিত্র্য অবধারিত।

চলমান লোকসাহিত্যের কথা ছেড়ে দিলে বিশেষ লেখকের নিঃসংশয় ব্যক্তিত্বধারক রচনায়ও অনুরূপ কারণে পাঠবৈচিত্র্য উৎপন্ন হতে পারে। ইংরেজ কবি ডান্‌-এর দৃষ্টান্ত বিবেচনা করুন। তাঁর গ্রন্থ 'পোয়েম্‌স্‌' প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর দুই বৎসর পরে, ১৬৩৩ সনে। এ গ্রন্থের অন্তর্গত অধিকাংশ কবিতা— বিশেষতঃ প্রেমের কবিতাগুলি, কয়েকটি এপিগ্রাম, এলিজি ও স্যাটায়ার— এই প্রথম মুদ্রিতাকারে প্রকাশ পেল যদিও ত্রিশ বছর আগেই এসব কবিতা লণ্ডনের শিক্ষিত সাহিত্যানুরাগী উচ্চমধ্যবিত্ত তরুণ-সমাজে খুবই চালু ছিল। কেউ কেউ হয়তো সরাইখানার চতুর বাক্‌পটু আড্ডায় কোনো কবিতার আবৃত্তি শুনে চট্‌ করে লিখে রাখলেন এবং কিছুকাল পরে শ্রুত কবিতার লিপিকৃত রূপ দিয়ে আস্ত একটি পাণ্ডুলিপিই ভরে ফেললেন। (রানী প্রথম এলিজাবেথের কালে অনেক কবিতাই পাণ্ডুলিপির রূপে চালু থাকত বৎসরের পরে বৎসর।) কবি ডান্‌-এর জীবদ্দশায় এ-সব কবিতা ছাপা হয় নি যদিও একাধিক পাণ্ডুলিপিতে বিধৃত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে যখন ছাপা হল, তখন একটি পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেই ছাপা হল বটে কিন্তু আজকের সম্পাদক ও বিদ্বান দেখছেন যে মুদ্রিত পাঠে ও অন্যান্য পাণ্ডুলিপির পাঠে অনেক প্রভেদ, কখনো কখনো মস্ত প্রভেদ। এইভাবে পাঠান্তর-সমস্যা কাব্য-উপভোগের পথে কণ্টক হয়ে দাঁড়ায়। পাণ্ডুলিপি থেকে এবং পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে যে সংস্করণ মুদ্রিত তা থেকে নিঃসংশয়ে বুঝতে পারা যায় না যে কবির রচনাটি ঠিক কী ছিল, যে সংস্করণ বা পাণ্ডুলিপি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত সেটিতে কবির শিল্পভাবনার বাণীমূর্তি নিখুঁত কিনা অথবা বিকৃত হলে কোথায় কেন কতটা বিকৃত।

প্রমাদ গুরুতর হওয়ার বেশি সম্ভাবনা যে-ক্ষেত্রে আলোচ্য রচনাদির মূলরূপ কোনো পুঁথি থেকে পাওয়া গেছে। পুঁথি হতে পারে জীর্ণ, খণ্ডিত, কীটদষ্ট; হস্তলিপি দুর্বোধ্য হতে পারে, দু-তিনটি অক্ষরের লিখন-সাদৃশ্য বিভ্রমজনক হতে পারে। যদি পুঁথি মাত্র একটিই পাওয়া গিয়ে থাকে তা হলে, শুদ্ধ পাঠ লাভের পথে বিঘ্ন যতটা নিশ্চয়তাও ততই। প্রাচীন ইংরেজি কাব্যের যে-সব আকর গ্রন্থ আমাদের কাছে এসেছে— এগ্‌জিটার গ্রন্থ, ভারচেলি গ্রন্থ,কটন্‌-পুঁথিমালা ইত্যাদি— সেগুলি যার যার বিধৃত কাব্যের একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ আকর, পুঁথি কয়েকটি ছাড়া এ-সব কাব্যের অন্য কোনো মূল নেই। চর্যাপদের মূল পুঁথি একটিই, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূল পাঠও একটিমাত্র পুঁথিতেই সীমাবদ্ধ। এ-সব অনন্যমূল কাব্যের

সুবিধা যে পাঠভেদ সংক্রান্ত যা কিছু সমস্যা ও সংশয় তা একটি পুঁথিতেই সীমিত, যদি সেই একটি পুঁথির পাঠ সুষ্ঠুভাবে নির্ণীত হয়ে যায় তা হলে নিখুঁত পাঠ সম্পর্কে কোনো আশঙ্কা থাকে না। নিখুঁত পাঠ লাভের যা কিছু বিঘ্ন তা ঐ একটি পুঁথিতেই সম্পূর্ণ। অপর পক্ষে এই অনন্যমূল পুঁথির অসুবিধা যে সংশয়সংকুল স্থলে অন্য পাঠের সঙ্গে তুলনা করার সুযোগ পাওয়া যায় না, অবস্থাটা নেহাৎই hit or miss, নিখুঁত পাঠ পেলাম তো পেলাম, নতুবা চিরতরেই হারিয়ে ফেললাম।

ইংরেজি সাহিত্যে প্রাচীন পুঁথি আর আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা এখন কম। যতরকম সম্ভব পুঁথির আশ্রয়স্থল খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে, অকৃপণভাবে শ্রম নিষ্ঠা অর্থ উৎসর্গীকৃত হয়েছে, এখনকার দিনে বড়জোর বার্ট্রাম্ ডবেল্-এর মতো অধ্যবসায়ী কাব্যপ্রেমিক টমাস্ ট্র্যাহার্নের কিছু অপ্রকাশিত কাব্যের পাণ্ডুলিপি খুঁজে পেতে পারেন (১৯০৮ সনে পাওয়া গিয়েছিল যদিও ট্র্যাহার্ন মারা গিয়েছিলেন ১৬৭৪ সনে) অথবা অকস্মাৎ ওয়েল্‌সের অথবা উত্তর-স্কট্‌ল্যাণ্ডের কোনো দুর্গম গ্রামস্থ সম্প্রতি ঐশ্বর্যরিক্ত প্রাচীন ভূস্বামীর গৃহে দু-চারটি মধ্যযুগীয় নাটকের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যেতে পারে। তুলনায় বাংলা সাহিত্যের পুঁথিসন্ধান এখনো গোড়ার পর্যায়ে চলেছে বলে মনে হয়, বিশেষতঃ মনে হয় যখন দেখি আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে কত ব্যাদিত ছেদ। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও মৈমনসিংহ গীতিকা মাত্র সেদিনের আবিষ্কার ; আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কবিদের সম্বন্ধে আমাদের তথ্যসমাহার এখনো কত অনিশ্চিত ; প্যালিওগ্রাফি (প্রাচীন লিপি-পাঠবিদ্যা) ও প্রাচীন ভাষাজ্ঞান এখনো কত দুর্লভ ; প্রাচীন পুঁথিপাঠে আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রশ্মির ব্যবহার, প্রাচীন কাগজ ও কালী বিচারে আধুনিক রসায়নবিজ্ঞানের ব্যবহার কত অপটু। এতাবৎ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ যা কিছু হয়েছে, নিতান্তই কোনো কোনো সাহিত্যপ্রেমীর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একক চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে। এখন সময় এসেছে কোনও সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান অথবা শক্তিশালী বিদ্যায়তনের তরফ থেকে তন্নিষ্ঠ অনুসন্ধান চালাতে হবে কেননা খণ্ডিত বাংলাদেশে দুষ্প্রাপ্য পুথি কোথায় যে কোন্ খণ্ডে লুকিয়ে গেল তা জানা দুঃসাধ্য। তা ছাড়া বাংলাদেশের আর্দ্র আবহাওয়ায় বাঙালীর আয়ুর মতো পুঁথির আয়ুও হ্রস্ব। ক্রতক্ষয়শীল গ্রামগুলিতে যদি বা দু-চারটি পুঁথি এখনো থেকে থাকে, আর কতকাল থাকবে বলা কঠিন। ঢাকায় বাংলা অ্যাকাডেমিতে পূর্ববঙ্গীয় পুঁথি সংগ্রহের মূল্যবান কাজ অগ্রসর হচ্ছে।

কিন্তু পুঁথিসংগ্রহকালে পুঁথি খাঁটি না ভেজাল সে বিষয়ে অবহিত হতে হবে। প্রায় বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্বে কোনো কোনো মাসিক পত্রিকায় এক তর্কযুদ্ধ চলেছিল, বাংলার কুলপঞ্জীগুলি নির্ভরযোগ্য ইতিহাস-আকর কিনা। সেকালে অনেক খ্যাতনামা তীক্ষ্ণসন্ধানী ইতিহাসবিদের কাছে শুনেছিলাম, কোনো কোনো ঘটক কীভাবে প্রাচীন হস্তাক্ষরের অনুকরণ ক'রে লিখিত পুঁথিটিকে নানা প্রক্রিয়ায় তিন-চারশো বছরের পুরানো পুঁথি বলে চালিয়ে থাকেন। সাহিত্যিক জালিয়াতির বহু দৃষ্টান্ত বিদেশে পাওয়া যায়। দু-একটির

উল্লেখ করছি। আঠারো শতকের ইংরেজ কবি চ্যাটার্টনের দৃষ্টান্ত বোধ হয় বহুজন-পরিচিত। চ্যাটার্টন্ কিছু কবিতা প্রকাশ করেছিলেন, আসলে সেগুলি স্বরচিত, কিন্তু সেগুলিকে তিনি এক পুরানো পুঁথিতে পাওয়া প্রাচীন ইংরেজি ভাষায় (অর্থাৎ মিড্‌ল্ ইংলিশে) লেখা কবিতা বলে চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। সত্যিকারের মিড্‌ল্ ইংলিশ জানার মতো শিক্ষা ও বিদ্যা চ্যাটার্টনের ছিল না, তিনি শুধু কিছু আপাত-প্রাচীন বানান ও শব্দরূপের প্রয়োগ করেছিলেন, আর জগৎকে এই বলে ভাঁওতা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন যে পুঁথিখানি তিনি স্বগ্রামস্থ গির্জার প্রাচীন কাগজপত্রের মধ্যে পেয়েছিলেন। হরেস্ ওয়ল্‌পোল্ ও অন্যান্য জনকয়েক কাব্যানুরাগী যদিও শুরুতে এই আবিষ্কারের দাবীতে উৎসাহিত হয়েছিলেন, বিদ্বান বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণে এই জালিয়াতি অচিরেই ধরা পড়ে এবং মর্মাহত নিঃসম্বল অথচ প্রতিভাশালী তরুণ কবির জীবনান্ত হয়। আর-একজন জালিয়াত ছিলেন উইলিয়ম হেনরি আয়ার্ল্যাণ্ড (১৭৭৭-১৮৩৫)। ইনি উকিলের কেরানী ছিলেন, সেই সুযোগে কিছু দলিল-দস্তাবেজ জাল করেন এবং সেগুলি শেক্‌স্‌পীয়র-সংক্রান্ত বলে চালাবার চেষ্টা করলেন। ক্রমে তাঁর সাহস বাড়ল, তিনি বললেন দুটি নাটকও আবিষ্কার করেছেন, সেগুলি শেক্‌স্‌পীয়র-রচিত।—এ জোচ্চুরি বিশেষজ্ঞদের হাতে ধরা পড়ল এবং ক্রমে আয়ার্ল্যাণ্ড অপরাধ স্বীকারও করলেন। ইদানীংকার সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত গ্রন্থ-প্রবঞ্চক ছিলেন টমাস জেম্‌স্ ওয়াইজ। এঁর পুস্তক-সংগ্রহ ছিল এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ। বহু দুষ্প্রাপ্য মুদ্রিত গ্রন্থ পত্রপত্রিকা এঁর সংগ্রহশালায় ছিল এবং যে-কোনো ইংরেজ লেখকের প্রথম ও দুষ্প্রাপ্য সংস্করণ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ওয়াইজের মতামত এমনই মর্যাদা লাভ করেছিল যে আজ থেকে কয়েক বৎসর পূর্বে অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ওঁকে এম. এ. ডিগ্রীতে ভূষিত করেন। কিন্তু ১৯৩৪ সনে জন্ কার্টার ও গ্রেহাম পলার্ড নামক দুই ভদ্রলোক "অ্যান্ এনকোয়ারি ইন্‌টু দি নেচার অব্ সার্টেন নাইনটিন্‌থ সেঞ্চুরি প্যাম্‌ফ্‌লেট্‌স্" নামক গ্রন্থে প্রমাণ করেন যে শ্রীযুক্ত ওয়াইজ-বর্ণিত অনেক দুর্লভ সংস্করণ বস্তুতঃ জাল এবং এই জালিয়াতিতে তিনি সাহায্য ও সমর্থন পেয়েছিলেন অন্য দুজন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের কাছ থেকে— মরিস্ বাক্‌স্‌টন্ ফর্মান (যিনি কীট্‌সের পত্রাবলী ও কবিতাবলী সম্পাদনা করে যশোলাভ করেছিলেন) ও স্যর এড্‌মণ্ড গস্ (কবি, লেখক, ঐতিহাসিক)। শ্রীযুক্ত ওয়াইজের জালকরণ প্রণালীর একটি উদাহরণ দিই। ইংরেজ কবি-দম্পতি রবর্ট ও এলিজাবেথ ব্রাউনিং ১৮৪৬ সনের শেষভাগে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন, তার পরেই দুজনে ইতালীতে চলে যান, সেখান থেকে ১৮৫০ সনে মিসেস ব্রাউনিংয়ের অনবদ্য প্রেমকাব্য, 'সনেট্‌স্ ফ্রম দি পর্টুগীজ' নামক সনেটগুচ্ছ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই ঘটনার দীর্ঘকাল পরে, যখন ব্রাউনিং-দম্পতির কেউই জীবিত নেই, শ্রীযুক্ত ওয়াইজ বললেন যে উক্ত সনেটগুচ্ছ ১৮৫০-এর পূর্বেই ১৮৪৭ সনে প্রকাশিত হয়েছিল, তবে এই প্রথম সংস্করণ গোপনে ছাপা হয়েছিল, কবিবন্ধু মিসেস মেরী রাসেল মিট্‌ফোর্ডের ব্যবস্থায় যাতে কিনা অল্প কয়েকটি মুদ্রিত কপি শুধু অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবকে

বিলি করা যায় ; এটি যেন সীমিত খাস-সংস্করণ, জনসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট আম-সংস্করণ নয়। (এ হেন সীমিত খাস-সংস্করণ সে যুগে সুপ্রচলিত ছিল। টেনিসনের 'ইন মেমরিয়ম্' এ হেন সংস্করণের উদাহরণ, টেনিসনের আরেকটি কাব্য 'দি লাভার্স টেল্' সর্বজনের জন্য প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৯ সনে, যদিও কাব্যটির দীর্ঘতম অংশ রচিত হয়েছিল ১৮২৮ সনে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে, এবং তা ছাড়া ১৮৩৩ ও ১৮৬৮ সনে দুটি সীমিত খাস-সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছিল বন্ধুসমাজে বিলির জন্য।)

শ্রীযুক্ত ওয়াইজ-বর্ণিত ১৮৪৭ সনের তথাকথিত সংস্করণটি (যেটি আসলে ওয়াইজ জাল করে ছেপেছিলেন) চড়া দামে বিক্রী হয়ে গেল। কিন্তু ১৯৩৪ সনে কার্টার ও পলার্ড প্রমাণ করলেন যে তথাকথিত আদি সংস্করণটি যে কাগজে ছাপা হয়েছে সে কাগজ মিসেস্ ব্রাউনিংয়ের জীবৎকালে তৈরি হত না (এই প্রমাণ রসায়নবিত্তার সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে), এই তথাকথিত সংস্করণে এমন কয়েকটি হরফ ব্যবহৃত হয়েছে যা কিনা হরফ-নির্মাতা ক্লে কোম্পানি ১৮৯০ সনের পূর্বে আদৌ নির্মাণ করেন নি। এই দুটি বড় যুক্তি এবং অন্যান্য ছোটখাটো যুক্তির অরোধ্য আঘাতে শ্রীযুক্ত ওয়াইজের প্রবঞ্চনা প্রকট হয়ে পড়ল।

এই দু-চারটি দৃষ্টান্ত থেকে খানিকটা অনুমান করা যেতে পারে যে বহু ভেজাল-বর্ণিত এ সংসারে সাহিত্যগ্রন্থেও ভেজাল ও খাঁটির তারতম্য বিদ্যমান। এবং সংসারের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, সাহিত্যক্ষেত্রেও তেমনি বিচক্ষণ ব্যক্তি ভেজাল বর্জন করে খাঁটি বস্তুটি বাছাই করে নেবেন। গ্রন্থের ভেজালত্ব প্রমাণ করতে হলে আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক কৌশল জানতে হয়,তা ছাড়া সতর্ক ভাষাজ্ঞান ও সর্বোপরি সূক্ষ্ম শিল্পবোধ না থাকলে কেবল কানুনমাফিক বিশ্লেষণ অকৃতকার্য হতে পারে। বলা বাহুল্য যে খাঁটি ও ভেজাল, এই দুটি কথা আমি গ্রন্থের সাহিত্যরস সম্পর্কে প্রয়োগ করছি না, গ্রন্থটি যে-লেখকের, যে-কালের, যে-ভাবধারার বলে' দাবী পেশ করা হয়েছে, সে দাবী গ্রাহ্য কিনা, অর্থাৎ গ্রন্থটির যা পরিচয় সেটি তা-ই কিনা, এই প্রমাণেই জানা যাবে গ্রন্থটি খাঁটি না ভেজাল, যে পাঠ আমার কাছে সরবরাহ করা হয়েছে সে-পাঠ শুদ্ধ না বিকৃত, যে-কাব্যানন্দ আমি উপভোগ করছি এই পাঠের নির্ভরে, সে-আনন্দ স্থায়ী না অলীক। গ্রন্থের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা-বিচারের পদ্ধতি পুঁথিতে ও মুদ্রিত গ্রন্থে অনেকটা পৃথক যদিও মূলনীতিগুলি একই ধরণের। যিনি কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেন অথবা যিনি কাব্যালোচনায় নিছক আনন্দের প্রত্যাশী, তাঁদের দুজনকেই গ্রন্থের শুদ্ধতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হবে এবং যদিও আলোচকের পক্ষে স্বয়ং শুদ্ধতা-নির্ণয়ে লিপ্ত হওয়া সম্ভব না হতে পারে, সৎ সম্পাদকের পক্ষে এ কার্য অবশ্যম্ভাব্য। সমগ্র গ্রন্থের শুদ্ধতা নির্ণয় করতে হবে, আর যদি গ্রন্থটি খাঁটি বলে ধরা যায় তা হলেও অংশবিশেষে পাঠান্তর বিদ্যমান কিনা, বিদ্যমান থাকলে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ collate করতে হবে অর্থাৎ একত্র করে তাদের তুলনা করতে হবে যাতে এই তুলনাভিত্তিক বিশ্লেষণে শুদ্ধ অথবা শুদ্ধতর-সম্ভব পাঠ আমাদের আয়ত্ত হয়।

৩

শুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ের পথে যে বিচিত্র জটিলতা তার কিছু আভাস দেওয়া হয়েছে উপরের অনুচ্ছেদে। মূলগ্রন্থ বা গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করতে হবে। মূল হয়তো লেখকের স্বহস্তলিপি (holograph) অথবা লিপিকারকের হস্তলিপি, হয়তো একাধিক লিপিকারকের একাধিক হস্তলিপি। অতএব সমকালীন হস্তলিপি অধ্যয়ন করতে হবে। বাংলা সাহিত্যে এ-সব কাজ তেমন কিছু হয়েছে বলে জানিনে—আমার অজ্ঞতা হওয়াই সম্ভব—কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রের তিন পৃষ্ঠাব্যাপী স্বহস্তলিপির ও অন্যান্য ষোড়শ শতকী ইংরেজদের স্বহস্তলিপির ভিত্তিতে যে তথ্যপূর্ণ, যুক্তিপূর্ণ, আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রশ্মি-পরীক্ষিত লিপিবিদ্যা গড়ে উঠেছে, অথবা ষোড়শ শতকেরও অনেক আগেকার মধ্যযুগীয় মিড্‌ল্ ইংলিশের বহু ডায়ালেক্‌ট্ বা আঞ্চলিক উপভাষার এবং ওল্‌ড্ ইংলিশের লিপিবিদ্যা গড়ে উঠেছে, তেমন নির্ভরযোগ্য বিস্তৃত, সম্পূর্ণ, আধুনিক-জ্ঞানসম্মত বঙ্গলিপিবিদ্যা আমাদের ভাষায়ই বা গড়ে উঠবে না কেন? পুঁথিপাঠোদ্ধার অতীব কুশলী বিদ্যা। যিনি প্রাচীন সাহিত্যের পাঠ নির্ণয় করবেন তাঁর সন্ধানলক্ষ্য হবে পুঁথি, যিনি মুদ্রণোত্তর যুগের সাহিত্যচর্চায় নিযুক্ত তিনি অন্বেষণ করবেন মুদ্রিত পুস্তক। দুই অন্বেষণ এক ধরণের নয়, দুই সন্ধানে লক্ষ্যে প্রণালীতে কিছু তারতম্য আছে, কিন্তু দু রকম সন্ধানেরই প্রথম কথা—সাহিত্যবস্তুগুলি সংগ্রহ করতে হবে। এই সাহিত্যবস্তুগুলির মধ্যে, মুদ্রণোত্তর যুগে, আমরা অন্তর্ভুক্ত করব: ক. মূল পাণ্ডুলিপি, খ. ছাপাখানায় দেওয়া কপি, এবং গ. সম্ভব হলে প্রুফ কপি, বিশেষতঃ যদি রচয়িতা স্বয়ং প্রুফ দেখে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের দেখা কিছু প্রুফ সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। মুদ্রণকালে সংগত পাঠ সম্বন্ধে রচয়িতা হয়তো কিছু আলোচনা করে থাকতে পারেন; আলোচনা বাচনিক হয়ে থাকলে অবশ্য আমাদের লাভ নেই কেননা সে-আলোচনা নিশ্চয় ফনোগ্রাফে বা টেপ্-রেকর্ডে ধরে রাখা হয় নি; কিন্তু কবি যদি এ বিষয়ে পত্র ব্যবহার করে থাকেন (যথা কীট্‌স্, জেরার্ড ম্যান্‌লি হপ্‌কিন্‌স্, রবীন্দ্রনাথ) তা হলে সেই পত্রগুলিকেও গ্রন্থপ্রমাণ বলব। ছাপাখানায় দেওয়া কপি, ন্যায় প্রুফও যখন সম্পাদকের উপাদান, তখন অবশ্য ছাপাখানার রীতিনীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হতে হবে। সে-সব রীতিনীতি কালে কালে বদলায়, আবার ছাপাখানা থেকে ছাপাখানায় তার তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। এমন কি প্রত্যেক কম্পোজিটরের, প্রত্যেক প্রুফ-পাঠকেরও কিছু খামখেয়াল কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এবং পুঁথিলিপিকারদের লিপিবৈশিষ্ট্য যেমন অধ্যয়নের বিষয়, ছাপাখানার খামখেয়ালও তেমনি অবর্জনীয় তথ্য। এ কালের শ্রেষ্ঠ শেক্‌স্‌পীয়র-সম্পাদক ডোভার উইল্‌সন্ বলেছেন, 'We can at times creep into the compositor's skin and catch glimpses of the MS. through his eyes. The door of Shakespeare's workshop stands ajar.' ('কখনো কখনো আমরা যেন শুঁড়ি মেরে কম্পোজিটরের চামড়ার তলায় ঢুকে যেতে পারি আর তখন তার চোখ দিয়ে পাণ্ডুলিপির চকিত দর্শন পেতে পারি।

শেক্‌স্‌পীয়রের কর্মশালার দুয়ার খুলে যায়।') অনেক সময় মুদ্রিত পুস্তকে ভুল থেকে গেছে কেননা ছাপাখানায় যে 'কপি' দেওয়া হয়েছিল ভুল তাতেই ছিল, ছাপাখানার ভূত আসলে 'কপি'-কারকের ভূত!

এই সংগ্রহ-কাজ অবশ্য, শুদ্ধ বিচারে, সাহিত্যিক নয় কেননা এ কাজ দালাল ও চর লাগিয়েই সম্পন্ন হতে পারে, হয়ও। দীনেশচন্দ্র সেন ও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু লোক মারফত অনেক পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাধিকারী আমেরিকান ক্রোড়পতি শ্রীযুক্ত ফল্‌জার সারা দুনিয়ায় চর লাগিয়ে তাঁর আশ্চর্য লাইব্রেরি গড়েছিলেন। দালাল ও চর লাগিয়ে কাজ হাসিল করা নিরাপদ নয় কেননা দেখা গেছে দালালরা (বিদেশে দেখা গেছে, এ দেশেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দালালরা বিশ্বাসযোগ্য ছিল না) দুনো মুনাফার লোভে ভেজাল মাল চালাতে পারে।

পুঁথি ও গ্রন্থ সংগৃহীত হওয়ার পরে শুরু হবে আসল সম্পাদনকর্ম। সম্পাদনকর্মের উদ্দেশ্য মূল রচনার আদর্শ-রূপ (archetype) স্থির করা। সে উদ্দেশ্য সাধনার্থে সম্পাদক যাবতীয় পুঁথি ও পুস্তক একত্র করে স্থির করবেন কোন্‌টি কোন্ সনে লিপিকৃত বা মুদ্রিত হয়েছিল; পুঁথিতে পুঁথিতে ও পুস্তকে পুস্তকে পাঠভেদগুলি (তুচ্ছতম ভেদগুলিও বাদ যাবে না) লক্ষ্য করবেন; কোথায় কোন্ অক্ষর বা শব্দ বাদ পড়েছে, বিকৃত হয়েছে, কাটাকুটি করা হয়েছে, স্থানান্তরিত হয়েছে বা পরিবর্তিত হয়েছে, তার সম্পূর্ণ হিসাব রাখবেন। এ কাজ বিব্লিঅগ্রাফির কাজ, বলতে পারি কেতাব-শুমারির কাজ। দৃশ্যতঃ এ কাজেরও সাহিত্যিক বা শৈল্পিক মূল্য বিশেষ নেই কিন্তু বিচক্ষণতার সহিত দেখলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ কাজের মূল্য হৃদয়ংগম হবে। যখন দেখি চসরের 'ক্যাণ্টারবেরি টেল্‌স্' এবং ল্যাংল্যাণ্ডের 'পিয়র্স প্লাউম্যান'-এর অনেকগুলি পুঁথি পাওয়া গেছে (যথাক্রমে ৮৩টি ও ৬০টি) সমকালে ও পরবর্তী এক শতকে লেখা, তখন প্রমাণ পাই যে গ্রন্থ দুটি পাঠকসমাজে ক্রমান্বয়েই সমাদর পেয়েছে। শেক্‌স্‌পীয়রের মৃত্যুর সত্তর বৎসরের মধ্যে চার-চারটি সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী-সংস্করণ বেরিয়ে গেল অথচ তাঁর সমকালীন অনেক লেখকদের রচনার অনুরূপ গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হল না; বায়রনের কাব্যগ্রন্থগুলি ও টেনিসনের 'ইন্ মেমরিয়ম' পুনঃপুনঃ মুদ্রিত হয়েছিল; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশের দু' সপ্তাহের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়েছিল—এ-সব তথ্যে সংশ্লিষ্ট লেখকদের জনপ্রিয়তা প্রমাণ হয় আর নিঃসংশয়েই জনপ্রিয়তা সাহিত্যমূল্যের একটি মস্ত বিচার্য অংশ। কেতাব-শুমারির অন্য মূল্য দৃষ্টান্ত দিয়ে পেশ করি। শেক্‌স্‌পীয়রের কোনো কোনো নাটক তাঁর জীবৎকালেই কোয়র্টো সাইজে মুদ্রিত হয়েছিল, অতএব (সহজ বিচারে) এই মুদ্রণগুলির অথরিটি বা প্রতিপত্তি প্রচুর। শেক্‌স্‌পীয়রের মৃত্যু হয় ১৬১৬ সনে, ১৬২৩ সনে প্রথম সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয় ফোলিও সাইজে। কোয়র্টোতে ও ফোলিওতে বিস্তর পাঠভেদ বিদ্যমান এবং দীর্ঘকাল যাবৎ সমস্যা চলেছে যে, কোন্ পাঠ অধিক গ্রাহ্য, যে পাঠ লেখকের জীবৎকালে প্রকাশিত হয়েছিল, না, যে পাঠ তাঁরে

কি জানি কোন্ মূলের নির্ভরে প্রকাশ করেছিলেন? এই অনিশ্চিত অবস্থায় বর্তমান শতকে শ্রীযুক্ত পলার্ড প্রমাণ করলেন যে কতকগুলি কোয়র্টোতে যদিও তারিখ দেওয়া আছে শেক্স্পীয়রের মৃত্যুর পূর্বের, তবুও আসলে সেগুলি ছাপা হয়েছিল মৃত্যুর পরে, ১৬১৯ সনে, যে-বৎসর সমগ্র রচনাবলী প্রকাশের উদ্যম হয়েছিল, কিছু নাটক ছাপা হয়েছিল, তার পরে নানা কারণে সে উদ্যম ছিন্ন হয় কিন্তু মুদ্রিত নাটক কয়টিকে আগেকার তারিখ লাগিয়ে জীবৎকালীন সংস্করণ বলে চালানো হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে কয়েকটি কোয়র্টো হীন গ্রন্থ, আবার অন্য কয়েকটি কোয়র্টো খুবই সম্ভবতঃ শেক্স্পীয়রের মূল পাণ্ডুলিপি থেকেই ছাপা হয়েছিল। পলার্ডের প্রমাণের ভিত্তি কেতাব-শুমারির নানা সূক্ষ্ম তথ্য, বিশেষতঃ কাগজের মার্কা ও ব্যবহৃত হরফগুলির বৈশিষ্ট্য। পলার্ডের এই প্রমাণে নাটক কয়টির রচনা-তারিখ সম্বন্ধে বিভ্রমের নিরসন হয়েছে, ফলে শেক্স্পীয়র-প্রতিভার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিচ্ছন্নতর হয়েছে।

এর পরে সম্পাদক পুঁথি ও পুস্তকগুলিকে স্তরান্বিত করবেন। সব কয়টি সংস্করণেরই মূল্য একই স্তরের নয়। আদর্শপাঠ প্রস্তাবকালে সমধিক গ্রাহ্যতার হিসাবে পুস্তকগুলি স্তরবিন্যস্ত হবে এবং উর্ধ্বস্তরের পাঠ অবশ্যই নিম্নস্তরের পাঠের চেয়ে বেশি প্রতিপত্তি পাবে। অনেক পুঁথি ও মুদ্রিত সংস্করণ হয়তো কোনো পূর্বগ পুঁথি বা সংস্করণের হুবহু নকল মাত্র, যায় ভুলচুক সুদ্ধ। এ-সব নকলের মূল্য তুচ্ছ।

এভাবে সম্পাদনকর্মের প্রথম অধ্যায়ে তিনটি পর্যায় আমরা পেরিয়ে এলাম: collection, collation, classification—সংগ্রহ, তুলনা, স্তরায়ন। (class বলতে আমরা সচরাচর বুঝি শ্রেণী, কিন্তু শ্রেণী কথাটিতে গুণ ও মর্যাদাসূচক সেই উচ্চাবচতার ধারণা পাই না যেমন পাই স্তর কথাটিতে।) সংগৃহীত সংস্করণগুলির যেন একটা বংশপঞ্জী তৈরি করা হল, কোন্ সংস্করণ আদিম আদর্শ গ্রন্থের নিকটতম ধারাবাহক, কোন্ সংস্করণই বা জারজ বা দূরান্বিত সে সমস্যার নিরসন হল। এখন যাবতীয় পুঁথির বা সংস্করণের বা পুনর্মুদ্রণের সাবধানী তুলনায় সম্পাদক একটি আদর্শ মূলগ্রন্থ প্রস্তুত করবেন, এ গ্রন্থের অস্তিত্ব নেই কিন্তু যদি অবিকৃত মূল গ্রন্থ আবিষ্কৃত হত তা হলে তার পাঠ ও সম্পাদক-কৃত আদর্শ গ্রন্থের পাঠ অভিন্ন হত। ইওরোপীয় পাঠকেন্দ্রিক আলোচনায় এই কাজের নাম 'রিসেন্‌শন্', বাংলায় বলতে পারি (গ্রন্থের) পুনর্বিন্যাস।

কোনো গ্রন্থের অনেকগুলি মুদ্রিত সংস্করণ থাকলে কোন্ সংস্করণটির অথরিটি বা প্রতিপত্তি সর্বাধিক হবে? এককালে Editio Princeps বা প্রথম সংস্করণের প্রতিপত্তি ছিল সর্বাধিক। দুর্লভ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ অবশ্য চড়া দামে বিক্রয় হয় সাহিত্যিক কারণে ততটা নয় যতটা দুর্লভতা ও বাজারদরের সম্পর্ক বিষয়ে ধনবিজ্ঞানের নীতি অনুসারে। (আমার সামনে লণ্ডনের ড'সন্ কোম্পানির ১২৪নং পুস্তক তালিকা আছে, তাতে দেখতে পাচ্ছি রাস্কিনের 'অন্ দি ওল্ড্ রোড্', ১৮৮৫ সনে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের দাম ধরা হয়েছে ১০০ পাউণ্ড; ক্লেমঁ মারো'-সম্পাদিত ১৫২৬ সনে প্রকাশিত সিওন্ ছ

লরিস্‌ ও জাঁ দ্য মেঁয়ো প্রণীত লা রোমাঁ দ্য লা রোজ-এর দাম ধরা হয়েছে ২৭৫ পাউণ্ড। এ রকম চড়া দামের প্রধান কারণ এ-সব গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য।) কিন্তু প্রথম সংস্করণ শ্রেষ্ঠ সংস্করণ না হতে পারে, অধিক ক্ষেত্রেই নয়, সেজন্য আজকাল (অক্‌স্‌ফোর্ডের অধ্যাপক চ্যাপম্যানের ভাষায়) 'the most authoritative edition is the last published in the author's lifetime', অর্থাৎ যাবতীয় সংস্করণের মধ্যে সর্বাধিক প্রতিপত্তিশালী হচ্ছে লেখকের জীবৎকালে প্রকাশিত সর্বশেষ সংস্করণ। কিন্তু এ বিষয়েও মুশকিল আছে। সর্বশেষ সংস্করণেই যে কবির পরিণততম শিল্প তেমন না-ও হতে পারে; প্রবীণ বা বৃদ্ধ বয়সের জরাশিথিল উদ্যমে হয়তো লেখক সংস্করণটিতে মনোনিবেশ করতে পারেন নি; অথবা নিজ অপরিণত রচনায় সংকোচ বোধ ক'রে তিনি হয়তো আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। (দ্রষ্টব্য 'সঞ্চয়িতা' ১৩৬৬ পুনর্মুদ্রণ, ৮৫৯ পৃষ্ঠাতে গ্রন্থপরিচয়ে 'পরিচয়' কবিতাটি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে শিশুতে গৃহীত ও সঞ্চয়িতায় সংকলিত পাঠ এতই ভিন্ন যে এদের পৃথক কবিতাও বলা চলে)।

আদর্শ পাঠ অথবা শ্রেষ্ঠ সংস্করণ সম্বন্ধে ইদানীংকার পণ্ডিতেরা, দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে, সংশয়ী হয়েছেন। এই সংশয় অবশ্য খাটে প্রাচীন গ্রন্থ সম্বন্ধে অথবা যে-সব গ্রন্থের মূল পাণ্ডুলিপি বা ঐতিহাসিক প্রমাণরহিত সংস্করণ পাওয়া যায় না সে-সব গ্রন্থ সম্বন্ধে। বিগত দেড়শো দু'শো বছরের মধ্যে মুদ্রণকার্যের এতই উন্নতি হয়েছে যে সব আধুনিক গ্রন্থাদির বিচারে আদর্শ পাঠের প্রশ্ন ওঠে না। (বাংলায় সুমুদ্রিত গ্রন্থের কাল অনেক সংকীর্ণ বলে মনে হয়। সযত্নমুদ্রিত বাংলা গ্রন্থ কি বিশ্বভারতীর পূর্বে পাওয়া যায়?) ইদানীং পণ্ডিতেরা বলেন যে কল্পিত আদর্শ পাঠের সন্ধানে না ঘুরে যে সংস্করণ মনে হবে মূল রচনার নিকটতম প্রতিবেশী সেটিকেই অবলম্বন করা উচিত; এই-সঙ্গে মুখ্য পাঠান্তরগুলিও সন্নিবেশিত হওয়া দরকার। কিন্তু যদি অন্য পুঁথির বা সংস্করণের পাঠান্তরগুলি গ্রহণযোগ্য না হয় তা হলে সম্পাদক কী করবেন?—এই প্রশ্নের উত্তরে সম্পাদন-কর্মের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পৌঁছলাম। প্রথম অধ্যায়ের তিন-পর্যায়ী কর্মের উল্লেখ করেছি ইতিপূর্বে: সংগ্রহ, তুলনা, সুরায়ন— এ-সব পর্যায়ের উদ্দেশ্য একটা আদর্শ পাঠ কল্পনা করা অথবা সদৃশতম জ্ঞাতিপাঠ নির্দেশ করা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে নিজ প্রস্তাবিত পাঠ প্রস্তুতের সময় সম্পাদককে অনেক সময় নূতন পাঠ উদ্ভাবন করতে হবে কেননা চলমান অনেক পাঠই তিনি সংগত মনে করেন না। এই নূতন পাঠ উদ্ভাবনের কাজ emendation বা পাঠশোধনের কাজ।

৪

পাঠশোধনের সরলতম স্তরে সাদাসিধে মুদ্রণপ্রমাদের সংশোধন হয়ে থাকে। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতের' যে-পাঠভেদ সংকলিত হচ্ছে শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় দ্বারা তাতে দেখতে পাচ্ছি এক সংস্করণের মুদ্রণপ্রমাদ অন্য সংস্করণে সংশোধিত

হয়েছে, যথা, 'সুখের বিলাপ' : প্রথম পাঠ ছিল 'সুখে কহে নিশ্বাস ফেলিয়া,' সংশোধিত রূপ হয়েছে 'সুখ কহে নিশ্বাস ফেলিয়া'। 'সন্ধ্যা' কবিতাতে ২৪নং ছত্রটি প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণে এইরূপ : 'যেন তার কতশত, পুরান সাধের স্মৃতি'। এই ছত্রটি অন্য এক সংস্করণে ছাপা হয়েছে, 'যেন তোর কতশত'। 'তোর' শব্দটি আদৌ অর্থহীন নয় বরং সংগত অর্থই করা যায়, তবুও পৌর্বাপর্য বিবেচনায় মনে হয় 'তার' পাঠই শুদ্ধ এবং তা হলে 'তোর' পাঠ সম্ভবতঃ মুদ্রণপ্রমাদ। "দেশ" পত্রিকায় এই সংকলকদ্বয় 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটির যে-পাঠভেদ সংকলন করেছেন তাতেও সম্ভবপর মুদ্রণপ্রমাদের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যথা ১৬ ছত্রে বাসনা / বেদনা, ১০৭ ছত্রে ছিঁড়িয়া / ছুঁড়িয়া। কয়েক বৎসর হল "কবিতা" পত্রিকায় আলোচনা চলেছিল রবীন্দ্রনাথের কথাটি 'মিড-ভিক্টোরীয় যুগবর্তী' না 'মিড-ভিক্টোরীয় যুগবতী'। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুদ্রণপ্রমাদ ঠিক প্রমাদ না আপাতপ্রমাদ বলা কঠিন। কবি ইয়েট্সের বিখ্যাত কবিতা 'বিজান্টিয়ম্' থেকে কয়েকটি ছত্র তুলছি—

A starlit or a moonlit dome disdains
All that man is,
All mere complexities,
The fury and the mire of human veins.

প্রথম ছত্রের শেষ শব্দটি disdains রূপে (অধুনা এই রূপটিই স্বীকৃত) আবার distains রূপেও পাওয়া গেছে; d ও t কোন্ অক্ষরটি যে মুদ্রণপ্রমাদ, কোনো অক্ষরই যে প্রমাদ, তা বলা অসম্ভব কেননা দুই রূপেই ছত্রটির সুন্দর মানে পাওয়া যায়। অধ্যাপক চ্যাপ্‌ম্যান্ অনুরূপ দৃষ্টান্ত শেক্‌স্‌পীয়র থেকে দিয়েছেন : ফোলিওতে আছে and in one purpose অথচ কোয়ার্টোতে আছে end in one purpose, দুই রূপেই সংগত মানে পাওয়া যায় অথচ and-এর a এবং end-এর e তে মুদ্রণপ্রমাদ না ইচ্ছাকৃত অক্ষর-পরিবর্তন (কার ইচ্ছা, লেখকের না কম্পোজিটরের?) সে কথা বলার উপায় নেই।

এক সংস্করণ থেকে অন্য সংস্করণে আরো সংশোধন পাওয়া যায় যেগুলি মুদ্রণপ্রমাদ নয়, সামান্য অবয়ব-পরিবর্তন মাত্র, যথা, দীর্ঘ ঈকারের জায়গায় হ্রস্ব ইকার, মূর্ধন্য ণ-এর জায়গায় দন্ত্য ন ব্যবহৃত হওয়া; বন্ধনীচিহ্ন, কমা প্রভৃতি চিহ্নের পরিবর্তন। উদাহরণ-স্বরূপ ব্রাউনিংয়ের 'পলিন্' কাব্যের উল্লেখ করছি। এ-কাব্যের তিনটি সংস্করণ বেরিয়েছিল কবির জীবৎকালে, ১৮৩৩ সনে, ১৮৬৮ ও ১৮৮৮ সনে। দ্বিতীয় সংস্করণের সংশোধনগুলি এভাবে শ্রেণীবিভক্ত হতে পারে : ক্যাপিট্যাল বা বড়ো অক্ষর বর্জন (Winter/winter, Fancy/fancy); পৃথক পৃথক শব্দকে যুক্তশব্দ বানানো (sun treader/sun-treader, quick glancing/quick-glancing); বানান বদলানো (sate/sat, altho'/although)। প্রথম সংস্করণে ড্যাস্-চিহ্নের ছড়াছড়ি, ১০৩১ ছত্রে সম্পূর্ণ কাব্যটিতে ৩০২ বার ব্যবহৃত হয়েছে; তৃতীয় সংস্করণে কমিয়ে ৭৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণগুলিতে অবশ্য মুখ্যতর সংশোধন বহু পাওয়া যায় কিন্তু যে-সব অবয়ব-পরিবর্তনের

উল্লেখ করলাম এগুলিও নিরর্থক নয়, এগুলি থেকে কবির প্রবীণ রচনা-প্রণালী হৃদয়ংগম হয়। সম্পাদক এ-সব পরিবর্তন তুচ্ছ করবেন না, বরং প্রয়োজন হলে অনুরূপ আরো পরিবর্তন স্বয়ং করতে পারেন।

পাঠ-সংশোধনের জটিলতর পর্যায়ে পাই মূল শব্দের অবয়বী ও অভিধাগত পরিবর্তন, পুরাতন শব্দের (বা ছত্রাংশ, ছত্র, ছত্রাবলী) বর্জন, নূতন শব্দের (বা ছত্রাংশ, ছত্র, ছত্রাবলীর) প্রয়োগ। এই জটিল সংশোধনের উদ্দেশ্য কবির মূল রচনার সন্নিকট হওয়া। এ কার্যে সম্পাদকের মুখ্য অবলম্বন প্রত্যেক পাঠভেদের প্রাচীনতম নিদর্শন। ডক্টর জন্‌সনের অমূল্য উপদেশ এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় : Always turn the old text on every side, and try if there be any interstice through which light can find its way (পুরানো পাঠটি নিয়ত সবদিক থেকে নাড়াচাড়া কর, দেখ কোনো রন্ধ্রপথ পাও কিনা যেখান দিয়ে আলো প্রবেশ করতে পারে)। এই নীতি অবলম্বনে ডক্টর জন্‌সন্ স্বয়ং যে-সব সংশোধন করেছিলেন শেক্‌স্‌পীয়র-পাঠে, তার মাত্র দুটির উল্লেখ করছি। 'অ্যাণ্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপাট্রা' নাটক, ৪ অঙ্ক ১৫ দৃশ্য, ৭৩-৭৪ ছত্র :

Cleopatra. No more but e'en a woman, and commanded
By such poor passion as the maid that milks

ফোলিও-সংস্করণে ছিল (এই নাটকটির এই প্রথম সংস্করণ, পূর্বে কোনো কোয়ার্টো-সংস্করণ প্রকাশিত হয় নি) but in a woman ; জন্‌সন্ in সরিয়ে e'en বসিয়েছেন। অন্যে মূল রচনা পড়ে গেছেন, লিপিকার শুনে লিখে গেছেন, e'en শুনে in লিখেছেন, এমন হওয়া খুবই সম্ভব, এ স্থলে in-এর মানে হয় না সে কথা বিবেচনা করেন নি। জন্‌সন্-কৃত পাঠান্তরে সংগত ও সুন্দর মানে হয়েছে। মাত্র ৮ লাইন পূর্বে অ্যাণ্টনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন, তারপরেই ক্লিওপাট্রা মূর্ছা গেছেন, মূর্ছাভঙ্গের পরে বলছেন, এখন আমি আর সম্রাজ্ঞী নই, মহীয়সী নই, আমি শুধু প্রেমিকা, যে-সামান্যা শ্রমজীবী নারী প্রেমাবেগে শাসিতা আমিও তারই মতো নারী মাত্র, প্রেমিকা।—যদি শেক্‌স্‌পীয়রের মূল রচনা আমাদের করায়ত্ত থাকত তা হলে তুলনায় দেখতে পেতাম (তুলনায় বলছি কেননা এ-সব বিষয়ে যোলো আনা নিশ্চয়তা অসম্ভব) জন্‌সনের সংশোধন খাঁটি। পক্ষান্তরে আর একটি দৃষ্টান্ত বিবেচনা করুন, যেখানে জন্‌সনের সংশোধন গ্রহণ না-ও করা যায়। এই নাটকেরই পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য, ৪১-৪২ ছত্রে ক্লিওপাট্রা বলছেন :

What, of death, too,
That rids our dogs of languish ?

ফোলিওতে আছে languish— শব্দটি সচরাচর ক্রিয়াপদ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়, এখানে বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, সুতরাং জন্‌সন্ l কেটে দিয়ে anguish, বিশেষ্য শব্দ বসিয়েছেন। আধুনিক পণ্ডিত দেখিয়েছেন যে languish শব্দটির বিশেষ্য-প্রয়োগ শেক্‌স্‌পীয়রে অন্যত্র ('রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট', ১, ২, ৫০) পাওয়া যায়, এমন কি অনেক

পরবর্তী কালে কোল্‌রিজের কাব্যেও পাওয়া যায়। এবং আলোচ্য ছত্রে languish কথাটি সুপ্রযুক্ত। অতএব জন্‌সনের সংশোধন অনাবশ্যক, অগ্রাহ্য। একই নাটকের অন্য দুইটি বহুজনগ্রাহ্য সংশোধন বিবেচনা করুন।

১. a grief that smites
My very heart at root. (৫, ২, ১০৪)

কথাটি ফোলিওতে আছে suites, অসংগত-প্রযুক্ত মনে হয়। কবি পোপ প্রস্তাব করলেন shoots বসানো হোক। তাতে শুদ্ধ মানে হয় বটে কিন্তু shoots ও suites-এ চেহারার সাদৃশ্য নেই। পরে ক্যাপেল্ নামক পণ্ডিত বললেন কথাটি smites; smites ও মূল suites-এ প্রায় ষোলো আনা সাদৃশ্য এবং সহজেই অনুমান করা যায় যে কম্পোজিটরের হাতে m বদলে u হয়েছে। অতএব ক্যাপেলের সংশোধন সংগত, সুন্দর, গ্রাহ্য।

২. For his bounty,
There was no winter in't : an autumn 'twas
That grew the more by reaping : (৫, ২, ৮৬-৮৮)

পরলোকগত অ্যাণ্টনির গুণকীর্তন করছেন ক্লিওপাট্রা। ফোলিওতে ৮৭ ছত্রে আছে an Anthony 't was, তাতে পরিচ্ছন্ন বাক্-রীতি (ইডিয়ম) পাওয়া যাচ্ছে না। সংশোধক টিবল্‌ড্ বললেন কথাটি autumn; এই কথাটিতে পরবর্তী ছত্রের বাক্‌প্রতিমার সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতি বিদ্যমান, তা ছাড়া autumn ও Anthonyতে বিভ্রম হওয়া নেহাৎ অসম্ভব নয়, অতএব টিবল্‌ডের পাঠান্তর গ্রাহ্য।

প্রাচীন পুঁথির পাঠ উদ্ধার করা আদৌ সহজ নয়, বিশেষতঃ যখন সেই পুঁথি অবলম্বনে পরে অনেক দায়িত্বহীন নকল ছাপা হয়ে গিয়ে থাকে। যে-আধুনিক পণ্ডিত নানা অসুবিধা সত্ত্বেও পাঠশুদ্ধি প্রস্তাব করেন তিনি আমাদের প্রশংসার্হ যদিও তাঁর প্রস্তাব সব সময় সংশয়াতীত না হতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দিই আলাওলের 'পদ্মাবতী' থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ দ্বারা প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকা'য় (বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৯, শীত সংখ্যা ১৩৬৯) জনাব সৈয়দ আলী আহসান সাহেব জায়সীর 'পদুমাবৎ' ও আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্য দুটির সতর্ক সবিচার আলোচনান্তর 'পদ্মাবতী'র কোনো কোনো অংশের পাঠশুদ্ধি প্রস্তাব করেছেন। দু-তিনটি প্রস্তাব বিবেচনা করুন।

১. সিংহল-দ্বীপ-বর্ণন খণ্ড, ২নং স্তবক, ১২ ছত্র: পুঁথিগুলিতে পাঠ পাওয়া যায়— জমু দিপ পক্ষ আর সাকাএ সাম্বনি / জথো দিপ পল্ল আর আসকো সাল্‌মলি / জথো দিপ পক্ষ আর সক্লেশ সুস্বালি /—কোনো পাঠই গ্রাহ্য নয়, মানে করা যায় না। আলী আহ্‌সান সাহেব সমীচীন কারণে ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন; জম্বু দ্বীপ প্লক্ষ আর শাক শাল্মলী। আমার কেবল একটি নিবেদন আছে। যদি "দ্বীপে" করা যায় তা হলে অধিকরণ কারকের কৃপায় ছত্রটি ব্যাকরণ- ও বাক্‌ভঙ্গী- সংগত হয়, বাক্যটির মানে যুক্তিসংগত হয়। এ-কারের যোজনা কষ্টকল্পনা হবে না।

২. উক্ত খণ্ডের ৬নং স্তবক, ৭ ছত্র: পুঁথির পাঠ: শ্বেত রক্ত মউৎপল দেখিতে সুন্দর /—ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র সংশোধন:—শ্বেত রক্ত মণ্ডিত জল দেখিতে সুন্দর /—মূল জায়সীতে আছে—ফুলা কঁবল রহা হোই রাতা /—আলী আহ্‌সান সাহেবের প্রস্তাব: —শ্বেতরক্ত সউৎপল দেখিতে সুন্দর / পুঁথির পাঠ স্পষ্টতঃই অশুদ্ধ, 'মউৎপল' কোনো শব্দ নেই। শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবের প্রস্তাবিত 'শ্বেত রক্ত মণ্ডিত জল' কষ্টকল্পনা, তা ছাড়া জায়সীর ভাবসংগত নয়। আহ্‌সান সাহেবের প্রস্তাবে 'সউৎপল' শব্দটি যদিও বহুব্রীহি সমাসসিদ্ধ তবুও আদৌ চলিত নয়, আলাওল নূতন শব্দ সৃষ্টির দিকে মনোযোগী ছিলেন না। তা ছাড়া 'শ্বেতরক্ত সউৎপল দেখিতে সুন্দর', এই বাক্যবন্ধের মানেও ঠিক হয় না। কী দেখতে সুন্দর?—যে শ্বেতরক্ত উৎপলের সহিত বর্তমান। এতদ্দ্বারা জোর দেওয়া হচ্ছে রক্তের উপরে, অথচ জোর দেওয়া উচিত উৎপলে। আমার বিনীত প্রস্তাব যে 'মউৎপল' পুঁথির লিখনদোষজনিত ভ্রম, কথাটি 'সে উৎপল' অথবা 'যে উৎপল', তা হলে ছত্রটি হবে: শ্বেতরক্ত যে উৎপল দেখিতে সুন্দর। সাদা পদ্ম, লাল পদ্ম, দু' রকম পদ্মের কথাই কবি বলেছেন।

৩. উক্ত খণ্ডের ৮নং স্তবক, প্রথম দুই ছত্র.

পুনি ফুলবারি লাগা চহুঁ পাসা।
বিরিছ বেধি চন্দন ভই বাসা॥

—জায়সী

মনোহর উদ্যান পুষ্পেত তার পাশ।
বৃক্ষ সব হৈল যেন চন্দনের বাস॥

—সংশোধন, পুঁথির পাঠ

মনোহর পুষ্করিণী উদ্যান তার পাশ।
বৃক্ষ সব ভেদি হৈল চন্দন সুবাস॥

—আলাওল—আহ্‌সান

আমার বিনীত প্রস্তাব যে আহ্‌সান সাহেব অকারণে 'পুষ্করিণী' শব্দটির আমদানি করেছেন, জায়সীতে নেই, পুঁথিতে নেই, পুঁথিতে এর আভাসও নেই, তা ছাড়া তাঁর প্রস্তাবিত প্রথম ছত্রটিতে পয়ারের ছন্দোগতি ব্যাহত হয়েছে। এমন হওয়া সম্ভব নয় কি যে পুঁথির 'পুষ্পেত' শব্দটি = পুষ্পিত, হ্রস্ব ই-কারের জায়গায় এ-কার লিখেছেন লিপিকার? তা হলে আমার প্রস্তাবে ছত্রটি হবে—

মনোহর উদ্যান পুষ্পিত তার পাশ।

এর পরে শেক্‌স্‌পীয়র থেকে দুটি অংশের পাঠভেদ বিবেচনা করা যাক। প্রথমটি নেওয়া হয়েছে 'কিং লীয়র', প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য থেকে। রাজা লীয়র রাজ্যের বাঁটোয়ারা করছেন, বড়ো দুই মেয়েকে তাদের অংশ দিয়ে তাকিয়েছেন প্রিয়তমা কনিষ্ঠা কন্যার দিকে:

but now our joy,
Although the last, not least in our dear love,
What can you say to win a third, more opulent
Than your sisters' ?

এই পাঠ পাওয়া যায় ১৬০৮ সনের কোয়র্টো-সংস্করণে— এইটিই প্রাচীনতম সংস্করণ। পক্ষান্তরে ১৬২৩ সনের ফোলিও-সংস্করণে এ-অংশটির পাঠ অন্যরকম :

Now our Joy
Although our last, and least ; to whose young love,
The vines of France and milk of Burgundy
Strive to be interess'd ; what can you say to draw
A third more opulent than your sisters ? Speak.

এককালে কোয়র্টো-পাঠটিই বেশি প্রচলিত ছিল এই যুক্তিতে যে 'last but not least' পদটি ইংরেজি কথ্যরীতির সঙ্গে সংগত। আজকাল যুক্তি বদলে গেছে ; এখন বলা হয় যে এখানে বাক্-ভঙ্গী লেখকের লক্ষ্য নয়, তিনি 'least' কথাটিতে বোঝাতে চাচ্ছেন যে বড় বোন দুটির তুলনায় কর্ডেলিয়া ছিলেন ছোটখাটো, যেন নেহাৎ বালিকা। এ-যুক্তিতে ফোলিও-সংস্করণের পাঠে কর্ডেলিয়ার সুন্দর এক মূর্তি উদ্ভাসিত হয়েছে, সুতরাং ফোলিও-পাঠই গ্রাহ্য। (এ-উপলক্ষে বলা প্রয়োজন যে এই বিশেষ অংশটির সমস্যা ছেড়ে দিয়েও অন্যান্য অনেক প্রবল যুক্তিতে ইদানীং সমগ্র 'কিং লীয়রে'র ফোলিও-পাঠই শুদ্ধতর বলে মানা হয়।)

আর-একটি অংশ গ্রহণ করছি 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' থেকে। পঞ্চম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে রোমিওর শেষ উক্তি ; আমি উদ্ধৃত করছি দ্বিতীয় কোয়র্টো-সংস্করণ থেকে। এই সংস্করণের একটি ছত্রাংশ ও কয়েকটি ছত্র আধুনিক সংস্করণে বর্জিত হয়, এই বর্জিত অংশ বন্ধনীচিহ্নের মধ্যে দেখানো হয়েছে।

Ah dear Juliet
Why art thou yet so fair ? [I will believe] Shall I believe
That unsubstantial death is amorous,
And that the ban abhorred monster keeps
Thee here in dark to be his paramour ?
For fear of that I still will stay with thee,
And never from this palace of dim night
Depart again. [Come lie thou in my arm,
Here's to thy health, where ere thou tumblest in,
O true Apothecary !

Thy drugs are quicke. Thus with a kiss I die.

Depart again]

দশ ছত্র নীচে শেষ তিন ছত্র পুনরাবৃত্ত হয়েছে। আধুনিক সম্পাদকগণ মনে করেন যে কোয়ার্টো-সংস্করণটি শেক্স্পীয়র স্বয়ং অদলবদল করেছিলেন এবং পুনরাবৃত্ত ছত্রাংশ কয়টি বাদ দিয়েছিলেন কিন্তু ছাপাখানার লোক পাণ্ডুলিপি ঠিকমতো ধরতে না পেরে বর্জিত অংশটিও ছাপানোর ফলে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সেজন্যই বন্ধনী-সীমিত ছত্রগুলি আধুনিক সংস্করণে বাদ যায়।

৫

গ্রন্থ-সম্পাদনার কিছু সমস্যার, বিশেষতঃ পাঠ-সংশোধনের বহু সমস্যার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। অতঃপর এ-সব সমস্যা সম্বন্ধে কয়েকটি মুখ্য সূত্র ও পন্থার প্রস্তাব করা যায় কি? সম্পাদন-কর্মশাস্ত্র ইওরোপেই অপ্রবীণ যদিও আঠারো শতকেই এ-শাস্ত্রের দিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নজর পড়েছিল এবং উনিশ শতক থেকে এ-শাস্ত্রের ব্যাপক ও গভীর চর্চা হতে থাকে। বাংলাদেশে এ-শাস্ত্রের চর্চা অর্ধ শতাব্দীর অনধিক। এ-শাস্ত্রের রীতিনীতি সূত্রগুলি এখনো কালপক্ক হয়ে ওঠে নি তবুও জনকয়েক মান্য সম্পাদন-শাস্ত্রবিদের উপদেশ-নির্ভরে আমি কয়েকটি মুখ্য নীতি ও পন্থার প্রস্তাব করছি।

সম্পাদক সর্বপ্রথমে ভেবে দেখবেন তাঁর সম্পাদনার উদ্দেশ্য কী, তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ কোন্ পাঠকের জন্য? হতে পারে তাঁর উদ্দেশ্য এমন এক তথ্যপ্রমাণযুক্তি-সংবলিত পাঠবিচার প্রস্তুত করা যাতে হয়তো নেহাৎ অল্পসংখ্যক লোক উৎসাহ পাবেন কিন্তু তাঁরা পণ্ডিত ব্যক্তি এবং তাঁরা বুঝতে পারবেন যে দুরূহ জ্ঞানজগতের কোন্ অজ্ঞানতার রন্ধ্রপথ এই পাঠবিচারের 'অ্যাপারেটাস্ ক্রিটিকাস্' নামক বিচারযন্ত্রের সামর্থ্যে নিশ্ছিদ্র হয়ে গেল। অর্থাৎ তাঁর গ্রন্থ পণ্ডিতদ্বারা পণ্ডিতের জন্য লিখিত, আর যেহেতু এ গ্রন্থ সাধারণ পাঠকের জন্য নয় বরং সাধারণ পাঠকের জন্য সমীচীন যে গ্রন্থ সে গ্রন্থের আকর, তার সত্যাসত্যের চরম ধর্মাধিকরণ, সেজন্য এ গ্রন্থ নিশ্চয় পণ্ডিতগ্রাহ্য অথচ সাধারণজন-দুর্বোধ্য সংকেত চিহ্নে ভূষিত থাকবে। পক্ষান্তরে সম্পাদকের উদ্দেশ্য হতে পারে যে মহৎ গ্রন্থটি অনেক পাঠসমস্যা সত্ত্বেও সাধারণজনের আয়ত্ত হওয়া উচিত, সুতরাং তথ্য-প্রমাণ-সংকেতের জটিল পরিবেশ বর্জন করে ভিতরের সারবস্তু অর্থাৎ তাঁর প্রস্তাবিত পাঠটি তিনি পেশ করবেন। এই পাঠই তাঁর বিচারে শুদ্ধ পাঠ, এই পাঠ বিদ্বজ্জনসমাজে গৃহীত হয়েছে (তথ্যপ্রমাণের সাহায্যে) কিন্তু সাধারণজন তথ্যভারাক্রান্ত হবেন না, শুদ্ধ পাঠে তৃপ্ত থাকবেন। উদাহরণস্বরূপ অধ্যাপক ইস্রেল গলান্‌স্ দ্বারা সম্পাদিত সুশোভন ক্ষুদ্রকায় টেম্প্‌ল্-সংস্করণ শেক্স্পীয়র নাটকাবলীর উল্লেখ করতে পারি, এ-সংস্করণের পিছনে যে প্রভূত পরিশ্রম ও বিচার বিদ্যমান তার কিছুমাত্র বেদাক্ত পরিচয় সংস্করণগুলিতে লক্ষ্য করা যায় না।

অতএব সিদ্ধান্ত যে সম্পাদিত গ্রন্থের দুই উদ্দেশ্য হতে পারে, পণ্ডিততুষ্টি ও সাধারণ-জনতুষ্টি। কিন্তু এই সিদ্ধান্তকালে একটি কথা বিনাদ্বিধায় বলা আবশ্যক। কথাটি এই যে, সম্পাদিত গ্রন্থের চেহারা যেমনই হোক-না কেন— বিচারযন্ত্র ভারাক্রান্ত অথবা ঋজু ও পরিচ্ছন্ন যাই হোক-না কেন— গ্রন্থের পাঠ উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে শুদ্ধ,এমন নয় যে অপণ্ডিত পাঠকের জন্য অশুদ্ধ পাঠ প্রস্তুত করলেই চলবে। এ কথাটি বলা আবশ্যক কেননা সম্পাদনার নামে বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘকাল পর্যন্ত অনেক বিবেকহীন কাজ চলেছে। শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয় ১৩৭০ শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যার 'বিশ্বভারতী পত্রিকায়' শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদনা বিষয়ে যে মূল্যবান প্রবন্ধ শুরু করেছেন তাতে এ-প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলেছেন। ভট্টাচার্য মহাশয় বলছেন: "এ যুগে আবার যখন ওই সকল বই [প্রাচীন সাহিত্যগ্রন্থ] মুদ্রিত হয় তখন প্রকাশকেরা কোনো না কোনো পণ্ডিত ব্যক্তির হাত দিয়া পাণ্ডুলিপি সংশোধন করাইয়া লন।...যেখানে পাঠান্তর আছে সেখানে সম্পাদক যে পাঠ তাঁহার নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় সেইটিই গ্রহণ করেন। যেখানে কোনো শব্দের বা ছত্রের অর্থবোধে বাধা হয় সেখানে ইচ্ছামত এক শব্দ তুলিয়া দিয়া আর এক শব্দ বসাইয়া দেন, কখনো কখনো নূতন ছত্র রচনা করিয়া দেন। তাহাতে মাঝে মাঝে গণ্ডগোল যে ঘটে না এমন নয়, কিন্তু তাহা লইয়া কেহ মাথা ঘামায় না।...দীনেশচন্দ্র সেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীদের হাতে এই সকল গ্রন্থের [রামায়ণ মহাভারতের] যেসব সংস্করণ বাহির হইয়াছে সেগুলি আবালবৃদ্ধবনিতার পাঠ্য। যে সকল অংশ আধুনিক যুগে রুচিবিগর্হিত বলিয়া গণ্য হইতে পারে সেইসব অংশ তাঁহারা বর্জন করিয়াছেন, প্রয়োজনবোধে ভাষার সংস্কার— এবং মার্জনাও করিয়াছেন।" এই ছত্র কয়টিতে ভট্টাচার্য মহাশয় কিছু আধুনিক বাংলা সম্পাদনার প্রণালী বর্ণনা করেছেন। প্রণালীর সততা ও গ্রাহ্যতা সম্বন্ধে তিনি স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি। আমার মনে হয় যিনি তাঁর প্রবন্ধে একটি বিশেষ গ্রন্থের সম্পাদনা সম্বন্ধে সতর্ক বিশ্লেষণে নিযুক্ত হয়েছেন তিনি নিশ্চয় বর্ণিত সম্পাদকীয় স্বেচ্ছাচার সমর্থন করেন না। যে কালে গ্রন্থ মানে ছিল পুঁথি, এক মূল গ্রন্থের অসংখ্য নকল লোকসমাজে প্রচলিত থাকত, যে কালে বৈজ্ঞানিক ও সত্যসন্ধ সম্পাদনার ধারণা আদৌ ছিল না, সেকালে পুঁথিলিপিকারগণ অথবা যাঁরা পুঁথির লিপি করিয়ে নিতেন তাঁরা, নিজ নিজ রুচি অভিপ্রায় ও সাহিত্যাদর্শ অনুযায়ী পাঠ-পরিবর্তন করতেন, তাঁদের পুঁথিতে অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ শোভা পেত। তাঁদের স্বেচ্ছাচার ছিল যুগধর্মে সীমিত। কিন্তু মুদ্রণোত্তর কালে, যে কালে মূল রচনা অথবা সংশয়স্থলে মূল রচনার নিকটতম রূপ পরিবেশন করা সম্পাদনার উদ্দেশ্য বলে পরিগণিত হয়েছে, সেকালে রুচির নামে বা আবালবৃদ্ধবনিতার পাঠযোগ্যতার নামে স্বৈরাচার অতীব গর্হিত যত বড় খ্যাতনামা ব্যক্তিই এ কাজ করে থাকুন-না কেন। ইংরেজি সাহিত্যে এমন স্বৈরাচারের কুখ্যাততম উদাহরণ পাই ১৮১৮ সনে প্রকাশিত টমাস্ বোড্লার (Thomas Bowdler) সম্পাদিত (সম্পাদিত কথাটি এ ক্ষেত্রে

প্রয়োগ করাই বোধ হয় অসমীচীন) 'ফ্যামিলি শেক্‌সপীয়র' নামক গ্রন্থাবলীতে। এই ব্যক্তি সমাজহিতের নামে শেক্‌স্‌পীয়রের রচনা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছিলেন এবং তাঁর নাম থেকে bowdlerise কথাটি অর্থাৎ নীতি ও রুচির নামে অন্যের রচনায় অদলবদল করা, ইংরেজি ভাষায় চালু হয়েছে। প্রধানতঃ তিনি বর্জন করেছিলেন সে-সব অংশ যেগুলি তাঁর মতে আবালবৃদ্ধবনিতার নৈতিক চিন্তা কলুষিত করতে পারে। এমন কথা তিনি (এবং তাঁর বঙ্গীয় অনুগামিগণ) ভাবেন নি যে ১. পরিবর্তনশীল সামাজিক নীতির চেয়ে সত্য মহত্তর, ২. নীতির খাতিরে বর্জন ও 'সংস্কার' করতে হলে গ্রীক, রোমান, সংস্কৃত, এলিজাবেথীয় ইংরেজি সাহিত্যের প্রকাণ্ড অংশ নিপীড়িত হবে, ৩. দু-চারজন শুচিবায়ুগ্রস্ত নীতিবাদী সত্ত্বেও সাধারণ জনসমাজের নৈতিক শক্তি এমন ঠুনকো নয় যে শেক্‌স্‌পীয়র রামায়ণ মহাভারতের অবর্জিত সংস্করণ পাঠে চুরমার হয়ে যাবে।

গ্রন্থ-সম্পাদনা আসলে সত্যের সন্ধান, এ-সন্ধানে স্বেচ্ছাচারের কিছুমাত্র স্থান নেই, নীতি ও সামাজিক রুচির নামে, আপন সাহিত্যাদর্শের খাতিরে, কোনো পাঠান্তর সাধনের স্থান নেই। পণ্ডিতজনোচিত পাঠই হোক, সাধারণজনোচিত পাঠই হোক, পাঠের যে-রূপ অধ্যবসায়ী নিয়মনিষ্ঠ বিচারে প্রস্তুত হয়েছে সেই সত্যরূপই তার একমাত্র রূপ। কচিৎ কোনো স্থলে নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণের পরেও হয়তো সমস্যার ফয়সালা হয় না, তখন হয়তো আপন রুচির নির্ভরে সম্পাদককে রায় দিতে হতে পারে। কিন্তু সে রায়ের সঙ্গে নীতিবোধ ও সামাজিক এবং রাজনৈতিক শোভনতার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। একান্তভাবে সাহিত্যিক ও গ্রন্থতাত্ত্বিক (বিব্লিওগ্রাফিক্যাল) কারণে সে রায় তৈরি হবে। উপরে প্রথম অনুচ্ছেদের শেষ ভাগে হ্যাম্‌লেট্‌-নাটকের অমীমাংসিত প্রশ্নের উল্লেখ করেছি: solid, sallied, sullied, কোন্ পাঠ গ্রহণ করা হবে? তিন পাঠেরই সপক্ষে প্রমাণ আছে, তিন পাঠেই গ্রহণযোগ্য মানে পাওয়া যায়। আমি সম্পাদক হলে এ ক্ষেত্রে বেছে নিতাম sullied, সমগ্র নাটকটি ও এই বিশেষ নাট্যাংশ সম্বন্ধে আমার অনুভূতি ও চিন্তার সঙ্গে sullied কথাটি সম্পূর্ণরূপে সংগত এই ব্যক্তিগত রুচির কারণে পাঠটি গ্রহণ করতাম (সামাজিক রুচির কারণে নয়)। কিন্তু সেইসঙ্গে পাদটীকায় অন্য পাঠ দুটিরও উল্লেখ করতাম এবং সে-পাঠের সপক্ষে যুক্তিগুলিও পেশ করতাম। এই বিশেষ দৃষ্টান্তটির ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত রুচির প্রতিপত্তিই অধিক হয়ে পড়ছে।

যদি সম্পাদনার উদ্দেশ্য হয় প্রমাণসংবলিত সংস্করণ প্রস্তাব করা, তা হলে পাঠান্তর ও পাঠশুদ্ধির প্রশ্ন ওঠে। আধুনিক লেখকদের গ্রন্থ-সম্পাদনায় পাঠশুদ্ধির তেমন সুযোগ নেই। ধরা যাক, রবীন্দ্রনাথের রচনা। তাঁর রচনায় এক সংস্করণ থেকে অন্য সংস্করণে পাঠান্তর অবশ্য অনেক পাওয়া যায় কিন্তু যেখানেই মুখ্য পাঠান্তর, এমন কি পাণ্ডুলিপি থেকেও মুদ্রিত পাঠ পৃথক, সেখানে ধরে নিতে হবে যে এসব পাঠান্তর কবির স্বয়ংকৃত। অতএব রবীন্দ্রোত্তর সম্পাদক পাঠশুদ্ধি প্রস্তাবের ধৃষ্টতায় লিপ্ত হবেন না, বরং তাঁর কর্তব্য হবে সম্পাদিত গ্রন্থে কবির জীবৎকালে প্রকাশিত সর্বশেষ পাঠটি দিয়ে—কোনো কোনো কবিতার (যেমন 'নির্ঝরের

স্বপ্নভঙ্গ') এডিশিয়ো প্রিন্‌সেপস্ অর্থাৎ সর্বপ্রথম পাঠটি দিয়ে—পরে অন্যান্য সংস্করণস্থ পাঠান্তরগুলির নির্দেশ দেওয়া। এরকম ভেয়ারিঅরম্ বা পাঠভেদ-সংবলিত সংস্করণ বিদেশী সাহিত্যে প্রচুর, রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ বা কবিতাবিশেষ নিয়ে এ হেন সংস্করণ প্রস্তুত হচ্ছে। পাঠশুদ্ধির সমস্যা, সম্পাদক নিজেই পাঠ প্রস্তাব করবেন কি না এ সমস্যা, প্রধানতঃ প্রাচীন গ্রন্থের বেলায় উদ্ভূত হয়।

পাঠশুদ্ধির সমস্যায় কয়েকটি সূত্র স্মরণ রাখা দরকার। সম্পাদকের মুখ্য অবলম্বন হবে লেখকের স্বহস্তরচিত পাণ্ডুলিপি; যদি এ হেন পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব না থাকে তা হলে এমন কপি যা মূল পাণ্ডুলিপির সাক্ষাৎ নকল (এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রমাণ থাকা দরকার)। যেখানে পর পর অনেকগুলি মুদ্রিত সংস্করণ বা পুঁথি সংস্করণ বিদ্যমান অথচ জানা যায় যে এগুলি পূর্বতন কোনো সংস্করণের পুনরাবৃত্তি মাত্র (উপরন্তু কালক্রমে সেই পূর্বতন সংস্করণের ভুলভ্রান্তি বাড়িয়েই দিয়েছে), সে ক্ষেত্রে সতর্ক পরীক্ষার পরে সংস্করণ-পুনরাবৃত্তিগুলিকে অবহেলা করা চলে। শেকস্‌পীয়রের 'রিচার্ড দি সেকেণ্ড' নাটকের দ্বিতীয় কোয়র্টো-সংস্করণে প্রথম সংস্করণের চেয়ে ১২৩টি ভুল বেশি, পঞ্চম সংস্করণে মোট ভুল ২১৪টি। 'লাভস্ লেবারস্ লস্ট'-এর কোয়র্টোতে ১৭৬টি ভুল ছিল, পরবর্তী ফোলিও-সংস্করণে ১১৭টির সংশোধন হয়, ৫৯টি অবিচলিত ছিল, ১৩৭টি নূতন ভুল সন্নিবিষ্ট হয়। অতএব সম্পাদক স্বয়ং সব কয়টি সংস্করণই পরীক্ষা করবেন কিন্তু সম্পাদিত পাঠে অধিক গ্রাহ্য ও স্বল্পগ্রাহ্য পাঠের তারতম্য করবেন। পাঠবিচার অতীব জটিল কর্ম সে কথা ইতিপূর্বে বলেছি। পাঠবিচারে প্রয়োজন ইতিহাসজ্ঞান, ভাষাজ্ঞান, লিখনরীতি ও মুদ্রণরীতি সম্বন্ধে জ্ঞান, সাহিত্যরসবোধ এবং সর্বোপরি ইংরেজিতে যাকে বলে shrewd common-sense, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান। এইসঙ্গে কিছু সৌভাগ্য হলে আরও উত্তম। কোনো কোনো সম্পাদক (যথা টিবল্‌ড্) সাহিত্যরসে ধনী না হয়েও সৌভাগ্যবলে সুষ্ঠু পাঠশুদ্ধি প্রস্তাব করেছেন। সাহিত্যরসিক সম্পাদক বিচার করবেন লেখকের বিশিষ্ট ভাব, চিন্তাপ্রণালী, শব্দপ্রয়োগ, ভাবানুষঙ্গ, বাক্‌প্রতিমা, ছন্দ ইত্যাদি কাব্যকারুর বিভিন্ন প্রকাশ। একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি। শেকস্‌পীয়র-পরবর্তী কালে ওয়েব্‌স্টার প্রতিভাশালী নাট্যকার ছিলেন। তিনি দুখানা প্রসিদ্ধ নাটক (দি ডচেস্ অব মল্‌ফি, এবং দি হোয়াইট্ ডেভিল) ও একটি অনতিপ্রসিদ্ধ নাটক (দি ডেভিল্‌স্ ল'-কেস্) রচনা করেছিলেন সে বিষয়ে সংশয় নেই কিন্তু এ ছাড়া আরো কয়েকটি নাটক সে যুগের প্রথানুসারে অপর লেখকের সহযোগিতায় রচনা করেছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাটকগুলির কোন্ কোন্ অংশ তাঁর রচনা সে কথা জানার নিঃসংশয় উপায় নেই বটে কিন্তু নিশ্চিত নাটকগুলির শব্দপ্রয়োগ ছন্দ বাক্‌প্রতিমা ইত্যাদির তুলনায় (অর্থাৎ যাকে ইন্‌টার্নল্ এভিডেন্স বলা হয় সেই গ্রন্থগত প্রমাণে) অপর নাটকগুলিতে তাঁর রচিত অংশ কোন্‌গুলি সে বিষয়ে আমরা পরিচ্ছন্ন ধারণা করতে পারি।

পাঠশুদ্ধি প্রস্তাবে নিছক অনুমান অগ্রাহ্য। এ বিষয়ে বহুদর্শী অধ্যাপক চ্যাপম্যানের উক্তি স্মরণীয়—

"The practice of conjecture is pleasant, but like other pleasant things is dangerous. A commentator is apt to think that every line needs a note ; Johnson said of Warburton that he 'had a rage for saying something when there was nothing to be said.' An emender is apt to acquire a rage for correcting when there is nothing to correct." (অনুমানের অভ্যাস সুখকর বটে কিন্তু অন্যান্য সুখকর জিনিসের মতই বিপৎসংকুল। ভাষ্যকার মনে করেন যে প্রতি ছত্রের জন্যই ভাষ্য প্রয়োজন। জনসন্ ওয়র্বর্টন্ সম্বন্ধে বলেছিলেন যে যে ক্ষেত্রে কিছুই বলার নেই সেখানেও কিছু বলার জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল। যেখানে কিছু সংশোধন করার নেই সেখানেও সংশোধন করার জন্য পাঠ-সংশোধকের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হতে পারে।) সম্পাদন-কর্মে নিযুক্ত হয়ে আমাদের নিয়ত স্মরণ রাখতে হবে যে পাঠশুদ্ধি কখনোই ভেজালের কাজ নয়, আমাদের স্বকীয় নীতিবোধ, ধর্মজ্ঞান, রাজনৈতিক প্রত্যয় ইত্যাদির বর্ণে যেন আমরা মূল রচনা কখনই রঞ্জিত না করি। অর্থাৎ সম্পাদন-কর্মে ঐকান্তিক নৈর্ব্যক্তিকতা অপরিহার্য গুণ।

পাঠশুদ্ধি প্রস্তাবে আর-একটি কথা নিত্যস্মর্তব্য। কোনো পাঠশুদ্ধিই কেবল ছত্রবিশেষ বা স্তবকবিশেষের প্রসঙ্গে নির্ধারিত হওয়া উচিত নয়। যেহেতু কাব্যের শিল্পমাহাত্ম্য কবিতাটির সম্পূর্ণ নির্মিতিতে, তার সমগ্র অবয়বের সুষমা যোজনায়, সেজন্য সার্থক কাব্যের প্রতিটি শব্দ মূল্যবান। সুতরাং পাঠশুদ্ধির কালে প্রতিটি প্রস্তাব সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে, ভেবে দেখতে হবে প্রস্তাবটিতে সমগ্র কাব্যস্বভাবের সংগতি আছে কিনা।

কয়েকটি বহুজন-স্বীকৃত সূত্র শৃঙ্খলিত করলাম, এখন শেষ দুটি সূত্র পেশ করি। সম্পাদনা বিষয়ে, বিশেষতঃ পাঠশুদ্ধি বিষয়ে শেষ এবং সর্বমুখ্য সূত্র এই যে অন্য কোনো সূত্রই অব্যর্থ নির্বিকল্প সূত্র নয়। এ-সব সূত্রের উদ্দেশ্য সাহিত্যগ্রন্থে সত্যবস্তুর আবিষ্কার। যদি কোনো গ্রন্থের আলোচনায় দেখা যায় যে প্রচলিত সূত্রগুলিতে সত্যবস্তু ধূমাঙ্কিত হচ্ছে, প্রোজ্জ্বল হচ্ছে না, তা হলেও সূত্রগুলিতে মনোনিবেশ করা নেহাৎ অন্ধ গতানুগতিকতা হবে। গত দুই শতাব্দীতে ইওরোপে গ্রন্থ-সম্পাদনার অভিজ্ঞতায় যে কয়েকটি মূলসূত্র বহুজনমান্য হয়েছে, সে কয়টি এই অনুচ্ছেদে উপস্থাপিত করেছি কিন্তু এ কথাও মনে রাখছি যে এমন কোনো পুঁথি বা গ্রন্থ আমাদের আলোচনা করতে হতে পারে অথবা এমন কোনো সাহিত্যিক পরম্পরার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করতে হতে পারে (যথা আন্দামান বা নাগাভূমির নিরক্ষর অলিখিত ছড়া বা কাহিনী) যেখানে প্রাগ্রসর সাহিত্যালোচনার সূত্রগুলি নেহাৎই অকেজো। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে উপস্থিত-মত নূতন প্রণালী নির্ণীত হবে। কোনো নিয়মই যে অদ্বিতীয় নয়, সব নিয়মই প্রয়োজনবোধে বদলাতে পারে, সে

কথার প্রমাণ পাই এডিশিয়ো প্রিন্‌সেপ্‌স্‌ ও লেখকের জাবৎকালীন শেষ সংস্করণ এই দুয়েরই প্রতিপত্তিতে।

সর্বশেষ সূত্রটি ঠিক সূত্র নয়, এ সূত্রে বলব যে সম্পাদনার আদর্শ সম্বন্ধে, গ্রন্থ-সম্পাদনার চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে, চেতনা যেন কখনোই মলিন না হয়। সম্পাদনা কর্মে এমন বোধ একান্ত আবশ্যক যে, যে অধ্যবসায়ী একনিষ্ঠ দুরূহ পরিশ্রমের বর্ণনা করেছি কখনই যেন সে পরিশ্রম স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে না দাঁড়ায়, এই পরিশ্রমের অন্তিম উদ্দেশ্য সাহিত্যের সত্যসন্ধান, এবং সাহিত্যের সত্য রসের সত্য। পুঁথিকর্মী, পাঠ-শুদ্ধিকার, গ্রন্থপঞ্জীকার সবাই যে যার বিশেষজ্ঞ শক্তিতে রসের সত্যপ্রতিষ্ঠা করছেন। যাঁরা শুদ্ধ কবিতাটি পড়ছেন তাঁরা যেমন এই শুদ্ধির অন্তরালস্থিত পরিশ্রম সম্বন্ধে উন্নাসিক হতে পারেন না, যাঁরা শোধনকর্মে ব্যাপৃত তাঁরাও কখনো শোধনের অন্তিম উদ্দেশ্য বিস্মৃত হবেন না, তাঁরা জানবেন সম্পাদনা পন্থা মাত্র, পথের লক্ষ্য সাহিত্যশিল্পের আনন্দ।

কালের মাত্রা এবং রবীন্দ্রনাটক

শ্রীশঙ্খ ঘোষ

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার মহড়া দেখে রবীন্দ্রনাথ প্রতিমাদেবীকে লিখেছিলেন 'সমস্ত জিনিসটি বেশ দ্রুত এবং সুঠাম হলে ভালো হয়। এ নাটকটি লিরিক্যালের চেয়ে ড্রামাটিক বেশি'।[১] লক্ষণীয় যে ড্রামাটিক প্রয়োজনের উপলব্ধিতে কবি এই সুঠাম দ্রুততা প্রত্যাশা করেছেন। তাঁর পরিণত বয়সের নাট্যকলায় এ তথ্যটিকে বিশেষরূপে নির্ণায়ক মনে হয়। 'বহুশাখান্বিত ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য' থেকে মুক্তি অর্জন করে রবীন্দ্রনাটক ক্রমশঃ যে এক 'বাহুল্যবর্জিত সুপরিচ্ছন্নতার সামঞ্জস্য'[২] অন্বেষণ করেছে, সে কি অক্ষমতাজাত অথবা বিশেষ ভাবেই অভিপ্রেত, নূতনতর কোনো নাট্যাদর্শ তাঁর পরিকল্পনাকে ভিতর থেকে সমৃদ্ধ করেছিল কি : এই-সব জিজ্ঞাসার উত্তরে ঐ তথ্য হয়তো সহায়ক হবে।

সংকোচনের সূত্রপাত দেখি কাব্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা থেকে। পূর্বরচিত দুটি পঞ্চমাঙ্ক নাটকের পর চিত্রাঙ্গদা ছিল স্পষ্টতঃই প্রতিবাদ, কিন্তু সে যেন কবির প্রতিবাদ, যেন নাট্যকারের নয়। নাটকে কবিতার ব্যবহার ক্রমে যেন তাঁকে পরাজিত করল, কবিতায় নাটকের ব্যবহারই এখন উদ্দিষ্ট। মালিনীতে এমন-কি মিত্রাক্ষর পর্যন্ত ব্যবহৃত হতে পারল সর্বাঙ্গে, আর তার পরেই আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে গান্ধারীর আবেদন বা কর্ণকুন্তীসংবাদের কাল এখন আসন্ন, কাব্যনাট্য এখন আশ্রয় পাবে নাট্যকাব্যের সরলতায়।

গ্রীক নাটকের সঙ্গে তুলনার কথা ভেবে মালিনীকে বলা হয়েছিল দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু ও-নাটিকার অবয়বসংহতি সত্ত্বেও তার নাট্যরূপকে অনুরূপ বিশেষণে প্রমাণ করা কঠিন। ক্ল্যাসিক্যাল নাটকের সূত্রানুযায়ী কালৈক্য এবং দেশৈক্যের কথাই ওখানে কবির মনে ছিল, কিন্তু মনে ছিল আলোচনার সময়ে, রচনার সময়ে সম্ভবতঃ নয়।

ক্ল্যাসিক্যাল ঐক্যগুলির এখন আর প্রয়োজন আছে বলে আপাততঃ মনে হয় না। শেক্সপিয়র থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত এই ঐক্যধারণার তুচ্ছতা বারংবার প্রমাণিত হয়েছে এবং কর্ণেই-এর এ বিশ্বাসে কেউ বড়ো উৎসাহ দেখান না যে নাট্যকাল ও মঞ্চকালের সর্বসম হওয়া বাঞ্ছনীয়। দৃশ্যসংস্থান এবং কালপ্রবাহের অবিচ্ছিন্ন ঐক্যের চিন্তায় আধুনিক নাট্যকার বিচলিত নন, তিনি কেবল অনুসন্ধান করেন গাঢ়তর এক আত্মিক ঐক্য। কিন্তু তবু দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে হয় যখন দেখি বর্তমান শতাব্দী একাঙ্কিকার প্রতি অতিমাত্র আগ্রহশীল, কাব্যনাট্যের পুনর্জন্ম দিকে দিকে সরবে ঘোষিত হয় এবং অন্ততঃ শ' মনে করছিলেন যে নাট্যসাহিত্যে আবার নূতন করে প্রতিষ্ঠা পাবে গ্রীক আদর্শ।

নাটক ও কবিতার অন্তশ্চারী সমন্বয় এবং সক্ষম দর্শকের কল্পনায় সজীবতা সৃষ্টির

আকাঙ্ক্ষায় ইয়েট্স এক আঙ্গিক নির্বাচন করেছিলেন পরিণত বয়সে, যার প্রেরণা ছিল জাপানী নো-প্লে। 'ফোর প্লেজ ফর ড্যান্সার্স'-এর একটি নির্দেশনায় তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে দেয়ালের সামনে যে-কোনো ফাঁকা জায়গাই হতে পারে মঞ্চ। এর সঙ্গে তুলনীয় তপতীর ভূমিকায় উচ্চারিত রবীন্দ্রাদর্শ, যেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট তুলবার ছেলে-মানুষিকে কবি প্রশ্রয় দিতে চান নি। ইয়েট্স-রবীন্দ্রনাথের এই সদৃশ চিন্তনের সূত্র হিসেবে জাপানী শিল্প ও জীবনের অভিজ্ঞতাকে হয়তো অন্যতম মনে করা যায়। মনে পড়ে যে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের জাপান-ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ গভীর অভিভূত হয়েছিলেন তার জীবনযাত্রা ও শিল্পনির্মাণের পরিমিত সংযমে, তার 'হৃদয়ের মিতব্যয়িতা'য়[৩] নিরলংকার সৌন্দর্যে। এ কথা ঠিক যে কবি তাঁর গীতিপ্রতিভার উপযুক্ত এক নাট্যরূপ ইতিপূর্বেই অর্জন করে নিয়েছিলেন, সেখানে পুরাতনের সঙ্গে আপসের ইচ্ছা প্রায় পরিত্যক্ত এবং মিতব্যয়িতার আদর্শ তিনি আপন কল্পনাবলেই অধিকার করতে পারেন বলে বোঝা যায়। নতুবা ডাকঘর কেমন করে সম্ভব হল? কিন্তু তা সত্ত্বেও জাপানের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রসাহিত্যে উদ্দীপক ছিল মনে হয়। মনে হয়, আত্মস্থ প্রবণতাগুলিকে প্রকাশ করবার কোনো-একটা সহৃদয় সমর্থন তিনি আবিষ্কার করেছেন এইখানে এবং পরবর্তী রচনাবলীতে তাই শিল্পীর সচেতন দৃঢ়মনস্কতায় নাটককে করে নিতে পেরেছেন পটবিহীন, বিরামবিহীন। জাপান-যাত্রার কয়েকদিন আগেই ফাল্গুনী অভিনয় প্রসঙ্গে গগনেন্দ্রনাথকে তিনি সতর্ক করেছেন যে অভিনয় শুরু হবার পর একবারও যবনিকা পড়বে না,[৪] তা সত্ত্বেও তো নাট্যদেহকে পথ-ঘাট-মাঠ-গুহার চতুর্বিধ বিন্যাসে স্তরপরম্পরিত করে নিতে হল। কিন্তু এর পরবর্তী দুই প্রবল নাট্যরচনা মুক্তধারা ও রক্তকরবীতে আধুনিক নাট্যশিল্পের অনুকরণীয় এক নূতন আদর্শে এসে পৌছলাম। পরিবেশগত সীমাবদ্ধতা অঙ্গীকার করে নিয়ে ক্ল্যাসিক্যাল নাটক আবিষ্কার করে নিয়েছিল সংহতির আদর্শ, আর আধুনিক নাট্যকলা সেই গীতি-সংহতিরই অন্বেষণে অগ্রসর হয়ে পৌছল দেশকালগত ঐক্যে। ঐক্যগ্রথিত এই নূতন নাট্যরূপে সময়ের একটি স্বতন্ত্র বোধ ক্রমশঃ রচিত হবে বলে বোঝা যায়।

রবীন্দ্রনাথ যে এই অন্বেষণের অভিমুখী হয়েছিলেন, তাঁর নাট্যরচনার ইতিহাস সে কথা প্রমাণ করে। রাজা ও রানী, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা, মালিনী অথবা এমন-কি শারদোৎসব, রাজা, অচলায়তনও যখন রূপান্তর লাভ করে ১৯১৬ সালের সন্নিহিত কিংবা পরবর্তীকালে,[৫] নাট্যরূপান্তর অথবা ভাষান্তর, তখন দেখি অনিবার্যভাবে নাট্যকার দৃশ্যসমবায়কে সংহত করে নেন। রাজা ও রানী অবশ্য স্পষ্টতঃ কালের নির্দেশ দেয় না, অন্ততঃ এর প্রথমার্ধ অনির্দেশ্যের মধ্যে ছড়ানো। কিন্তু পরার্ধে ইলা-কুমারের কাহিনীতে 'সপ্তমীর অর্ধচাঁদ ক্রমে ক্রমে পূর্ণশশী হয়ে' উঠবে, সে পূর্ণিমাও নিষ্ফল করে দিয়ে আবার অবসানদৃশ্যে বিক্রম প্রতীক্ষা করে থাকবেন, কেননা 'পূর্ণিমানিশীথে আজ কুমারের সনে/ইলার বিবাহ হবে'। পূর্ণিমা থেকে পূর্ণিমার এই প্রসার তপতীতে অবান্তর। পঞ্চমাঙ্ক রাজা ও রানী তপতীতে পঞ্চদৃশ্যে বিন্যস্ত— তার প্রথম দুটিতে মীনকেতুর অর্চনাদিবস, আর পরিণামে দূরে দেশান্তরে

মার্তণ্ডের উপাসনা। বিসর্জনে কয়েক দিনের ঘটনা : জীববলিনিবারণ, রঘুপতির ষড়্‌যন্ত্র, ধ্রুবনিধনের আয়োজন এবং শ্রাবণের শেষ দুই দিন ভিক্ষা চেয়ে নেওয়া। ইংরেজি অনুবাদে এই ব্যাপ্ত সময়কে সংবরণ করে নেওয়া হয়েছে একদিনের মধ্যে বিরামহীন এক দৃশ্যের আয়তনে এবং জয়সিংহের প্রতি রঘুপতির নির্দেশেও তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন এল, মধ্যরাত্রির পূর্বেই রাজরক্ত এনে দিতে হবে, 'before it is midnight'। শ্রাবণের শেষ দুই দিন এখন কয়েক ঘণ্টায় পরিণত। চিত্রাঙ্গদার সময় অন্ততঃ এক বৎসর, এক বৎসরের জন্য সুরূপের আশীর্বাদ পেয়েছিল চিত্রাঙ্গদা। কাব্যনাট্যে এগারো দৃশ্যে ছড়ানো এই বৎসর নৃত্যনাট্যের দু'টি বিন্যাসে পরিণাম পেল। মালিনীর চতুর্দৃশ্যবিন্যাস অবশ্য অনেকটাই সংযমের ইতিহাস তথাপি কর্ণকুন্তীসংবাদ জাতীয় রচনার ভূমিকা হিসাবেই তার কথা বিবেচ্য এবং সেখানেও যে কবি সম্পূর্ণ কালৈক্য ব্যবহার করেছেন এমন নয়। প্রথম তিন দৃশ্য এবং চতুর্থ দৃশ্যের মধ্যে সময়ের এতটা ব্যবধান যে ঘটনা এবং চরিত্র -গত অনেকখানি পরিবর্তন আমাদের অলক্ষ্যেই ঘটে যায়, অনেক সময় মনে হয় যে গ্রীক নাট্যকার হয়তো বিষয়টিকে গ্রহণ করতেন মাত্র চতুর্থ দৃশ্যেরই উপস্থাপন থেকে। এই কালখণ্ডের সংকোচন সম্ভবপর হয় নি, তবুও ইংরেজি মালিনীতে চার দৃশ্য পরিণত হল দুই দৃশ্যে, মধ্যে একটি সময়সেতু থেকে গেল মাত্র।

পৃথক কোনো নাট্যাদর্শই নিশ্চয় এই সর্বাত্মক পরিবর্তনের কারণ। আবার পৃথক নাট্যাদর্শও আন্তরিক কোনো চারিত্র থেকে অনুপ্রাণিত, এ-ও ঠিক। সে আন্তরিক চারিত্রটি কী?

হয়তো, সময় বিষয়ে কবির উপলব্ধি। শারদোৎসব থেকে মানবনাট্যকে বলয়িত করে নিল প্রকৃতি ও আত্মিকতারও নাটক এবং শরৎবসন্ত ঋতুগুলি এখন পটভূমির থেকে পুরোভূমি পর্যন্ত হয়ে উঠতে চায়। তবু সময়কে সেখানে কবিভাবনার অনুষঙ্গরূপে মাত্র দেখা যায়, বলা যায় না যে সময়ই এখন স্থায়ী ভাবনা বা থিম্। কিন্তু ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ফাল্গুনী নাটকে সময়ই হল সম্পূর্ণ বিষয় এবং সময় সম্পর্কে এই নবপ্রতিষ্ঠিত ধারণার পর রবীন্দ্রনাটকে দেখা দিল কালের স্বতন্ত্র মাত্রা।

ফাল্গুনীতে আছে অনন্ত সময়ের তত্ত্ব। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষণীয় যে তারও পূর্বে ডাকঘরে ছিল অনন্ত সময়ের চিত্র। এই কথাটি প্রথম দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে না হয়তো, কিন্তু প্রহরে প্রহরে যে-প্রহরী ডাকঘরের সামনে ঘণ্টা বাজিয়ে দেয় তার অনুরণন যে সমগ্র নাটকময় ছায়ার মতো অনুসরণ করে, এ উপলব্ধিতে না পৌঁছলে ডাকঘরের অনেকখানি করুণব্যাকুল অনুভব অনায়ত্ত থেকে যাবে। নাটকের কয়েকটি সংলাপ এখানে মনে করা চাই :

> তুমি ঘণ্টা বাজাবে না প্রহরী?
>
> এখনো সময় হয় নি।
>
> কেউ বলে 'সময় বয়ে যাচ্ছে', কেউ বলে 'সময় হয় নি'। আচ্ছা, তুমি ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেই তো সময় হবে?

সে কি হয়! সময় হলে তবে আমি ঘণ্টা বাজিয়ে দিই।

আবার,

…তখন তোমার ঐ ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং! তোমার ঘণ্টা কেন বাজে?

ঘণ্টা এই কথা সবাইকে বলে, সময় বসে নেই, সময় কেবলই চলে যাচ্ছে।

কোথায় চলে যাচ্ছে? কোন্ দেশে?

এর পর অমলের সময়ের সঙ্গে সময়ের দেশে চলে যাবার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে অশ্রুতভাবে দেশকাল একজায়গায় সন্নিহিত হয়ে গেছে, কিন্তু সে স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। প্রহরী যখন সতর্ক করে বলে দেয় যে 'সে দেশে সবাইকে যেতে হবে বাবা' তখন তার মধ্যে আমরা কেবল ফাল্গুনীর শ্রুতিভূষণের পরামর্শ শুনতে পাব না, তার অতিরিক্ত একটি প্রলেপন পাব; সময়ের থেকে ছিন্ন হবার বেদনা নয়, সময়ের সঙ্গে যুক্ত হবার আকুতি। সেইজন্য অমল কেবলই এই শব্দ শুনতে পায়, রাজার কানের কাছে ঘণ্টা বাজাবার মতো একেবারেই নয়, বিস্তারিত সৌন্দর্যজগতের বুকের ভিতর থেকে দীর্ঘশ্বাসে চলে আসে সেই শব্দ, বেলা একপ্রহরেও তার চোখে আচ্ছাদন নেমে আসে আর 'দুপুরবেলা যখন রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করে, তখন ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং ঢং— আবার এক এক দিন রাত্রে হঠাৎ…ঘরের প্রদীপ নিবে গেছে, বাইরের কোন্ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং ঢং'। এর পর যখন শুনি যে পাহাড়ের উপর থেকে রাজার ডাকহরকরা 'কতদিন কত রাত ধরে কেবলই নেমে আসচে' যাকে অমল অনেকবার দেখেছে মনে হয়— সে অনেকদিন আগে— তখন প্রায় সংশয় থাকে না যে নিরন্তর সময়চলার পথচ্ছবিটি জীবনসুন্দর রূপে তার দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত হয়ে গেছে। তাই এখন সেই হাল্‌কা দেশের কল্পনা তার কাছে সহজ 'যেখানে কোনো জিনিসের কোনো ভার নেই—যেখানে একটু লাফ দিলেই পাহাড় ডিঙিয়ে চলে যাওয়া যায়।'

কিন্তু এখনও বিষয়টিকে দেখা হয়েছে কবিভাবনায়, সৌন্দর্যরূপে। দার্শনিকের তত্ত্বরূপে এরই প্রকট বিশ্লেষণ দেখা দিল ফাল্গুনীতে। 'গানের বিষয়টা কী?' 'শীতের বস্ত্রহরণ।' ফাল্গুনীর ভিতরকার এই কথাটি বলতে গিয়ে জীর্ণতাহীন নীলিমানির্মল আকাশের উল্লেখ করেন কবি, 'প্রকাশ' অংশে নবযৌবনের দল সুন্দরী এই প্রিয়া পৃথিবীর প্রতি তাদের হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করে দেয়। অন্ধ বাউলের সাহচর্যে তারা এখন এমন দেশে উপস্থিত যেখানে সবাই বলে 'যাই যাই'। এই চিরাগত প্রবাহ, এই অপরিম্লান সৌন্দর্য আর অনির্দেশ্য এই বিচ্ছেদব্যাকুলতার 'যাই যাই' উচ্চারণে সমস্ত ডাকঘর নাটিকাটি রচিত হতে পেরেছিল, ফাল্গুনীতে এটি পরিণতির এক অংশ মাত্র। এই অনুভূতির আদ্যন্ত চিত্রচিহ্ন ও ভাষ্যব্যাখ্যা নেবার জন্যে পথঘাটমাঠ অতিক্রম করে যাত্রীসংঘ এইখানে এসে উপস্থিত আজ। চন্দ্রহাস অনেক আগেই জ্ঞানের দ্বারা বুঝেছিল যে সময় জিনিসটাই খেলা, চলে যাওয়াই তার লক্ষ্য—কিন্তু সমস্ত দেহমন দিয়ে এই উচ্চারণের সত্যতা উপলব্ধির

জন্য তাকে গুহা পর্যন্ত প্রবেশ করতে হয়েছে, সে উপলব্ধি প্রকাশের কোনো ভাষা তার জানা নেই। শীতের বস্ত্রহরণ এই 'গানে'র বিষয়। সাম্প্রতিক কালখণ্ডের মধ্যে যাকে অবসান জরা মৃত্যু বলে দেখতে পাই তার সত্যস্বরূপ আবিষ্কারে ধরা পড়ে যে জীবন অনন্তপ্রবাহিত, বসন্তই নূতন করে আত্মপ্রকাশের জন্য শীতের ছদ্মবেশ নেয়। সময়ের এই দুই রূপ: 'Facts-এর দিকে দেখি জরা মৃত্যু, Truth-এর দিকে দেখি অক্ষয় জীবনযৌবন'।*

২

মুক্তধারার উপস্থাপন-রীতি এই ফ্যাক্ট-এর দিক থেকে, রক্তকরবীতে তার জায়গা নিয়েছে ট্রুথ। গঠনের দিক থেকে গুরুত্বময় এ-দুই নাটকের আভ্যন্তরীণ চরিত্রে এই একটি বড়ো ভেদ আছে। এবং এরই ফলে সময়ের ব্যবহারে দুই নাটকে স্বতন্ত্র রীতি সঞ্চারিত হয়েছে বলে মনে হয়।

মুক্তধারার এই পর্যায়ক্রমিক সংলাপ কটি লক্ষ্য করা যাক:

১. সূর্য তো অস্ত যায়— আমার সুমন তো এখনো ফিরল না।

২. ওর পিছন থেকে সূর্য যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন।

৩. ওই দেখো সঞ্জয়, গৌরীশিখরের উপরে সূর্যাস্তের মূর্তি। কোন্ আগুনের পাখি মেঘের ডানা মেলে রাত্রির দিকে উড়ে চলেছে···ডানা ঝুলিয়ে রাত্রির গহ্বরের দিকে পড়ে যাচ্ছে···গোধূলির আলোটি ওই নীল পাহাড়ের উপরে মূর্ছিত হয়ে রয়েছে।

৪. সূর্য অস্ত গেছে, আকাশ অন্ধকার হয়ে এল, কিন্তু···রোদ্দুরের মদ খেয়ে যেন লাল···

৫. ভৈরব-মন্দিরের ত্রিশূলটাকে অস্তসূর্যের আলো আঁকড়ে রয়েছে যেন ডোববার ভয়ে।

৬. অন্ধকারের জন্যে অপেক্ষা করছিলুম, আমার চিঠি পেয়েছ তো?

৭. গোধূলির আলো যতই কমে আসছে, আমাদের যন্ত্রের চূড়াটা ততই কালো হয়ে উঠছে।

৮. কে আসে? কে হে? জবাব দাও না কেন? বুধন না কি?··· উঃ, ঝিঁঝিঁর ডাকে আকাশটার গা ঝিমঝিম করছে।

৯. শিবতরাইয়ে? এই অমাবস্যারাত্রে?

১০. অন্ধকারের বুকের ভিতর খিলখিল করে হেসে উঠল যে।···প্রহর জাগে প্রহরী জাগে / তারায় তারায় কাঁপন লাগে।

অনতিদীর্ঘ এই নাটিকার অন্ততঃ দশটি উচ্চারণ পাওয়া গেল যেখানে স্পষ্টতঃই সময়ের নির্দেশ আছে। এমন ইঙ্গিত আরো দু'একটি চয়ন করা সম্ভব। অর্থাৎ নাট্য-

মহারাজ, আদিকাল থেকেই ঐ দুই দেবতার মধ্যে বিরোধ।

বিক্রম

ক্ষতি তাতে মানুষেরি। এক দেবতা আরেক দেবতার প্রসাদ থেকে মানুষকে বঞ্চিত করেন। ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র মিলিয়ে চিরদিন তোমরা দেব-পূজার ব্যবসা ক'রে এসেচো তাই দেবতার তোমরা কিছুই জানো না।

দেবদত্ত

সে-কথা ঠিক, দেবতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় পুঁথির থেকে। শ্লোকের ভিড় ঠেলে মরি; দক্ষিণা পাই, কিন্তু ওঁদের কাছে ঘেঁষবার সময়ই পাই নে।

বিক্রম

আমার মীনকেতু অশাস্ত্রীয়; অনুষ্টুভ ত্রিষ্টুভের বন্ধন মানে না। রুদ্র-ভৈরবের সঙ্গেই তাঁর অন্তরের মিল—পিণাক ছদ্মবেশ ধ'রেচে তার পুষ্পধনুতে।

দেবদত্ত

শুনে ভয় হয়। কিন্তু যা নিয়ে বিপদ ঘটে তা'র কারণ হ'চ্চে অনঙ্গদেব যে-ঘরকে তাঁর পায়ের ধূলি-লেপনে চিহ্নিত ক'রে নেন, সে-ঘরে অন্য কোনো

তপতী নাট্যাভিনয়কালে কবি-কর্তৃক পরিবর্তিত কপির পৃষ্ঠা। পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

। রবীন্দ্র-সংগ্রহ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কর্তৃক উপহৃত

দেবদত্ত। মহারাজ, ঐ দেবতাটিকে যথাসাধ্য পাথর কাটিয়ে দেখাবারই চেষ্টা করেছি। আভাসে যেটুকু জানাশোনা যায়েচে তাতে ভৈরবের সাথে অদ্ভুত বেশভূষায় ও চেহারায় মিল দেখতে পাই নি।

বিক্রম। তার কারণ, এ পর্যন্ত ওঁকে বিদেশী বেশের অংশ দিয়ে কল্পনাকে সাজিয়েছে। তাঁকে বাস্তুদেশে বিদেশী শস্ত্রের কালিমায়, কুসুমের রক্তিমায় নীল কণ্ঠলিকার নীলিমায়, - উনি বসন্তের নানাবর্ণ সাজিতে সজ্জিত আছেন, তাই তো বজ্রপাণি ইন্দ্রের সভায় উনি নিন্দিতভাবে চরের বৃত্তি করেন। রুদ্রের কোপানলের আগুনে তাই তো ওঁকে দগ্ধ করেছিল।

দেবদত্ত। সে ইতিহাস তো চুকে গেছে। আবার সেই পোড়া দেবতাকে নিয়ে কেন এই উপসর্গ? পুনর্বার ওঁকে পোড়াতে হবে না কি?

বিক্রম। না, তাঁকে মৃত্যুর ভিতর দিয়েই উঠাতে হবে - সে জন্যে বীরের শক্তি চাই। তোমাদের ভৈরবের স্তুতি সম্পূর্ণ হবে না আমাদের বীরমন্ত্রের স্তব যদি তার সঙ্গে না যোগ করি।

ভস্ম-অপমান-শয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু,
রুদ্র-বহ্নি হতে লহো জ্বলদর্চি তনু।
যাহা মরণীয় যাক মরে,
জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্তি ধরে।
যাহা জড়, যাহা মূঢ় তব,
যাহা স্থূল দগ্ধ হোক, হও নিত্য নব।
মৃত্যু হতে জাগো পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু॥

তোমরা জান না, মহেশ্বর মদনকে অমৃত বর দিয়েছিলেন, মৃত্যু দিয়েই তিনি তাকে অমর করেছেন। অতনুই অমৃত লোকের অধিকারী হয়েছে।

প্রযোজকের এ ক্ষেত্রে কোনো স্বেচ্ছাপ্রয়োগের সুযোগ নেই, সংলাপের সমতারক্ষার প্রয়োজনে কালবিন্যাস তাঁকে নিশ্চিতরূপে মান্য করতে হবে।

প্রথম সংলাপের অস্তায়মান সূর্য থেকে দশম উদ্ধৃতির 'তারায় তারায় কাঁপন লাগে' পর্যন্ত সময়ের একটি সংগত ধারাবাহিকতা কত নিপুণভাবে গ্রথিত। নির্বাণমুখ আলোর মুহূর্তে মুহূর্তে রঙ বদল হয়ে যায়, তারপর কখন সে ফিকে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে গাঢ় তমসায় চিহ্নহীন হয়ে পড়ে— এই প্রতিটি ছবি যেন লেখা আছে চরিত্রগুলির উচ্চারণে। প্রাক্‌গোধূলির রক্তআলো থেকে গোধূলির মূর্ছিত আলোয়, আবার তার থেকে সরিয়ে অন্ধকারের বুকের ভিতর নিয়ে যায়। অন্ধকারও একরকম নয়। প্রথম অন্ধকারে গোপন কথা সম্ভব হল: 'আমার চিঠি পেয়েছ তো?' কিন্তু আর কিছু পরেই, যতই কালো হয়ে উঠছে সব, চরিত্রগুলি পরস্পরকে আর দেখতে পায় না, ভয়ে বুক কাঁপিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করতে থাকে 'কে আসে? কে হে? জবাব দাও না কেন?' অবশেষে অমাবস্যা রাত্রির অন্ধকারের একেবারে বুকের ভিতর থেকে মুক্তধারার কল্লোল ভাসতে থাকে, উপরে আকাশে তখন তারায় তারায় কাঁপন লেগেছে।

কতটুকু সময়ের এই ঘটনা? সন্ধ্যা থেকে রাত্রি পর্যন্ত কয়েক ঘণ্টা মাত্র। অভিনয়ের জন্য কতটা সময়ের প্রয়োজন? এর চেয়ে কম নয়। নাট্যকাল ও মঞ্চকাল এখানে প্রায় সমন্বিত হয়ে গেছে। এখানে স্মরণীয় যে আধুনিক একাঙ্কিকা রচনার পদ্ধতিতে রবীন্দ্রনাথের এই নাট্যদেহ নির্মিত নয়, কেননা চরিত্র ও ঘটনা -গত বাহুল্য— এমন কি motif-এর বাহুল্যেও মুক্তধারা ও রক্তকরবী পরিকল্পিত, কিন্তু তারই মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়া হয়েছে ঐক্যময় কাল। এই আঙ্গিকের জন্য প্রয়োজন ছিল এমন এক ছোটো কালখণ্ড নির্বাচন করে নেওয়া যেখানে ঘটমান ক্রিয়া এবং লিপ্ত চরিত্রাবলী সংঘাত-সম্ভাবনার শীর্ষে উত্তীর্ণ। মুক্তধারায় সেই সীমাবদ্ধ সময়টিকে কবি অর্জন করতে পেরেছেন: গোধূলির অন্ধকার।

গোধূলি কেন? সন্ধ্যালগ্নের বিষণ্ন রক্তিমাভ পরিমণ্ডল আতঙ্ক ও বেদনার উভয়তোমুখ চেতনাকে স্পর্শ করতে পারবে বলে হয়তো। অন্ধকার কেন? এর উত্তরে একটু দ্বিধা লাগে। 'তা হলে তাঁকে কি আর পাব না' গণেশের এই উদ্‌ভ্রান্ত জিজ্ঞাসার উত্তরে ধনঞ্জয় যখন জানায় 'চিরদিনের মতো পেয়ে গেলি' তখন তার মধ্যে জীবনের যে স্থির প্রত্যয় প্রকাশ পায়, রবীন্দ্ররচনায় উষাই তো তার উপযুক্ত পটভূমি!

কিন্তু এইখানে, সমধর্মী অপর কয়েকটি নাটক বা তার মৃত্যুদৃশ্যের সঙ্গে মুক্তধারার অভিপ্রায়গত স্বাতন্ত্র্য বুঝে নিতে হয়। অভিজিৎ রঞ্জন নয়, বরং এক হিসেবে এ দুই চরিত্রের বিপরীতমুখী গতি। 'আমারও বুক কান্নায় ভরে রয়েছে' এই হল অভিজিতের পরিচয়, আর রঞ্জন হল চন্দ্রহাসের মতোই 'বিধাতার হাসি'। রঞ্জন বহির্জাগতিক মুক্ত আলোকের অনুষঙ্গ নিয়ে অনায়াসে যক্ষপুরীর বন্ধনসীমায় চলে আসে, অভিজিৎ রুদ্ধ প্রাসাদজীবন থেকে মুক্তি চায় গৌরীশিখরের দিকে যেখানে ভাবীকালের

পথ রচিত হবে। সে যে রুদ্ধ, এই কথাটি নাটকে আমরা ভুলতে পারি না, জয়সিংহের মনশ্চাঞ্চল্য মনে পড়ে কখনো কখনো। 'অভিজিৎ হচ্ছে সেই মারনেওয়ালার ভিতরকার মানুষ' রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা থেকে কথাটা আরো স্পষ্ট হয়, এ-চরিত্রে পীড়ার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনই কবির প্রয়োজন ছিল। এই পীড়িত অনুভবের যোগ্য অনুষঙ্গ রচনা করতে পারে জয়সিংহেরই অবসানদৃশ্যের মতো ঘনকৃষ্ণ অমাবস্যা রজনী।' এমন-কি ট্র্যাজেডি কথাটি পর্যন্ত এখানে ব্যবহার করতে হল তাঁকে: যে মানুষ আঘাত করছে আত্মার ট্র্যাজেডি তারই।

মাত্র এই নয়। এরও পরে প্রশ্ন জাগে, অভিজিতের জন্মবৃত্তান্ত কেন জানতে দেওয়া হল আমাদের। স্বল্পকালের মধ্যে অতীতের অনেকটা কেন আমাদের অভিজ্ঞতার মুঠোয় তুলে ধরা হল। এর মধ্যে কি নিয়তির ইঙ্গিত প্রবল নয়? 'তোমরা ভাবছ তোমরাই আগুন লাগিয়েছ? না, এ আগুন যেমন করেই হোক লাগত' অভিজিতের এই উক্তি প্রথম যেন একটু কঠোর ও নিষ্ঠুর শোনায়, কিন্তু তার পরেই ঝর্নাতলায় তার পরিত্যক্ত জন্ম, পশ্চিমের গৌরীশিখর, মুক্তধারার আহ্বান এবং অমাবস্যার অন্ধকারের সঙ্গে একে সংগতিপূর্ণ বলে বোঝা যায়। এর মধ্যে এক অমোঘ নিয়তির অনিবার্যতা থেকে গিয়েছে, ঘন গঠনের মধ্যে বা আরো রুদ্ধশ্বাস নিবিড়তা ভরে দেয়। হয়তো সিঞ্জ-এর (Synge) কোন কোন নাটিকার ছায়া পাঠকের মনে ভেসে আসে, সেই fate, সেই মৃত্যুর হাতছানি এবং সেই সংহত কালখণ্ডে সুপ্রখর জীবনোপলব্ধি।

ফ্যাক্ট-এর দিক থেকে এই হল মুক্তধারা। কিন্তু নিয়তি বা মৃত্যুর সিঞ্জ-তুল্য ভাবনার দ্বারা নিশ্চিত হতে পারেন না রবীন্দ্রনাথ, এর থেকে এক আনন্দময় উত্তরণও তিনি রেখে যেতে চান, উপস্থাপনকে ফ্যাক্ট থেকে সরিয়ে নিয়ে। তখনই জরা মৃত্যুর অপর দিকটা চোখে ভেসে ওঠে অক্ষয় জীবন যৌবন। তখনই মুক্তধারার পরবর্তী প্রয়াসে প্রয়োজন হয় রক্তকরবীর। কিন্তু ফ্যাক্ট থেকে সরিয়ে নেবার কোনো ইঙ্গিত কি নেই মুক্তধারায়? সে তো সম্ভবপর নয়। বস্তুতঃ সেই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই কাঁপনজাগা অন্ধকারের ভিতর থেকে ধনঞ্জয়ের সাধুকণ্ঠ ভাসিয়ে দিতে হয়েছিল 'চিরকালের জন্য পেয়ে গেলি'।

শেষ এই উক্তির দ্বারা, এমন কি সমগ্রভাবে ধনঞ্জয় ও তার সম্প্রদায়ের উপস্থিতি দ্বারা এক দ্বিস্তর অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করতে চেয়েছেন লেখক। কিন্তু রচনারূপায়ণে তাঁর এই অভিপ্রায় কতটা সফল? নাট্যকাল ও মঞ্চকালকে সমন্বিত করার আদর্শে এই অংশগুলি অনেক প্রক্ষিপ্ত মনে হয় না কি? অনায়াস সামঞ্জস্যে তা নাট্যদেহে লিপ্ত বলে বোঝা যায় না যেন। যেখানে 'প্রায়শ্চিত্ত নাটকের সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী আছে'[৮] আর শিষ্যবর্গসহ গুরুর আবির্ভাবে যেখানে অচলায়তনিক সংলাপের রেশ পাওয়া যায়—সেই অংশগুলি মুক্তধারার সময়সংহতিকে ঈষৎ মাত্রায় তরলতর করে দেয়, নিকটসময় থেকে দূরসময়ে বা খণ্ডকাল থেকে পূর্ণকালের দিকে তাকে প্রসারিত করে নিতে পারে না।

৩

তা পারে রক্তকরবী। রক্তকরবীর বহিরবয়বে স্থান ও কাল -গত ঐক্যের এক মায়া মাত্র রচিত হয়েছে, আবার ঐ সঙ্গে প্রচ্ছন্ন গঠনে এ নাটক ছড়িয়ে আছে বৃহত্তর কালপ্রবাহে। স্থানকালের ব্যবহার বিষয়ে দুই নাটককে সদৃশ মনে হয় কেবল আপাত-বিচারে। বস্তুতঃ, ইতিপূর্বে অর্জিত তাঁর নিপুণতা রক্তকরবীতে নূতনতর একটি সম্ভাবনা সন্ধান করল।

ভাগ্যক্রমে, কালনির্দেশক বাক্যাবলী এ-নাটকেও অল্পপরিমাণ ব্যবহৃত :

১. দেখছ না, পৌষের রোদ্দুর পাকাধানের লাবণ্য আকাশে মেলে দিচ্ছে?

২. ওকি কথা, সকাল থেকেই মদ?

৩. বর্শার ডগায় এক এক টুকরো আলো বিঁধে নিয়ে চলেছে।

৪. আজ সকালে ওরা পৌষের গান গেয়ে মাঠে যাচ্ছিল, শুনেছিলে?

৫. তোমার কুঁদফুলের মালা পরব যখন ঘোর রাত হবে।

৬. তোমার কপোলে রক্তকরবীর গুচ্ছ আজ প্রলয়গোধূলির মেঘের মতো দেখাচ্ছে।

৭. দেখতে দেখতে সিঁদুরে মেঘে আজকের গোধূলি রাঙা হয়ে উঠল।

৮. সর্দার! সর্দার! দেখো ওর বর্শার আগে আমার কুন্দফুলের মালা।

যদিও বলেছি কালনির্দেশক, তবু উদ্ধৃত এই উক্তিগুলির নির্দেশ মুক্তধারার তুলনায় অনেক তির্যক্, যেন ব্যঞ্জনার দুয়ার খোলা রাখবার জন্যই এই পদ্ধতি।

রৌদ্রের লাবণ্যবর্ণ প্রথম উক্তিতে সকালের আভাস দিয়ে যায়, নবজীবনচঞ্চল কিশোরকে দিয়ে নাটকের সূত্রপাতেও হয়তো সেই নবীন প্রভাতের উপযুক্ত পরিবহন আছে, আবার পৌষের গানটি যে সকালেই ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল তা জানা যায় পরবর্তী সময়ে বিশুর কাছে নন্দিনীর স্পষ্ট উল্লেখে। 'সকাল থেকেই মদ' চন্দ্রার এই ধিক্কার-বাণীর সঙ্গে সঙ্গে প্রভাত তার লাবণ্য থেকে যেন অনেকটা সরে এসেছে, আর যখন অভিজ্ঞ এবং ঈষৎ রিপুমন্থর চন্দ্রা সর্দারনীদের দেখতে পাচ্ছিল 'বর্শার ডগায় টুকরো আলো'র মিছিলে, তখন রৌদ্রঝলসিত মধ্যাহ্নের আভাস কালপরিবেশে এবং চরিত্র-রচনায় একই সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে মনে হয়। অবশেষে ধীরে ধীরে কখন সূর্য নেমে আসে, নন্দিনীর কপোলে রক্তকরবীকে প্রলয়গোধূলির মতো দেখেন অধ্যাপক, সে চিত্রকল্পে কি বাস্তব অস্ত-আভা সঞ্চারিত ছিল না অনেকখানি? অল্প পরেই তো নন্দিনীকে উচ্চারণ করতে হবে 'দেখতে দেখতে সিঁদুরে মেঘে আজকের গোধূলি রাঙা হয়ে উঠল'।

এর পরিণাম কোথায়? মুক্তধারার মতো কোনো আগুনের পাখি অন্ধকারের গহ্বরে ঝাঁপিয়ে পড়ে নি, তবু মনে হয় অন্ধকার ক্রমে অধিকার করে নিল সমগ্র নাট্য-

কালকে। শক্তি-উপাসক রাজার ধ্বজাপূজার জন্য আর কোন্ সময় প্রশস্ত? উপরন্তু, শেষ মুহূর্তে নন্দিনী সর্দারের বর্শার আগে তার মালাটিকে যে নিগৃহীত হতে দেখেছিল সে তো অন্ধকারেই সম্ভব। আমরা তো সর্দারের প্রতিশ্রুতি ভুলি নি: 'তোমার কুঁদফুলের মালা পরব যখন ঘোর রাত হবে'। তার এই আস্ফালন নিষ্ফল ছিল না, নাট্যপরিণামে আছে এই অন্ধকারের আবহ।

কিন্তু কালানুসরণে এই পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে শেষ মুহূর্তে আমাদের বিপন্ন হতে হয়। অন্ধকারের আবহ? যদি অন্ধকার তবে নাট্য-অবসানে কেমন করে সম্ভব দূরে ঐ গানের ধুয়া 'ধুলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে'? সন্দেহ নেই যে এখানে কবি প্রথম দুই চরণের মাত্র পুনর্ব্যবহার করেছেন, তাও তাৎপর্যময় দু'একটি শব্দের পরিবর্তনে, ফলে রোদের সোনা অথবা আলোর খুশি হয়তো আর ফিরে আসে না। এমন-কি পৌষের ডালা ভরা যে ফসল ছিল, দিবাবসানে তা আছে ধুলার আঁচলে— এমন কল্পনাও হয়তো সম্ভবপর। কিন্তু তবু সন্দেহ থেকে যায়। অন্ধকারের পটভূমিতে ও-গান যেন ঈষৎ সংগতিবিহীন।

অপর পক্ষে, রক্তকরবীর পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত[৯] নাটকের অন্তিম গান হিসেবে বিশুর এই কথাগুলি যদি থাকত. 'আমার শেষ রাগিণীর প্রথম ধুয়ো / ধরলি রে কে তুই' তবে সময়ের সঙ্গে তার কোনো সংঘর্ষ হত মনে হয় না। 'পশ্চিমে ঐ দিনের পারে / অস্তরবির পথের ধারে / রক্তরাগের ঘোমটা মাথায় / পরলি রে কে তুই' একে গ্রহণ করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে শেষ পর্যন্ত সম্ভব ছিল না, কেননা সে ক্ষেত্রে নাটকটির সমাপন চিহ্নিত হত বিশু-নন্দিনীর ব্যক্তিগত সম্পর্কের পরিধিতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও কি মনে হয় না যে কবি নাটককে শেষ করতে চেয়েছেন আলোকাভাসেই, সেইজন্যও গানের ওই পরিবর্তন? মুক্তধারার সংহত নিদারুণতার সঙ্গে রক্তকরবীর প্রসারিত সমগ্রতার আস্বাদনগত ভেদ সহজেই অনুভবগম্য, অভিজিতের বিষাদবিধুর আত্মত্যাগের বেদনা এবং রঞ্জনের স্পর্ধিত মৃত্যুবরণের জীবনোল্লাস ভিন্ন পটপ্রেক্ষিতের প্রত্যাশা করে।

যদি তা সত্যি হয়, তবে আবার নূতন করে ভাবনার প্রয়োজন। এই শেষ মুহূর্তে নাট্যকার কি সময়ের স্বাধীনতা নিলেন? আদি থেকে উপান্ত্য মুহূর্ত পর্যন্ত সময়ের ধারা যদি অবিচ্ছিন্ন থাকে তবে অন্তিম এই স্বাধীনতা শিল্পের পক্ষে কি শুভ? মুক্তধারার মতো মঞ্চকাল ও নাট্যকালকে সর্বসমন্বিত করে নেবার আগ্রহ এখানে নেই, কিন্তু তবু তো মনে হচ্ছিল যে সময়কে এখানে এক সমগ্র একক-এ গণ্য করে একটু ছোটো করে নেওয়া হয়েছিল, রঙিন কাচখণ্ডের মধ্য দিয়ে সূর্যকে যেমন দেখি, সমগ্রতায় কিন্তু ক্ষুদ্রাকারে। কয়েক ঘণ্টায় অভিনীত এক সমগ্র দিবসের চিত্র। অন্য এক দিক থেকে লক্ষ্য করলেও এই সময়ের এককে স্থির মনে হয়। নাটকের প্রথমে অধ্যাপক-নন্দিনীর সংলাপে জেনেছি 'আজ' রঞ্জন-নন্দিনীর মিলন হবে, তারপর বিশু অথবা সর্দার কিংবা রাজা সকলকেই নন্দিনী তার 'আজকের' দিনের আশার আনন্দ নিবেদন করে যায় এবং পরে সেই প্রতীক্ষাকে একটু ভিন্ন

অর্থে আমরা সফল হতে দেখলাম : ও আসবে বলেছিল, ও তো এল। তা হলে এ সেই একদিনের কাহিনী যেদিন নাট্যঘটনার চূড়ান্ত আরোহণ, যেদিন সকালবেলা নীলকণ্ঠ পাখির পালক বহন করে এনেছিল আর যেদিন পরাহ্ণ এসেছিল রঞ্জনের মৃতদেহ বহন করে।

তাও কি ঠিক? এ কি সেই একদিন? তবে কেমন করে কুবেরগড়ে রঞ্জনের উপস্থিতির পরেই ক্রমান্বয়ী এই সংলাপগুলি সম্ভব?—

ওই না রঞ্জন রাস্তা দিয়ে চলেছে গান গেয়ে?

রঞ্জন এখানে এসেছে, যেমন করে পারিস···

তাকে পাঁচদিন আগে একবার দেখেছিলাম, আর দেখি নি।

সেদিন রাতে শম্ভু মোড়লের বাড়িতে দেখেছি।

তার প্রসঙ্গে দিনের উল্লেখে এই পরস্পরবিরোধী উক্তিমালা লক্ষ্য করে এখন তবে সমস্ত বিষয়টিরই পুনর্বিচার প্রয়োজন। রঞ্জন তবে একদিনের মধ্যে থেকেও অনেক দিনের সমাহার, আবার নাট্যকালপ্রবাহে তাই আলো থেকে ক্রমিক অন্ধকারের পরেও আবার কখন আলোক জ্বলে ওঠে। এমন-কি উক্ত ক্রমও আর বাস্তব নয়, অতিবাস্তব। কেননা, ইতিপূর্বে একজন অভিনেতা সমালোচক যেমন লক্ষ্য করেছেন,[১০] আমাদের আলোচ্য দিনটি একই সঙ্গে কাজের দিন আর ছুটির দিন। কিশোর গেল কাজে, ফাগুলাল বলে ছুটি আর বিশু তার নন্দিনীর ছুটি থেকে 'নিজের কাজে' ফিরে যাবার চেষ্টা করে কখনো কখনো। ফাগুলাল বলেছিল আজ ধ্বজাপূজা তাই ছুটির দিন, নাট্যশেষে সেই ধ্বজাপূজা আসন্ন হবার অল্প আগে কিশোর বলে 'আজ কামাই করেছি, তাই ওরা কুত্তা লেলিয়ে দিয়েছে'। এত সব বিপরীত ঘটনা, অথচ সংগত সুষম রেখাটিকেও প্রতি মুহূর্তে লক্ষ্যলগ্ন রাখা হয়েছে— এ কি অনভিপ্রেত শিথিলতা মাত্র? এ কি অসংবৃত স্বেচ্ছাচার? অথবা এর মধ্যে কোনো গূঢ়তর প্রবর্তনা রক্তকরবীর নাট্যস্বরূপকে মহত্তর তাৎপর্যে দ্যোতিত করে তুলছে?

এই নাটকের প্রায় মধ্যবর্তী অংশে হয়তো সেই দ্যোতনার উপস্থাপন আছে একটু সূক্ষ্ম বিন্যাসে। রাজা ছিলেন জালের আড়ালে আর সেখানে তিনি তাঁর প্রতিকল্প রচনা করেছেন কোটরগত এক ব্যাঙের মধ্যে, যার কাছে বেঁচে থাকার মন্ত্র নেই, আছে টিঁকে থাকবার জাদু। 'এই ব্যাঙ একদিন একটা কোটরের মধ্যে ঢুকেছিল। তারি আড়ালে তিন হাজার বছর ছিল টিঁকে। এই ভাবে কী করে টিঁকে থাকতে হয় তারই রহস্য ওর কাছ থেকে শিখছিলুম।' শিখছিলুম শব্দটির ঘটমান অতীত রূপ একটু বিচলিত করে আমাদের, কেননা আমরা লক্ষ্য করি যে প্রতিকল্প ঐ ব্যাঙের বয়স তিন হাজার বৎসর। ক্লান্ত পাহাড়, পর্বতের চূড়া অথবা হাজার বছরের পুরোনো বটগাছের চেয়েও রাজার এই বর্ণনা অনেক বেশি কার্যকর হল, ব্যাঙের এই তিন হাজার বছরের অস্তিত্ব, কেননা ঐ সময়ের কোনো বাস্তব সম্ভাবনা বিচার করবার জন্য এ মুহূর্তে মন উৎসুক হয় না অথচ

আমাদের অগোচরে রাজার অস্তিত্ব— অতএব সমগ্র রক্তকরবীর অস্তিত্ব— সাম্প্রতিক কাল থেকে অনন্ত কালে, রূপময় কাল থেকে কালহীনতায় প্রসারিত হয়ে যায় এবং নাট্যবর্ণিত চরিত্রগুলির মধ্যে বিশেষ ও নির্বিশেষ পরস্পর নিবিড়ভাবে অন্তঃপ্রবিষ্ট হতে পারে।

আগে একবার বলেছি আধুনিক একাঙ্কিকা গঠনকল্পে রবীন্দ্রনাথের নাট্যরূপ নির্বাচিত নয়। স্থান ও কালের সংহতি যেমন এর কাম্য, তেমনি ব্যাপ্তির আকাঙ্ক্ষাও এর গভীরে অনুস্যূত। পঞ্চম হেনরি নাটকের প্রস্তাবনায় শেক্সপিয়র তাঁর কোরাসের মুখে বলেছিলেন 'jumping over times / Turning the accomplishment of many years / Into an hour glass' এবং দর্শকদের সাহায্য নিতে হয়েছিল 'on your imaginary forces'। এই hour-glassটি রবীন্দ্রনাথও ব্যবহার করলেন, কিন্তু দর্শকের সক্রিয় সাহায্যে বাইরে থেকে নয়। দর্শকের কল্পনা এখানে অলক্ষ্যে কখন্ এক স্তর থেকে অন্য স্তরে সরে যায় দূরবর্তী ভাসমান প্রবাহে, নিঃসময়ের দিকে।

রবীন্দ্রনাট্য যেখানে মহত্তম সেখানে সময় এমনভাবে নিঃসময়ে মিলিত হয়ে যায়। 'আমার ভারি ইচ্ছে করছে ঐ সময়ের সঙ্গে চলে যাই—যে দেশের কথা কেউ জানে না, সেই অনেকদূরে'— অমলের এই বাসনা যেন চরিতার্থ হয় যখন নাটকের উক্ত সিদ্ধি আমাদের দূরের জগৎকে স্পর্শ করিয়ে আনে এবং একই সঙ্গে বহুতল অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। ট্র্যাজেডির খ্যাতনাম অভিনেত্রী সিবিল থর্নডাইক তাঁর অভিনয়ে অন্বেষণ করেছিলেন এই নিঃসময়ের অনুভব, কেননা 'Get above it into Timelessness, into the realm of imagination, the mind of God, into a place of quiet knowledge where the two opposites namely, intense feeling and beyond feeling are co-existent।'[১] নিবিড় অনুভব ও উধাও অনুভবের এই সমন্বয়েই শিল্পমহিমা. দৈনন্দিনতার থেকে সে তবে মুক্তি পায় চিরন্তনতার দিকে এবং শ্রেষ্ঠ শিল্পের সেই নিঃসময় অনুভূতি হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাটকেরও বিষয়। মুক্তধারা তীব্র শাণিত আঙ্গিকের মধ্যে ধারণ করেছে intense feeling, কিন্তু সেইখানেই, সাম্প্রতিক যন্ত্রকাল এবং সাময়িক সমস্যার মধ্যেই, তাকে নিহিত মনে হয়। সেই একই কাল এবং সমস্যাকে পটভূমিতে গণ্য করেও রক্তকরবী যে তার থেকে উত্তীর্ণ হতে পারল তার একটি বড়ো কারণই এই যে intense feeling এবং beyond feelingকে একত্র সংসক্ত করবার সাধনায় কবি এখানে তৎপর। মুক্তধারা সময়বদ্ধ, রক্তকরবী সময়হারা; মুক্তধারায় আছে আবেগের চাপ, রক্তকরবীতে আবেগের মুক্তি। কোন্ পদ্ধতিতে এই মুক্তি অর্জন সম্ভব? থর্নডাইক অভিনেতাদের জানিয়েছিলেন, your technique: a flexible voice! রবীন্দ্রনাথও হয়তো উপরি-উক্ত লক্ষ্যের অভিপ্রায়ে বলতে পারতেন, your technique: a flexible sequence!

৪

বলতে পারতেন নয়, বলেওছিলেন। একটু অন্যভাষায় রক্তকরবী রচনার প্রায় সমকালে অন্যত্র তিনি লিখেছেন 'কালের বা দেশের মাত্রা বদল করবা-মাত্রই সৃষ্টির রূপ এবং ভাব বদল হয়ে যায়'। সমীপবর্তী উক্তি কয়েকটি পর পর এইরকম :

> দেশই বলো, আর কালই বলো, যাতে করে সৃষ্টির সীমা নির্দেশ করে দেয়, দুইই আপেক্ষিক, দুইই মায়া।
>
> বিশ্বসৃষ্টির বৈচিত্র্যও দেশকালের মাত্রা-অনুসারে। কালের বা দেশের মাত্রা বদল করবা-মাত্রই সৃষ্টির রূপ এবং ভাব বদল হয়ে যায়।
>
> দেশকালের মধ্যেই দেশকালের অতীতকে উপলব্ধি করে তবেই আমরা বলতে পারি 'মরি মরি'।[১২]

রক্তকরবীতে কালের এই মাত্রাবদল ঘটে যাবার পর, সমগ্র সময়ের আয়ত্তীকরণের পর, সময়কে আবার কবি বাইরের দিক থেকে ভেঙে দিতে পারলেন নূতন একটি শিল্পরূপের মধ্যে—নাট্যসৃজনে তাঁর পরিণত আঙ্গিক নৃত্যনাট্যের মধ্যে। আপাত-ঐক্যের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাকে ভরে দিয়েছিলেন রক্তকরবীতে, আপাতবিচ্ছিন্ন কয়েকটি অংশের মধ্য দিয়ে ঐক্যকে স্পর্শ করলেন নৃত্যনাট্যে। চিত্রাঙ্গদা চণ্ডালিকা অথবা শ্যামায় দৃশ্যবাহুল্য নেই বটে, কিন্তু একই দৃশ্যপ্রেক্ষিতের ধারাবাহিকতাও এখন তিনি নিষ্প্রয়োজন ভাবছেন। চিত্রাঙ্গদা ছয়, চণ্ডালিকা তিন এবং শ্যামা চারটি পরম্পরায় বিন্যস্ত এবং তার মধ্যে সাম্প্রতিক কালের দ্রুত অপসরণও ঘটে যাচ্ছে। তিনটি নারীজীবনের দীর্ঘ দ্বন্দ্ববন্ধুর পথাতিক্রমণের পূর্ণ রূপটিকে প্রকাশ করা হয়েছে এই রচনাত্রয়ীতে, কিন্তু তার এক দ্রুত সুঠাম প্রবাহও রচিত দেখি শিল্পরূপে। তৃষাকাতর আনন্দের আবির্ভাবের অল্প পরেই প্রকৃতির যে বিহ্বলতা, তাকে কালপ্রবাহে অবিচ্ছিন্ন বলেই উপলব্ধি করতে অভ্যস্ত হই। তবু তো সত্যি যে মায়ের কাছে ইতিহাসের বিবৃতিতে প্রকৃতি যখন বলে 'সেদিন বাজল দুপুরের ঘন্টা, ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর' তখন সেই উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে একটা অনির্দেশ্য দূরতা সঞ্চারিত হয়ে যায় কালানুভবে। আবার অন্যদিকে, শ্যামার এক চতুর্থ দৃশ্যেই বজ্রসেনের প্রেম উৎকণ্ঠা অভিজ্ঞতা ঘৃণা ব্যাকুলতা অনুতাপ পর্যায়ক্রমে তাকে বিচলিত করে যায়, শ্যামার প্রবেশ ও প্রস্থানের মধ্যবর্তী একাধিক একাকিত্বে বজ্রসেনকে সংলাপমুখর শুনতে পাই। এখানেও ব্যাপ্তকালকে অনায়াস ভঙ্গিতে সংহত করে নেয়া হয়েছে স্বল্পসময়ের সীমায়। কিন্তু এর দ্বারা কোনো অসংগতির অনুভব জাগে না, বরং সুষমার তৃপ্তিই ভরে ওঠে। এ কেমন করে হল? আত্মন্ত নৃত্যগীতের সুসমঞ্জস ব্যবহারেই কালসীমায় সীমাহীন কালের এই অনুভব সম্ভবপর মনে হয়। ১৯৩০ সালে আইনস্টাইনের সঙ্গে আলাপনে কবি এমন এক মনের সম্ভাবনা জানিয়েছিলেন যার কাছে 'the sequence of things happens not in space but only in time like the sequence of

notes in music. For such a mind its conception of reality is akin to the musical reality'।[১৩] এই musical reality-র সন্ধান রক্তকরবীতে এক পদ্ধতি আশ্রয় করেছিল, নৃত্যনাট্যে পেল অন্য পদ্ধতি। কালের অংশগুলিকে যোজনা করে নয়, গান যে ঐক্যকে দেখায়, 'সে হচ্ছে রসের অখণ্ডতাকে সম্পূর্ণ করে' এ কথা অন্যত্র কবি লক্ষ্য করেছেন।[১৪] এই গান এবং তার অভিনয়-নৃত্যের মধ্য দিয়ে সেই অখণ্ড সমগ্রের উপলব্ধি সহজে নিবিড়তর করে পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রক্তকরবী রচনার পরবর্তীকালে জাভাযাত্রার অভিজ্ঞতা হয়তো তাঁর এ বিশ্বাসের মূলে রসসঞ্চার করেছিল। সেখানে তিনি অনুভব করেছেন যে নর্তকীরা সমস্ত দেহ দিয়ে কথা বলে, দেহ দিয়ে সময়ের উপর আলপনা রচনা করে যায় এবং 'এদের সংগীতই তাল, এদের নৃত্যই গান'।[১৫] এই প্রেরণা এল চিত্রাঙ্গদা চণ্ডালিকা শ্যামায়, যেখানে রসের অথবা সময়ের অখণ্ডতা সৃষ্টিতে নৃত্যগীতের যুগল সহায়তা রবীন্দ্রনাটকে একটি নূতন মাত্রার যোজনা করতে পারল। এর জন্য প্রয়োজন ছিল নৃত্যনাট্যগুলির মতো দ্রুত সুঠাম এক রূপের। কালের মাত্রাকে পরিবর্তিত করে নেবার সঙ্গে সঙ্গে ভাব ও রূপও যে কেমন করে পৃথক হয়ে যায়, এ হয়তো তারই এক বহিরঙ্গ প্রমাণ।

এই ভাবে মনে হয়, রবীন্দ্রনাটকে কালের ব্যবহারকে কয়েকটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা সম্ভব। প্রথমে ছিল ধারণা, পরে তার রূপ। ডাকঘরে ছিল সান্তকাল থেকে অনন্তকালের অভিমুখে আকর্ষণ, ফাল্গুনীতে সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে অনন্তের উপলব্ধি। এই ধারণারই রূপমূর্তি দেখা দিল পরবর্তী নাট্যচর্চায়। মুক্তধারায় এল আবদ্ধ কালের সংহতি, আর রক্তকরবীতে আপাতসংহতির মধ্যে প্রসারিত মুক্তি। এরও পর নৃত্য-নাট্যগুলিতে ফিরে আসে বাঁধনখোলার মধ্য থেকে গাঢ়তর সংহতির সন্ধান, আর সান্ত-অনন্তকে মিলিয়ে কালের এই মুক্তি ঘটিয়ে দিলে নৃত্য। নটরাজের যে চেলা 'মহাকালের বিপুল নাচে'ই 'বাঁধনখোলার সাধন' শিখছিলেন[১৬], এই শেষ শিল্পরূপটির মধ্যে কালের মুক্তিপ্রত্যাশা তাঁর পক্ষে ছিল স্বাভাবিক।

১। রবীন্দ্র-সংগীত, শান্তিদেব ঘোষ, পৃ ২২। ২। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, জাভাযাত্রীর পত্র, পৃ ৫০৫। ৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, জাপানযাত্রী, পৃ ৩০৪। ৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৬০১। ৫। শারদোৎসবের ২ দৃশ্য ঋণশোধে ১, রাজার ২০ দৃশ্য অরূপরতনে ৫, অচলায়তনের ৬ দৃশ্য গুরুতে ৪ দৃশ্যে পরিণত। ৬। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৬০৭। ৭। অবশ্য, জয়সিংহের মৃত্যু ঠিক অমাবস্যায় বলে উল্লিখিত নেই। রাজর্ষিতে এই দিনের উল্লেখ আছে ২৯ আষাঢ়, চতুর্দশী। বিসর্জনে শ্রাবণের শেষ রজনী। দিন প্রায় এক মাস সরে গেছে। ৮। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৫৩৩। ৯। *Rabindranath Tagore 1861-1961, A Centenary Volume*, Sahitya Akademi, পৃ ২০০। ১০। অভিনয় নাটক মঞ্চ, শম্ভু মিত্র, পৃ ১৪৫। ১১। *Theatre and Stage*, vol I, ed. Harold Downs, পৃ ৩১। ১২। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, পৃ ৪৪৩-৪৪। ১৩। *The Religion of Man*, পৃ ২২৫। ১৪-১৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, জাভাযাত্রীর পত্র, পৃ ৪৯৫। ১৬। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, নটরাজ, পৃ ১৯৫।

বিজ্ঞপ্তি

রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি-উৎসব উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে কর্মসূচী প্রণয়ন করেন, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে পরিষৎ-পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ তাহার অন্তর্গত। তদনুযায়ী ৬৬ বর্ষের তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা একত্র রবীন্দ্র-সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইল।

এই সংখ্যা প্রকাশে ভূতপূর্ব পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, পরিষদের ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বর্তমান সম্পাদক শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ ও সহকারী সম্পাদক শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় এবং পরিষদের অন্যান্য কর্মীগণ নানাভাবে পত্রিকাধ্যক্ষের সহায়তা করিয়াছেন। পরিষদের হিতার্থী শ্রীরাধাপ্রসাদ গুপ্ত, শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী, শ্রীশম্ভু সাহা, শ্রীক্ষিতীশ রায় এবং শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক নানাভাবে আনুকূল্য করিয়াছেন। যাদবপুর স্কুল অব প্রিন্টিং টেকনলজি বিনা ব্যয়ে এই সংখ্যার মলাটের চিত্রের ব্লক প্রস্তুত ও মুদ্রিত করিয়া দিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বিশ্বভারতীর সানুগ্রহ অনুমতিক্রমে এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যাসংগীত পাঠভেদ-সংবলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মলাটের প্রথম পৃষ্ঠার চিত্রও বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত; এই চিত্রের প্রতিলিপি আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত। মলাটের চতুর্থ পৃষ্ঠার চিত্র শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদারের সৌজন্যে প্রাপ্ত। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রখানি শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রুফের প্রতি-লিপি পত্রিকাধ্যক্ষের সংগ্রহভুক্ত। অপরাপর চিত্রসংগ্রহের বিষয় যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই সংখ্যায় রবীন্দ্রকৃতি আলোচনা-প্রসঙ্গে বিভিন্ন রচনা মুদ্রিত হইয়াছে। পরিষদের প্রথম পর্ব হইতে রবীন্দ্রনাথের সহিত এই প্রতিষ্ঠানের যে গভীর যোগ ছিল পরিষৎ অপর একখানি গ্রন্থে সে-বিষয়ে সকল বিবরণ প্রকাশ করিবেন; এই সংখ্যায়, পরিষদের কোন প্রতিষ্ঠাদিবস-উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন মুদ্রিত হইল।

নানা কারণে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটায় পত্রিকাধ্যক্ষ আন্তরিক দুঃখিত। এই বিলম্বের জন্য পত্রিকা প্রকাশের পূর্বেই দু-একটি প্রবন্ধ স্বতন্ত্র গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিবার অনুমতি দিতে হইয়াছে। এ জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ পরিষৎ-সদস্যদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৬

মুদ্রক
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা ৩৭

চিত্রাবলী-মুদ্রক
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
৭।১ বিধান সরণী, কলিকাতা ৬
০
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিয়ো
৭২।১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

ব্লক-নির্মাতা
বেঙ্গল অটোটাইপ কোম্পানি
২১৩ বিধান সরণী, কলিকাতা ৪
০
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিয়ো
৭২।১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রচ্ছদ-মুদ্রক
স্কুল অব প্রিন্টিং টেকনলজি
যাদবপুর, কলিকাতা ৩২